২৫ বছর পূর্তি স্মারক

চেতনায় দীপ্তপথ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

অভিমত

এই সেদিন যে কচি কচি-প্রাণবন্ত চেহারার ১১ জন আমার স্নেহের ছাত্রীরা ইসলামের আলোকে ছাত্রীদেরকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিল- তারাই আজ ২৫ বছরে উপনীত। সত্যি, ভাবতেই মনটা আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আজ তারা শুধু ইডেন কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন ছাত্রী সংগঠনের বিকল্প হতে পারে না। যাদের উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভরশীল- তাদেরকেই গঠন করার এই মহৎ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার যেখানে নারী সমাজ, সেখানে তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ছাত্রীরা আজ শালীনতার ব্যাপারে বেশ সোচ্চার, তাদের দ্বারাই সম্ভব উন্নয়নের কারিগর হিসেবে ইসলামের সুমহান দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবর্তন করা। তাই এই ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে তারা যে 'স্মারক' প্রকাশের পদক্ষেপ নিয়েছে, এতে আমি স্বাগত জানাই। আশা করছি এ স্মারক ভবিষ্যত জনশক্তির কাছে প্রেরণার উৎস হবে।

পরিশেষে, ছাত্রীসংস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছাত্রীরা অগ্রপথিক হিসেবে আল কুরআনের আলো দূর্বার গতিতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দিবে এ প্রত্যাশা করছি।

চেমন আরা
অধ্যাপিকা
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ
ইডেন মহিলা কলেজ।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ

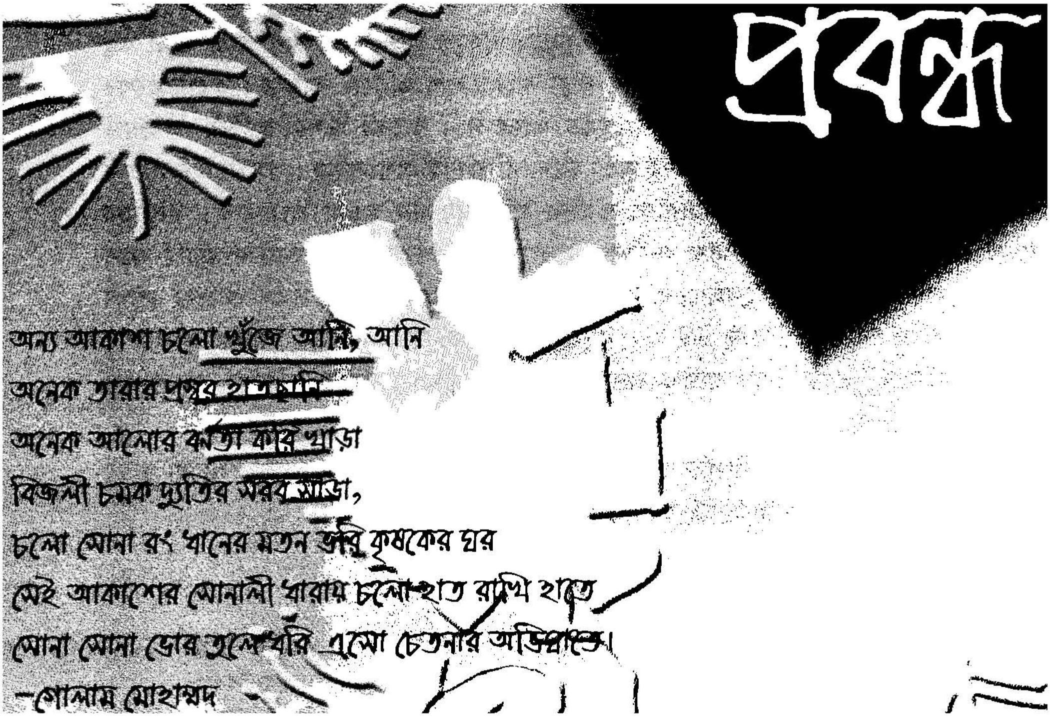

www.pathagar.com

যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনে মুসলিম মহিয়সীরা

রায়হান জামিলা

সৃষ্টিজগতে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। এ মানুষকে আল্লাহ নারী ও পুরুষ দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন। যদিও পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তথাপি বিশ্বজগতের মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারীরাই পুরুষের লাগাম হাতে নিয়ে আছে। কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়-

রাজা করিছে রাজ্য শাসন, রাজাকে শাসিছে রানী
রানীর কল্যাণে ধুয়ে গেল রাজ্যের যত গ্লানি।

নারীর কারণে যেমন- হেলেনের কারণে ট্রয় নগরীর ধ্বংস, সীতার কারণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ইসাবেলার কারণে স্পেনের মুসলিম সভ্যতার বিনাশ হয়েছে তেমনি নারীর কারণেই পৃথিবী সুন্দর ও সুষমামণ্ডিতভাবে গড়ে ওঠেছে। যে সব নারীরা মহান রাব্বুল আলামীনের পথনির্দেশিকা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তাদের কারণেই যুগে যুগে পৃথিবী হয়েছে সুষমামণ্ডিত, মানবজাতি হয়েছে গৌরবান্বিত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ায় মানুষকে তারই খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। খেলাফতের এ দায়িত্ব নারী ও পুরুষ উভয়েরই। আর এ দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর যমীনেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব। আল্লাহ নবীদের এ দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণা ঃ

"তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াতের বিধান এবং সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে এ দ্বীনকে দুনিয়ার সমস্ত মতবাদের উপর বিজয়ী করতে পারেন।" (সূরা আত তাওবা-৩৩, সূরা আল ফাত্তহ-২৮, সূরা আস সফ-৯)

এ কাজকে কুরআনে বলা হয়েছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, ইকামতে দ্বীন। আর বাংলায় বলা হয় ইসলামী আন্দোলন। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় এ দায়িত্ব শুধু পুরুষের একার নয়। কেবল পুরুষকেই এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। নারীরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। মহান আল্লাহ পাকের দরবারে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে পূর্ণমাত্রায়। কুরআনের ঘোষণা ঃ

"মুমিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা পরস্পর বন্ধু ও সাথী। তারা যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের উপর আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। এই মু'মিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবহমান এবং

www.pathagar.com

তারা সেখানে চিরদিন থাকবে এই চির সবুজ-শ্যামল বাগিচায়। তাদের জন্যে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের জায়গা থাকবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। (আত তাওবা ঃ ৭১-৭২)

এ দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে এবং সে দায়িত্ব পালনের জন্যে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কিভাবে কাজ করতে হবে তার নির্দেশও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেনঃ "আমি তোমাদের মধ্যে কারও কাজকে বিনষ্ট করে দেব না, পুরুষ হোক কি স্ত্রী –তোমরা সবাই সমজাতের লোক। কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্যে নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আমারই পথে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিস্কৃত হয়েছে ও নির্যাতিত হয়েছে এবং আমারই জন্যে লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সব অপরাধই আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচায় স্থান দেব যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে। আল্লাহর নিকট এটাই তাদের প্রতিফল। আর উত্তম প্রতিফল একমাত্র আল্লাহর কাছেই পাওয়া যেতে পারে। (আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই শুধু আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সময়েই নয় বরং তার আবির্ভাবের পূর্বে যে সমস্ত নবী-রাসূল এসেছিলেন তাদের সহযোগিতা এবং সাহায্যেও এগিয়ে এসেছিলেন কিছু মহিয়সী মহিলা। তাদের সাহায্য-সহযোগিতা এবং ত্যাগ ছাড়া এ ইতিহাস হয়তবা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। ইসলামী আন্দোলনের এ সুকঠিন কন্টকাকীর্ন চরাই-উৎরাইয়ের দুর্গম পথ পাড়িদানকারী হাজারো নারীর মধ্যে আমরা কতিপয় মহিয়সীর জীবন ইতিহাস আলোকপাত করছি। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তাদের জীবন ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি ঃ

১. রাসূল (সা) এর পূর্ববর্তী যুগ
২. রাসূল (সা) এর যুগ
৩. রাসূল (সা) এর পরবর্তী যুগ
৪. বর্তমান যুগ

১. রাসূল (সঃ) এর পূর্ববর্তী যুগ

(১) **হযরত হাজেরা ঃ** হযরত ইবরাহীম (আ) এর স্ত্রী হাজেরা। ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহর নির্দেশে স্ত্রী হাজেরা এবং তার শিশুপুত্র ইসমাঈলকে জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে রেখে আসলেন তখন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক হাজেরা এটা আল্লাহর নির্দেশ জেনেই সন্তুষ্ট চিত্তে এ ফায়সালা মেনে নিলেন। হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি আল্লাহর নির্দেশে আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন। তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহর নির্দেশ। তখন হাজেরা বলেছিলেন অর্থাৎ 'আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।' হাজেরা শান্তভাবে শিশুপুত্রের পাশে বসলেন এবং বললেন, যে আল্লাহ এ নির্দেশ দিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে ধ্বংস হতে দিবেন না। কি অপূর্ব নির্ভরশীলতা!

এ দিকে ঐ অবস্থায় স্ত্রী-পুত্রকে রেখে ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করলেন ঃ 'প্রভু হে। আমি আমার বংশের এক অংশকে জনমানবহীন এক মরুপ্রান্তরে তোমার ঘরের পাশে এনে বসিয়েছি, যেন তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং প্রভু হে! মানুষের মন তুমি এদিকে আকৃষ্ট করে দাও। ফল-মূল থেকে তাদের খাদ্য সামগ্রী দান কর, যেন তারা তোমার প্রতি কৃতার্থ হয়। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭)

এই দোয়া আল্লাহ অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেছেন। আল্লাহপাক বিবি হাজেরার মাধ্যমে আরব অর্থাৎ মক্কানগরীকে আবাদ করলেন। ইবরাহীম (আঃ) বিবি হাজেরাকে শিশুপুত্রসহ রেখে আসার পর সেই নির্জন প্রান্তরে বুকের সুধা দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলতে লাগলেন পুত্রকে। এরপর যখন ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হলেন সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে কুরবানী করতে তখন তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ অগ্নিপরীক্ষায় হযরত হাজেরা দ্বিধাসংকোচহীন চিত্তে তুলে দিলেন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে স্বামীর হাতে। বাস্তব কর্মে প্রমাণ করলেন ঈমানদার মানুষের কাছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে প্রিয়।

www.pathagar.com

(২) **হযরত রহিমা ঃ** আল্লাহর নবী হযরত আইয়ুব (আ) যখন কঠিন রোগাক্রান্ত, যখন তাঁর সুসময়ের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন একে একে সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেল তখন সাথে রয়ে গেলেন তার স্ত্রী রহিমা। আইয়ুব (আ) কে দিনের পর দিন সেবা-যত্ন দিয়ে কঠিন রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও সান্ত্বনা দিয়ে এসেছেন এই ত্যাগী। স্বামীর সেবা করতে গিয়ে কোন দুঃখকষ্টকে তিনি পরোয়া করেননি। এমন ত্যাগ তিতিক্ষার নজীর ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

(৩) **হযরত মরিয়ম (আ) ঃ** হযরত ঈসা (আ) এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ)। যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন নিজের বিশেষ নিদর্শন প্রকাশের জন্য। ছোটবেলা থেকেই বিবি মরিয়ম ছিলেন আল্লাহভীরু এবং ইবাদত বন্দেগীতে অভ্যস্ত। কুরআন মজীদে আল্লাহপাক বর্ণনা করেছেন ঃ

(আর হে নবী) এই কিতাবে মরিয়মের অবস্থা বর্ণনা কর। যখন সে আপন লোকজন থেকে আলাদা হয়ে পূর্বপ্রান্তে নিঃসম্পর্ক হয়ে রয়েছিল এবং পর্দা টাঙ্গিয়ে তার পিছনে লুকিয়ে বসেছিল এই অবস্থায় আমরা তাঁর নিকট নিজের রূহকে পাঠালাম, আর সে তার সামনে এক অপূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করল। মরিয়ম সহসা বলে উঠল ঃ তুমি যদি সত্যি কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তি হয়ে থাক তবে আমি তোমার থেকে রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সে বলল আমি তো তোমার রবের প্রেরিত। আর এজন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করব। মরিয়ম বলল ঃ আমার পুত্র হবে কেমন করে। যখন আমাকে কোন মানুষ স্পর্শ পর্যন্ত করেননি, আর আমি কোন চরিত্রহীনা নারীও নই। ফেরেশতা বলল ঃ এভাবেই হবে। তোমার রব বলেন যে, এরূপ করা আমার পক্ষে খুবই সহজ। আর আমরা এটা করব এ উদ্দেশ্যে যে, এই পুত্রকে লোকদের জন্যে একটি নিদর্শন বানাবো। আর নিজের তরফ থেকে এক রহমত বানাবো। এ কাজ অবশ্যই হবে। (সূরা মরিয়ম ঃ ১৬-২১)

এভাবে আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে বিবি মরিয়ম সহ্য করলেন হাজারো লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। লোকেরা তাকে বলতে লাগল ঃ

"(হে মরিয়ম) তুমিতো বড়ই পাপের কাজ করেছ। হে হারুনের বোন। তোমার পিতা তো কোন খারাপ লোক ছিল না। তোমার মাও ছিল না কোন চরিত্রহীন নারী। (মরিয়ম ঃ ২৭-২৮)

আল্লাহপাক মরিয়মকে এ সময়ে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেননি। এবং এ সময়ে আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন ঃ

"তাকে বল; আমি রহমানের জন্যে রোযার মানত মেনেছি। এ কারণে আমি আজ কারও সাথে কথা বলব না। (মরিয়ম ঃ ২৬)
এরপর মরিয়ম (আ) বাচ্চাটির দিকে ইশারা করলেন।

"শিশুটি বলে উঠল ঃ আমি আল্লাহর বান্দাহ। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন। বরকত ওয়ালা করেছেন– যেখানেই আমি থাকিনা কেন। আর নামায ও যাকাত দেয়ার নিয়ম পালনের হুকুম করেছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকব এবং আপন মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে স্বৈরাচারী ও খারাপ চরিত্রের বানাননি। সালাম আমার প্রতি, যখন আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি, যখন আমি মরব এবং যখন আমি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠব।" (মরিয়ম ঃ ৩০-৩৩)

দোলনায় শায়িত শিশু লোকদের সাথে এভাবে কথা বলে প্রমাণ করলেন, তিনি নিশ্চয় আল্লাহর প্রেরিত নবী এবং তার মাতা পবিত্র সতী সাধবী নারী। আর এই অবস্থায় ধৈর্যধারণ করার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তাকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ নারীর মর্যাদা দিলেন।

(৪) **হযরত আছিয়া ঃ** হযরত মুসা (আঃ) এর যুগের এক আদর্শ নারী হযরত আছিয়া। ফেরাউন ছিল মিসরের সম্রাট এবং খোদায়ী দাবীদার। হযরত আছিয়া ছিলেন তারই সম্রাজ্ঞী। কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহপাক কিছু মহামানব সৃষ্টি করেন যারা দুনিয়ার সমস্ত সুখ-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশকে পায়ে ঠেলে সত্য ও ন্যায়ের

www.pathagar.com

পথে থাকার জন্য হাজারো দুঃখ কষ্ট বরণ করেন। হযরত আছিয়াও ছিলেন এ রকমই একজন মহিয়সী মহিলা। তিনি অস্বীকার করলেন ফেরাউনের খোদায়ী দাবীকে, পক্ষান্তরে তিনি সাড়া দিলেন নিঃস্ব নিঃসম্বল আল্লাহর বান্দাহ হযরত মুসা (আ) এর আহ্বানে। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য গ্রহণ করে তিনি বিরাগভাজন হলেন ফেরাউনের। যালেম ফেরাউন কঠোর নির্যাতন চালালো তার উপর। কিন্তু তবুও তিনি সত্যের এ পথ থেকে বিচ্যুত হন নি।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন; দুনিয়ার সমস্ত নারীর উপর চারজন নারীর মর্যাদা রয়েছে– মরিয়ম বিনতে ইমরান, আছিয়া বিনতে মুবাহিম, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ।"

(২) রাসুল (সঃ) এর যুগ

(১) **মা আমেনা ঃ** তিনি হচ্ছেন ঐ নারী যাকে আল্লাহ তাআলা বেছে নিয়েছেন বিশ্ব মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মানুষ নবীকুল শিরোমনি দুনিয়া ও আখেরাতের সরদার বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জননী হিসেবে। তার পুরো নাম আমিনা বিনতে ওহাব ইবনে আবদ মানাফ ইবনে যোহরা ইবন কিলাব ইবন মুররা।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সঃ) বলেন, "আমি তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম বংশের অধিকারী। আদম থেকে নিয়ে আমার বংশে কোনই ব্যভিচারী নেই। সবসন্তানই নিকাহর মাধ্যমে জন্মপ্রাপ্ত।" হযরত ইবনে আব্বাসের সূত্রে ইবনে মুনযিব বর্ণনা করেছেন ঃ কোন নবীর স্ত্রী কোনদিন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি।" যেখানে নবীদের স্ত্রীদের চরিত্র সম্পর্কে এ ধরনের হাদীস রয়েছে সেখানে তাঁদের মাতা মাতামহের চরিত্র যে আরও সুন্দর নির্মল হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মাতৃ সম্পর্ক স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের চাইতে বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) এর মা বলেছেন, তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় আমার দেহ থেকে একটি নূর বেরিয়েছিলো, সেই নূরে সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহ ঝলমল করছিলো। রাসূল (সা) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তার দেহে জন্মের সময় চমক সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্বের মহামনীষীরা সতী-সাধ্বী ও পুণ্যবতী মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে ঐসব নারীদের ত্যাগ-তিতিক্ষা অপরিসীম। মা আমেনা পিতৃহীন শিশুপুত্রকে অতি আদরযত্নে ছয় বৎসর পর্যন্ত লালন পালন করেছেন এবং তাকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার পথে পরিচালিত করেছিলেন।

(২) **হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ঃ** রাসূল পাক (সা) এর প্রথম সহধর্মিণী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে রাসূল (সা) কে সার্বিক সহযোগিতা এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন স্বামীর জন্য বন্ধুর পথ অতিক্রম করে খাদ্য সরবরাহ করতেন দিনের পর দিন। বর্তমান হাজীরা হজ্ব করতে গিয়ে হেরা গুহায় অবাক হয়ে যান, কি করে এই বৃদ্ধ মহিলা প্রতিদিন এত উচুঁতে উঠে রাসূল (সা) এর জন্য খাবার পৌঁছে দিতেন। রাসূল (সা) এর উপর যখন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হল তখন তিনি ভীতশংকিত অবস্থায় বাড়ী ফিরে এলেন। তিনি খাদীজা (রাঃ) কে তাঁর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিতে বললেন। হযরত খাদীজা (রাঃ) অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইলেন। রাসূল পাক (সা) সবকিছু তাকে খুলে বললেন। তখন খাদীজা (রাঃ) তাঁকে প্রচুর সান্ত্বনার বাণী শোনালেন এবং তার অশান্ত মনকে শান্ত করলেন। শুধু তাই নয় বরং স্বামীর উপর অবতীর্ণ বিষয়কে সত্য বলে মেনে নিলেন। তিনিই প্রথম মুসলিম এবং প্রথম সালাত আদায়কারী। মক্কার ধনাঢ্য মহিলা খাদীজা (রাঃ) তার সমস্ত সম্পদ রাসূল (সা) হাতে তুলে দিলেন।

রাসূল (সঃ) দ্বীনের কাজ করে যখন গভীর রাতে বাড়ী ফিরতেন তখন খাদীজা (রাঃ) দরজার সথে নিজের পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাতেন। যাতে দরজার আওয়াজ শুনামাত্রই ঘুম ভেঙ্গে যায়। একদিন তিনি খাদীজা (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন– "হে খাদীজা। তুমি কি ঘুমাও না? প্রতিদিন আমি যত গভীর রাতে এসে দরজায় কড়াঘাত করি সাথে সাথে তুমি দরজা খুলে দাও।" তখন খাদীজা (রা) বললেন! আল্লাহর

www.pathagar.com

নবী দরজায় কড়াঘাত করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি ঘরের ভিতরে ঘুমে মশগুল থাকব তা কি করে সম্ভব?

রাসূল (সাঃ) সকল বিপদ-আপদে তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলতেন। অভিযোগ করতেন। নবুয়তের সপ্তম বছর মহররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদের বয়কট করে। তাঁরা শিয়াবে আবু তালিবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে হযরত খাদীজা (রাঃ)ও সেখানে অন্তরীণ ছিলেন। প্রায় তিনটি বছর বনু হাশিম দারুণ অভাব ও দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোন ব্যবস্থা প্রায় তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে হযরত খাদীজা (রা) হাসি মুখে সে কষ্ট সহ্য করেন।

মক্কার একজন বিত্তশালী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে স্বামীর সেবা করতেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–একদিন জিবরীল (আ) নবী (সঃ)এর নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে খাদীজা আসছেন পাত্রে করে আপনার জন্য তরকারী, খাদ্যসামগ্রী অথবা পানীয় কিছু নিয়ে। আপনি তাঁর রব ও আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মনি-মুক্তার তৈরী একটি বাড়ীর সুসংবাদ দান করবেন।"

নবুয়তের দশম বছরে খাদীজা (রাঃ) এর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এ বছর তাঁর চাচা আবু তালিবও ইন্তেকাল করেন যিনি দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর রাসূল (সঃ)কে আগলে রেখেছিলেন। তাই এ বছরকে তিনি শোকের বছর হিসেবে অভিহিত করেন।

রাসূলে করীম (সঃ) খাদীজা (রাঃ)কে গভীরভাবে ভালবাসতেন। খাদীজার মৃত্যুর পরও আজীবন তাঁর স্মৃতি ও অবদান মূহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি।

আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার খাদীজার কথা আলোচনা করলেন। আমি একটু কটুক্তি করে বললাম তিনি তো একজন বৃদ্ধা। তাছাড়া এমন, এমন। আল্লাহ তাঁর পরিবর্তে উত্তম নারী আপনাকে দান করেছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম নারী আমাকে দান করেন নি। মানুষ যখন আমাকে মানতে অস্বীকার করেছে, মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে তখন সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে তার সম্পদে আমাকে অংশীদার করেছে। আল্লাহ তার গর্ভে আমাকে সন্তান দান করেছেন এবং অন্যদের সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি বললাম ঃ আমি আর কখনও তাঁকে নিয়ে আপনাকে তিরস্কার করবো না। আয়িশা (রা) বলেন ঃ খাদীজার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) গৃহে কোন ছাগল জবেহ হলেই বলতেন ঃ কিছু গোশত তোমরা খাদীজার বান্ধবীদের বাড়ীতে পাঠাও।

হযরত খাদীজা (রা) নবী মুহাম্মদ (সা) কে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। অটল হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এবং নিজের সবকিছু তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মনবজাতির অপার কল্যাণ সাধন করে গেছেন এবং ইসলামী আন্দোলনে বিরাট অবদান রেখে গেছেন।

(৩) **হযরত আয়িশা (রাঃ)** ঃ আয়িশা (রাঃ) এর সাত বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং নয়বছর বয়সে ঘরে তুলে নেন। রাসূল (সা) যখন হিজরতের প্রাক্কালে আবু বকর (রা) এর বাড়ীতে আসেন এবং হিজরতের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেন তখন আয়িশা ও আসমা দুইবোন মিলে সফরের জিনিসপত্র গোছগাছ করেন। আয়িশা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দারসগাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবী শিক্ষার্থী। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা ছিল অতুলনীয়। রাসূলুল্লাহর (সা) অতি নিকটের মানুষ হওয়ার সুবাদে তিনি তার যাবতীয় কথা ও কাজ অধ্যয়নের খুব চমৎকার সুযোগ লাভ করেছিলেন। আয়িশা (রাঃ) এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদী রাসূল (সাঃ) এর একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের হাদীস জানতে পেরেছে। আবু মুসা আল আশসারী (রাঃ) বলেন, আমরা মুহাম্মদ (সা) এর সাহাবীরা কক্ষনো এমন কোন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হইনি, যে বিষয়ে আমরা আয়িশার (রা) নিকট জানতে চেয়েছি এবং সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান আমরা তাঁর কাছ থেকে পাইনি। হযরত আয়িশা (রা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক বড় বড় সাহাবীরা তাঁর কাছে জানতে চাইতেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর মদীনার সবচেয়ে বড় দারসগাহটি ছিল হযরত আয়িশার (রাঃ) হুজরা কেন্দ্রিক মসজিদে নববীর সেই বিশেষ স্থানে। ইরাক, মিসর, শাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে তাঁর খিদমতে হাজির হতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও ফতওয়া চাইতো, নারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে এবং যেসকল পুরুষদের থেকে হযরত আয়িশার (রাঃ) পর্দা করার প্রয়োজন ছিল না, তারা সকলে হুজরায় ভিতরের মজলিসে বসতেন, আর অন্যরা বসতেন হুজরার বাইরে মসজিদে নব্বীর মধ্যে। দরজায় পর্দা টানানো থাকতো। পর্দার আড়ালে তিনি নিজে বসতেন। লোকেরা প্রশ্ন করতেন। তিনি জবাব দিতেন।

ইসলাম পূর্ব আমলে মদীনার আনসারদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 'বুয়াস' এর বর্ণনা যেমন আয়িশা (রা) দিয়েছেন, তেমনি তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের কথা, দেব-দেবীর কথাও বলেছেন। ইসলামের কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেমন ওহীর সূচনা পর্ব, ওহী কেমন করে নাযিল হতো, ওহীর সময় রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থা কিরূপ দাঁড়াতো, নবুওয়াতের সূচনা পর্বের নানা ঘটনা হিজরতের ঘটনা, নিজের জীবনের ইফকের ঘটনা ইত্যাদির তিনি আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন। কুরআন কিভাবে, কি তারতীবে নাযিল হয়েছে এবং নামাজের পদ্ধতির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতকালীন অবস্থা, কাফন-দাফনের ব্যবস্থা, কাফনের কাপড়ের সংখ্যয়া মাপ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা তো বিশ্বাবাসী তাঁর মাধ্যমেই জেনেছে। শুধু কি তাই, তিনি যুদ্ধের ময়দানের অবস্থাও আমাদের শুনিয়েছেন। বদরের ঘটনা, উহুদের অবস্থা, খন্দক ও বনীকুরাইজার কিছু কথা, জাতুররিকা যুদ্ধে সালাতুল খানা এর অবস্থা, মক্কা বিজয়কালীন মহিলাদের বাইয়াত, বিদায় হজ্জের ঘটনাবলীর একাংশ ইত্যাদির কথা আমরা তাঁর মুখে শুনতে পাই। রাসূলুল্লাহর (সা) নৈশকালীন ইবাদতের কথা, ঘর-গৃহস্থালীর কথা, তাঁর আদব-আখলাক, স্বভাব-আচরণের কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন। এমন কি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে সবচেয়ে কঠিন দিন কোনটি গেছে সেকথাও তিনি বলেছেন। মোট কথা, নবী জীবনের একটি স্বচ্ছ ও সঠিক চিত্র তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আয়িশা (রাঃ) এর চারিত্রিক পবিত্রতার সার্টিফিকেট আল্লাহ স্বয়ং কুরআনের আয়াত নাজিল করে দিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই মহিয়সী নারীর জন্যে আরও আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন তায়াম্মুমের আয়াত। 'আলমুরাইসী' সফরে আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহর সঙ্গে ছিলেন। কাফেলা যখন আল বারদা নামক স্থানে পৌঁছে, তখন তার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে যায় এবং সাথে সাথে ব্যাপারটি তিনি রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) অবহিত করেন। সময়টি ছিল প্রভাত হওয়ার কাছাকাছি। রাসূল (সাঃ) যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন এবং এক ব্যক্তিকে হারটি খোঁজার জন্য দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন। ঘটনাক্রমে সৈন্যরা যেখানে তাঁবু গেড়েছিল সেখানে বিন্দুমাত্র পানি ছিল না। এ দিকে ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেল। লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত আবু বকরের নিকট ছুটে গিয়ে বলল, আয়িশা (রাঃ) সৈন্যবাহিনীকে কী বিপদের মধ্যে ফেলে দিল। আবু বকর (রাঃ) তখন সোজা আয়িশার (রাঃ) কাছে গিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে মেয়েকে বললেন, 'তুমি সব সময় মানুষের জন্য নতুন নতুন মুসীবত ডেকে আন।' ইসলামে এর আগে নামাজের জন্য ওযু ফরয ছিল। কিন্তু এই ঘটনার সময় পানি পাওয়া না গেলে কি করতে হবে, সে সম্পর্কে করণীয় কর্তব্য বলে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয় ঃ

'আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানি না পায়, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তবে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা ক্ষমাশীল।" (নিসা ঃ ৪৩)

তায়াম্মুমের ন্যায় পবিত্রতার এই সহজ বিধান যা অতীতে কোন উম্মতকে দান করা হয়নি, তা আয়িশা (রাঃ) এর কারণে উম্মতে মুহাম্মদী (সা) পেয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার একটি পুরস্কার।

হযরত আয়িশা (রা) বলতেন, আমি গর্বের জন্য নয়, বরং বাস্তব কথাই বলছি। আর তা হলো আল্লাহতাআলা এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা আর কাকেও দান করেননি। (১) ফিরিশতা রাসূলুল্লাহকে (স)

www.pathagar.com

স্বপ্নের মধ্যে আমার ছবি দেখিয়েছেন (২) আমার সাত বছর বয়সে রাসূল (সা) আমাকে বিয়ে করেছেন (৩) নয় বছর বয়সে আমি স্বামীগৃহে গমন করেছি (৪) আমিই ছিলাম রাসূলুল্লাহর একমাত্র কুমারী স্ত্রী (৫) যখন তিনি আমার বিছানায় থাকতেন তখনও তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো (৬) আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী (৭) আমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে (৮) আমি তাঁর খলিফা ও তাঁর সিদ্দিকের কন্যা (৯) আমাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে (১০) আমার মাগফিরাত এবং জান্নাতে আমাকে উত্তম জীবিকা দানের অঙ্গীকার করা হয়েছে (১১) রাসূলুল্লাহর (সা) পার্থিব জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে আমার মুখের লালা তাঁর লালার সাথে মিলেছে (১২) আমারই ঘরে তাঁর কবর দেয়া হয়েছে।

(৪) **ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ঃ** খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সঃ) এর কনিষ্ঠ কন্যা। তার মধ্যে চারিত্রিক মাধুর্যের সবরকম গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। স্বামী সেবা এবং সংসার জীবনে কৃচ্ছ সাধনার এক উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন তিনি নারী সমাজের জন্য। সংসারে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করতেন কিন্তু তাই বলে ইসলামের মূল জিনিস তার কাছে কখনও অবহেলিত হয়নি। অনেক সময় দেখা গেছে, তিনি একাধারে পায়ের সাহায্যে বাচ্চাদের দোল দিচ্ছেন, হাতে ময়দা পিষার জন্য চাকা ঘুরাচ্ছেন আবার কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করছেন। আটা পিষতে পিষতে তার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। পানির মশক টানতে টানতে তার বুকে দাগ পড়ে গেছে তবুও তিনি কখনও স্বামীর সংসারের প্রতি অবহেলা দেখাননি, স্বামীর কাছে কোনরূপ প্রাচুর্যের দাবী করেননি।

ফাতিমার (রাঃ) প্রশংসায় আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি ফাতিমার চেয়ে একমাত্র তার পিতা ছাড়া আর কোন ভাল মানুষ কখনো দেখিনি। একবার এক তাবেঈ আয়িশা (রা) কে প্রশ্ন করলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন? উত্তর দিলেন ঃ ফাতিমা। আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) মত চাল-চলন, উঠাবসায় মিলে যায় একমাত্র ফাতিমা ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। ফাতিমা যখন তাঁর পিতার সাথে দেখা করতে আসতেন পিতা সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, মেয়ের কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন। আবার পিতা তার ঘরে গেলে মেয়ে উঠে দাঁড়াতেন, পিতাকে চুমু দিতেন এবং নিজের স্থানে নিয়ে বসাতেন।

মা হিসেবেও আমরা তাকে আদর্শনীয় দেখতে পাই। শিশুকাল থেকেই তিনি হাসান-হুসাইনকে গড়ে তুলেছিলেন সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শে এমন যা না হলে এমন সুন্দর সন্তান কি কখনও সম্ভব হয়। যারা জান্নাতে হবেন কিশোরদের নেতা। ফাতেমা (রা) নিজেও যেমন ছিলেন পিতার সর্বাপেক্ষা আদরের তেমনি তিনি তার সন্তানদেরকেও গড়ে তুলেছিলেন পিতার আদর্শে।

(৫) **উম্মে সালমা ঃ** তিনি এবং তাঁর স্বামী আবু সালমা ইসলাম কবুলকারী প্রাথমিক দলের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং উভয়েই একই সাথে হাবশায় হিজরত করেন। এরপর তিনি স্বামী এবং পুত্র সালমাকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করার সময় পথিমধ্যে তার নিজ গোত্রের লোকেরা স্বামী থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর স্বামীর গোত্রের লোকেরা এসে পুত্রকেও নিয়ে যায়। স্বামী, স্ত্রী এবং পুত্র সন্তান তিনজনই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থায় প্রতিদিন তিনি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক পাহাড়ে বসে বসে ক্রন্দন করতেন। পরে তার গোত্রের এক দয়ালু লোকের পরামর্শে তাকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়। একথা শুনে স্বামীর গোত্রের লোকেরা ছেলেকে ফেরত দেয়। এরপর তিনি একাকী শিশুসন্তানকে সাথে নিয়ে উটের পিঠে করে মদীনার পথে রওয়ানা দেন। এভাবে তিনি হিজরতের সময় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। আবু সালমার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (সঃ) সাহাবীদের বার বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কেউ যখন অপমানজনক শর্ত মেনে নিয়ে ইহরাম ভাঙ্গতে রাজী হচ্ছিল না তখন উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) কে পরামর্শ দেন "আপনিই সর্বপ্রথম মাথা মুণ্ডন করে পশু কুরবানী করে দিন। আপনাকে দেখে সবাই তা করবে।" সাহাবীরা সাথে সাথে রাসূল (স) কে অনুসরণ করে মাথা মুণ্ডন করলেন। মীমাংসা হয়ে গেল এতবড় একটা সমস্যার। সবাই সন্ধিচুক্তি মেনে নিয়ে ফিরে গেলেন সে বছরের মত। সেই সন্ধি মুসলমানদের পক্ষে যে কত বড় সহায়ক হয়েছিল তা আমরা

www.pathagar.com

ইতিহাসে দেখতে পাই। হযরত উম্মে সালমা রাসূল (সা:) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করে উম্মতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন।

(৬) **আসমা বিনতে আবু বকর ঃ** প্রথমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি তাদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হিজরতের সময় তিনি গুহায় একদিন রাসূল (সাঃ) ও পিতা আবু বকরের (রাঃ) জন্য খাবার নিয়ে গেলেন। নাস্তা এবং পানির মশক বাঁধার জন্য রশি দরকার। কিন্তু এই মূহূর্তে হাতের কাছে রশি না পাওয়াতে তিনি নিজের নেতাক বা উড়না দু'টুকরো করে রশির কাজ সারেন। এক টুকরো দিয়ে নাস্তা এবং অপর টুকরো দিয়ে মশকের মুখ বন্ধ করেন। তখন রাসূল (সাঃ) তাকে 'যাতুন নেতাকাইন' উপাধি দেন। মদীনায় হিজরতের পথে তার প্রথম পুত্র আবদুল্লাহর জন্ম হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের হচ্ছে মদীনায় হিজরতের পর ইসলামের প্রথম শিশু। তিনি আব্দুল্লাহ এবং অন্যান্য পুত্রদেরকে দ্বীনি শিক্ষা ও আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ না করে মক্কাকে কেন্দ্র করে খেলাফতের আওয়াজ তোলেন। মক্কার শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের সাথে লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে মক্কা অবরোধ করে। দীর্ঘ ছয় মাস অবরোধের ফলে আব্দুল্লাহর সমর্থকদের অনেকেই পালিয়ে যায়। তখন তিনি মাতা আসমার কাছে পরামর্শের জন্য যান– আনুগত্য মেনে নেবেন কি না? জবাবে মাতা আসমা (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয় পুত্র, তুমি ভাল জান। তুমি যদি মনে কর যে, সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়ছ, তাহলে তোমাকে অটল-অবিচল থাকতে হবে। পুরুষের মত লড়ে যাও, প্রাণের ভয়ে কোন অবমাননা মেনে নেবে না। সম্মানের সাথে তরবারীর আঘাত খাওয়া অপমানের জীবনের চেয়ে অনেক উত্তম। তুমি শাহাদাত বরণ করলে আমি আনন্দিত হব। আর তুমি নশ্বর দুনিয়ায় লোভী প্রমাণিত হলে তোমার চেয়ে খারাপ আর কে হতে পারে। এমন লোক নিজেও খারাপ হয়, আর অপরকেও ধ্বংস ও জিল্লতীর চরমে নিয়ে ছাড়ে। তুমি যদি মনে কর যে, তুমি একা, আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় নেই, এটা সাহসী লোকদের কাজ নয়। তুমি কতকাল বেঁচে থাকবে? একদিন তো মরতেই হবে। তাই তোমার জন্য উত্তম হচ্ছে সুনাম রেখে মরা এতে আমি আনন্দিত হব।"

আব্দুল্লাহ তখন মৃত্যুর পর নানা প্রকার শাস্তির ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করছিল। তখন জবাবে আসমা (রাঃ) বলেন ঃ পুত্র! তুমি যে আশংকা প্রকাশ করছ, তা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু বকরী জবাই করার পর তার খাল ছিলে ফেলা হোক বা তাকে দিয়ে কিমা করা হোক তাতে বকরীর কোন কষ্ট হয় না।

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ মায়ের নিকট দোয়া চেয়ে লৌহবর্ম পরিধান করে শেষ বারের মত মায়ের সাথে দেখা করতে আসলে বার্ধক্যে দৃষ্টিশক্তিহীন আসমা (রাঃ) আব্দুল্লাহর সাথে কোলাকুলি করার সময় হতে লৌহবর্ম অনুভব করে বললেন ঃ প্রাণপ্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহ! যারা শাহাদাতের জন্য আকাংখী তারা লৌহবর্ম পরিধান করে না।

শাহাদাতের পর হাজ্জাজ আব্দুল্লাহর লাশ প্রকাশ্য রাজপথে ঝুলিয়ে রাখে। তিনদিন পর হযরত আসমা (রাঃ) দেখেন, নিচের দিকে মাথা দিয়ে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এমন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজেকে সংবরণ করে তিনি বললেন, ইসলামের ঘোড় সওয়ার দ্বীন মিল্লাতের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এ বীর পুরুষের কি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার এখনও সময় হয়নি।

হাজ্জাজের দম্ভ আর ঔদ্ধত্যের সামনে আসমার (রাঃ) ব্যক্তিত্ব ইসলামের ইতিহাসে অক্ষয় ও স্মরণীয় হয়ে আছে।

(৭) **হযরত খানসা (রাঃ) ঃ** হযরত উমরের শাসনামলে কাদেসীয়ার যুদ্ধে হযরত খানসা তার চারপুত্রকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। পুত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ "আমার প্রিয় সন্তানরা। তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ, স্বেচ্ছায় হিজরত করেছিলে। সেই অবিনশ্বর রবের শপথ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যেমনিভাবে তোমরা গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছ, ঠিক তেমনিভাবে তোমার পিতার সত্য

www.pathagar.com

সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে প্রতারণা করিনি? তোমাদের বংশধারা নিষ্কলুষ, নিষ্কলংক। তোমরা জান, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্যে মুসলমানদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট সওয়াব। এ সত্য তোমরা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করে নেবে যে, অবিনশ্বর সত্যের তুলনায় এ নশ্বর জগত অতি তুচ্ছ, নগণ্য। আল্লাহতা'আলা বলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধারণ কর, দৃঢ়পদ প্রদর্শন কর, সত্যের খেদমতের জন্য উঠেপড়ে লেগে যাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (আলে ইমরান ঃ ২০০)

তোমরা যখন দেখবে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যুদ্ধের তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে আর তার স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে চিকচিক করছে, তখন তোমরা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে এবং নির্দ্বিধায় তরবারী চালাবে আর অবিনশ্বর আল্লাহর নিকট থেকে বিজয় ও সাহায্য প্রত্যাশা করবে। ইনশাআল্লাহ পরকালের শ্রেষ্ঠত্ব মহত্বে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।"

মায়ের উপদেশ অনুযায়ী চারপুত্র রণক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ে এবং ইতিহাসের পাতায় শৌর্য-বীর্য আর সাহসিকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শেষ পর্যন্ত সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। হযরত খানসা তাদের শাহাদাতের খবর শুনে বলেন, আল্লাহর শোকরিয়া, তিনি তাদের শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট আমার প্রত্যাশা, আমি তাঁর রহমতের ছায়ায় আমার সন্তানদের সাথে মিলিত হবো।

(৮) **হযরত ছাফিয়া (রাঃ)** ঃ রাসূল (সাঃ) এর ফুফু হযরত সাফিয়া কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। খন্দকের যুদ্ধে এক ইহুদী দুর্গে হামলা করতে এলে তিনি সাহস করে তাঁবুর একটি খুঁটি তুলে ইহুদীর দিকে ছুড়ে মারার ফলে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ইহুদী মারা যায়। তারপর তিনি মৃতদেহ ইহুদীদের মধ্যে ছুঁড়ে মারেন। ওহুদের যুদ্ধে দুর্বল ঈমানের মুজাহিদদের বর্শা দিয়ে মেরে মেরে পলায়ন থেকে বারণ করেন এবং বলেন, তোমরা নবীজীকে রেখে পলায়ন করছ! যুদ্ধে তিনি নিজ ভাই হামযা (রঃ) এর বিকৃত লাশ দেখে নিজেকে এতটা সংবরণ করেন যে, কেবল 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলে মাগফিরাতের দোয়া করেন।

(৯) **উম্মে আম্মারা (রাঃ)** ঃ আকাবার বাইয়াতে যে দু'জন নারী অংশগ্রহণ করেন তন্মধ্যে তিনি একজন। ওহুদের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলে নবীজী বলতেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আমি যেদিকেই তাকিয়েছি, সব দিকেই উম্মে আম্মারাকে দেখতে পেয়েছি। তিনি আমার হেফাজতে যুদ্ধ করছিলেন।

(১০) **সুমাইয়া (রাঃ)** ঃ মশহুর সাহাবী হযরত আম্মার (রাঃ) এর মাতা। যারা ইসলামের জন্য সকল দুঃখকষ্ট অকাতরে বরণ করেছেন। হযরত সুমাইয়া (রাঃ) ছিলেন তাদের একজন। তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা যাকে সত্যের জন্য নানা প্রকার নির্যাতন সইতে হয়েছে। কেবল ইসলাম কবুলের কারণে মুশরিকরা তাকে লোহার পেশাক পরিধান করিয়ে মক্কার উত্তপ্ত বালুর মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখতো। রাসূল (সাঃ) সে পথ গমনকালে হযরত আম্মার এবং তার মাতাপিতাকে এ অবস্থায় দেখে বলতেন, ধৈর্য ধারণ কর, ইয়াসের এর পরিবার, তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। হযরত সুমাইয়ার দিন অতিবাহিত হতো এ অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে, রাত্রে কিছুটা পানি পেতেন। একদিন তাকে ঘরে এনে আবু জেহেল গালি দিতে দিতে তার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে। এতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে তিনি ইসলামের প্রথম শহীদের গৌরব অর্জন করেন।

(১১) **উম্মে মা'বাদ (রাঃ)** ঃ হিজরতের সময় নবীজী তার গৃহে অবস্থান করেন। তিনি নবীজীকে উত্তমভাবে মেহমানদারী করেন, তাঁর জন্য বকরী জবাই করেন। তাঁকে দেখা মাত্রই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন।

(১২) **উম্মে সুলাইম (রাঃ)** ঃ তিনি নিজ পুত্র আনাসকে নবীজীর খেদমতে পেশ করেন। আনাস ছিলেন নবীজীর বিশেষ খাদেমদের একজন। নবীজী তার গৃহে একবার তাশরীফ আনলে তিনি মাখন এবং খেজুর খেতে দেন। তিনি বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আনাস আপনার খাদেম। আমি তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি। তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন।

www.pathagar.com

(১৩) **ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ঃ** সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দশজনের মধ্যে তিনি এবং তাঁর স্বামী অন্যতম। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের মূলে ছিল তার বোন ফাতিমা। ইসলাম কবুল করার কারণে তিনি ভাই উমরের হাতে রক্তাক্ত হন।

(১৪) **খাওলা বিনতে খাত্তাব ঃ** ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমান সৈন্যদের তাঁবুতে রাতের অন্ধকারে তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে হামলা চালিয়ে সৈন্যদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। এভাবে তিনি সেই যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

(৩) রাসূল (সাঃ) এর পরবর্তী যুগ

(১) **ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এর নানী ঃ** তখন ছিল দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ) এর খেলাফত কাল। দুধে পানি মেশানো তখন ছিল সরকারীভাবে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। রাতের বেলায় তার নানী তাকে দুধে পানি মেশাতে যখন বলেছিল তখন তিনি বললেন, খলিফা না দেখলেও আল্লাহ্ তো দেখতে পাচ্ছেন। তখন তিনি যদিও ছোট্ট বালিকা মাত্র তবুও আল্লাহ ভীতি ছিল তার অন্তরে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই কথোপকথন শুনতে পান এবং এ-বালিকাকে পুরস্কৃত করেন। সেই মহিলারই নাতী ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ। কাজেই আল্লাহ্ ভীতির মহৎ গুণ মেয়ের মাধ্যমে নাতীর মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

(২) **আবদুল কাদের জিলানীর মা ঃ** আবদুল কাদের জিলানীকে তিনি ছোটকাল থেকে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে গড়ে তোলেন। তাকে জ্ঞানার্জনের জন্য বাণিজ্য কাফেলার সাথে বাগদাদ পাঠানোর প্রাক্কালে বলেছিলেন, ওহে বৎস, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। মায়ের এ শিক্ষা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। পথিমধ্যে ডাকাত দল যখন কাফেলাকে আক্রমণ করে সকলের মাল-সম্পদ লুট করল তখন তাকে দেখে ডাকাতের সরদার জিজ্ঞাসা করল-'তোমার কাছে কি আছে?' তিনি তখন নিজ জামার আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা চল্লিশ দিরহাম এর কথা জানালেন। ডাকাতের সরদার ছোট্ট বালকের এই সত্যবাদিতায় বিমোহিত হয়ে পরবর্তীতে ডাকাতি কাজ পরিহার করে একজন সৎ ব্যক্তিতে উন্নীত হতে পেরেছিল।

গর্ভাবস্থায় তিনি এতবেশী কোরআন তেলাওয়াত করতেন যে, পুত্র মায়ের গর্ভ থেকে ১৮ পারা পর্যন্ত কোরআন হেফ্‌জ করে এসেছে। এ ধরনের মায়েদের থেকে জন্মগ্রহণ করে উন্নত মানুষ যারা জগতকে আলোকিত করে তোলে।

(৩) **বায়েজীদ বোস্তামীর মা ঃ** তিনি তার ছেলেকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দ্বীনি চরিত্রে চরিত্রবান করে গড়ে তুলেছেন। এজন্য ছেলে মায়ের যথাযথ সম্মান ও সেবা করে বড় হতে পেরেছিল। ঘুম থেকে জেগে রাতের অধিকাংশে মা যখন পানি চাইল তখন ছেলে কলসীতে পানি না পেয়ে গভীর রাতে পানির জন্য ঝরনার কাছে ছুটে গেল এবং ফিরে এসে এক গ্লাস পানি ঢেলে মায়ের কাছে এসে যখন দেখলেন যে, মা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন মায়ের ব্যাঘাত হবে মনে করে মাকে না জাগিয়ে সারারাত মায়ের শিয়রে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মা ঘুম থেকে জেগে উঠে ছেলেকে এই অবস্থায় দেখে রাতের কথা মনে পড়ল। সাথে সাথে তিনি ছেলের জন্য দু'হাত উঠিয়ে মহান রবের দরবারে দোয়া করলেন। মায়ের দোয়ায় তিনি আজ দুনিয়ার বুকে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই মায়েরা সঠিক আদর্শে সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে আর এজন্য সন্তানরা মায়ের যথাযথ সম্মান ও সেবার পরিবর্তে দুর্ব্যবহার ও অমানবিক আচরণ করছে।

(৪) **সাঈয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর মা ঃ** সাঈয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী পাক-ভারত উপমহাদেশে মুজাহিদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তার মায়ের জীবনী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তিনি একজন আদর্শ মহিলা ছিলেন। এই জন্য তিনি ছেলেকে দ্বীনের মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

কিন্তু বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই যে, একমাত্র মুসলমান নারী কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিধান অমান্য করে নিষিদ্ধ আপন দেহ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছে। হোটেল রেস্তোঁরায় গিয়ে লাঞ্চ ও ডিনার খাচ্ছে,

www.pathagar.com

নৈশক্লাবের আনন্দ উপভোগ করছে, সিনেমা হলে গিয়ে পুরুষদের মাঝে উপবেশন করছে, পর্যটন কেন্দ্রের বায়ু সেবন করছে, বাজারে ঘুরে অসঙ্কোচে কেনাকাটা করছে। আরও আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলামী আইন ভঙ্গ করে এসকল কাজ করার দরুন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবার পরিবর্তে তারা আপন কার্যকলাপকে আরো গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করছে। এই নব্য পাশ্চাত্যঘেষা মহিলাদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত সন্তানদের ভবিষ্যৎ কি হবে? যে শিশু চোখ খুলেই তার চারপাশে শুধু ফিরিঙ্গিপনারই নিদর্শন দেখতে পাবে। যার নিষ্পাপ দৃষ্টি ইসলামী তাহ্যীব ও তমদ্দুনের কোন লক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করবেনা, যার কানে কখনো আল্লাহ ও রাসূলের কথা প্রবেশ করবে না, যার মন মগজের নির্মল পটে শুরু থেকেই ফিরিঙ্গিপনার চিত্র অঙ্কিত হয়ে যাবে সে তার আবেগ-অনুভূতি, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র, কার্যকলাপ, এক কথায় কোনো একটি দিক দিয়েও মুসলমান হয়ে গড়ে উঠতে পারবে না। আর কি করেই বা সম্ভব এক সাহসী দ্বীনি মুজাহিদ হওয়া।

(৪) বর্তমান যুগ

(১) **মরিয়ম জামিলা ঃ** আমেরিকার এক ইহুদী পরিবারে তার জন্ম। পূর্ব নাম ছিল মার্গারেট মার্কাস। ছোটবেলা থেকেই ইহুদীবাদের গলদ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। এজন্য তাকে অনেক দুঃখকষ্ট সইতে হয়েছে, এমনকি নিজ পরিবারেও যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজের দেশ, ঘরবাড়ী, স্বজন ছেড়ে পাকিস্তানে হিজরত করেছেন। তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সবটুকু মুসলিম জাগরণের কাজে লাগানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ পর্যন্ত অনেক বই লিখেছেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

(২) **জয়নাব আল গাজ্জালী ঃ** পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কাফেলাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য যেসব বিপ্লবী মানুষ জীবন বাজী রেখেছেন তাদেরই একজন জয়নাব আল গাজ্জালী। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে তথা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ যে সবকিছুর উর্ধ্বে একথা তিনি জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন। এই মহিয়সী নারীর জন্ম মিসরে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ক্রীড়নক হিসেবে প্রেসিডেন্ট নাসের যখন মিসরে মুক্তিকামী জনগণের উপর জঘন্যতম অত্যাচার চালাচ্ছিল তখন যেসব মানুষ ন্যায় ও সত্যের পক্ষে বাতিলের বিরুদ্ধে আওয়াজ বুলন্দ করেন, জয়নাব আল গাজ্জালী তাদের অন্যতম। প্রেসিডেন্ট নাসের তাকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর লোভ দেখান। কিন্তু তিনি এসব কিছু প্রত্যাখ্যান করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেন। নাসের তখন হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সড়ক দুর্ঘটনার এক নাটকীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। অবশেষে শেষ রক্ষার জন্য তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে তার উপর চালানো হয় অবর্ণনীয় নির্মম নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। কিন্তু কারাগারের সীমাহীন অত্যাচার যুলুমের পরেও তিনি স্বৈরাচারী খোদাদ্রোহী সরকারের কাছে নতি স্বীকার করেন নি। মানসিক যাবতীয় নির্যাতন সহ্য করে তিনি আল্লাহর পথে অটল অবিচল হয়ে রয়েছেন।

(৩) **হামিদা কুতুব ও আমেনা কুতুব ঃ** তারা শহীদ সাইয়েদ কুতুবের বোন এবং আরবী সাহিত্যের অম্লান দু'টি অনন্যা ব্যক্তিত্ব, তাদের একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে জাগাতে চেষ্টা করেছেন। কারাগারেও তারা ছিলেন তাদের ভাইদের সাথী। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে মিসর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কারাবাসকেও তারা বরণ করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সত্যে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামের জন্যে পুরুষরা যা করেছে মেয়েরা তার চেয়ে কম করেনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। ইসলামের প্রথম ঈমানদার প্রথম শহীদ এবং প্রথম সালাত আদায়কারীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হলেন দু'জন নারী। ইসলামের খাতিরে

www.pathagar.com

নারীরা কষ্ট সহ্য করেছে । তারা সবধরনের বিপদকে বরণ করে নিয়েছে। জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে ত্যাগ করেছে, নির্বাসন ও অনাহারের কষ্ট স্বীকার করেছে এবং সত্য দ্বীনের পথে সংগ্রামে তাদের পিতা, স্বামী ও ভাইদের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছে। ঐ সমস্ত নারীদের কারণেই ইসলাম এক সময় বিশ্বে কর্তৃত্ব করেছে।

প্রিয় বোনেরা, ইসলামী সভ্যতার বিকাশের জন্য অন্তপুর হচ্ছে সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এখানেই ইসলাম তার তাহযীব তমুদ্দুনের পরিচর্যা ও নিরাপত্তা বিধান করে। ইসলাম নারীকে যেসব কারণে শরয়ী পর্দার মধ্যে রাখতে ইচ্ছুক তার একটি বড় কারণ এই যে, যে বক্ষদেশ থেকে মুসলিম শিশু দুগ্ধ পান করে, অন্তত সে বক্ষদেশটি ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত থাকা প্রয়োজন। যে ক্রোড়ে মুসলিম শিশু প্রতিপালিত হয়, সে ক্রোড়টি অন্তত কুফর ও ভ্রষ্টতা, অনৈতিকতা ও কদাচার থেকে নিরাপদ থাকা দরকার। যে দোলনায় মুসলিম সন্তানের জীবনের প্রারম্ভিক স্তরগুলো অতিক্রান্ত হয়, তার চারপার্শ্বে অন্তত খালেছ ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করা প্রয়োজন। যে চারদেয়ালের মধ্যে মুসলিম শিশুর সরল মন-মগজে শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রাথমিক চিত্র অংকিত হয়, সেটি অন্তত বহিঃ প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকা আবশ্যক। আল্লাহ্‌র বিধান ভীরু কাপুরুষদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। নফসের দাস ও দুনিয়ার গোলামদের জন্যে নাযিল হয়নি। বাতাসের বেগে উড়ে চলা খড়কুটো, পানির স্রোতে ভেসে চলা কীট-পতঙ্গ এবং প্রতি রঙে রঙ্গীন হওয়া রংহীনদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। এমন দুঃসাহসী নরশার্দুলদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বাতাসের গতি বদলে দেবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, যারা নদীর তরঙ্গের সাথে লড়তে এবং তার স্রোতধারা ঘুরিয়ে দেবার মত সৎ সাহস রাখে। যারা আল্লাহ্‌র রংকে দুনিয়ার সকল রঙ্গের চাইতে বেশী ভালবাসে এবং সে রঙ্গেই যারা গোটা দুনিয়াকে রাঙ্গিয়ে তোলার আগ্রহ পোষণ করে। যে ব্যক্তি মুসলমান তাকে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার জন্য পয়দা করা হয়নি। তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো জীবন নদীকে তার ঈমান ও প্রত্যয় নির্দেশিত সোজা ও সরল পথে চালিত করা। আর আজও এ ধরনের উন্নত মুসলমান জন্ম দিতে হলে এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ করতে হলে উক্ত গুণাবলীর অধিকারী ঐসব মুসলিম মহিয়সীদের অনুসরণ করে ঈমানের সত্যতা প্রদর্শন করতে হবে।

www.pathagar.com

ছাত্রীসংস্থার ২৫ বছর ঃ একটি সুন্দর সমাজ গড়ার অঙ্গীকার

উম্মে খালেদা জাহান

অনেক শহীদের রক্তে রাঙানো প্রিয় স্বদেশভূমি বাংলাদেশ। এক বুক স্বপ্ন নিয়ে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নের বেড়াজাল ছিন্ন করে সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধ একটি দেশ গঠনের বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে আবির্ভাব হয়েছিল এ দেশটির। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শাসকদের ক্ষমতা লিপ্সা, অন্যায়-অরাজকতা লালন, আদর্শিক শূন্যতা-সর্বোপরি স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত একদল দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে গঠনমূলক ও সুপরিকল্পিত চিন্তার অভাবে শান্তির কাঙ্ক্ষিত সোনালী দিনগুলো স্বপ্নেই থেকে গেল। দেশের জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরির অন্যতম প্রতিষ্ঠান সর্ব পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গনগুলো কিন্তু স্বাধীন দেশের জাতীয় বিশ্বাস ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের অভাবে ব্রিটিশ হতে প্রাপ্ত গোলামীর শিক্ষাব্যবস্থা পরাধীনতার মানসিকতা সম্পন্ন আত্মপ্রত্যয়হীন ছাত্রসমাজ তৈরি করতে থাকে। উপরন্তু পাশ্চাত্য অশ্লীল সংস্কৃতির বিষাক্ত ছোঁয়া, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ব্যক্তি স্বার্থে ছাত্রদের রাজনীতিতে ব্যবহার, ধর্মনিরপেক্ষতার ছায়ায় ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চায় অনুৎসাহিতকরণ প্রভৃতি তৎপরতার ফলে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্রসমাজকে গ্রাস করে অনৈতিকতা কলুষতার অন্ধকার। যৌবনের উন্মাদনার বিপক্ষে ব্যবহারের ফলে ছাত্রসমাজ হয়ে পড়ে বেপরোয়া, বৃদ্ধি পেতে থাকে খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই চাঁদাবাজীসহ সন্ত্রাসী তৎপরতা। অনৈতিকতার এ ছোঁয়া লাগে ছাত্রীসমাজের মধ্যেও। ফলশ্রুতিতে ধর্ষণ, অপহরণের শিকার হয়ে হারিয়ে যেতে থাকে অসংখ্য ছাত্রী। কন্যা-জায়া-জননী হিসেবে অত্যন্ত সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত নারী সমাজ হয়ে পড়ে অধিকারহারা, নিরাপত্তাহীন।

এমনি পরিস্থিতিতে অন্যায়, অনৈতিকতা, অশ্লীলতার সয়লাবে ভেসে চলা দিকভ্রান্ত ছাত্রীসমাজকে গভীর মমতায় সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথে এগিয়ে নেয়ার মানসে অনন্য রাহবারের ভূমিকা পালনের দৃঢ় প্রত্যয়ে ১৯৭৮ সালের ১৫ই জুলাই ইডেন মহিলা কলেজ হতে মাত্র ১১ জন বোনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে সত্যের পতাকাবাহী দেশের একমাত্র একক ছাত্রী সংগঠন- বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। রাত্রির কালো বুক চিরে প্রভাতের শুভ্র রেখার মতোই আলোর সংকেত নিয়ে যে সংগঠন যাত্রারম্ভ করেছিলো হাজার হাজার ছাত্রীবোনের হৃদয়ে আলো ছড়িয়ে আজ সে সংগঠন পূর্ণ করেছে সাফল্যের ২৫ বছর। যুগের মুয়াজ্জিন হিসেবে তার কণ্ঠস্বর পৌঁছে গিয়েছে রাজধানীর বুক ছাড়িয়ে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত। ৩ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদর্শ মুসলিম নারী গঠনের উদ্দেশ্যে ছাত্রীসংস্থা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ একজন নারীর মাধ্যমেই গড়ে উঠে পরিবার, একজন নারীর আদর্শ, চিন্তা, চেতনার সংস্পর্শেই বেড়ে উঠে ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা। তাই কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে ছাত্রীসমাজকে

www.pathagar.com

সঠিকভাবে পরিচর্যা করে এ গুরুদায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তুলতেই কিছু চিন্তাশীল বোনের অগ্রযাত্রা। সুদীর্ঘ এ ২৫ বছরে ছাত্রীসংস্থা স্বীয় উদ্দেশ্য হতে একচুলও সরে আসেনি। এ সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বিশ্লেষণপূর্বক আদর্শ মুসলিম নারী গঠনের মাধ্যমে সুন্দর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় ছাত্রীসংস্থার প্রত্যয় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে।

যথার্থ প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বাংলদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ১ম দফা কর্মসূচি ঃ দাওয়াত

সত্যের মশাল হাতে অন্তরে ঈমানের রৌশনী নিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রীসমাজের হৃদয়ের সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সেই শাশ্বত আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিলো এ কাফেলার– "তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে লোকদের আল্লাহর পথে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা দিল আমি মুসলমান।" (হামীম আস সাজদা- ৩৩) হতাশার পঙ্কে নিমজ্জিত ছাত্রীসমাজকে সত্য ও ন্যায়ের উজ্জ্বল পথে আহ্বান জানানোর পাশাপাশি স্বীয় ঈমানকে মজবুত করার লক্ষ্যে গুটিকয়েক ছাত্রী বোন পথ বড় দুর্গম জেনেও যে যাত্রা শুরু করেছিলো আজও তা থেমে যায়নি। কারণ এ যে আল্লাহর প্রিয় নবী রাসূল (সাঃ) অনুসৃত পথ, শান্তি কল্যাণের পথ, রাসূল (সাঃ) এর উপর নবুওয়াত প্রাপ্তির পরপরই দ্বিতীয় মৌলিক নির্দেশ ছিলো দাওয়াত–"ওঠ, সতর্ক কর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।"

শুরু হয় রাসূল (সাঃ)-এর দাওয়াতী জিন্দেগী। মানবজাতিকে খোদাহীন সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা সংস্কৃতির পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক সাবধান করার কাজে আত্মনিয়োগ। দাওয়াতের মাধ্যমেই রাসূল (সাঃ)-এর সংগ্রামমুখর আন্দোলনী জীবনের সূচনা। কোরআনের ডাকে সাড়া দানকারীদের কোরআন প্রবর্তিত প্রশিক্ষণপদ্ধতির সাহায্যে এমন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তুলেন তৎকালীন আরব সমাজের যাবতীয় ক্লেদাক্ততাকে অপসারণ করে যাদের দ্বারা পরিচালিত সমাজ আজও সোনালী সমাজ হিসেবে আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

তাইতো কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ ছাত্রীসংস্থার প্রথম দফা কর্মসূচি হলোঃ–

"ছাত্রীদের মধ্যে দ্বীন ইসলামের সঠিক ধারণার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার"। সংক্ষেপে দাওয়াত। এ কর্মসূচির রয়েছে ২টি দিক-

ক. ছাত্রীদের মধ্যে দ্বীন ইসলামের সঠিক ধারণা দান

খ. ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার।

◆ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের অবারিত সবুজের মতোই বেশিরভাগ মুসলিম ছাত্রীর অন্তরের গহীনে লুকিয়ে রয়েছে সুন্দর সতেজ একটি মন। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃক মুসলমানদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে ঈমান শূন্য করার জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ বিবর্জিত, বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, অনৈতিকতার প্রসার ছাড়াও অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের স্বকীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি বিলুপ্ত হতে থাকে। আত্মমর্যাদাহীন তাবেদার জাতি সৃষ্টিতে তাদের প্রবর্তিত নীলনকশা অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তী সময়েও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চাকচিক্য ও আপাত মনোমুগ্ধকর মোহময়তায় আকৃষ্ট হয় এদেশের ছাত্রী তথা আপামর জনসাধারণ। পরিবর্তিত হতে থাকে তাদের আচার-আচরণ, চলাফেরা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির যা যুগ যুগ ধরে লালিত জাতীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা সত্ত্বেও ঘনঘোর অন্ধকারে আশার আলোকবর্তিকা এই যে, বৃটিশদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছাত্রীসমাজ তথা মুসলমানদের মন-মানস হতে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মুছে ফেলা যায়নি। ভুলক্রমে এ চোরাবালিতে পা বাড়ালেও তাদের অন্তরে রয়েছে সত্যের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ। ছাত্রীসংস্থা বিশ্বাস করে শুষ্ক মরুভূমির বুকে লুকিয়ে থাকা মৃত বীজ যেমন বৃষ্টির পানির শীতল ছোঁয়ায় জেগে উঠে, ধীরে ধীরে অংকুরোদগম ঘটিয়ে সবুজ ২টি পাতা নিয়ে অন্ধকার মাটির আবরণকে ঠেলে আলোর স্পর্শে হেসে উঠে ঠিক তেমনি এদেশের ছাত্রীসমাজের অন্তরের গহীনে লুকানো ঈমানের বীজ উপযুক্ত পথ-নির্দেশনা পেলে ঠিকই যাবতীয় অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতির আবরণ সরিয়ে বিকশিত হবে, জন্ম নিবে বীজ হতে ছোট্ট চারাগাছ যে চারাগাছ স্বীয় কাণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিবে, ফুলে ফলে সুশোভিত করবে চারিদিক। অর্থাৎ বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়ের মাধ্যমে হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ মুসলিম।

◆ শুধুমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামী বিশ্বাসের লালন নয় বরং বাস্তব জীবনে এর একনিষ্ঠ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করতে শহর হতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছাত্রীসংস্থা শুরু হতে আজ পর্যন্ত আয়োজন করে চলেছে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক তাফসীর

www.pathagar.com

ক্লাসের, যেখানে কোরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে ছাত্রী বোনদের হৃদয় মানসের মরিচা দূর করে সত্যের আলো ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলে। সে সাথে ছাত্রীসংস্থার কর্মী বোনেরা নম্র, বিনয়ী কোমল ব্যবহার, গভীর মমতা সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক সর্বোপরি উত্তম চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে সত্যের বাস্তব সাক্ষ্য উপস্থাপন করে ছড়িয়ে যেতে থাকে জান্নাতী সুবাস। দাওয়াত প্রসারে তাফসীরের পাশাপাশি বিভিন্ন উপলক্ষকে সামনে রেখে আয়োজন করে মাসিক/ দ্বিমাসিক সাধারণ সভা/ আলোচনা সভার। দাওয়াত বিস্তারে শুধুমাত্র গত ৫ বছরেই রাজধানী ঢাকা হতে পল্লীর নিভৃত অংগনে এ পর্যন্ত তাফসীরের সংখ্যা ৭৬,৭৩৪ এবং সাধারণ সভার সংখ্যা ১২,০২৩ (প্রায়)।

◆ প্রথম দফা কর্মসূচির বাস্তবায়নে ছাত্রীসংস্থা গৃহীত আরেকটি পন্থা, সিরাত (সাঃ) ও শিক্ষাদিবসসহ বিভিন্ন উপলক্ষকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয়ভাবে শাখাগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত সাধারণ জ্ঞান ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, যার মাধ্যমে ছাত্রীদের অন্তর্নিহিত মেধা যোগ্যতা সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে জ্ঞানানুশীলনে উৎসাহিত করার পাশাপাশি দাওয়াত বিস্তারের প্রচেষ্টা চলে। এছাড়াও চা-চক্র- বনভোজন, চড়ুইভাতি, নবীনবরণ, ঈদপুনর্মিলনী, সামষ্টিক ভোজ ইত্যাদি নির্মল আনন্দ বিনোদনের মাধ্যমে রুটিনমাফিক একঘেঁয়ে জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্যের ছোঁয়া আনতে চেষ্টা করে।

◆ সমাজের চিন্তাশীল অংশের মধ্যেও দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর পিয়াসে ছাত্রীসংস্থা আয়োজন করে সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমের। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে অল্পকিছু সময়ের ব্যবধানে মৌলিক ৩টি সমস্যাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ৩টি সেমিনারের সফল বাস্তবায়ন, শিক্ষিকা, প্রতিষ্ঠিত সুধী ও চিন্তাশীল ছাত্রী বোনদের হৃদয়মানসে একটি যথার্থ প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে ছাত্রীসংস্থার গ্রহণযোগ্যতাকে সুসংহত করার পাশাপাশি এর মননশীল কার্যক্রমও যথেষ্ট আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। সেমিনার ছাড়াও সর্বস্তরের সুধী ও শিক্ষিকা সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে শাখাগুলো প্রতিবছর আয়োজন করে সুধী ও শিক্ষিকা সমাবেশের।

◆ "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন" কোরআনের এ ঘোষণার আলোকে ছাত্রীসমাজকে জ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করে ভালো ছাত্রী হওয়ার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক এ সমাজে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করণে নিজস্ব মেধা যোগ্যতাকে বিকাশের সাথে সাথে মুসলিম মন মানসের আলোকে নিজেকে গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে প্রায় প্রতিবছরই শাখা কর্তৃক আয়োজিত হয় S.S.C ও H.S.C কৃতী ছাত্রী সম্বর্ধনা। এছাড়াও ছাত্রীসংস্থা বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল হোস্টেলগুলোতে অবস্থানরত ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজন করে শবে মেরাজ, শবে কদর, শবে বরাত উপলক্ষে নৈশ ইবাদত ও দোয়া মাহফিলের। যা ছাত্রীদের মৌলিক ইবাদত নিষ্ঠাসহকারে উদযাপনের পাশাপাশি যাবতীয় বিপদ-মুসিবতে আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দেয়ার মাধ্যমে তওহীদের খালেছ অনুভূতির আলোকে হৃদয় গঠনে উৎসাহিত করে।

◆ সাহিত্য একটি জাতির জীবন দর্পণ। সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতীয় রুচি, মূল্যবোধ দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠে। মিডিয়া আগ্রাসনের এ যুগে অশ্লীল গল্প, উপন্যাস, ম্যাগাজিন সিনেমা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কচি কোমল সতেজ তরুণ সমাজের অন্তরে সহজেই অনৈতিকতার বীজ রোপিত হচ্ছে যা একসময় মহিরুহে পরিণত হয়ে কলুষিত করছে সমাজ জীবনকে। বাতিলের সুকৌশল চক্রান্তে এ আগ্রাসনের কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি বিপথগামী হচ্ছে মুসলিম ছাত্রসমাজ। আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য ফ্যাশন, সাজসজ্জায় ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয় এদেশের মুসলিম ছাত্রীসমাজ। ইসলামী বিধানকে অবজ্ঞা করে নিজেদের অজান্তেই ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হচ্ছে অশ্লীলতা, অনৈতিকতার পঙ্কে। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অংগনের কলুষতা মোকাবেলায় সুস্থ সাহিত্য রচনা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উৎসাহিত করতে এ অংগনেও রয়েছে ছাত্রীসংস্থার সরব পদচারণা যার মাধ্যমে একদিকে যেমন ছাত্রী বোনদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে তেমনি অন্যদিকে ইসলাম যে কোন শুষ্ক নিরস জীবনাদর্শ নয় তাও স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) লেখনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজের অনাচার, পাপাচারের স্রোতকে রোধ করার প্রচেষ্টাকে জিহাদের সাথে তুলনা করেছেন। তাই ছাত্রীসংস্থা বিভিন্ন পত্রিকা, দেয়ালিকা, হ্যান্ডম্যাগাজিন, স্কুল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুস্তক প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইসলামকে উপস্থাপনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিবছর প্রকাশ হচ্ছে সিয়াম, সম্মেলন স্মারক ও শিশু চতুর্মাসিক পত্রিকা আলোর পাখি। শাখাগুলো কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে সিরাজুম মুনিরা, সুবহেসাদিক, প্রত্যয়, উন্মেষ, ফুলকলি, প্রত্যাশা, প্রশান্তি, ইত্যাদি নামে বিভিন্ন পত্রিকা ও হ্যান্ডম্যাগাজিন। শুধুমাত্র গত বছরই ১৩৬টি পুস্তক প্রদর্শনী, ২৫টি হ্যান্ড ম্যাগাজিন, ৬৯টি

www.pathagar.com

দেয়ালিকা প্রকাশ ও ছাত্রী বোনদের ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনে ৪,৬০,৭৭৪টি বই বিলি করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হতে ছাত্রীসংস্থা সমন্বয় সাহিত্য গোষ্ঠী ও রাইয়্যান শিল্পীগোষ্ঠীর মাধ্যমে সাহিত্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া গান, কবিতা, উপস্থাপনা প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রোগ্রামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শনের মাধ্যমে শরয়ী সীমার মধ্যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। "অপসংস্কৃতির বন্যায় খরা আসুক, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ছড়িয়ে পড়ুক" এ শ্লোগান নিয়ে ছাত্রীসংস্থার ২৫ বছর পূর্তিতে ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ২টি শো'তে উপস্থিত প্রায় আড়াই হাজার দর্শক-শ্রোতার ভূয়সী প্রশংসা এটাই প্রমাণ করে মিডিয়ার চাকচিক্যময় অশ্লীল প্রদর্শনী সত্ত্বেও ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি ছাত্রী ও সুধী সমাজের আকর্ষণ কমে যায়নি। এছাড়াও ডেকোরেশনের ক্ষেত্রে হাতে তৈরি কার্ড, ব্যাজ প্রশিক্ষণ, কোরআন-হাদিসের, পোস্টার লিখন প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মশালা, প্রশিক্ষণ শিবির, এক্ষেত্রে আগ্রহী বোনদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তাদের গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমে দাওয়াতকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনে সহযোগিতা করেছে।

এভাবেই ১ম দফা কর্মসূচি দাওয়াতকে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল ইত্যাদি ৪টি সেক্টরে সময়োপযোগী কৌশল নিয়ে বিন্দুমাত্র পার্থিব স্বার্থ নয় আল্লাহ্ সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নানাজনের নানা কটুক্তি, বিদ্রূপাত্মক ভূমিকা সত্ত্বেও দুর্জয় এ কাফেলার কর্মীরা এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। লক্ষ্য ভবিষ্যৎ ছাত্রী তথা নারী সমাজকে ঈমানের জ্যোতিতে উজ্জ্বল করে আলোঝলমল শান্তির পেলব পরশ মাখানো সুন্দর এক সমাজ গঠন।

বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ২য় দফা কর্মসূচি : সংগঠন ও প্রশিক্ষণ

"তিনিই যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল স্বয়ং তাঁদেরই মধ্য হতে দাঁড় করিয়েছেন যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান তাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। সূরা জুমআ- ২।

রাসূল (সাঃ) শুধুমাত্র লোকদের সতর্ক করার কাজই করেননি বরং কোরআন নির্দেশিত পন্থা অনুসারে তাদেরকে সুসংগঠিত করে তাযকিয়ায়ে নফস অর্থাৎ নফসকে পরিশুদ্ধ করার কাজও পাশাপাশি চালিয়েছেন। রাসূল (সাঃ) এর অবর্তমানে এ দায়িত্ব বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদীর। যাবতীয় পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের মূল লক্ষ্যই হবে এ মৌলিক কাজ সম্পাদন যার স্বাভাবিক দাবি সংগঠনে আওতাভুক্ত লোকদের ঈমানকে মজবুত করা, কোরআন সুন্নাহর শিক্ষাসমূহের বাস্তব পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি তাদের আমল আখলাক উন্নত করার, আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি লাভের ব্যবস্থা করা। এভাবে আল কোরআনের কাঙ্ক্ষিত মান অনুযায়ী লোক তৈরি করতে পারাই একজন দায়ী ও সংগঠকের প্রকৃত সফলতা। তাই রাসূল (সাঃ) আনুসৃত পথ ধরেই ছাত্রীসংস্থার দ্বিতীয় দফা কার্যক্রম হলো-

"ইসলামপ্রিয় ছাত্রীদের সুসংগঠিত করে উন্নত নৈতিক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দান" যার রয়েছে ২টি দিক-

ক. ইসলামপ্রিয় ছাত্রীদের সংগঠিত করা

খ. তাদেরকে উন্নত জীবন যাপনে প্রশিক্ষণ দান।

◆ ছাত্রীসংস্থার দাওয়াতে সাড়া দানকারী বোনদের সুসংবদ্ধ করে উন্নত নৈতিকতার প্রশিক্ষণ দিতে ছাত্রীসংস্থা গ্রহণ করে আসছে বিভিন্ন কার্যক্রম যা কোরআন হাদীস অনুসৃত এবং অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। বিশ্বাসী হৃদয়গুলোকে পরিচর্যা করে তাদের জীবন হতে যাবতীয় কালিমা, মালিন্যতা ও কলুষতা দূর করে শ্বেত শুভ্র সুবাসিত গোলাপে পরিণত করতে ছাত্রীসংস্থা এক অনন্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক সদস্যা বৈঠক, কর্মী বৈঠক, শিক্ষা শিবির, শিক্ষা বৈঠক, স্পীকার্স ফোরাম, গ্রুপ প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের চিন্তার ভ্রান্তির উন্মোচনের পাশাপাশি কোরআন সুন্নাহর আলোকে আলোকিত পবিত্র জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ চলে। সে সাথে ইউনিটে ইউনিটে ছাত্রীসংস্থা প্রবর্তিত সিলেবাস ভিত্তিক সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করণ, প্রতিদিনের সময়কে গঠনমূলকভাবে কাজে লাগিয়ে পরকালীন জবাবদিহিতাকে সহজ করার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ ও মাস শেষে রিপোর্টিং বৈঠকে যথাযথ পর্যালোচনা, স্বীয় পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নে মনোযোগী হয়ে ভালো ছাত্রী হওয়ার মাধ্যমে প্রভাব সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলার সার্বিক তদারকি নৈতিক মজবুতীর পাশাপাশি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-যাপনে সহযোগিতা করছে। গত ৫ বছরে এ লক্ষ্যে কর্মী

www.pathagar.com

বৈঠক হয়- ৫৬,৯১২ এবং জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আমল বৃদ্ধিতে শুধুমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বই সংখ্যা- ৭৮,২৩৬ ও পাঠাগার- ৭৩৭টি। ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয় তাদের চিন্তা, চেতনা, অভিরুচির। বুঝতে শিখে মানুষ হিসেবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, উদ্যোগী হয় স্রষ্টার নির্দেশ পালনের মধ্যে জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও সুন্দরের পথ খুঁজে নিতে। আত্মিক উন্নতির এ ছাপ পরিদৃষ্ট হয় তাদের কথাবার্তা, চালচলন এবং পোশাক-আশাকে। হেরা হতে বিচ্ছুরিত আলোয় ১৪ শত বছর পূর্বেই যে মহামানব নারীকে লাঞ্ছনা, অপমান, অধঃপতনের অতল গহ্বর হতে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন-' দিয়েছেন সম্মানজনক আসন, হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীকে সেই বিশ্বাসের বাণীগুলোকে ধারণ করে তারা একেকজন হয়ে উঠে অনুপম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। পাশ্চাত্যের চোরাগলিতে বারবার থমকে দাঁড়ানো ছাত্রীসমাজ আলোকোজ্জ্বল জান্নাতী সৌরভ আমোদিত পথে অবগাহন করতে পেরে নিশ্চিন্তে আঁকড়ে ধরে এ পথকে সারাজীবনের জন্য। লোভ-লালসা, যৌবনের সম্বলকে পুঁজি করে বিলাসব্যসনের নানা রঙিন মোড়কে আচ্ছাদিত সমাজের যাবতীয় প্রলোভনকে উপেক্ষা করে পরকালীন অনন্য জীবনের প্রাপ্তিতে সৌরভ ছড়িয়ে যেতে থাকে পরিবারে, সমাজে, কোরআনের রঙে রঙিন জীবনযাপনে ছুটে চলে কোরআন নির্দেশিত পথে। "সেই পথে তীব্র গতিতে ছুটে চল যে পথ চলে গিয়েছে আকাশ ও পৃথিবী সমান বিস্তৃত জান্নাতের দিকে, যা তৈরি করা হয়েছে সৎ ও খোদাভীরু লোকদের জন্য।" (কোরআন)

◆ সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় ছাত্রীসংস্থা এক ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ছাত্রীসংস্থা সিলেবাস প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সর্বোপরি সংগঠনের দায়ীত্বশীলাদের সযত্ন পরিচর্যায় ছাত্রীবোনদের অন্তরের সুপ্ত ঈমান জাগ্রত, বিকশিত করে আলোকিত করে তোলে তাদের পুরো জীবনকে। অথচ এ দায়িত্ব ছিল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ছিল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত যোগ্যতা বিকাশের পাশাপাশি মানুষ হিসেবে জীবনের লক্ষ্য, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সচেতন করা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হতে এ বোধ বিলুপ্ত প্রায়। ফলে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেয়া সত্ত্বেও জবাবদিহিতার অনুভূতিশূন্য ছাত্রসমাজ জাতীয় জীবনে যথার্থ কল্যাণ বয়ে আনতে পারছেনা। লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির ফলে অস্ত্রের ঝনঝনানি, দুনিয়াবী প্রচন্ড মোহে ছুটে চলা ছাত্রসমাজের অনৈতিক কার্যকলাপ, শিক্ষক ও ছাত্রের পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্কে ফাটল, নকলপ্রবণতা, প্রভৃতি কার্যকলাপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আজ সাধারণ ঘটনা। ফলে ধ্বংসপ্রায় ছাত্রদের সৃজনশীল প্রতিভা। এমনি আদর্শ বিহীন ও নৈতিকতাবিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ছাত্রীসংস্থা সংগঠনে শামিল বোনদের তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের স্বচ্ছ ধারণা দান এবং দুনিয়ার জীবনকে এ বোধের আলোকে পরিচালিত করতে নিরন্তর প্রশিক্ষণ দিয়ে চলছে।

◆ "তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।" (ইমরান-১০২) বিচ্ছিন্ন জীবন সহজেই শয়তানী প্রলোভনের শিকার হয়। এজন্য এ অংগনের কর্মী বোনেরা ঈমানী দাবি পূরণে পরস্পর মিলে গড়ে তুলছে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত সম্পর্ক। কর্মী বোনদের ত্যাগ কুরবানীর মানসিকতা, ছাত্রীদের এপথে সামিল করে নেয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, উত্তম চরিত্র, কোরআনের বিপ্লবী দাওয়াত সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন অনৈতিকতায় নিমজ্জিত আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে গাফেল বহু ছাত্রীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, প্রবৃত্তি পূজার যাবতীয় উপকরণকে স্বেচ্ছায় ছুঁড়ে ফেলে, বাহ্যত রসকষহীন অথচ জীবনবোধের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ইসলামের স্বচ্ছ, সুন্দর, আদর্শকে সানন্দে গ্রহণ করে অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে, বেপর্দাহীনতার কুফল অনুধাবন করে স্বেচ্ছায় হিজাবের অনুসারী হয়েছে।

◆ অনন্য এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ হাজার হাজার ছাত্রীর আস্থা ও ভালোবাসার সংগঠন। যার প্রমাণ উত্তরোত্তর এর শাখা ও জনশক্তি বৃদ্ধি। একদশক আগেও ১৯৯১-৯২ সেশনে যেখানে শহর শাখা ছিল প্রায় ৫৪টি, জেলা শাখা ছিল ২০টি, থানা শাখা ছিল- ৪টি, সেখানে বর্তমানে এর শহর শাখা- ৬৯টি, জেলা শাখা- ৬৯টি, এবং থানা শাখা- ১০৫টি।

বোনদের প্রচেষ্টায় প্রায় শতকরা আশি ভাগ থানায় দাওয়াত এবং শতকরা বিশ ভাগ থানায় সংগঠন সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। (সংগঠনের এ পরিসংখ্যান শুধুমাত্র যেখানে দুই এর অধিক ইউনিট আছে)। প্রতিটি মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে এর শাখা। পার্থিব উপায় উপাদানের স্বল্পতা সত্ত্বেও ঈমানের রৌশনীতে উজ্জ্বল বোনদের অক্লান্ত পদচারণা, আল্লাহর উপর অগাধ ভরসা এর যাত্রাপথকে করেছে আলোকোজ্জ্বল।

www.pathagar.com

নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও নারী অধিকার রক্ষায় অনন্য সংগঠন ছাত্রীসংস্থার ৩য় দফা কর্মসূচি : সমস্যা সমাধান

আধুনিকতার উচ্চ শিখরে আসীন সভ্যতাগর্বী আজকের বিশ্বে নারী আজও তার ন্যায্য অধিকার পায়নি। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা লাঞ্ছিত। যৌতুকের বলি হয়ে প্রতিবছর প্রাণ দিচ্ছে শত শত নারী, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ অপহরণের শিকার হয়ে সমাজ হতে নির্বাসিত করুন জীবনযাপন করছে এমন নারীর সংখ্যা কম নয়। অসহায়, দরিদ্র, নিরাপত্তাহীন নারী সমাজকে জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে ব্যবহারের ফলে সমাজ জীবন হচ্ছে কলুষিত। এছাড়াও পোশাক প্রদর্শনীর নামে অশ্লীল ফ্যাশন শো, অপমানকর সুন্দরী প্রতিযোগিতা, পত্র-পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনে পণ্য প্রচারের নামে নারীর গুপ্ত সৌন্দর্যের উন্মুক্ত প্রদর্শনী প্রভৃতি কার্যকলাপের মাধ্যমে নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহারের প্রচেষ্টার ফলে নারীর মর্যাদা বিনষ্টের পাশাপাশি সমাজে প্রসার হচ্ছে অনৈতিক কার্যকলাপ, বাড়ছে নারীর নিরাপত্তাহীনতা।

ভবিষ্যৎ নারী সমাজের বর্তমান রূপ ছাত্রীসমাজকে জীবনের শুরু হতেই স্বীয় মর্যাদা অনুধাবন ও অধিকার রক্ষায় সচেতন করে তুলতে ছাত্রীসংস্থার ৩য় দফা কর্মসূচি হলো-

"ছাত্রীসমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ" সংক্ষেপে সমস্যা সমাধান।

◆ ছাত্রীসংস্থা নারী জীবনের সংকট উত্তরণে সঠিক পথ-নির্দেশনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে পথ হচ্ছে রাসূল (সাঃ) অনুসৃত কোরআন নির্দেশিত পথ। ইসলামের অনুশাসন পালনের মাধ্যমেই নারী পাবে তার পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা। কেননা একমাত্র রাসূলের (সাঃ) কণ্ঠেই নিঃসরিত হয়েছে "জান্নাত মায়ের পদতলে অবস্থিত"। নারী সমস্যা ও নারী নির্যাতনের কারণ চিহ্নিত করে ইসলাম প্রদত্ত পন্থা প্রচারে ছাত্রীসংস্থার উদ্যোগে প্রথম সেমিনারই ছিল "নারী মর্যাদা বিষয়ক" যা ৩ দিন ধরে চলে। এছাড়াও অশ্লীলতা অনৈতিকতার পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে ছাত্রীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবি, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীদের ছাত্রীসংস্থা গঠিত কল্যাণ ফান্ড হতে স্টাইপেন্ড প্রদান, নারী শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, শবমেহের দিবস প্রভৃতি নারী সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও শাখাগুলোর পক্ষ হতে পত্র-পত্রিকায় বলিষ্ঠ বিবৃতি এবং বিভিন্ন সময়ে ঘটিত নারীর ওপর বর্বরোচিত নির্যাতনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলোর ব্যাপারে লেখালেখি ও প্রতিবাদমূলক বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে নারী মর্যাদা রক্ষায় স্বীয় সুদৃঢ় অবস্থান প্রকাশ করে আসছে। ছাত্রীসংস্থা বোনদের এই বোধকেও শানিত করছে যে সৌন্দর্য প্রদর্শন নয় বরং পর্দার সম্মানজনক বিধানের মাধ্যমেই নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে উত্তরোত্তর বাড়ছে হিজাব পরিহিত ছাত্রীদের সংখ্যা।

পাশ্চাত্যের নানা মনোমুগ্ধকর প্রচারণা, এবং ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় নানাভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে ছাত্রীসমাজ। ছাত্রীসংস্থা তাই মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি ছাত্রীবোনদের ইসলাম প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকার, মোহরানা, শিক্ষা অধিকার, নারী স্বাধীনতার সীমা সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী বিধান অনুশীলনে মযবুত মনোবল তৈরি করে।

◆ শিক্ষা মৌলিক প্রয়োজন ও মৌলিক সমস্যা। নারী-পুরুষ উভয়কে তার যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে স্ব স্ব অবস্থানে স্বীয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই পরিবার তথা সমাজ সুন্দর হয়। এজন্য প্রয়োজন ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দায়িত্ব কর্তব্যের আলোকে নৈতিক বোধ সমন্বিত একটি পরিপূর্ণ শিক্ষা কারিকুলাম রচনা। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার এত বছর পরও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে উপযুক্ত শিক্ষা কারিকুলাম রচনার লক্ষ্যে ছাত্রীসংস্থা সব সময় প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা দিয়ে আসছে, এ লক্ষ্যে গত জুন মাসে বুয়েট, মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং শিক্ষিকাসহ পেশাজীবী সুধীদের নিয়ে বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো "আজকের শিক্ষাব্যবস্থা ও আমাদের ছাত্রসমাজ" শীর্ষক সেমিনারের।

◆ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আজ নারীদের শিক্ষার হার বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান ছাত্রীসমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুসংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্রীসংস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কলেজে অনুষ্ঠিত ছাত্র-সংসদ নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করে আসছে। এ লক্ষ্যে গত ১ বছরেই ৫টি কলেজে কমনরুম সম্পাদিকা পদে জয়ী হয়। এবং এক্ষেত্রে ছাত্রীসংস্থার প্রতিনিধি বোনেরা বরাবরই সততা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আসছে। এছাড়াও ছাত্রীসংস্থা দরিদ্র ছাত্রীদের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে স্টাইপেন্ড প্রদান, ফ্রি কোচিং, বইপত্র নোট বিলি প্রভৃতি তৎপরতার মাধ্যমে ৩য় দফার কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

আদর্শ মুসলিম নারী গঠন: ছাত্রীসংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ছাত্রীসংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো 'বাংলাদেশের ছাত্রীসমাজকে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ্ অনুযায়ী গঠন করে তাদেরকে আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে গড়ে তোলা এবং দীন ইসলামের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যাতে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি হাসিল করা যায়।''

◆ ছাত্রীসংস্থার মূল লক্ষ্য ৩ দফা কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদর্শ মুসলিম নারী গঠন। একজন মুসলিম নারীর ক্রোড়ে লালিত শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। নারী ও পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে উঠে পরিবার যা সভ্যতা বিনির্মাণের সবচেয়ে প্রাথমিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ একক। শিশুর প্রথম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে পরিবারেই। পারিবারিক রীতি, নিয়ম কানুনের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাসগুলো কাদামাটির মতো শিশুর কোমল অন্তরে ছাপ ফেলে যা সহজে পরিবর্তন করা যায় না। শুধু তাই নয় গর্ভকালীন সময়েও মায়ের চিন্তা-চেতনার পরোক্ষ প্রভাব সন্তানের ওপর পড়ে। তাই শিশুকে সৎ সুন্দর চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে মায়ামমতা ভালোবাসা জড়ানো নৈতিক অনুশাসন মিশ্রিত একটি পরিবার সবচেয়ে বড় শর্ত। ছাত্রীসমাজকে এ গুরু-দায়িত্বের উপযোগী করে গড়ে তুলতেই ছাত্রীসংস্থার যাত্রা শুরু। এ লক্ষে ছাত্রীসংস্থা বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে আত্মিক মজবুতী অর্জনের পাশাপাশি একটি সুন্দর, সুশৃংখল পারিবারিক জীবন গঠনে সহায়ক কিছু বাস্তব প্রশিক্ষণও দেয়ার চেষ্টা করে। এ সংগঠনের T.C, T.S-এ রান্না হতে শুরু করে আন্তরিক পরিবেশন, ধুয়ামুছা এমনকি বাথরুম পরিষ্কারের কাজও করে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিযুক্ত বিভিন্ন মানের কর্মী বোনেরা। এমনকি বিবাহিত ছাত্রীবোনদের সন্তানদেরও প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে দেখাশুনা করে। এভাবে বোনেরা পারিবারিক দায়িত্ব পালনে শুরু হতেই ব্যবহারিক কাজে সচেতন হয়ে উঠে।

◆ পারস্পরিক সুন্দর ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্বের হৃদয়স্পর্শী অনুভূতি ইসলামী আন্দোলনে আল্লাহর সবচেয়ে বড় রহমত– আল্লাহর ঘোষণা– "তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে এবং তারই অপার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।" নানা রুচি, মেজাজ, পরিবারের বোনদের সম্মিলন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। এখানে স্থান রয়েছে দিনমজুরের, অসহায় মেয়েটিসহ উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তির আদুরে কন্যারও। কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসার ছায়া পেতে উদগ্রীব আদর্শের সুনিবিড় বন্ধনে তাদের মধ্যে যে অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে উঠে তা রক্তের সম্পর্ককেও হার মানায়। জান্নাতী এক আবেশ ছড়িয়ে রয়েছে এ সম্পর্কে। কারণ ইসলামে তাকওয়াই একমাত্র পার্থক্যের মানদণ্ড বংশ, পারিবারিক মর্যাদা, আর্থিক অবস্থা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। এভাবে বিভিন্ন রুচি ও পরিবেশের বোনদের সাথে সংযোগ কায়েমের প্রচেষ্টা, মজবুত সম্পর্ক, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অপর বোনের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানসিকতা, দীনী দাওয়াত দিতে গিয়ে বিরোধীদের শত কটুক্তি বাধার স্রোত সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের ত্যাগী জিন্দেগী অনুসরণে অটল মনোভাব, ধৈর্য, প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হয়েও বারবার ছাত্রীদের কাছে সহানুভূতিসম্পন্ন মন নিয়ে দাওয়াত উপস্থাপন, পরকালীন স্থায়ী জীবনের পুঁজি সংগ্রহে অল্পে তুষ্ট হওয়ার প্রবণতা এবং ছাত্রীজীবনের দীর্ঘ সময়ে এর অনুশীলন ছাত্রীসংস্থার কর্মী বোনদের মধ্যে উন্নত পর্যায়ের নৈতিকতা, বিনয়, নম্রতা, সহনশীলতা, মুরুব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করার মানসিকতা, ধৈর্য সহনশীলতার জন্ম দেয় যা পরবর্তীতে সুখী, সুন্দর সুশৃংখল পারিবারিক জীবন গঠনে সহযোগিতা করে।

এভাবেই ছাত্রীসংস্থা আদর্শিক ও ব্যবহারিক দু দিক দিয়েই ছাত্রীদের ভবিষ্যতে যথার্থ মুসলিম নারী হিসেবে গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যারা হবে হযরত খাদীজা, সুমাইয়া, ফাতেমা, আসমা (রাঃ) এর উত্তরসূরি। যাদের সন্তানরা হবে হযরত আমের, হাসান-হোসেন, আবদুল্লাহর মতো বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ফিরিয়ে আনতে যারা একেকজন অনন্য রাহবারের ভূমিকা পালন করবে। ছাত্রীসংস্থার একেকজন কর্মী দ্বারা গঠিত একেকটি পরিবার ইনশাআল্লাহ হবে ইসলামের আলোয় ঝলমল সুন্দর দুর্গ এবং তাদের বংশধররা হবে ঈমানের রঙে রঙিন আদর্শের সুষমায় উজ্জ্বল সৎ, যোগ্য, কর্ণধার। সুকঠিন ও প্রত্যয়ে ছাত্রীসংস্থা আলোর নিশান হাতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ছাত্রীসংস্থার সংগ্রামী কাফেলার নিকট প্রত্যাশা

আদর্শ মুসলিম নারী গঠনে প্রত্যয়বদ্ধ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের নব্য জাহিলিয়াতের এ অরাজকতাপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় আলোর পথ দেখিয়েছেন। এর শুকরিয়া আদায় করে যেতে হবে প্রতিনিয়িত ছাত্রীবোনদের এ পথে আহ্বানের মধ্য দিয়ে। কারণ সত্যের ঝান্ডা হাতে ছাত্রীসংস্থার যাত্রা অব্যাহত থাকলেও

www.pathagar.com

ছাত্রীসমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের কাছেই আমরা পৌঁছতে পেরেছি তাই কাজের বিস্তৃতিতে আত্মতৃপ্তির কোন সুযোগ নেই। খলিফা হিসেবে সত্যের সাক্ষ্যের এ দায়িত্ব পালনে গতিকে করতে হবে আরো বেগবান। এজন্য করণীয় ঃ

◆ স্বীয় চিন্তা, বুদ্ধি, সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে ইসলামকে আরো সুস্পষ্ট আরও হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কারণ বাতিলের নিত্যনতুন, চাকচিক্যময় কলাকৌশলের মোকাবেলায় সংগঠনের কৌশলগত দিকের প্রয়োগে আরও চিন্তাশীল ভূমিকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমরা আধুনিকীকরণকে ইসলামীকরণ করতেই চাই। ইসলামকে নয়। তাই দাওয়াত বিস্তৃতিতে পেরেশান হয়ে হেকমত তথা কৌশলগত দিককে আরও জোরালো করতে হবে।

◆ ছাত্রীসংস্থার বেশিরভাগ বোনই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দাওয়াত দানকারী কোন না কোন বোনের ব্যক্তিচরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে। কারণ কাগুজে পরিচিতির চেয়ে ব্যক্তির চারিত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফুটে উঠা পরিচিতির প্রভাব সহজেই পড়ে। কোরআনের ঘোষণা– "এভাবে আমি তোমাদের একটি উত্তম জাতিরূপে গড়ে তুলেছি- যাতে করে তোমরা গোটা মানবজাতির জন্য সত্যের সাক্ষ্যদাতা (বাস্তব নমুনা) হতে পার এবং রাসূল (সাঃ) যেন তোমাদের জন্য সাক্ষ্য বা নমুনা হন। (বাকারা ১৪৩)

তাই দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রত্যেকে উন্নত আমল, আখলাকের মাধ্যমে চারিত্রিক সুষমায় নিজেকে সুশোভিত করে তুলতে হবে, দিতে হবে সত্যের বাস্তবসাক্ষ্য।

◆ প্রতিযোগিতামূলক সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এ সংগঠনের কর্মীদের সার্বিক দিক দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বীয় ভূমিকাকে মজবুত করার লক্ষ্যে ভালো ছাত্রী হওয়ার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতাকে বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে এ সংগঠনের কর্মীদের কেউ অবমূল্যায়ন কিংবা অবজ্ঞা করার সুযোগ না পায়।

◆ আল্লাহর স্মরণে সিক্ত সদা জাগ্রত একটা অন্তর তৈরি করতে হবে। মহান আল্লাহর রহমত ও সাহায্য পাওয়ার জন্য এটাই অন্যতম শর্ত। এজন্য নিষ্ঠাসহকারে মৌলিক ইবাদত পালন, কোরআন সুন্নাহর আলোকে ব্যক্তিজীবন সংশোধনে সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টাসহ রাতের গভীরে আল্লাহর দরবারে ধর্না দেয়ার অভ্যাস জাগ্রত করতে হবে। কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে একদল উন্নত চরিত্রবান ছাত্রী তৈরি করা আমাদের লক্ষ্য। শুধুমাত্র সাংগঠনিক প্রসারে সে উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না। সেজন্য প্রয়োজন চারিত্রিক শক্তি ও পারস্পরিক মজবুত সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে স্বীয় অবস্থানকে শক্তিশালী করা।

◆ সর্বোপরি স্বীয়, মেধা, যোগ্যতাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করে পরকালীন অনন্ত জীবনে সফলতার লক্ষ্যে পিচ্ছিল এ পথে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের ত্যাগী জিন্দেগী হতে অনুপ্রেরণা নিয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণ করে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে– "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে ছালেহ করবে এমন লোকদের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে সেইভাবে দুনিয়ায় খেলাফত দান করবেন, যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদেরকে খেলাফত দান করা হয়েছে। তাদের জন্য আল্লাহ যে দীনকে পছন্দ করেছেন সেই দীনকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। তাদের বর্তমানের ভয় ও নিরাপত্তাহীন অবস্থা পরিবর্তন করে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করবেন। (নূর- ৫৫)

দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জনের লক্ষে ছাত্রীসংস্থার সংগ্রামী কাফেলার এ অগ্রযাত্রা আরোও বেগবান হোক। বিগত ২৫ বছরের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি মূল্যায়ন করে সুন্দর ও কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় স্বীয় চেতনাকে আরোও শানিত করে প্রত্যেকটি ছাত্রীসমাজের হৃদয়ে ছড়িয়ে দিক সত্যের আলোকচ্ছটা। মহান আরশে আজমের অধিপতি ছাত্রীসংস্থার যাবতীয় তৎপরতাকে এ লক্ষে পরিচালিত করার তৌফিক দিন, আমিন। #

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বিশ্ব মানবতার সংকটঃ মুসলিম উম্মাহর করণীয়

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

মাত্র আড়াইশত বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-নিপীড়িত ঔপনিবেশ ছিল। দখলদার মুক্ত হবার পর একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আজ মহান ঔপনিবেশিক তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিগত শতাব্দীতে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে একটি ভারসাম্য ছিল। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শিক লড়াই এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে বিশ্ব কমপক্ষে মহাযুদ্ধের আপদে জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে সমাজতন্ত্রের আত্মহত্যা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার ফলে বিশ্বে একক পরাশক্তির উত্থান ঘটে। একক পরাশক্তি হিসাবে আমেরিকার উত্থানের ফলে বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে যারা আশা করেছিলেন বিগত একদশকের ঘটনাবলী প্রমাণ করছে বিশ্ব আবার উত্তপ্ত এবং অশান্ত হতে যাচ্ছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শিক লড়াইয়ের অবসান হবার পর পরই বিশ্ব নতুন করে সভ্যতার সংঘাতের অধ্যায়ে প্রবেশ করে। অর্থনীতি, সমরশক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, মিডিয়া, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিক্ষা-দীক্ষায় একচ্ছত্র প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে পশ্চিমা সভ্যতার পতাকাবাহীরাই বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। তবে বিশ্বের মানবজাতির ইতিহাস যেহেতু বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারকারী শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস তাই পশ্চিমা দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ যথার্থই ধরে নিয়েছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর নতুন কোন শক্তির সাথেই নবতর সংঘাতের সূচনা হবে। আর এক্ষেত্রে তারা যথার্থই বিশ্লেষণ করেছেন যে, একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে জীবন্ত সভ্যতা অর্থাৎ খৃষ্ট সভ্যতা, ইহুদী সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা, চীনা সভ্যতা প্রভৃতি সভ্যতার মধ্যে সংঘাত হবে। খৃষ্টান ও ইহুদী সভ্যতা যেহেতু আজ একাকার এবং এদের সম্মিলিত ব্যাপারটাই হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। সুতরাং শক্তিশালী পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথেই অন্যান্য সভ্যতার সংঘাত হবে। হিন্দু সভ্যতা যেহেতু খৃষ্টান ও ইহুদীদেরকে মুসলমানদের চাইতে বেশি পছন্দ করে তাই তাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার পক্ষে এবং মুসলিম সভ্যতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়াই স্বাভাবিক।

মুসলমানরা বিভিন্ন দিক বিবেচনায় অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি জনগোষ্ঠি এবং তাদের রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অহংকার। সুতরাং তাদের পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতার আনুগত্য করা সম্ভব হবে না বরং মুসলমানরা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে। এমন এক পরিস্থিতিতে চীনারা হয়তো ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগলিক ও রাজনৈতিক কারণে পাশ্চাত্যদের পক্ষেই অবস্থান নিতে পারে। সুতরাং শেষ অবধি পাশ্চাত্য বনাম ইসলামী সভ্যতার মধ্যে চূড়ান্ত একটি সংঘাতের আশংকা

www.pathagar.com

বিদ্যমান। আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর উইলিয়াম হান্টিংটন তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ "Clash of Civilization" এ পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ইসলামই তথা মুসলমানরাই একমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারে বা পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে ইসলামী সভ্যতারই একটি অনিবার্য সংঘাত হবে। অতএব এসব ক্ষেত্রে তিনি আমেরিকাসহ পাশ্চাত্য সভ্যতার দাবীদারদের পরামর্শও দিয়েছেন কিভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ইসলামী সভ্যতাকে মুকাবিলা করা যাবে।

বিশেষ করে আমেরিকা নিশ্চিতভাবেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, বিশ্ব নেতৃত্বে একচ্ছত্রভাবে প্রভাব বজায় রাখতে হলে অবশ্যই ইসলামী শক্তির উত্থান ঠেকাতে হবে। এজন্য তারা ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এবং কৌশল অবলম্বন করেছে।

এখানে একটি বিষয়ে আমাদের সবাইকে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে যে, বিশ্ব রাজনীতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য এবং প্রভাব বিস্তার করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমেরিকা তার সবকিছুই করছে। বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দানের জন্য আমেরিকার কতিপয় জনপ্রিয় শ্লোগান আছে। আর তাহলো (১) স্বাধীনতা, (২) গণতন্ত্র, (৩) মানবাধিকার, এবং (৪) মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ইত্যাদি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সাম্প্রতিক বিশ্ব-রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যেসব ঘটনা ঘটে গেল এবং ঘটছে তাতে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীদের মুখোশ খুলে গিয়েছে এবং তাদের থলের বিড়াল বের হয়ে গিয়েছে। অতি আধুনিক প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বিকট চেহারাটা নানা প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রেখেছিল তা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়েছে। অবশ্যই সচেতন বিশ্লেষকদের চোখে সুন্দর শব্দাবলীর অন্তরালের বীভৎস্য সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটা গোপন ছিল না। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতিও অনেক আগেই ধরা পড়েছে। তথাপি সাম্প্রতিক আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দিয়েছে।

আমেরিকায় গণতন্ত্র পরাজিত

আব্রাহাম লিংকন, টমাস জেফারসন, উড্রো উইলসনের আমেরিকায় আজ গণতন্ত্র পরাজিত হয়ে গিয়েছে। একটি ছোট উগ্রবাদী যুদ্ধবাজ গোষ্ঠির হাতে আমেরিকার ৩০০ মিলিয়ন মানুষ আজ বন্দী। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবধিকার আজ অস্ত্র ব্যবসায়ী, তেল ব্যবসায়ী, মিডিয়া সম্রাট, চরমপন্থী খৃষ্টান ও মানবতাবিরোধী ইহুদী চক্রান্তকারীদের নিকট পদদলিত, ভূলুণ্ঠিত।

আফগানিস্তান ও ইরাক দখল

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন-টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাকে উপলক্ষ করে ওসামা বিন লাদেন নামক এক যাযাবরকে অজুহাত বানিয়ে "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" নামে আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ টন বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করে আমেরিকা যে নিষ্ঠুর বর্বরতার স্বাক্ষর রেখেছে তা দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকার এই যুদ্ধ ছিল আরোপিত এবং অন্যায় যুদ্ধ। সেখানে তালেবান সরকারের পতন ঘটিয়ে আমেরিকা মোতায়েন করেছে ৭,০০০ মার্কিন সৈন্য।

২০০৩ সালে আমেরিকা ইরাকের নিকট গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র আছে বলে প্রচারণা চালিয়ে জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করে ইরাকের ওপর হামলা চালিয়ে অবশেষে ইরাককে দখল করে নিল। গোটা বিশ্ববাসী প্রতিবাদ জানিয়েছে কিন্তু আমেরিকা তা শুনেনি। জাতিসংঘের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র দখল করে আমেরিকা প্রমাণ করলো তাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুকাবিলায় জাতি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। আমেরিকা কোন ধরনের আন্তর্জাতিক আইন বা বিধানে বিশ্বাসী নয়। নীতি, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বলে বিশ্বে আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশ্ব এক নৈরাজ্যের যুগে পদার্পণ করেছে। এখানে এক দানবীয় শক্তি তার স্বেচ্ছাচার চালাবে যখন যার ইচ্ছা তার ঘাড় মটকাবে।

আমেরিকার বর্বরতা, গণহত্যা, গুপ্ত হত্যা, ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের ঘৃণ্য তাণ্ডবের খতিয়ান সুবিশাল। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই তাণ্ডব।

www.pathagar.com

(১) ১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ২০ লাখ মানুষ হত্যা করে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করে। (২) ১৯৪৫-৫৩ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ বাহিনীর ছদ্মাবরণে মার্কিন বাহিনী উত্তর কোরিয়ার ২৫ লাখ লোক হত্যা করে। (৩) ১৯৪৯-৫৩ সালে আলবেনিয়ায়-গুপ্ত হামলা চালিয়ে সহস্রাধিক মানুষকে হত্যা করে। (৪) ১৯৪৭-৫০ গ্রীসকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে। (৫) ১৯৪৮-৫৬ পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপে চালায় অপারেশন ইসপ্লিন্টার ফ্যাক্টর। এতে হত্যা করা হয় চেকোস্লোভাকিয়াতে একলাখ ঊনসত্তর হাজার হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়ায় হত্যা করা হয় ৫ লাখ লোক। (৬) ১৯৪৮ সালে বৃটেনের সহায়তায় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জনপদ ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের উৎখাত করে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকা। বিশ্বের অন্যতম সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলকে আমেরিকা অদ্যাবধি সহায়তা দিয়ে আসছে। ১৯৫৭ সালে আমেরিকার সাহায্যেই ইসরাইল গাজা উপত্যকা ও সিনাই উপদ্বীপ দখল করে। এযাবত ইসরাইল কমপক্ষে ৬৪ বার জাতিসংঘ প্রস্তাব লংঘন করেছে আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে। ইতিহাসের ঘৃণ্যতম হত্যাকান্ড চালাচ্ছে ও মানবাধিকার লংঘন করছে ইসরাইল প্রায় প্রতিদিন তাও আমেরিকার সার্বিক সহায়তায়। (৭) পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রায় বিশ বছরব্যাপী আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে নাপাম বোমা, জীবাণু বোমাসহ ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের বেপরোয়া ব্যবহার করে ৪৩ লাখ ভিয়েতনামীকে হত্যা করে। (৮) ১৯৫৮ সালে সংখ্যালঘু খৃষ্টানদের অনুরোধে ১৪,০০০ মার্কিন সৈন্য লেবাননে অবতরণ করে ৫০ হাজার মুসলমান হত্যা করে। (৯) ১৯৫৫-৭৩ কম্বোডিয়া এবং ১৯৫৭-৭৩ লাওসের যুদ্ধে আমেরিকা কমপক্ষে ২০ লাখ মানুষকে হত্যা করে। (১০) ১৯৫৯ সালে আমেরিকা হামলা চালায় হাইতিতে। ১৯৯৩ সালে আবার হামলা চালিয়ে দেশটির শাসক জেনারেল সিড্রাসকে বিতাড়িত করে। এবছরেই সোমালিয়ায় চালায় অপারেশন রোস্টার হোপ এবং হত্যা করে ২০ হাজার সোমালিয়ানকে। (১১) ১৯৬৪ সালে সিআইএ কঙ্গোর জাতীয়তাবাদী নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে হত্যা করে। জাতিসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল দ্যাগ হ্যামার শোল্ড এ হত্যাকান্ডের বিরোধিতা করায় বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তাকেও হত্যা করা হয়। (১২) ১৯৬০ সালে আমেরিকা ডোমিনিকান রিপাবলিকে হামলা চালায় এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দেশটি দখল করে রাখে। (১৩) ১৯৫৯-৮০ সাল পর্যন্ত আমেরিকা বিভিন্ন সময় কিউবার ওপর রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র প্রয়োগ করে। ফলে লাখ লাখ মানুষ ও পশু মারা যায় এবং ধ্বংস হয় ফসল। (১৪) চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে চিলির মার্কিন মালিকানাধীন খনি কোম্পানী জাতীয়করণ করলে ক্ষিপ্ত মার্কিনীরা ১৯৭৩ সালে সিআইএর মাধ্যমে আলেন্দেকে হত্যা করে। নরপিশাচ জেনারেল পিনোচেটকে ক্ষমতায় বসায়। মার্কিন প্রত্যক্ষ সহায়তায় পিনোচেট পঞ্চাশ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। (১৫) ১৯৬৪-৭৩ সালে সিআইএ বলিভিয়া ও পানামায় অভ্যুত্থান ঘটায় এবং কোস্টারিকার জোসে ফিগুয়ার্সকে ক্ষমতাচ্যুত করে। (১৬) ১৯৭৯-৮১ সালে গ্রানাডায় আগ্রাসন চালিয়ে মার্কিন বাহিনী ঐ দেশের সরকার প্রধান মরিস বিশপসহ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। (১৭) ১৯৮০ সালে নিকারাগুয়ায় ১৫ হাজার এবং পানামায় হামলা চালিয়ে ৮ হাজার মানুষকে হত্যা করে। (১৮) ১৯৮৮-৮৯ সালে মার্কিনীরা লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে হত্যা করার জন্য বিভিন্নভাবে হামলা চালায়। এতে তার দু'বছর বয়সী শিশু কন্যাসহ বিভিন্ন সময়ের হামলায় এক সহস্রাধিক লিবীয় নাগরিক নিহত হয়। (১৯) ১৯৯১ সালে মার্কিনীরা বৃটেনের সহায়তায় ইরাকে পরিচালনা করে 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম" ৪৪দিন ব্যাপী এই হামলায় ব্যাপক বোমা বর্ষণ ছাড়াও ৯৪টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। প্রায় ৩০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটে এই হামলায়। ইরাকের ১৫ লাখ শিশু অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে দুধ, ওষুধ ও পথ্যের অভাবে। (২০) ১৯৬০ সাল থেকে এযাবত কলাম্বিয়ায় মাদক চোরাচালান বন্ধ করার নামে মার্কিনীরা হত্যা করে আনুমানিক ৬৭ হাজার কলাম্বিয়ানকে। (২১) ১৯৯২-৯৩ সালে মার্কিনীদের সহযোগিতায় খৃষ্টান ও ইহুদীরা বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলমানদের ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা করে কমপক্ষে পঁচিশ হাজার মুসলিম নর-নারীকে। ১৯৯৯ সালে কসোভোতে বিমান হামলা চালিয়ে মার্কিনীরা হত্যা করে ৩,০০০ মানুষ। (২২) ১৯৯৪ সালে হেবরন মসজিদে মার্কিন মদদপুষ্ট ইহুদীরা হামলা চালিয়ে ফজরের নামায আদায় রত শতাধিক মুসলমানকে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। (২৩) ১৯৯৮-সালের ৮ আগস্ট কেনিয়া ও তানজানিয়ায় বোমা হামলা চালিয়ে মার্কিনীরা হত্যা করে ২২৫ জন নাগরিককে এবং আহত করে প্রায় চার হাজার মানুষকে। (২৪) ১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট মার্কিনীরা একই সঙ্গে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় আফগানিস্তান ও সুদানে।

www.pathagar.com

ফলে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় দফা হামলা চালায় আফগানিস্তানে। এসময় ক্লাস্টার বোমাসহ ব্যাপক গণবিধ্বংসী বোমা ব্যবহার করায় তিন লক্ষাধিক আফগান মুসলিম নিহত হয়। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ পুনরায় হামলা চালিয়ে ১০ এপ্রিল মার্কিনীরা দেশটি দখল করে নেয়। (২৫) বিগত ৬ দশকে বিশ্বে যত সামরিক অভ্যুত্থান, গুপ্ত হত্যা, আঞ্চলিক ও জাতিগত সংঘাত ও গণহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির সাথে কোন না কোনভাবে আমেরিকা অথবা সিআইএ জড়িত ছিল। ১৯৪৯ সালে সিরিয়ায় নির্বাচিত সরকার, ১৯৫৩ সালে ইরানে ডঃ মুসাদ্দেকের সরকার, ১৯৬৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুয়েকর্ণোর সরকার উৎখাত করে আমেরিকা। অসংখ্য দেশের সরকার উৎখাত করে আমেরিকা। স্বল্প পরিসরে যার বিবরণ দেয়া কঠিন। বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নানাভাবে হস্তক্ষেপের যাবতীয় কূটকৌশল ও জালপেতে রেখেছে আমেরিকা। সুতরাং নিষ্ঠুর ভাবে মানুষ হত্যা এবং জঘন্য মানবাধিকার লংঘন আমেরিকার জন্য নতুন কিছু নয়।

বিশ্বব্যাপী সামরিক ঘাঁটি ও সৈন্য মোতায়েন

সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা পূরণের জন্যই যে আমেরিকা বিশ্বব্যাপী সামরিক আধিপত্য বিস্তার করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বের অনেক দেশেই আমেরিকান সৈন্য মোতায়েন আছে এবং রয়েছে অসংখ্য ঘাঁটি।

(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই জাপানে আছে ১৮ হাজার, ওকিনাওয়ায় সপ্তম নৌবহর ও ২০ হাজার মার্কিন সৈন্য ও ৮৪টি যুদ্ধ বিমান।

(২) দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৯,১৫০ মার্কিন সৈন্য।

(৩) প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গুয়াম, দিয়াগো গার্সিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় আছে মার্কিন নৌ ও বিমান ঘাঁটি।

(৪) থাইল্যান্ডে আছে একটি সেনা কন্টিনজেন্ট।

(৫) ফিলিপাইনে আছে উল্লেখযোগ্য মার্কিন সৈন্য যারা মুসলিম স্বাধীনতাকামীদের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

(৬) গুয়ানতানামোতে মোতায়েন আছে ২২০০ মার্কিন সৈন্য।

(৭) কলাম্বিয়া ও হন্ডুরাজে আছে ৪০০ স্থল ও নৌসেনা।

(৮) বারমুডা, আইসল্যান্ড ও অ্যাজোর্স দ্বীপপুঞ্জে আছে ১৭০০ মার্কিন সৈন্য।

(৯) ইউরোপে অবস্থান করছে ৯৮ হাজার সৈন্য, জার্মানীতে ৫৬ হাজার এবং ৬০টি যুদ্ধ বিমান, ইটালীতে ১২,৪০০,বেলজিয়াম নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন ও গ্রীসে আছে ৮২৮৩ জন। বলকান অঞ্চলের বসনিয়ায় ২,০০০, কসোভোতে ৫,০০০ মার্কিন সৈন্য। তাছাড়া এখানে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে ৩৪,০০০ ন্যাটো পরিচালিত সৈন্য আছে। হাঙ্গেরী ও মেসিডোনিয়ায় অবস্থান করছে ৮৪০ জন।

(১০) বর্তমান ১৫টি মুসলিম দেশে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। (১) সৌদি আরব (২) কুয়েত (৩) কাতার (৪) জর্ডান (৫) আরব আমিরাত (৬) বাহরাইন (৭) ওমান (৮) মিশর (৯) জিবুতি (১০) তুরস্ক (১১) আফগানিস্তান (১২) পাকিস্তান (১৩) উজবেকিস্তান (১৪) তাজিকিস্তান (১৫) ইরাক।

(১১) ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন আছে ষষ্ঠ নৌবহর ও ২০০০ মেরিন সেনা এবং প্রশান্ত মহাসাগরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ৪টি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ, ১০টি পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম সাবমেরিন এবং ডেস্ট্রয়ারসহ বিভিন্ন ধরনের ৫৫ রণতরী।

মানুষ হত্যার জন্য বিশাল সামরিক বাজেট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের গণবিধ্বংসী অস্ত্র খুঁজে বেড়ায়। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই মজুদ আছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ভাণ্ডার। ২০০৩ সালের মার্কিন বাজেট ২১২৮ বিলিয়ন ডলার এবং এর মধ্যে সামরিকখাতে বরাদ্দ ৩৭৯ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশী টাকায় ২২,৭৪,০০০ কোটি টাকা। এত বিশাল বাজেটের লক্ষ্য হচ্ছে শক্তি প্রয়োগ করে অবাধ্য রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় শয়তানের দোসরদের দমন করা। মিঃ বুশের ভাষায় ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়া এই তিনটি দেশ শয়তানের দোসর। পরবর্তীতে তারা সিরিয়া, কিউবা ও লিবিয়াকে এই তালিকা ভুক্ত

www.pathagar.com

করেছে। ২৫টি রাষ্ট্রকে তারা কালো তালিকাভুক্ত করেছে তার মধ্যে ২৪টিই মুসলিম রাষ্ট্র। বর্তমানে গোটা মুসলিম বিশ্বই আসলে আমেরিকার টার্গেটের লক্ষ্য বস্তু। আমেরিকা তো ঘোষণাই করে দিয়েছে যে, যারা তাদের সাথে নেই তাদেরকে গণ্য করা হবে তাদের শত্রু হিসাবে। যে কোন দেশ সন্ত্রাস করছে বলে মনে করলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে দেশের ওপর হামলা চালাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার যুদ্ধমন্ত্রী রামসফেল্ডের পক্ষ থেকে।

জাতিসংঘ ও জাতি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন

জাতিসংঘ এখন আমেরিকার আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, বিশ্ব সংস্থা হিসেবে এই জাতিসংঘের কোন মূল্য নেই। আমেরিকা তার সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য হাসিলের জন্য জাতিসংঘের নাম ব্যবহার করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাতিসংঘ আমেরিকাসহ কতিপয় বৃহৎ রাষ্ট্রের মর্জিমাফিক কাজ করে আসছে। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের সময় না দিয়ে আমরিকা যখন ইরাকের ওপর হামলার আল্টিমেটাম ঘোষণা করলো তখন জাতিসংঘ মহাসচিব তড়িঘড়ি করে অস্ত্রপরিদর্শকদের ইরাক ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে আমেরিকাকে ইরাক হামলার পথ সুগম করে দেয়। জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়াই ইরাকের ওপর হামলা চালিয়ে অবৈধ যুদ্ধ করার অপরাধে আমেরিকা দায়ী। কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কিছুই করতে পারবে না। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যই যে জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়েছিল সেই জাতিসংঘ আজ যুদ্ধ বন্ধে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এমতাবস্থায় কি জাতিসংঘের কোন প্রয়োজন আছে?

ইরাক ও আফগানিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য ছিল। আমেরিকা রাষ্ট্র দুটো দখল করে পরাধীন করে দিল। ইরাকের জনগণের আজ অধিকার নেই তাদের নেতা নির্বাচনের। আমেরিকা যাকে খুশি ইরাকের ক্ষমতায় বসাবে। যেমন হামিদ কারজাইকে বসিয়েছে আফগানিস্তানে। আমেরিকার মত বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মুকাবিলায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব কি নিরাপদ?

আমেরিকায় মানবাধিকার

সবচাইতে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ বলে কথিত আমেরিকায় এখন সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ কারাগারে। ২০ লাখ মানুষ আমেরিকার কারাগারে। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর কয়েক হাজার মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তাদের আত্মীয় স্বজনরা তথা বিশ্ববাসী কেউ জানে না। শতকরা ২৮% আফ্রিকান আমেরিকান জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কারাগারে কাটাতে বাধ্য। গুয়ানতানামো বন্দী শিবিরে আলকায়দা বন্দীদের সাথে ন্যূনতম মানবিক ব্যবহার করা হচ্ছে না। তাদের ওপর অকথ্য, নিষ্ঠুর, পাশবিক-শারীরিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আমেরিকায় আছে শত শত সন্ত্রাসী গ্রুপ-যারা দিনেদুপুরে হত্যাকাণ্ড, গুম, নারী ধর্ষণ, ছিনতাইসহ বীভৎস সব অপরাধ করছে। আমেরিকার সরকার তাদের কিছুই করতে পারছে না। মানবাধিকারের শ্লোগানে উচ্চকিত আমেরিকা বর্ণ বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়নি এবং অদ্যাবধি একজন কৃষ্ণাঙ্গকেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচিত করেনি।

আমেরিকার দ্বিমুখী নীতি

সাদ্দাম হোসেনের নিকট গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এই মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে আমেরিকা ইরাকে হামলা করে দেশটি দখল করে নিল এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালালো। অথচ ইসরাইলের নিকট ইরাকের তুলনায় অনেক বেশি মারণাস্ত্র আছে তার জন্য তো ইসরাইলের উপর আমেরিকা হামলা চালায়নি। ইরাক ১৯ বার জাতিসংঘ প্রস্তাব লংঘন করায় আমেরিকা তার শাস্তির ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু ইসরাইল ৬৪ বার জাতিসংঘ প্রস্তাব লংঘন করেছে আমেরিকার মদদেই। আমেরিকা তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কাশ্মীর ইস্যুতে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব পাস করেছে। ভারত অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় যাবত এ প্রস্তাব লংঘন করে চলছে জাতিসংঘ বা আমেরিকা কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য কোন চাপ প্রয়োগ করেনি। ১ কোটি ৪০ লক্ষ কাশ্মীরী জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি একচোখা আমেরিকা। আর মাত্র ৬ লাখ পূর্ব তিমুরবাসীর জন্য গণভোট অনুষ্ঠান করে পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতিসংঘের মাধ্যমে গণভোট বাস্তবায়ন করে স্বাধীনতা দান করেছে। পূর্ব তিমুরবাসীরা খৃস্টান এটাই তাদের বড় গুণ আর কাশ্মীরীরা মুসলমান সেটাই তাদের বড় দোষ। হয়তোবা এ কারণেই আমেরিকা কাশ্মীর ইস্যুতে গণভোট অনুষ্ঠানে আগ্রহী নয়।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে আমেরিকা গণতন্ত্র চায় না

আমেরিকার পণ্ডিত ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করে মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র বিকশিত হলে ইসলামী রাজনৈতিক দল তার বেনিফিসিয়ারী হবে তাই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক স্বৈরাচার এবং একনায়কদের আমেরিকা সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের পতনের পর আমেরিকা ধরে নিয়েছে গণতন্ত্র আসলে ইসলামপন্থীরা লাভবান হবে। এ কারণেই আলজিরিয়ার নির্বাচনে ইসলাম পন্থীদের বিজয়ের মুখে সেখানে নির্বাচন বানচাল করে দিয়েছে আমেরিকা এবং মদদ যোগাচ্ছে সামরিক স্বৈরাচারকে। বার বার তুরস্কে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যাহত করে আমেরিকা সহযোগিতা করে যাচ্ছে তাদের বশংবদ সামরিক স্বৈরাচারী শক্তিকে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যাতে বিকশিত হতে না পারে সেজন্য গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি বিনাশ করার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। পাকিস্তানে বার বার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করেছে তারা। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় বেড়ে উঠা রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঠেকানোর জন্য ইসলামী মৌলবাদের উত্থান ঠেকানো এবং তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের নামে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর আমেরিকা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য এবং সমাজতন্ত্রের গতি রুদ্ধ করার জন্য ইসলামী সংগঠনগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করার কৌশল অবলম্বন করেছে আমেরিকা। সমাজতন্ত্রের পতনের পর আবার ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর ধ্বংস সাধনে জঘন্য ভূমিকা নিয়েছে তারাই। আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্বের অবসান করার জন্য মুজাহিদ সংগঠন ও ওসামা বিন লাদেনের সাথে সহযোগিতা করেছে আমেরিকা। আবার সোভিয়েত দখলদারিত্বের অবসানের পর মুজাহিদরা যাতে সরকার গঠনে সক্ষম না হয় সেজন্য অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে গড়ে তুলেছে তালেবান বাহিনী। আবার সেই তালেবান সরকারের ধ্বংস সাধন করে আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ টন বোমা নিক্ষেপ করে ওয়ার অন টেররিজমের নামে দখল করে নিয়েছে আফগানিস্তান। ইরানের রেজা শাহ পাহলভীকে সাহায্য করেছে ইসলামী বিপ্লব ঠেকানোর জন্য। জনতার ইসলামী বিপ্লব সফল হবার পর প্রথমে ষড়যন্ত্র করেছে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে যখন সফল হয়নি তখন ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হোসেনকে সর্বাত্মক সাহায্য করেছে ইরানের বিরুদ্ধে আট বৎসরব্যাপী যুদ্ধ চালাতে। আমেরিকা ও বৃটেনের মদদে ইরাক যখন মধ্যপ্রাচ্যে একটি শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তখন ইসরাইলের নিরাপত্তায় উদ্বিগ্ন আমেরিকা ইরাককে ধ্বংস করার কৌশল অবলম্বন করেছে। শিয়া সম্প্রদায় এবং কুর্দিদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারে সাহায্য করেছে আমেরিকা। আবার সাদ্দাম হোসেনকে অপসারিত করার জন্য কুয়েত দখলে উস্কানী দিয়ে তৈরি করেছে নতুন রঙ্গমঞ্চ। কুয়েত উদ্ধারের নামে সামরিক অভিযান চালিয়েছে ইরাকের বিরুদ্ধে। এরই ধারাবাহিকতায় ইরাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র উদ্ধার ও ইরাকী জনগণকে মুক্ত করার নামে চাপিয়ে দিয়েছে একতরফা যুদ্ধ। সকল আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতা অগ্রাহ্য করে ঝাপিয়ে পড়েছে ইরাকের ওপর।

মিথ্যাবাদী ও প্রতারক প্রমাণিত হয়েছে আমেরিকা ও বৃটেনের নেতৃত্ব

নিজ দেশের জনগণের নিকট এবং বিশ্ববাসীর নিকট প্রেসিডেন্ট বুশ ও প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার আজ মিথ্যুক ও প্রতারক হিসাবে প্রমাণ করেছেন নিজেদেরকে। ইরাক দখল করার পর বিশ্ববাসীর সামনে আজ সুস্পষ্ট হয়েছে ইরাকে কোন গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র বা রাসায়নিক অস্ত্র নেই। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন ইরাকে কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্র বা রাসায়নিক অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মিঃ রবিন কুকসহ বৃটেনের ৫ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্যায় যুদ্ধের। গোটা ইউরোপ ও আমেরিকার সাধারণ জনগণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এবং তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা জানিয়েছেন ইরাকের ওপর হামলার। এমনকি খৃষ্টান জগতের নেতা পোপ জন পল দ্বিতীয় আমেরিকা ও বৃটেনের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইরাকের ওপর হামলা অন্যায়। এ যুদ্ধ যারা করছে তাদের ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ঈশ্বরের নিকট দায়ী হতে হবে। তিনি যুদ্ধ পীড়িত ইরাকবাসীর পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়েছেন বিশ্ববাসীর প্রতি। এমনকি আমেরিকার শান্তিকামী জনগণও ছিল এই অন্যায় যুদ্ধের বিরোধী। ইতিহাসের অবিস্মরণীয় বিক্ষোভ হয়েছে আমেরিকার বড় বড় শহরগুলোতে।

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধী মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার আইনজীবীগণ যেসব যুক্তি দেখিয়ে নাৎসী বাহিনী ও হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ প্রমাণ করেছেন সেই সব যুক্তিতেই আজ ইরাকে দখলদার আমেরিকা ও বৃটিশ বাহিনী যুদ্ধাপরাধী। এ যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ অন্যায় এবং একতরফা যুদ্ধ, অবৈধ যুদ্ধ। যুদ্ধে মানবাধিকার লংঘন করা হয়েছে এবং গণহত্যা চালানো হয়েছে। বেসামরিক নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করা হয়েছে। শিশু ও নারীর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে বাড়িঘর, দালানকোঠা। যুদ্ধবাজদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে সভ্যতার নিদর্শন, লুঠ করা হয়েছে মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী। ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনের দাবিদার আমেরিকা যুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে মিথ্যা খবর পরিবেশন করেছে। বানোয়াট কাহিনী প্রচার করেছে ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায়। এই মিথ্যার বেসাতি বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছে। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট হয়েছে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ঘৃণ্য দুশমন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে আমেরিকা ও বৃটেনের বর্তমান নেতৃত্ব।

ইরাকের তৈল সম্পদ দখলই ছিল অন্যতম টার্গেট

সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসায় বেসামাল মিঃ বুশ ইরাকের তেলক্ষেত্র দখলের জন্যই যে মিথ্যা অজুহাতে ইরাক দখল করেছে এটা আজ বিশ্ববাসীর সামনে পরিষ্কার। ইরাকের তেল উত্তোলন ও তা বাজারজাতকরণের মধ্যে দিয়ে আমেরিকা প্রমাণ করেছে তেলের জন্যই এই মানবতা বিরোধী যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছে আমেরিকা। আগামী কয়েক দশকে সৌদি আরবের তেলের রিজার্ভ কমে আসবে এবং ইরাকই হবে মধ্যপ্রাচ্যে সর্ববৃহৎ তেল রিজার্ভের মালিক। এমতাবস্থায় যেকোন মূল্যে ইরাকের তেল সম্পদ করায়ত্ত করার লোভই যুদ্ধবাজ বুশের উদ্দীপনার মূল বিষয়বস্তু। ইরাকের তেল ইরাকী জনগণের। অথচ ইরাকের তেল বিক্রয় করেই পুষিয়ে নেবে আমেরিকা তার যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি। ইরাক পুনর্গঠনের নামে ঠিকাদারীর দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে। উল্লেখ্য যে, আমেরিকার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে এসব কর্পোরেট কোম্পানীর ভূমিকাই মুখ্য। জার্মানী, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া আমেরিকার ইরাক হামলার মৌখিক বিরোধিতা করলেও সঙ্গত কারণেই তারা কোন কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। বরং ইরাক দখল করাটাকেই তারা তলে তলে স্বাগত জানিয়েছে।

খৃষ্টান উগ্রবাদী ও ইহুদী চক্রের ধর্মোন্মাদনা

আমেরিকায় ইভাঞ্জেলিক্যাল খৃষ্টান উগ্রবাদী এবং মানবতা বিরোধী ইহুদী লবী কার্যত ধর্মীয় উন্মাদনা নিয়েই পরিচালনা করেছে এই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ বিরোধী অন্যায় যুদ্ধ অভিযান। বুশ মনে করেন, ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে নেতৃত্ব দেবার জন্যই ঈশ্বর তাকে মনোনীত করেছেন। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর পরই বুশ তার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় একে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড হিসাবে অভিহিত করেন। পরে মার্কিন প্রশাসন অবস্থা বেগতিক দেখে সংশোধন করে বলেছে কথাটা তার "মুখ ফসকে" বেরিয়ে গেছে। সে সময় তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, এ যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম। Prophecy and Politics গ্রন্থটি যারা পড়েছেন তারা ভালো করেই জানেন উগ্রবাদী খৃষ্টান ও ইহুদীরা এ লড়াইকে ভালো ও মন্দের মধ্যকার লড়াই মনে করেন। বাইবেলের ভাষায় ভাল-মন্দের লড়াই অর্থাৎ খৃষ্টান ও শয়তানের লড়াই। বুশ আরো বলেছেন, আমি প্রেসিডেন্ট হই, ঈশ্বর এটা চেয়েছেন। টাইম ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর হামলার পর প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, এই পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ঈশ্বরই তাকে নির্ধারিত করেছেন।

ইভাঞ্জেলিক্যাল খৃষ্টানদের নেতা বিল গ্রাহাম ও তার পুত্র ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম বুশের অতি ঘনিষ্ঠ জন। ১১ সেপ্টেম্বরের পর ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম ইসলামের প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন। তিনি ইসলামকে ঐতিহ্যগতভাবে সন্ত্রাস ও দুষ্টদের ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেন। গ্রাহাম প্রায়ই হোয়াইট হাউসে যেতেন। ২৭ মার্চ ইরাক যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে নিয়ে ১৪১ জন ইভানজেলিকেল খৃষ্টান নেতা গোপন বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে জেরি পলওয়েল উপস্থিত ছিলেন যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করেন। পরে অবশ্য লোক দেখানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এসব খৃষ্টান নেতারা মতামত ব্যক্ত করেন "খৃষ্টান ধর্মের জন্য ইসলাম হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ।" সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে

www.pathagar.com

বুশের নেতৃত্বে কার্যত ইসলামের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করা হয়েছে। এসবের পিছনেই রয়েছে বিশ্বজোড়া আমেরিকার দানবীয় সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে বিশ্ব আজ এক অন্ধ এবং উন্মাদ সাম্রাজ্যবাদের কবলে। বিশ্ব মানবতা আজ তাই ইতিহাসের এক মহাসঙ্কটে নিপতিত। এই সংকট শুধুমাত্র মুসলমানদের সংকট নয়। এই সংকট বিশ্ব মানবতার জন্য এক বিরাট সংকট। এক শ্রেণীর যুদ্ধবাজ স্বার্থপর মানুষই আজ মানুষের সবচাইতে বড় শত্রু।

আমেরিকার এই আগ্রাসনের মুকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর কর্মকৌশল কি হতে পারে

আমেরিকার আগ্রাসী পলিসির মুকাবিলায় মুসলিম উম্মাহর কর্মকৌশল কি হওয়া উচিত এ প্রশ্নের অনুসন্ধান করেছেন আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রখ্যাত পণ্ডিত পাকিস্তানের প্রফেসর খুরশিদ আহমদ। তিনি তার এক সুলিখিত গবেষণা নিবন্ধে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

তার মতামতের নির্যাস হলো এই পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বকে আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরতা ও হিকমত এবং প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে হবে। ইসলামের মূলনীতির প্রশ্নে কোন ধরনের আপোষ না করে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্যে অটল থাকতে হবে। এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থী জাতি হিসাবে সর্বাবস্থায় সকল ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থার ওপর অবিচল থাকতে হবে। দৃঢ়তা ও অবিচলতার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা।

আমাদেরকে সকল কর্মকাণ্ডে ন্যায়নীতি, সততা ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। অন্যরা যাই করুক মুসলমানরা হবে ইনসাফের পতাকাবাহী। প্রতিরোধ, যুদ্ধ, প্রতিশোধ প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করা যাবে না। এহেন জটিল পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সবাই মিলে আলোচনা, পর্যালোচনা, মত বিনিময় করতে হবে আমাদের কর্মকৌশল কি হতে পারে এবং আমরা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

মুসলিম উম্মাহকে আগে নিজের ঘর সংশোধনের পরিকল্পনা নিতে হবে। নিজেদের অনৈক্য ও বিভেদ দূর করতে হবে। প্রত্যেক দেশের নিজ অবস্থান, মুসলিম জাতির সম্মিলিত অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা ও তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

এ পরিস্থিতিতে আমরা যদি নিস্ক্রীয় বা অসচেতন থাকি সেটা হবে আত্মঘাতী। পরিস্থিতির সামনে আত্মসমর্পণের নীতি অবলম্বন করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে আমাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু ঘটবে।

আবার আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে নিজেদেরকে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকায় আবদ্ধ করে তাবলিগী তৎপরতায় নিজেদের সীমাবদ্ধ করা হলে সে কৌশলও সঠিক হবে না বা কোন ফলোদয় হবে না। তাতে বরং পরাজয় ও গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হতে হবে। তৃতীয় পথ হচ্ছে সংঘাত ও প্রতিশোধের পথ। ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে এমন পথ অবলম্বন করা হলে সেটাও হবে বোকামী ও আত্মহননের পথ।

আমরা মনে করি এহেন সংকটজনক পরিস্থিতিতে বিগত শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর সামনে যে চ্যালেঞ্জ ছিল একবিংশ শতাব্দীতেও মোটামুটি একই ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের মুকাবিলা করতে হবে। বিগত শতাব্দীতে আল্লাহর কিছু বান্দা মুসলিম জতির নাজাতের জন্য বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন। বিশেষ করে জামাল উদ্দীন আফগানী, মুহাম্মদ আবদুহ, আল্লামা ইকবাল, সাঈদ বদিউজ্জামান নুরসী, আয়াতুল্লাহ খোমেনী, হাসানুল বান্না শহীদ এবং মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী সমসাময়িক পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে এক জীবন সঞ্চারকারী কর্মসূচি তৈরি করে মুসলিম জাতিকে তা গ্রহণের আহ্বান জানান তাদের এই সমুদয় অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আমাদের নতুনভাবে সংগঠিত ও প্রস্তুতি গ্রহণের কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে।

নিম্নোক্ত প্রধান কতিপয় বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে

(১) **মূল লক্ষ্য নির্ধারণ ঃ** আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে নিজেদের বিশ্বাস, ঈমান, নিজ পরিচয় ও নিজ মনযিল ঠিক রাখতে হবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের পবিত্র সুন্নাহ আমাদের অবলম্বন এবং পথ। এখান থেকেই সকল শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

www.pathagar.com

(২) **শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতি ঃ** লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য নৈতিক ও সামাজিক শক্তি এবং বৈষয়িক ও সামরিক শক্তি অর্জন মনযিলে পৌঁছার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন। এজন্য যাবতীয় উপায় উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ আল্লাহর নির্দেশ-এটা আমাদেরকে গভীরভাবে বুঝতে হবে।

(৩) **উম্মাহর ঐক্য ঃ** মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সংহত করা অতি জরুরী। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আমাদেরকে আরও বিপন্ন করে তুলবে। টিকে থাকার একটাই পথ-সম্মিলিতভাবে মুকাবিলা করা। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যদি সম্মিলিতভাবে পরিস্থিতি মুকবিলার কোন পন্থা উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কারও রাষ্ট্রীয় অস্তি-ত্বই টিকে থাকবে না।

(৪) **মানবতার সংশোধন ও কল্যাণ সাধনই উদ্দেশ্য ঃ** আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুকাবিলায় তাদের ধ্বংস সাধন আমাদের লক্ষ্য নয়। আমেরিকার আগ্রাসী প্রশাসন এবং নেতৃত্বের শোষণ, নিপীড়ন, সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার মুকাবিলা করার অর্থ আমেরিকার জনগণের ধ্বংস সাধন নয়। কারণ সে সমাজের মধ্যে ভালো ও মন্দ দুটোই রয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দানকারী একটি উম্মত হিসাবে মানবতাকে কল্যাণের পথে আহ্বান করা আমাদের দায়িত্ব। তাদের সংশোধন আমাদের কাম্য। এ জন্য সংলাপের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং সেই সমাজ থেকে ভালো চিন্তার মানুষগুলোকে সাহায্যকারী হিসেবে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(৫) **রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুকাবিলা ঃ** আজকের বিশ্ব রাজনীতিতে রাষ্ট্র হচ্ছে মূল খেলোয়াড়। জনগণ বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় তুলেও আমেরিকাকে ইরাক হামলা থেকে বিরত করতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুকাবিলায় কতিপয় জাতি রাষ্ট্রও যদি একটি অবস্থান নিয়ে এগিয়ে আসতো তাহলে পরিস্থিতি ভিন্নরূপ নিতে পারতো। সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারী করবে না এমন লোকদের হাতে যদি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব না আসে তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যত কৌশল নির্ধারণ করা হোকনা কেন তা ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে না। এমতাবস্থায় এমন রাজনৈতিক কৌশল নিতে হবে যাতে আল্লাহর নির্দেশিত এবং মহানবী (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত খেলাফতী রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রই পারে এই পরিস্থিতির মুকাবিলায় জনগণের শক্তিকে কাজে লাগাতে। সকল মহলকে এ বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে।

(৬) **বহুমুখী কার্যক্রম ঃ** শুধুমাত্র বন্য সামরিক শক্তির জোরেই আমেরিকা আজ একটার পর একটা রাষ্ট্র দখল করার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে না। এজন্য তার যেমন আছে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য। সুতরাং আমরা যদি আমেরিকার আগ্রাসনের কবল থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদের এগুলো মুকাবিলার জন্য বহুমুখী কর্মকাণ্ড চালাতে হবে এবং বহুমুখী কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

(৭) **মুসলিম বিশ্বে সংস্কার ও সংশোধন ঃ** নিছক আবেগ দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির মুকাবিলা সম্ভব নয়। মুসলিম বিশ্বের যে সম্ভাবনা আছে তা কাজে লাগাতে হবে। গণতন্ত্র চর্চা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গকে ভূমিকা পালন করার সুযোগ করে দিতে হবে। অনেক মুসলিম দেশেরই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই এবং মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষিত নয়। অথচ ইসলাম অবাধ মতামত ব্যক্ত করার গ্যারান্টি দান করেছে। অন্যদের পরিবর্তে নিজ জাতির ওপর আস্থা রাখতে হবে। পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য ভিত্তিক আলোচনা, বিতর্ক এবং ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভরশীলতা মুসলিম দেশগুলোর জন্য বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনছে। মুসলিম বিশ্বে থিংক ট্যাংক গড়ে তোলা, গঠনমূলক আলোচনা, পারস্পরিক আস্থা আমাদের উন্নতি ও শক্তির জন্য বড় ধরনের সহায়ক হতে পারে।

(৮) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ** শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব দান। মনে রাখতে হবে এসব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অগ্রবর্তী ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়েই আমরা অগ্রসর হতে পারি।

(৯) **আত্মনির্ভরশীলতা ঃ** গ্লোবালাইজেশন তথা বিশ্বায়নের নামে মুসলমানদের তাদের ঈমান-আকিদা, কৃষ্টি-কালচার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সমূলে উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বিশ্ব সংস্থা নামধারী সকল প্রতিষ্ঠান মূলত নব উত্থিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। এজন্য মুসলিম দেশগুলোর নিজেদের জনশক্তি,

www.pathagar.com

সম্পদ, উপায়-উপকরণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অর্থনীতি এমনভাবে আত্মনির্ভরশীল করতে হবে যাতে কোন অন্যায় চাপের মুখে নতি স্বীকার না করতে হয়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কোনটাই রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। এজন্য অবিলম্বে মুসলিম বিশ্বের সকল সংস্থা ওআইসি, ডি-৮, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী চেম্বার অব কমার্সসহ সকল প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগিয়ে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে কৃষি-শিল্প, অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সময় এসেছে।

(১০) **পরিস্থিতি মুকাবিলায় চাই শক্তিশালী মিডিয়া ঃ** মিথ্যা প্রচার করে, মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত খবর ম্যানুফেকচার করে মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমা সভ্যতার ধ্বজাধারীরা। পাশ্চাত্যের জনগণের নিকট সঠিক তথ্য পরিবেশন এবং বিশ্বমানবতার এই সংকট উত্তরণের জন্য চাই সত্যপন্থীদের শক্তিশালী মিডিয়া। মুসলিম জাহানের বিপুল সম্ভাবনা আছে নিজস্ব শক্তিশালী জনপ্রিয় মিডিয়া গড়ে তোলার। সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধে সীমিত সামর্থনিয়ে আল জাজিরা টিভি চ্যানেল যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয় আমরাও মিডিয়া জগতে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। আমাদের সম্পদ আছে, উপায়-উপকরণ আছে, পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোগের অভাবে আমরা হেরে যাচ্ছি। এই বন্ধাত্বের অবসান ঘটিয়ে মিডিয়ার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা পরিস্থিতির অনিবার্য দাবি।

(১১) **ইসলামের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী চরমপন্থীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ঃ** নানাবিধ ঐতিহাসিক কারণেই সংকটকালে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অবকাশ সৃষ্টি হয়। অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরাও তাদের অজান্তেই বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অজুহাত সৃষ্টির জন্য বিভ্রান্তির বীজ ছড়াতে পারে। অথবা হামলার পটভূমি রচনার জন্য নিজেরাই ইসলামের নামে বদণাম রটানোর কৌশল গ্রহণ করতে পারে। বিশ্বের প্রধান ইসলামী আন্দোলনসমূহ আল্লাহ রাসূলের মধ্যমপন্থার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তারা অস্ত্র, সন্ত্রাস ও হঠকারিতায় বিশ্বাসী নয়। ইসলামী আন্দোলন সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য নানা চক্রান্তও হতে পারে। সুতরাং মুসলিম সমাজে এবং অন্যদের সামনেও এটা সুস্পষ্ট করে দেয়া যে, ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। ইসলাম মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও শান্তিতে বিশ্বাসী। ইসলাম বল প্রয়োগে নয় বরং মানুষের হৃদয় জয় করা, ইনসাফ, সততা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবনে বিশ্বাসী বিশ্বজনীন মানব কল্যাণাকাংখী এক মহৎ জীবন দর্শন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ ও মুক্তিই ইসলামের কাম্য। অন্যায় ও অজ্ঞতার পর্দা ছিন্ন করে ন্যায় ও কল্যাণের আলোকিত সমাজ নির্মাণই ইসলামের অঙ্গীকার।

(১২) **আল্লাহর রহমত কামনা ঃ** গোটা মানবজাতিকে এই সংকটের মহাসমুদ্র থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের মহান স্রষ্টা প্রভুর দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানো ও আল্লাহর রহমত কামনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং সমূহ বিপর্যয় ক্ষতি থেকে হেফাজত করার জন্য দোয়া করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

www.pathagar.com

বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণে গৌরবোজ্জ্বল মুসলিম অতীত

আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি

মুসলিম জাতি! শৌর্য বীর্যের অধিকারী প্রতাপশালী একটি জাতি। এ জাতির উত্থান হয়েছে শাসক হয়ে, শাসিত হতে নয়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায়ই এ জাতির একমাত্র লক্ষ্য বা মিশন। তাই তো ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে যখন আমরা দৃষ্টিসীমায় তা মেলে ধরি তখন সত্যি বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। কি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসই না মুসলমানরা রচনা করে গেছে! কি অতুলনীয় কৃতিত্বই না তারা রেখে গিয়েছে! বিশ্বের প্রতিটি সভ্যতায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও যার সমকক্ষ কোন কিছুর নজির পাওয়া দুষ্কর।

এমন এক সময় ছিলো যা ছিলো মুসলমানদের স্বর্ণালী এক সময়। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আজকের দুনিয়ায় মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। বিশ্বের মানচিত্রে সবচেয়ে অত্যাচারিত, আর নির্যাতিত জাতি হিসাবে মুসলমানরা তাদের আসন পোক্ত করে নিয়েছে। কেন আজ মুসলমানদের এই অসহায় অবস্থা? যে গৌরবের রাজটীকা মুসলমানদের মাথায় শোভা বর্ধন করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা আজ কোথায় হারালো তারই সন্ধানে আজকের এ লেখার অবতারণা।

আজ থেকে ১৪ শত বছর পূর্বে "পড় তোমার প্রভুর নামে" এই অমোঘ নির্দেশের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল ইসলামের যাত্রা। পবিত্র কোরআনের এ নির্দেশ ছিলো বিশ্ববাসীর জন্য জ্ঞানের মহিমাকে উচ্চকিত করার নির্দেশ। পবিত্র কোরআনুল করীমের এ নির্দেশের অলঙ্ঘনীয় অনুসরণের ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি তৎকালীন সময়কার সবচেয়ে অসভ্য আর যাযাবার এক জাতি ছিনিয়ে নিয়েছিল বিশ্বসভ্যতার মশাল। ফলে মধ্যযুগের সেই কুহেলিকা ভেদ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নয়নে বিশ্বসভ্যতার রাহবারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মুসলিম জাতি। যা নবম-দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ পরিক্রমায় এক অনন্য মাইলফলক। তাই আধুনিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের যুগের পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন মুসলিম বিজ্ঞানী ও মনীষীরা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং এ সভ্যতা তার অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানদের কাছে ঋণী Robert Briffault দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা উল্লেখ করেছেন এভাবে–

Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. The debt of our science to that of Arabs does not consist in statling discoveries or revolutionary theories; science ours a great deal more to the Arab culture, it onces its existence."

www.pathagar.com

অথচ মুসলিম অমুসলিম অনেক সুধীজন আছেন যারা মুসলমানদের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চান। ৬ষ্ঠ শতাব্দী হতে ১৪০০ শতাব্দীকে তারা মধ্যযুগ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে অভিহিত করেন।

কিন্তু এ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হতে ১৪০০ শতাব্দী- ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে যা অন্ধকার বর্বর মধ্যযুগ বা 'Dark Age'- তা শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ তারা তখনও ছিল সভ্যতা থেকে যোজন যোজন দূরে। ওখানকার বহু মানুষ তখন পর্যন্ত গাছের ডালে, পর্বত গুহায় বাস করত। গোসল করে শরীর পরিষ্কার করাও ছিল তাদের দৃষ্টিতে পাপ। গীর্জার শাসন-দাঁত মাজলেও জরিমানা করত। অথচ এই সময়টাই ছিল ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ। আলোকিত যুগ। কারণ এ যুগেই মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিকে উন্নয়নের দ্বার উন্মোচন করেন। শিল্প সাহিত্য, চিকিৎসা, গণিত, রসায়ন, স্থাপত্য ইত্যাদি সকল দিকে ছিল তাদের গৌরবোজ্জ্বল পদচারণা, কিন্তু আমরা কি তা জানি? না। কারণ সভ্যতার চোর এই ইউরোপীয়রা এ যুগের মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত উপকরণ বগলদাবা করে জন্ম দিয়েছে আধুনিক ইউরোপ। আর মুছে ফেলেছে মুসলিম মনিষীদের এ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা। আগাগোড়াই এই সভ্যতাটিকে চাপা দিয়ে অন্ধকার যুগে পরিণত করা হয়েছে। এতে পূর্ণ কৃতিত্বের মালিকানা দখল করাই বড় কথা ছিল না, ইসলামী সভ্যতা পৃথিবীতে আর কোনদিন মাথা তুলতে না পারে- এটাই ছিল প্রতিপক্ষের মূল কথা।

আজকের দুনিয়ায় এ আধুনিক সভ্যতার উৎকর্ষতা নিয়ে যে বড়াই করছে ইউরোপ আমেরিকা তার সিঁকি ভাগও তাদের কৃতিত্ব নয় বরং তার পুরোটাই মুসলমানদের সৃষ্টি। অর্থাৎ বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানরাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য। আশা করি বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের সেই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিম্নোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

জ্ঞান অন্বেষায় মুসলমানরা

তৎকালীন সময়ে মুসলিমরা ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। জ্ঞানের প্রতিটি দরজায় তারা প্রবেশ করেছে আহরণ করেছেন সেখানেই জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেখানেই মুসলমানরা তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

হিজরী ২১৫ সালে আব্বাসীয় খলিফা মামুন প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলার খরচ করে বাগদাদে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে তোলেন যার নাম দেন "বায়তুল হিকমাহ" -এর সাথে ছিলো জ্যোর্তিবিদ্যার মানমন্দির ও পাঠাগার। তিনি সেখানে বহুসংখ্যক পন্ডিত ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে, বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, দর্শন ও সাহিত্যের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করেন। যার ছিলো ১০০টি উটের বোঝা পরিমাণ।

গণিত শাস্ত্র

Legacy of Islam গ্রন্থের Istronomy and Mathematics অধ্যায়ে Baron carra de vaux বলেন, "এল জেবরা হচ্ছে আরবী আলজার কথাটির ল্যাটিন রূপ। এর অর্থ শক্তি, ভাগ্য, অসংগতি। বিজ্ঞান আজ যে সব সংখ্যা ব্যবহার করছে তা আরবী সংখ্যা। বর্তমানে ব্যবহৃত কম্পিউটারের প্রযুক্তির মূল ভিত্তি হচ্ছে 'O'। 'O' বা zero এই মূল্যমান গ্রহণ করার মাধ্যমে মুসলমানরা মূলত গণিত শাস্ত্রের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নের প্রদত্ত তথ্যে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে–

৮ম শতাব্দী

আবু ইসহাক আল কাজারী : তাঁর রচিত গ্রন্থ Armillery Sphery আজও গণিতের অনেক বিষয়ে প্রামাণ্য হিসেবে গৃহীত হয়। *তিনিই প্রথম আরব গণনা পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করে আরব বর্ষ গণনা ও দিনপঞ্জী প্রণয়ন করেন।*

৯ম শতাব্দী

আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মূসাআল খারেজমী : বীজগণিতের সর্বপ্রথম আবিষ্কারক হলেন আল খারেজমী। এ বিষয়ে তাঁর রচিত 'হিসাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালাহ' গ্রন্থের নামানুসারে এ শাস্ত্রকে পরবর্তীতে ইউরোপীয়রা আলজেবরা নামকরণ করেন। খারিয্মীর এ গ্রন্থে আট শতাধিক বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ সন্নিবেশিত হয়। *সমীকরণের*

www.pathagar.com

সমাধান করার প্রায় ছয়টি নিয়ম তিনি আবিষ্কার করেন। খারেযমীর গ্রন্থখানি দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত করেন। খারেজমীর গ্রন্থখানি তখন থেকেই ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে পঠিত হয়। আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ আল মারওয়াজী তার প্রণীত ত্রিকোণমিতির সংগে পরবর্তীতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আবুল কাসেম আহমদ, আবু জাফর মোহাম্মদ, হাসান ইবনে মুসা বিন শাকীর ঃ *ভাতৃত্রয় সর্বপ্রথম লোহিত সাগর তীরে নির্ভুলভাবে ডিগ্রী মেপে পৃথিবীর প্রকৃত আকার ও আয়তন নির্ণয় করেন। বাহুর পরিমাপ নিয়ে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটি তাদেরই আবিষ্কার।* কোণকে তিনখণ্ড করার জটিল নিয়ম তারাই আবিষ্কার করেন। তাদের প্রচেষ্টায় বলবিজ্ঞান-বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। আবুল হাসান সাবেত ইবনে কোরা জ্যামিতির অনেক মৌলিক বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। *তিনি প্রথম বীজগণিতের সমস্যাসমূহ জ্যামিতিতে পূর্ণভাবে ব্যবহার করেন।*

১০ম শতাব্দী

আবুল কাসেম আল মিশরী ঃ বর্তমানে ভগ্নাংশ লিখন প্রণালীর যে ব্যবহার তা তিনিই আবিষ্কার করেন। বীজগণিতের দ্বিমাত্রা সমীকরণের উভয় প্রকার সমাধান তারই কীর্তি।

আবুল কামিল আল মিশরী ঃ *বর্তমানে ভগ্নাংশ লিখন প্রণালীর যে ব্যবহার তা সর্বপ্রথম তিনিই অবিষ্কার করেন।* বীজগণিতের দ্বিমাত্রা সমীকরণের উভয় প্রকার সমাধান তার শ্রেষ্ঠ অবদান।

একাদশ শতাব্দী

আবু বকর মোহাম্মদ আল কারখী ঃ গণিত বিষয়ে তিনি 'আল কাফিফিল হিসাব' 'কিতাবুল কাখরী' ইনবাত আল সিয়া আল খাকিয়া, 'আল বদিফিল' হিসাব রচনা করেন। গ্রন্থাবলীতে ভগ্নাংশের মূল Quarter, Square, বর্গমূল নির্ণয় প্রণালী, সমতলভূমির পরিমাপ ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

আবুল জুদ মোহাম্মদ ইবনুল লাইজুস সানী ঃ বহুভূজের মধ্যে তিনি সুষম সপ্তভূজের বাহুর পরিমাণ নির্ধারণ করেন এবং সর্বপ্রথম সমীকরণটির সমাধান পেশ করেন। Couics এর সাহায্যে তিনি কোণকে ত্রি-খণ্ডিত করার সমাধান করেন। Pasabola এবং Hypesbola ছেদনের মাধ্যমে সমাধান করেন।

হামিদ ইবনে খিদর আল খুজানী ঃ বীজগণিতের ত্রৈমাত্রিক সমীকরণে মতবাদ তাকে গণিতে অমর করে রেখেছে। *তিনিই ১ম মূলদ সংখ্যার প্রকল্প হিসেবে দুটি ত্রৈমাত্রিক সংখ্যার যোগফল অন্য একটি ত্রৈমাত্রিক হতে পারে না তা অবিষ্কার করেন।*

আবু রায়হান আল বিরুনী ঃ 'কিতাবুল হিন্দ' ও আছরারুল বাকিয়া, গ্রন্থে অভিধানরূপে গণিতের ব্যবহার করেন। তিনি প্রথম Sinetable তৈরি করেন। শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম গণনায় আল বিরুনীর আবিস্কৃত Formula কে বর্তমানে নিউটনের উদ্ভাবন বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ নিউটনের জন্মের বহু পূর্বে আল বেরুনী শুধু এগুলো আবিস্কারই করেননি এগুলোর ব্যবহার করে সাইন তালিকা প্রণয়ন করেন।

ইবনুল হাইছাম ঃ তার শ্রেষ্ঠ অবদান ত্রিকোণমিতিতে তার রচিত 'মাকলাতুমুখতাছরফি সামতোল কিবলা গ্রন্থে Cotgent সম্পর্কীয় নতুন Theory উদ্ভাবন করেন।

ওমর বিন ইব্রাহীম খৈয়াম ঃ বীজগণিত বিষয়ে তার রচিত ১০টি গ্রন্থে তিনি দেন

১. বীজগণিতের সংজ্ঞাসমূহের ব্যাখ্যা

২. সরল ও যৌগিক সমীকরণের তালিকা

৩. ১ম ও ২য় মাত্রা সমীকরণের আঙ্গিক ও জ্যামিতিক সমাধান।

রসায়ন

গণিতের ন্যায় রসায়ন শাস্ত্রেও মুসলমানদের অবদান ছিল অতুলনীয়। মূলত যা বলা যায়, তা এই যে রসায়নের জনক মুসলমান বিজ্ঞানীগণ। নিম্নে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হলো ঃ

www.pathagar.com

জ্ঞানিসপ্তম শতক

হযরত আলী (রা) ঃ পারদ ও অভ্র একত্র করে যদি বিদ্যুতের মত কোন বস্তুর সাথে মিশিয়ে দিতে পার, তাহলে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাতের অধিশ্বর হতে পারবে। নিকৃষ্ট ধাতু হতে সোনা তৈরির এ ফর্মুলার পরিকল্পনাকারী রসায়নবিজ্ঞানী ৪র্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)।

খালিদ বিন ইয়াজিদ ঃ উমাইয়া যুগের অন্যতম বিজ্ঞানী খালিদ বিন ইয়াজিদ, 'কিতাবুল হারাবাত', 'সাহিফাতিল কবীর', সাহিফাতিস সগীর এবং ওয়াসিয়াতিহি ইলা ইবনিহি ফিস সান আ' তারই বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ।

৮ম শতক

জাফর আস সাদিক ঃ রসায়নবিজ্ঞানের জনক জাবির ইবনে হাইয়ানের শিক্ষক। তিনি 'রিসালা জাফর আস সাদিক ফি ইলমিস সালা ওয়াল হাজাবিল মোকাররম গ্রন্থ রচনা করেন।

জাবির ইবনে হাইয়ান ঃ *পৃথিবীর সর্বপ্রথম রসায়ন বৈজ্ঞানিক।* রসায়ন শাস্ত্রের জনক হিসাবে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আরব রসায়ন শাস্ত্রের জনক। পশ্চিমা রসায়ন শাস্ত্র ও আলেকেমির উপর তার প্রভাব ছিল ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী। তার কয়েকশত অবদান সর্বজন স্বীকৃত এবং এখনও তা টিকে আছে। তার ৫০০টি গবেষণাকর্ম মুদ্রিত অবস্থায় প্যারিস ও বার্লিনের জাতীয় পাঠাগারে পাওয়া যায়। ইউরোপের জ্ঞানীরা তাকে আদর করে ডাকে বুদ্ধির অধ্যাপক। তারা স্বীকার করেন তিনি ১৯টি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারক। জাবির ইবনে্ হাইয়্যান রচিত গ্রন্থের পরিমাণ ২৭৭ খানা, যার পৃঃ ২৬৭০। চিকিৎসা সংক্রান্ত বই ৫০০, জ্যোর্তিবিদ্যা সংক্রান্ত-১ দার্শনিক যুক্তি খণ্ডনের বই ৫০০। বিশ্বের বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত তার কিছু রসায়ন গ্রন্থের নাম :

১. The First Book of Foundation to Barmaecides.
২. The Book of Extraction from Potentiality to Actuality.
৩. The Unveiling of Secrits and the Reasling of Vels রয়েছে ব্রিটিশ মিউিজিয়ামে।
৪. Letter on Cemistry-কায়রো।
৫. The Progerties of Elinir of Gold.
৬. The Book of Mercy লিডেনে রক্ষিত
৭. The Little Book of Mercy
৮. The Book of Concentration. লিডেনে
৯. The Book of Abstraction
১০. The Book of Purity মিউজিয়ামে (ব্রিটিশ)
১১. The Book of Calcination.

এছাড়াও মহান বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধাতু সম্পর্কে আলাদা আলাদা বই রচনা করেন।

৯ম শতক

জাকারিয়া আর রাজী ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতিমান হলেও রসায়ন বিষয়ে 'কিতাবুল মাদখাল কিতাবুল আসবার গ্রন্থ রচনা করেন।

১০ম শতক

মোহাম্মদ ইবনে উমায়েল ঃ ১৯০৩ সালে লক্ষ্ণৌতে প্রাপ্ত একটি আরবী পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে জানা যায় তার যে বইটি রসায়ন শাস্ত্রে আজও দিক নিদর্শন রূপে রয়েছে তাহলো Book of the Silvery Water and Storry Earth।

www.pathagar.com

১১শ শতক

আবুল হাকিম মোহাম্মদ ঃ রসায়নের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় শাখার সরল ও সহজ পন্থা উল্লেখ করে 'আইনুস সানাহ ওয়া আইওয়ানুস' গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৩শ শতাব্দী

আবুল কাশেম ঃ 'ইলমুল মুকতাসাব ফি যারায়োতিজ জাহাব' গ্রন্থে রসায়নের প্রত্যক্ষ মতবাদ স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন।

চিকিৎসা শাস্ত্র

Dr. Mayerhof তার বই "The Legacy of Islam" এ লিখেন মুসলিম ডাক্তারগণ ক্রুসেড যুদ্ধে আগত মেডিকেল এটেনডেন্সে অগোছালো ও প্রাথমিক পর্যায়ে অব্যবস্থাপনা দেখে হাসতেন। ইউরোপীয়গণ সে সময়ে ইবনে সিনা, জাবির, হাসান বিন হাইসাম বা রাজীর বই সমূহের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। পরে ল্যাটিন ভাষায় বইগুলো অনুবাদ হয় কিন্তু অনুবাদকের নাম উল্লেখ করা হয়।"

এ ছাড়াও অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মাঝে ছিলেন আন্দালিসিয়ার আবুল কায়েস, ইবনে যাহার ইরানের আব্বাস, মিসরের আলী ইবনে রেজভান, বাগদাদের উবনে ইসাউ, মসুলের আম্মার, আন্দালুসিয়ার আবুল রুশদ। এদের বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। বিভিন্ন শতকে মুসলিম চিকিৎসদের অবদান তুলে ধরা হলো ঃ

৮ম শতক

জাবির বিন হাইয়ান, আল কীন্দি ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত ৫০০টি গ্রন্থ রচনা করেন। ২৭টি চিকিৎসা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে রোগ ও রোগের ঔষুধের ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এছাড়া ঠাণ্ডা, যকৃত, পেটের পীড়া, প্লীহার রোগ, আগুনে পোড়ার ঔষধ ইত্যাদির ব্যবস্থাপত্র তিনি উল্লেখ করেন।

৯ম শতক

আলী ইবনে রাব্বান ঃ *চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম বিশ্বকোষ 'ফিরদাউসুল হিকমত' রচনা করেন।*

আবুল হাসান আহমদ আবারী ঃ চোখের চিকিৎসার উদ্ভাবক, হিপোক্রেটের চিকিৎসা পদ্ধতি তিনি 'মুয়ালাযাতুল তুকরাতিয়া' রচনা করেন।

১০ম শতাব্দী

আবু বকর মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আর রাজী ঃ হাম, শিশু চিকিৎসা, Neutopsyciatic ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে চিরকালের এই মহান বিজ্ঞানী *"Interventricular Hydrocephalus" সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন।*

উইল ডুরান্ট (Will Durant) লিখেন যে, মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া রাজী মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মাঝে অগ্রসর ছিলেন। তিনি দুই শতাধিক গ্রন্থের রচিয়তা যা আজো ব্যাপকভাবে পঠিত হয়। তার বিশেষ অবদান হলো ঃ মহান বিশ্বকোষ (The great Encyclopedia)। এটি ২০ খন্ডের বিশাল বিশ্বকোষ যা বর্তমানে দুষ্পাপ্য। এই বিশ্বকোষের ৫ খন্ড চক্ষু বিজ্ঞানের উপর। ১২৭৯ সালে এটির ল্যাটিন অনুবাদ হয় কেবলমাত্র ১৫৪২ সালে ৫টি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। শত বছর ধরে এ গ্রন্থগুলো প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। ১৩৯৪ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোর্স হিসাবে এটিকে গ্রহণ করে।

১০ম শতক

আলী ইবনে আব্বাস ঃ *তিনি অমর হয়ে আছেন 'কিতাবুল মালিকী' নামক ২০ খণ্ডে রচিত বিশাল গ্রন্থটির জন্য।* যেখানে বিভিন্ন রোগের কারণ উপসর্গ ও চিকিৎসার বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। তিনি প্রথম ব্যান্ডেজ ব্যবহারের কথা বলেন। একজিমা, কুষ্ঠ, বসন্ত, হাম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন।

www.pathagar.com

আবু মনসুর মুয়াফাক ঃ Plastic of Paris তৈরি ও সার্জারীতে এর ব্যবহার আবিষ্কার করেন। 'কিতাবুল অবনিয়া' গ্রন্থ রচনা করেন যাতে ৫৮৫টি প্রতিষেধকের বর্ণনা আছে।

মোহাম্ম বিন আহমদ ঃ গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে 'তাদবীরুল হাবালা ওয়াল আতফাল ওয়াম সিরিয়ান' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

১১শ শতক

ইয়াহিয়া ইবনে ইসা সাইদ ইবনে হিবাতুল্লাহ ঃ Discoures the Creation of men গ্রন্থটিতে প্রজনন, গর্ভধারণকাল প্রসব, পুষ্টি সাধন, মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আবুল কাসেম খালাক আল জাহ্‌রাবী ঃ *সমগ্র স্পেন তথা ইউরোপে সার্জিকেল বিদ্যা তিনিই সর্বপ্রথম চালু করেন।* Anatomy, Physiology এর Surgery সম্পর্কে তার *শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আত তাসরীফ' যা Medical Encyclopedia* হিসেব অবিহিত।

হাসান ইবনে নুহ ঃ কিতাবুগানা ওয়া মানা বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থটির রচয়িতা। তিনি ছিলেন ইবনে সিনার শিক্ষক।

আবু আলী আল হুসাইন বিন আবদুল্লাহ ইবনে সিনা ঃ চিকিৎসা বিষয়ে তার শ্রেষ্ঠ অবদান চিকিৎসা বিশ্বকোষ আলকানুন কিতাব ত্রয়োদশ হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বছর এ বইটি ছিল ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা চিকিৎসা বিজ্ঞানে মাইলফলক স্বরূপ। ৫ খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটিতে ৭৫০টি গুল্ম, প্রাণীজ ও খনিজ ঔষধের বর্ণনা আছে। Encyclopedia Britania তে টমাস ক্লিফোর্ড উল্লেখ করেছেন 'ইবনে সীনার কানুন হিপোক্রিটাস ও গ্যালেনের কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে।

Dr. Mayerhof এ বিষয়ে লিখেছেন যে- ইবনে সিনার বিখ্যাত বই কানুন চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাস্টার পিস হিসাবে এত প্রসিদ্ধ যে, পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দে এর ১৬টি সংস্করণ ছাপা হয় যা ১৫টি ল্যাটিন ও ১টি আরবী ভাষায়। বিজ্ঞানের অমূল্য গ্রন্থ হিসাবে ষোড়শ শতাব্দীতে এর শত শত কপি মুদ্রণ হয়। এখনও চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেকে এ বইটি থেকে সহায়তা নেন।

তার আরেকটি গ্রন্থ "কিতাবুল শেফা" যা ১৮টি খন্ডে বিভক্ত বিখ্যাত একটি গ্রন্থ। উল্লেখ করা যেতে পারে এ গ্রন্থটির ৫ম খন্ডটি ইউরোপে এরিস্টটলের নামে প্রকাশিত হয়েছে।

ইয়াহিয়া ইবন ঈসা ঃ জ্বর, চর্মরোগ ও রোগের পূর্বাভাস সম্পর্কিত 'কিতাবু তাকযীমুল আবদান' ও 'মিনগাজুল বায়ান ফি মা ইয়াস তামলাহুল ইনসান' গ্রন্থ রচনা করেন।

একাদশ শতাব্দী

ইবনে জুহর ঃ মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইউরোপের চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে জুহর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি, তার রচিত তিনটি গ্রন্থের মধ্যে *'কিতাবু তাইসি'র সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।*

আবুল কাসেম আম্মার ঃ চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে তাকে মুসলিম জাতির সর্বপ্রথম মৌলিক চিকিৎসাবিদ বলা হয়। *চোখের ছানি অপারেশনে তিনি শোষণ করে ছানি তুলে ফেলার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।*

ইবনুল হাইছাম ঃ চক্ষু চিকিৎসার ব্যাপারে যুগপৎ অবদান রাখেন।

আবু রায়হান আল বিরুনী ঃ ফার্মেসী বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

দ্বাদশ শতাব্দী

ঈসমাইল বিন হাসান ঃ ফার্সিতে Medical Encyclopedia হিসেবে বিখ্যাত 'জাখিরায়ে খারিজম শাহী' তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

ইবন রুশদ ঃ স্পেনীয় বিজ্ঞানীটি চিকিৎসা বিষয়ে ২০টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে 'কুল্লিয়াত ফিততীব' বিখ্যাত।

চৌদ্দ শতক

মোহাম্মদ আল মাহসী বিন আলী মুনপুরী আল ইয়ামানী আল হিন্দ ঃ *চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একজন বাঙালী বিজ্ঞানী।* তিনি রহমা ফিততীব ওয়াল হিকমা, তাসহিনুল আনাফী ফিততীব ওয়াল হিকমা, সিফা ওয়াল আজসাম ইত্যাদি

www.pathagar.com

গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থাবলীতে খাদ্যবস্তু, ঔষধ, স্বাস্থ্য, শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগ ও সাধারণ রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানরা শুধু গবেষণা ও অনুসন্ধান নিয়েই ব্যস্ত থাকেননি, তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন যেমন– তৎকালীন সময়ে কেবল বাগদাদ নগরীতেই ৬০টি ঔষাধালয় থেকে খলিফা বিনা পয়সায় জনগণের জন্য ঔষধ দেয়া হতো।

তৃতীয় হিজরীতে আব্বাসী ও গভর্ণর তাদের নিজ নিজ এলাকায় শ্রেষ্ঠ হাসপাতালগুলো গড়ে তুলেন। তখন কেবল বাগদাদেই ৪টি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল ছিল ও সেখানে ২৪ জন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

মার্ক ক্যাপ লিখেছেন, "কায়রোতে একটি বড় হাসপাতাল ছিল সেখানে জীবন্ত ঝর্ণা ছিল, বিশাল ফুলের বাগান ছিল, ৪০টির বেশি বিশাল উঠোন ছিল সেখানে রোগীদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হতো, ভাল হয়ে গেলে ৫টি স্বর্ণমুদ্রাসহ তাকে ফেরত পাঠানো হতো। সে সময় কর্ডোভা নগরীতে ৬০০টি মসজিদ, ৫০টি হাসপাতাল ছিল।

এসব কেন্দ্রে অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও থাকত সার্জারীর আলাদা বিভাগ, যাতে থাকতেন অস্ত্রোপচারের আলাদা সার্জন।

তাই আজকের আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী তা অবশ্যই আমাদের জোর দিয়ে বলতে হবে।

ভূ-বিজ্ঞান

ভূ-বিজ্ঞানে ও মুসলিম ভূগোলবিদ্‌গণ রচনা করে গেছেন সেই একই ইতিহাস। যার প্রমাণ পাই নিম্নের তথ্য থেকে–

৯ম শতাব্দী

আল খারেজমী ঃ তাঁর রচনায় তিনি আরবীতে *ভূ-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ স্থাপন করেন। 'সুরাতুল আরদ নামক গ্রন্থটি নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত তার অনন্য কীর্তি।*

আল বাত্তানী, আল ফারগানী ও ইবনে ইউনুস ঃ অক্ষরেখা দ্রাঘিমা ও ভূ-মণ্ডল বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছেন।

ইয়াকুব বিন ইসহাক আল কান্দি ঃ দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সাথে ভূ-গোলক চর্চায়ও বিখ্যাত। তার মূল্যবান দুটি গবেষণা গ্রন্থ হচ্ছে 'রসমুল মামুর মিনাল আরদ এবং রিসালাতুল ফিল বিহার ওয়াল মদ ওয়াল জায়ব।

ইবনে খুরদাদবীহ ঃ *মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম ভূগোল বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের রচয়িতাকে ভূগোলবিদদের জনক বলা হয়।*

আহমদ বিন মুহম্মদ আত-তায়ার আস সারাকসী ঃ 'আল মাসালিক ওয়াল মাগালিক' ও 'রিসালাত ফিল বাহারসীয়াহ ওয়াল জাবল' নামক দুটি মূল্যবান ভূগোল গ্রন্থের রচয়িতা।

ইবনে ওয়াদী আল ইয়াকুবী ঃ তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল বুলদান'।

১০ শতাব্দী

ইবনে রুনতাহ ঃ তাঁর রচিত বিবরণমূলক গাণিতিক ও জনতাত্ত্বিক ভূগোল 'গ্রন্থ আলাক আন নাসীফা' বিষয় বৈচিত্র্যের *কারণে এটাকে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিশ্বকোষ বলা হত।*

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল মুকাদ্দেসী ঃ *সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ছিলেন।* তিনি *মুসলিম জাহানকে ১৪টি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের পৃথক মানচিত্র তৈরী করেন।* তাঁর *রচিত গ্রন্থ 'আহসানুত তাকাসীম ফী সারিফাতিল আকালীম।"*

১০ শতাব্দী

যায়েদ আল বলখী ঃ অন্যতম মুসলিম মানচিত্র নির্মাতা, রচিত গ্রন্থ 'সুরাতুল আকালীম' ও মাসালিক ওয়াল মাসালিক'।

আল বিরুনী ঃ সর্বপ্রথম গোলাকার মানচিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল হিন্দু ও 'কিতাবুল তাফহীম'।

ইবনে হাক্কাল ঃ *তিনি প্রথম বিশ্বের মানচিত্র আঁকেন।*

www.pathagar.com

১১শ শতাব্দী

আল ইদ্রিসী ঃ পাশ্চাত্যের সর্বাপেক্ষা সুপরিচিতি ভূগোলবিদ। তিনি খ-গোলক (Galestial spter) তৈরী এবং একটি গোলককে জ্ঞাত জগতের অবস্থান নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুর রোজারী'। তিনি *প্রায় ৭০টি মানচিত্র নির্মাণ* করেন এবং এতে *পৃথিবীর অক্ষাংশ পরম্পরায় ৭টি আবহাওয়া বিভাগ দেখান।*

১২শ শতাব্দী

ইয়াকুব বিন আবদুল্লাহ আল হামাভী ঃ তাঁর রচিত গ্রন্থ *মুজমাউল বুলদান' এ* পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিবরণ ও বিচিত্র তথ্য বর্ণ ক্রমানুসারে সজ্জিত হয় বলে *এটি ১টি বিশ্বকোষ হিসেবে মর্যাদাপ্রাপ্ত।* তাঁর অন্যগ্রন্থের নাম 'মুজামুল উদাবা'।

এছাড়া অন্যান্য বিখ্যাত ভূগোলবিদগণ হচ্ছেন–

১২শ শতাব্দী - আবুল ফাতাহ বান্দারী, আবু হামিদ আন্দালুসী

১৩শ শতাব্দী ঃ ইবনে সাঈদ, ইবনে আলী মারাকেলী, ইবনে ইবারী

১৪শ শতাব্দী ঃ ইবনে বতুতা, আবুল ফিদা

১৫শ শতাব্দী ঃ ইবনে মাজেদ

১৬শ শতাব্দী ঃ আদী আল রইস

ভূ-বিদ্যায় এদের রয়েছে রচনা, গবেষণা এবং গ্রন্থাবলী। পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানকেও তাঁরা প্রভাবিত করেছিলেন। আধুনিক সভ্যতাকে মুসলমান বিজ্ঞানীরা পথ দেখালেও ইতিহাসের গৌরবকে ধারণ করা ছাড়া বর্তমানে মুসলমানদের তেমন বড় বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক উত্তরাধিকার বলতে গেলে নেই। হায়... আমরা কি শুধু ইতিহাসকেই ধারণ করব?

বিশ্বকোষ প্রণয়ন

আধুনিককালে বহু দেশে বহু উন্নত ধরনের বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে। একালে বিশ্বকোষ রচিত হয় সাধারণত বিশিষ্ট পরিষদের তত্ত্বাবধানে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে বিশ্বকোষ রচনার যে ধরনের পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধান দরকার হয় সেকালে মাত্র এক একজন মনীষী কিভাবে যে এতবড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। সেই যুগে মুসলিম মনীষীদের অনন্য সাধারণ জ্ঞান সাধনার এবং অসাধারণ দক্ষতার একক অসামান্য নিদর্শন। এই সমস্ত বিশ্বকোষগুলো–

৯ম-১০ম শতক

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাযী	কিতাবুল হাবী আল রাযী বিশ্বকোষ ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত
ইবনে আবু উমার মুহাম্মদ ইবনে আহম্মদ ইবনে আবদরাব্বিহি	বিশ্বকোষ 'আল ইকদুল ফরীদ ২৫ খণ্ডে বিভক্ত।
আবু নাসের আল ফারাবী	বিশ্বকোষ কিতাব ইয়াহইয়া আল উলুম
ইখওয়াআনুস সাফা	বিশ্বকোষ রাসায়েলে ইখওয়ানুস সাফা ৫১/৫২ খণ্ডে বিভক্ত।
আবুল ফারাজ আলী	সঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষ
ইবনুল আল ইস্পাহানী	কিতাবুল আগানী- ২১ খণ্ডে সমাপ্ত।
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ	পৃথিবীর সর্বপ্রথম এবং সর্ব পুরাতন
ইবনে আল খারেজমী	Encyclopaedia 'মাফাতিহুল উলুম'।

www.pathagar.com

৯ম-১০ম শতক

আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইবনে নাদিম — বিশ্বকোষ ফিহরিস্তুল উলুম ১০ খণ্ডে রচিত।
মোতাহ্হার ইবনে তাহির আল মুকাদ্দেসী — বিশ্বকোষ কিতাবু বাদওয়াত তারিখ

একাদশ-দ্বাদশ

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আল ইদরীসী — ৭০টি মানচিত্র এবং অসংখ্য তথ্য এবং তত্ত্ব সম্বলিত বিশ্বকোষ 'নুযহাতুল মুশতাক ফি ইকতিরাকীল আফাক' বা কিতাবুল রোজার।
আবু হাইয়ান আলী আত্ তাওহীদী — বিশ্বকোষ 'আল মুকাবাসাত' এতে বিভিন্ন বিদ্যা সংক্রান্ত ১৩০টি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে।
ইসমাইল আল জুরজানী — চিকিৎসা বিশ্বকোষ জাখিবা আল খারিজম শাহী' ১০টি খণ্ডে বিভক্ত। ফার্সী ভাষায় এটি প্রথম Medical Encyclppaedia।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ

ভৌগলিক আবদুল্লাহ আল হারাবী — বিশ্বকোষ মুজামুল বুলদান।
ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান — জীবনী বিষয়ক বিশ্বকোষ- ওরাকাতুল আয়ান ওয়া আনবাইয় জামান। এতে ৮৬৫ জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী স্থান পেয়েছে।
শিহাবুদ্দীন আহমদ নুওয়ায়রী — বিশ্বকোষ 'নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনুলীল আদাব" ৫ অংশে বিভক্ত ও ৩০ খন্ডে সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ

সালাউদ্দীন খলিল আল সাফাদী — জীবনী বিশ্বকোষ "আল ওয়াকী বিল ওয়াকায়াত' এতে ১৪ হাজারের অধিক জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়। উদ্ভিদবিদ্যার বিশ্বকোষ "কিতাবুল জামি আদরিয়াতিল মুফরাদাত" এতে ১৪০০ প্রকারের ঔষুধের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ

আলী ইবনে আব্বাস — বিশ্বকোষ 'কিতাবুল মালেকী'- ২০ খন্ডে সমাপ্ত।
ইবনে ফাদলিল্লাহ আল উমারী — বিশ্বকোষ 'মাসালিকুল আবসার ফী আমলিকিল আমসার'।
আল দামীরী — প্রাণী বিষয়ক বিশ্বকোষ 'কিতাবু হায়াতুল হায়ওয়ান"।

পদার্থবিদ্যা

পদার্থবিদ্যায়ও মুসলমানদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন-

নবম শতাব্দী

আবুল হাসান ঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রথম ও প্রকৃত আবিষ্কারক। *১৭ শতকে গ্যালিলিও এর আবিষ্কারক নন। সংস্কারক ছিলেন মাত্র।*

১০ শতাব্দী

ইবরাহীম ইবনে সাবিত ঃ কণিক ও সূর্যঘড়ি প্রস্তুত সম্বন্ধে কয়েক খণ্ডের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
আল মাগানি ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা রকম যন্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণদ্বারা বিজ্ঞান জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন।
বিন ফিরমিস ঃ *উড়ো জাহাজের প্রথম আবিষ্কারক।*

www.pathagar.com

একাদশ শতাব্দী

আল বিরুনী ঃ আল বিরুনী আলো ও গতি সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

১. তাসহিদুল মুসতাকাররে লিমানিল মাসারবে' এতে আলোর গতিপথ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

২. তাহ্শীলু আশ শাআয়াত বেআবআদেত তরফে আনিয়স অসাতে সময়ের জটিল পদ্ধতিতে আলো সম্পর্কীয় আলোচনা।

দ্বাদশ শতাব্দী

ইবনে হায়সাম ঃ তিনি তাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্ক শাস্ত্রবিদ ছিলেন। আবার আধুনিক *বিশ্বসভ্যতা তাকে 'অপটিক' এর জনক বলে চিহ্নিত করেন। তিনিই সেই বিজ্ঞানী যিনি আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়ম আবিষ্কার করেন যা বর্তমান Snell's Law নামে পরিচিত।*

৭টি খণ্ডে বিভক্ত 'কিতাবুল মানাজির' তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এর–

১ম খণ্ড – দৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা

২য় খন্ড– চোখ দ্বারা কিভাবে দেখে?

৩য় খন্ড – দৃষ্টি বিভ্রমের কারণ

৪র্থ খণ্ড– পালিশ করা, বস্তু থেকে কিভাবে প্রতিফলন ঘটে?

৫ম খন্ড– প্রতিবিম্ব সম্পর্কে

৬ষ্ঠ খন্ড– প্রতিফলন ও প্রতিফলনের জন্য চোখে যেসব বিভ্রম ঘটে।

৭ম খন্ড – স্বচ্ছ বস্তু থেকে প্রতিসরণের দ্রষ্টব্য সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ

তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন– চোখ থেকে আলোক রশ্মি কোন বস্তুর ওপর পড়লেই সে বস্তুটা দেখা যায় না বরং কোন বস্তু থেকে আলোর রশ্মি এসে পড়লেই তবে সে বস্তু আমরা দেখতে পাই।

মাকালাতু ফিজজুয়ে গ্রন্থে তিনি আলোর প্রতিসরণ সম্বন্ধে টলেমীর ফরমুলাকে খন্ডন করেন।

'রিসালাতু ফিশ্শফক' গ্রন্থে তিনি বায়ুমন্ডলের উর্ধ্বসীমা নির্ণয় করেন। মাকালাতু ফিল মারাইয়াল মুহরিকা বিল কুতুত গ্রন্থে Dioptra প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনায় আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, প্রতিবিম্বের স্বরূপ ও তার নানা দোষ যেমন–Spherical ও Chromatic abberation প্রভৃতি আলোচনা করেন।

শিল্প সংস্কৃতি

শিল্প সংস্কৃতিতে মুসলমানরা কতটুকু সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নেহেরুর উক্তিতে। পন্ডিত নেহেরু তার A Glimpse at world History তে লিখেন "কর্ডোভায় ১০ লক্ষ লোক বাস করত। সেখানে ২০ কি. মি. দীর্ঘ পাবলিক পার্ক ছিল, ৪০ কি. মি. ব্যাপী তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৬,০০০ প্রাসাদ ও বড় বড় বাড়িঘর, ২০০ সুন্দর আবাসবাড়ি, দোকানপাট, ৩০০ মসজিদ, ৭০০ হাম্মাম খানা, অসংখ্য পাঠাগার ছিল। যার মধ্যে রাজকীয় পাঠাগারে ৪ লক্ষ বই ছিল।"

মুসলমানরা প্রাচীন চর্ম কাগজ বাদ দিয়ে প্রথম তুলার তৈরি কাগজ প্রচলন করেন এবং এতে করেই ইউরোপে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ ঘটে।

ফিলিপহিট্টি তার History of the Arabs গ্রন্থে বলেন, "সড়ক তৈরির প্রযুক্তি মুসলমানদের হাতে এতটা উন্নত হয় যে কার্ডোভায় মাইলের পর মাইল পাকা সড়ক ছিল যার দু'পাশে রাতে বাতি জ্বলত, সেই একই সময়ে লন্ডন বা প্যারিসের পথে বৃষ্টিস্রাত রাতে বের হলে হাটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে যেত।

www.pathagar.com

দুঃখজনক হলেও যা সত্যি

মুসলমানদের এই সমস্ত অসমান্য অবদানকে বিশ্বের দরবারে প্রোজ্জ্বল তারকা হিসাবে উদ্ভাসিত করতে দেয়নি ইউরোপীয়রা। তারা মুসলিম অবদানকে চুরি করেছে, বগলদাবা করে নিজেদের ঘরে তুলে নিয়েছে। সুযোগ নিয়েছে মুসলমানদের উদারতা আর সহনশীলতার। আর তাইতো তারা বিকৃত করেছে এ সমস্ত মনীষীদের নাম, যার প্রমাণ কিছুটা নিম্নের তালিকা থেকে পাওয়া যায় :

প্রকৃত নাম	বিকৃত নাম	প্রকৃত নাম	বিকৃত নাম
আল-রাযী	রাজম	আল-বাতানী	আল বাতেনিয়াস রেথেন
আল খাসীব	আল বুবাথের	ইউসুফ আল ঘুরী	জোসেফটি প্রিজড
আল খাওয়ারিজমী	আল গরিদম	আল কায়াবিসি	আল ক্যাবিটিয়াস
আবু আলী ইবনে সিনা	এভিসিনা	আল যারকালী	মারজাকেল
ইবনুল হায়সাল	আল হাজেন	ইবনে আবির রিজাল	আবেন রাজেল
জাবির ইবনে হাইয়ান	জিবার	ইবনে বাত্তা	এটেন প্রেস
ইবনে রুশদ	এভেরোন	আল বিতরোজী	আল পিপ্রাজিয়ান
আবু বকর ইবনে তোফায়েল	আবু বাথার	আল মাশায়	আলবু মাছের
আল কিন্দি	আল-কিন্দাস	আল ফারসানী	আল ফাসানেম
হোসায়েন ইবনে ইসহাক	জোগাম্নিটিউস		

যে স্বর্ণালী অতীত মুসলমানেরা পাড়ি দিয়ে এসেছে, যে সুমহান গৌরবে মুসলমানেরা ছিল গৌরবান্বিত, সে মুসলমানরাই আজ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চরম আগ্রাসনের শিকার।

ইংরেজ, ফরাসী ও সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী সোভিয়েত ইউনিয়নের পর মুসলিম বিশ্বে নব্য আগ্রাসন শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার দ্বারা। বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্যের বিস্তারের পথে মুসলিম বিশ্বকে প্রধান অন্তরায় মনে করে কৌশলে একটা একটা করে মুসলিম দেশ তারা ধ্বংস করে দিচ্ছে। ফ্রান্স, ব্রিটেন আর ইন্ডিয়া তাদের সাথে একাকার হয়ে একাজে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। হিন্দু, খ্রিস্টান ও ইহুদীরা আজ মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছতে ঐক্যবদ্ধ। আর আমরা মুসলমানরা আয়েসী ঘুমে বিভোর। ভুলে গিয়েছি নিজেদের অস্তিত্বের কথা। ভুলে গিয়েছি কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয় ষড়যন্ত্রকারীদের। ধিক্ মুসলিম বিবেক ধিক্।

আমরা আমাদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে চাই–

যে সোনালী অতীত আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকে আমরা যদি সেই অতীতে ফিরে যেতে চাই তাহলে আর বসে থাকা নয় আমাদেরকে জাগতে হবে। ঠিক করে নিতে হবে আমাদের কর্মপন্থা। তাই প্রিয় পাঠক আসুন–

- শাশ্বত বিধানকে এমন মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরি যাতে দুনিয়ার অন্য কোন বিধানের সাথে এ বিধান সংমিশ্রিত না হয়।
- বিজ্ঞান প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আসুন বিশ্বের সকল সচেতন বিবেকের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এখনই দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাই।
- মুসলিম এই পরিচয়টাই এখন মুখ্য, তাই এই পরিচয়কে সামনে রেখে সকল মুসলিম উম্মাহকে একই প্লাটফরমে দাঁড়া করানো জন্য ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় হই।

তথ্যসূত্র :

১. বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমের অবদান, নূরুল হোসেন খোন্দকার
২. বিজ্ঞানে মুসলমানের অবদান, আ. জ. ম. ওয়াবায়দুল্লাহ
৩. বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, মুহাম্মদ নূরুল আমী

www.pathagar.com

কাফেলা

মাহবুবা খাতুন শরীফা

সময়ের চলমান পরিস্থিতিতে
তোমার সূচনা ছিল অনিবার্য।
পরিস্থিতির পারিপার্শ্বিকতায়
তোমার যাত্রা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।
তোমার দীপ্ত পদযাত্রায়
সমাজের অপশক্তির বাহিনী ছিল ভয়ার্ত।
অবলা অসহায়াদের অব্যক্ত দাবিগুলো
তোমার পথ চলায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।
উচ্ছৃঙ্খল ক্ষতবিক্ষত তরুণী
তোমার আহ্বানে সম্বিত ফিরে পেয়েছে
হে সত্য দীপ্ত কাফেলা,
তোমার কালো হিজাবে ঢেকে দাও
সমাজের সকল প্রকার নোংরামী।
তোমার গতিকে আরো বেগবান কর
সমাজের সুপ্ত প্রতিভাধরকে কর বিকশিত।
অন্ধকার গহ্বরে খুঁজে বের কর
আরো সুমাইয়্যা ফাতেমা আর উম্মে সালমা।
হে আদর্শ নারী গঠনের দাবিদার,
আবর্জনার কালো স্তূপে
তোমার যাত্রা হোক চির কল্যাণকর।
তোমার আঁচলেই বেড়ে উঠবে নব প্রজন্ম,
আবু বকর উসমান আর আলী হায়দার
তোমার ক্রোড়ে উজ্জীবিত হবে
এ শতাব্দীর মুক্তির শ্লোগান ধারী মুজাহিদ দল।
অতএব হে সত্য সেনানী কাফেলা,
ছুটে চল সঠিক লক্ষ্য পাণে,
দিগন্তেই দেখবে সুশোভিত জান্নাতী মঞ্জিল।

আর পরাধীনতার জিঞ্জির নয় চাই স্বর্ণালী অভ্যুদয়

আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ

ভূমিকা ঃ

৬০০ কোটি মানুষ নিয়ে যে বিশ্ব আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণ শিখরে আরোহন করে এগিয়ে চলছে তার এক-চতুর্থাংশ মানুষ বিশ্বাসে তৌহিদপন্থী-মুসলিম। এই ১২৫ কোটি মুসলমান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু সর্বত্র। ৫৬টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দারা ছাড়াও এর এক বিরাট অংশ অমুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু জনসমষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তসীমা থেকে যে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধেছে তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ একের পর এক মুসলিম জনপদ স্বাধিকার লাভ করেছে। আজও চলছে বেশ কিছু জনপদে স্বাধীনতাকামী মানুষের অন্তহীন লড়াই, স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ভৌগলিক স্বাধীনতা লাভের পাশাপাশি মানুষ মূলত চিন্তার স্বাধীনতা পেতে চায়। কী লাভ ঐ ভূখণ্ডের স্বাধীনতায় যার বাসিন্দারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বঞ্চিত থাকে? যাদের চিন্তা-চেতনার চাবিকাঠি থাকে উপনিবেশিক শাসকদের হাতের মুঠোয়? যাদের এক টুকরা জমিন ছাড়া আর কোন স্বকীয়তা খুঁজে পাওয়া যায়না? যারা বিশাল ভূখণ্ড, বিপুল সম্পদ, বিস্তৃত রাজত্ব সত্ত্বেও উম্মাহর প্রয়োজনে উপযুক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না?

ও,আই, সি, আই, ডি, বি-র মতো বড় বড় সংস্থা গড়ে তোলার পরও যখন মুসলিম উম্মাহ আমেরিকার রন্ধনশালা জাতিসংঘের বারান্দায় বসে নিরুপায় ক্রন্দন ছাড়া আর তেমন কিছুই করতে পারে না তখন দেশ ও জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক।

এটা ঠিক মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ একের পর এক পরাধীনতার জিঞ্জির ছিন্ন করে স্বাধীনতার পতাকা ছিনিয়ে আনলেও তাদেরকে বারবার প্রভু বদল করতে হয়েছে কিংবা সাবেক উপনিবেশিক প্রভুদের ইচ্ছার কাছে অনেক কিছুকে বন্ধক রাখতে হয়েছে। নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহে ক্ষমতার মসনদে যারাই আসীন হয়েছেন তারা দেশ-জনতার স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের ভবিষ্যত নিরাপদ করেছেন কিংবা প্রভু-তুষ্টির নীতিমালা গ্রহণ করেছেন।

রাবাত থেকে জাকার্তা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশ্বের সবচেয়ে বড় Contigous tand rnass এর অধিকারী মুসলিম উম্মাহর বর্তমানে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত ইসলাম বিরুধী শক্তি নয়া মেরুকরণ করছে মুসলিম উম্মাহত্ব নয়াজাগরণের সম্ভাব্যতাকে নস্যাৎ করার জন্য। এরই প্রেক্ষাপটে নতুন করে ভাববারও একটি শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তোলার তীব্র তাগিদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বক্ষমান প্রবন্ধ মূলত সেই তাগিদ থেকে লেখা।

উম্মাহর প্রয়োজন আজ এক তীব্র ঝাকুঁনির যা এর প্রতিটি সদস্যকে সুষুপ্তি ও নিদ্রার কবল থেকে উদ্ধার করে জাগিয়ে তুলবে, প্রয়োজন এক নতুন সালাহদ্দিনের, যিনি নতুন ক্রুসেডের মোকাবেলায় উম্মাহকে জিহাদের প্রান্তরে বলিষ্ঠভাবে নেতৃত্ব দেবেন। পরাধীনতার যে নতুন পর্দা সমগ্র উম্মাহকে এক গভীর অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ছিড়েঁফুড়ে স্বাধীনতার দীপ্ত সূর্যকে উদ্ধারের প্রবল প্রয়াস চালানো সময়ের দাবি। সেই সোনালী ভোরের শুভ্র আলোয় প্রতিটি মুসলিম জনপদকে আলোকিত করার জন্য চাই আল-কুরআনের সুতীব্র আলোক প্রক্ষেপ।

স্বাধীনতা-পরাধীনতার চক্রাবর্ত মুসলিম শাসনের সোনালী অতীত ঃ

মানবতার সর্বকালের সেরা বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জাজিরাতুল আরবে জন্মলাভ করেন যা ছিল তৎকালীন পৃথিবীর এক পশ্চাৎপদ এলাকা। আরবের বুকে বিরাজমান কুসংস্কার, নিগ্রহ, দুঃখ বেদনার চিত্র এঁকে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন নেই। আজকের প্রেক্ষাপটে আমেরিকা বা ফ্রান্সের সাথে তুলনা করলে পাপুয়া নিউগিনি বা ঘানার অবস্থা যা তৎকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে রোম-পারস্যের তুলনায় জাজিরাতুল আরব ছিল আরো পেছনে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল এর পুণ্যভূমি মক্কার কথা যেখানে কাবা'র অবস্থান। এই পবিত্র গৃহের ঐতিহ্যক অবস্থান তখনও সমান দেদীপ্যমান ছিল।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জাজিরাতুল আরবের একদল সৌভাগ্যবান মানুষ এমন এক জনসম্পদে পরিণত হয় যারা মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে এমন এক রাষ্ট্র গড়ে তোলে যা রোম-পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত্‌ কাঁপিয়ে তোলে। ৬৩ বৎসর বয়সে নবী করীম (সঃ) একটি পরিপূর্ণ, স্বাধীন, সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

নবী (সঃ) এর ওফাতের পর তাঁর সাহচর্য ধন্য পৃথিবীর বিস্ময় পুরুষগণ যাদেরকে আমরা সাহাবী হিসেবে চিনি তারা ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখেন। ৬৩৩ পরবর্তী ৩০ বৎসর খোলাফায়ে রাশেদার যুগ। ইসলামের মহান খলিফা হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী এই চারজন নবী-প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফতের ঝাণ্ডাকে যেকোন মূল্যে উর্ধ্বে তুলে ধরেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যাকে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম উদার, বিশ্বাসী ও সরল মানুষ হিসেবে আমরা জানি, তাঁর সময়ে মুসাইলামা কাজ্জাবের মত ভণ্ড নবীকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করা হয়, যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালে এক এলাকার সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ন্যায় ইনসাফকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যে প্রধান বিচারপতি (হযরত ওমর রাঃ) এক বৎসরের মাঝে বিচার প্রার্থী হিসেবে কাউকে পাননি।

হযরত ওমর (রাঃ) যাকে আমরা ইতিহাসের অন্যতম সাহসী মানুষ হিসেবে জানি তাঁর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অনারব বিশ্বের বিশাল সীমানায়। রোম-পারস্যের শাসকেরা পরাজিত হয়, সাধারণ মানুষেরা দলে দলে ইসলাম কবুল করে, ইসলামী রাষ্ট্রের নৌবাহিনী সুসংগঠিত হয়, জলে-স্থলে সর্বত্র ইসলামের সৈনিকদের পদচারণা আল্লার রহমত হিসেবে গণ্য হয়। ওমর (রাঃ) তো সেই শাসক যিনি ছিলেন অর্ধ্বজাহানের শাসক। তাঁর প্রাসাদ ছিল খেজুর গাছের ছায়া, দৃষ্টি ছিল দূর পৃথিবীর সীমানায় কোথায় কোন ক্ষুধার্ত কুকুর না খেয়ে মরছে তার ভয়ে অশ্রুসজল, মিম্বর থেকে যিনি যুদ্ধরত সেনাপতিকে অন্যদেশে যুদ্ধের নির্দেশনা দিতেন।

হযরত ওসমান গনি আর হযরত আলী (রাঃ) ইসলামের তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের এই ক্রম বিকাশকে অব্যাহত রাখেন।

আমীর মুয়াবিয়ার (রাঃ) একটি ভুলের কারণে খোলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগের ইতি হয়ে মুসলিম দুনিয়ায় শুরু হয় রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জীবনের শেষরক্ত বিন্দু দিয়ে জিহাদ করেন নবী দৌহিত্র হযরত হাসান হোসায়েন। জীবন দিয়েছেন তবুও তারা রাজতন্ত্রকে আপোষে মেনে নেননি।

www.pathagar.com

রাজতন্ত্রের উত্থান ঃ

ইতিহাসের বাতায়ন পথে আমরা এরপর দেখতে পাই উমাইয়া, আব্বাসীয়সহ বিভিন্ন রাজতন্ত্রের বিকাশ। তারা ইসলামের নামেই, খেলাফতের নামেই তাদের রাজতন্ত্র অব্যাহত রেখেছেন। মুসলিম খেলাফতের নতুন কেন্দ্র হিসেবে ঐতিহ্যের দেশ ইরাক আর তার রাজধানী বাগদাদ বিকশিত হয়।

ইসলামী শাসনের অবসান হয়ে মুসলিম শাসনের যাত্রা শুরু হয় সপ্তম শতাব্দীর পর। সেই থেকে মুসলিম শাসকগণ পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তারা ইসলামের আদর্শকে ব্যক্তি জীবনে গ্রহণ করলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেন। তার ফলশ্রুতিতে যা হবার তাইই হলো। রাজতন্ত্রের অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ হলো, ক্ষমতার হাত বদল হলো, আস্তে আস্তে ঐক্যের পরিবর্তে দলাদলি হলো এবং এর সুযোগ গ্রহণ করলো ইসলামের দুশমন ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকগণ।

প্রায় ষোলশত শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলিম শাসকদের শাসন অব্যাহত ছিলো। মুসলিম শাসনের সুফল স্বরূপ পৃথিবী জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সকল বিষয়ে এগিয়ে যায়। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ বিজ্ঞানের সকল শাখায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেন, বড় বড় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মানুষেরা এসে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র হয়, জ্ঞানের ঝর্ণাধারায় অবগাহন করে তারা নিজ নিজ দেশের হতাশাক্লিষ্ট মানুষের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে নতুন করে জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায় উজ্জীবিত করে। ইউরোপের নতুন রেনেসাঁর সূচনা হয়।

ইউরোপে যখন মধ্যযুগ মুসলিম জাহানে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূর্য মধ্য গগনে দেদীপ্যমান। মধ্যযুগের ইউরোপে চার্চের সাথে বিজ্ঞানের তুমুল বিরোধ চলছিল যার ফলে চার্চ ও বিজ্ঞান পরস্পর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। চতুর ওরিয়েন্টালিস্টগণ এই বিরোধের দায় ইসলামের উপর চাপাতে দ্বিধা করেনি। তারা ইসলামকেও বিজ্ঞানের দুশমন হিসেবে উপস্থাপন করে।

পরাধীনতার শৃংখলে বাধা জাতি ঃ

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় শক্তির নবজাগরণ ঘটে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে এগিয়ে আসার পাশাপাশি তারা বিশ্বের দুর্বল ও দরিদ্র জনপদগুলোতে উপনিবেশিক শাসন কায়েম করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা সংস্কৃতির নেতৃত্ব হারিয়ে মুসলিম জাহানের শাহানশাহগণ পরাজয়ের শেকলে বন্দী হয়ে পড়েন। সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কোথাও ইংরেজের, কোথাও ফ্রান্সের, কোথাও পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের অধীনস্ত উপনিবেশে পরিণত হয়।

উপনিবেশে পরিণত হওয়ার আগে যে পথে পতনের শুরু তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

এক. মুসলিম শাসকগণ তাদের হেরেমে ভিন্ন ধর্মের সুন্দরী রমণীদের তুলে আনেন। এসব রমণীদের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তুলে এনে প্রথমে হৃদয়ের অধীশ্বর, অতঃপর অন্তঃপুরের রানী, সবশেষে রাজ্যের গোপনীয় ও বড় বড় বিষয়ের সিদ্ধান্তের অংশীদার বানিয়ে দেশের সর্বনাশ করা হয়। তুরস্কের সুলতানগণ ইউরোপীয় রাজপরিবার সমূহের রাজকন্যাদের ঘরে তুলে আনে, পাক-ভারত উপমহাদেশে হিন্দু রাজপুত রমণীরা এভাবে জেঁকে বসে। এভাবে রাজপরিবারের ভবিষ্যত বংশধরগণ ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে গড়ে ওঠে।

দুই. শাসকদের দরবারে ভিন্ন ধর্মীর পণ্ডিত দরবারী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এরাই রাজাদেরকে প্রজাকল্যাণ ও ধর্মীয় সহনশীলতার নামে ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষাসমূহ ভুলে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রকারান্তের ধর্মহীনতার দিকে ঠেলে দেয়। এই ধর্মহীনতাই কালক্রমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পতনের একটি বড় কারণ হয়।

তিন. বণিকের বেশে এসে এসব উপনিবেশিক শক্তি প্রথমে তাদের শক্ত ঘাঁটি করার জন্য সুযোগ চেয়ে নেয়। নির্বোধ শাসকগণ তাদের বিশাল সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করতে ইচ্ছুক এসব ভিনদেশীদের মতলববাজী টের না পেয়ে একরকম নিরাপদ বোধ করেন এবং অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ও ঘাঁটি কায়েমের সুযোগ দেন। ইতিহাস সাক্ষী এইসব বাণিজ্যিক ঘাঁটিই পরবর্তী কালে বেনিয়ে থেকে শাসকে পরিগণিত শাসক গোষ্ঠির সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

উপনিবেশের কবলে ছিলাম যখন ঃ

আগেই বলেছি উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের হাতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। রাষ্ট্রের সীমানার ব্যাপক বিস্তৃতির পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সবিশেষ উন্নতি হয়েছে। যতই এসবের বিস্তৃতি হয়েছে ততই ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্তি, নৈতিকতা ও ঐক্যের দিক থেকে বিরাট ঘাটতি দেখা দেয়।

১২৫৮ সালে তথাকথিত আব্বাসীয় খলিফা(?) আল মুতাসীম বিল্লার শাসনকালে চেঙ্গিসখানের ভ্রাতুষ্পুত্র হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পর বিশ্ববাসী মুসলিম সামরিক শক্তির প্রতি যে শ্রদ্ধাভাব পোষণ করতো তা মূহূর্তে উড়ে যায়। খ্রীষ্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে পুনরায় উছমানীয় তুর্কীগণ Ohoman কর্তৃক ইউরোপের পূর্বাংশ বিজিত হলে এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অংশে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলিমগণ সেই হৃতগৌরব আর ফিরে পায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উছমানী তুর্কীগণ তাদের প্রাধান্য রক্ষা করলেও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে।

উমাইয়া বংশের আব্দুর রহমান কর্তৃক স্পেন বিজিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। ছয়শত বৎসর সেখানে রাজত্ব করার পর ক্রমশঃ মুসলিম শক্তি নিস্তেজ ও অবশেষে পরাজিত হয়।

আজ পৃথিবীর বুকে ৫৭টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে, রয়েছে এর প্রায় ১৫০ কোটি মুসলিম জনতা। এসমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র মাঝখানে একটি সুদীর্ঘ সময় পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ উপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে ছিল। এ সময় কালটি মূলতঃ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত। এসময়টিতে প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রকেই পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হতে হয়। ব্যতিক্রমী রাষ্ট্র হিসেবে আমরা পাই আফগানিস্তানকে যারা খুবই অল্প সময়ের জন্য ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল। বাকী সব মুসলিম রাষ্ট্রকেই উপনিবেশিক শাসনের শিকার হতে হয়।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন উপনিবেশিক শক্তির কবলে চলে গেলে সেখানে কতিপয় বৈশিষ্ট্য জন্ম নেয়ঃ

এক. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপনিবেশিক শক্তি মুসলিম নামধারী একদল লোককে তাদের মিত্রশক্তি হিসেবে গ্রহণ করে। এরা নামে মুসলমান হলেও কার্যত পরাশক্তির দোসর হিসেবে মুসলিম উম্মাহ রাষ্ট্রের বিরোধিতা কে নিজের মিশন হিসেবে গ্রহণ করে। এরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে প্রভু ও রাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিগ্রীর জন্য প্রেরণ করে। তাদের সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে।

দুই. উপনিবেশিক শক্তি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে তাদের শাসনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য একদল মানবপুত্র কেরানী ও দোভাষী তৈরির প্রকল্প স্বরূপ একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামকে কেবল একটি ধর্ম হিসেবে শিক্ষা দেয়া হবে। যেমনঃ ভারতের ক্ষেত্রে ১৮৩৫ সালে ইংরেজগণ লর্ড ম্যাকলে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যার বিষফল থেকে আজও পর্যন্ত উপমহাদেশের মানুষ মুক্তি অর্জন করতে পারেনি।

তিন. ইসলামকে একটি জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে মুসলিমগণ ছোট ছোট দল উপদলে বিভক্ত হয়। তাদের মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ধর্মীয়, আঞ্চলিক ভাষাগত ও গোষ্ঠিগত জাতীয়তা। জন্ম নেয় পারস্পরিক বিভেদ ও হানাহানি।

চার. মুসলিম জনগোষ্ঠির মাঝে জন্ম নেয় ক্রমবর্ধমান হতাশা। তারা মুসলমানদের মাঝে সচেতনতা ও ঐক্য সৃষ্টির পরিবর্তে গোলামীর ভকমা অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ইসলামী শিক্ষা পরিহার করে সন্তানদেরকে চার্চ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে সাহেব বানানোতে আত্মনিয়োগ করে। আরেকদল মুসলমান দুনিয়া বিমুখ খানকাহবাসী হিসেবে তথাকথিত দ্বীনদারীকে গ্রহণ করে এক অদ্ভুত জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

প্যান ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দেলন ঃ

প্যান ইসলামী আন্দোলনের প্রতীক পুরুষ মরহুম সৈয়দ জামাল উদদীন আল আফগানী। ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৯৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জাগরণের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রয়াস চালান। এ মতবাদের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সকল মুসলিমকে ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতির সৃষ্টি করে অমুসলিমদের পরাধীনতা থেকে মুসলিম জীবন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা।

www.pathagar.com

বিশ্ব মুসলিমদের পরাধীনতার ও পশ্চাৎপদতার কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে পান-মুসলমানদের এ দুর্দশার প্রধান কারণ তাদের মাঝে বিরাজমান অনৈক্য। তাদের অনৈক্যের সুবাদেই ইউরোপীয়রা মুসলিমদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সফল হয়। এজন্য তিনি মুসলিম দুনিয়ার ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি মনে করেন প্রথমতঃ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। অর্ধ-স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকেও পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন হতে হবে।

জালাল উদ্দীন আফগানী একদিকে ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত "ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি" খ্যাত তুর্কী সুলতানদের কাছে গিয়ে তাঁর আন্দোলনের কথা বলেন, অপরদিকে পারস্যের শাহের কাছে গিয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি মিসরের বিখ্যাত আলেমদের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করেন, চলে আসেন ভারতের হায়দ্রাবাদের মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে।

জামালউদ্দিন আফগানী ১৮৭১-১৮৭৯ পর্যন্ত মিসরে অবস্থান করেন। তাঁর বিপ্লবী সাহচর্যে মিসর জেগে উঠলে মিসর সরকার তাঁকে বহিষ্কার করে। মিসরে তাঁর সুযোগ্য অনুসারী ও আধুনিক মিসরের চিন্তানায়ক শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। এক পর্যায়ে আব্দুহু মিসর থেকে ৩ বৎসরের জন্য নির্বাসিত হন এবং আফগানীর আহ্বানে ফ্রান্স গমন করে এবং পরে ফ্রান্স থেকে বৈরুত চলে যান। এ সময় ইংরেজগণ মিসর দখল করে। ১৯০৫ সালে আব্দুহুর মৃত্যুর পর মিসরের অন্যতম প্রধান সংস্কারক সায়্যিদ রশীদ রিযা এ আন্দোলনের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেন। ১৮৮৯ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত রশীদ রিযা এবং তাঁর সম্পাদিত 'আলমানার' মিসর সহ আরব বিশ্বের সর্বত্র চিন্তার পরিশুদ্ধি ও জাতীয় চেতনার জন্ম দেয়।

১৯২৩ সাল থেকে "ইখওয়ানুল মুসলিমীনের জন্ম দেন হাসানুল বান্না। তাঁর নেতৃত্বে এ সংগঠন মিসর কিংবা আরব বিশ্বই শুধু নয় সমগ্র পৃথিবীতে তরুণদের মাঝে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করে।

আফগানীর আন্দোলনকে উপমহাদেশে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন মরহুম জসিম সৈয়দ আমীর আলী ও স্যার আব্দুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়। এরই ফলে একের পর এক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে।

এসব স্বাধীন দেশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে শাসকগণ ইসলামী খেলাফত বা শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে হয় পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বা কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নেয়।

এ পর্যায়কে আমরা বলতে পারি পুনর্জাগরণের চেতনার যুগ। তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মুসলিম দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা অর্জন করলেও ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী হয়নি এসব রাষ্ট্র। এজন্যই এসবকে আমরা বলি "মুসলিম জাতীয় মুক্তি আন্দোলন" যা ইউরোপের জাতীয়তাবাদী ধারার অনুসরণে গড়ে উঠেছে।

ভৌগলিক স্বাধীনতা শেষ কথা নয় ঃ

বিগত একশত বৎসরের মাঝে ৫৭টির উপরে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে ওঠেছে। পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলিমগণ অর্জন করেছেন ভৌগলিক স্বাধীনতা। ভৌগলিক স্বাধীনতার পাশাপাশি তারা গলা থেকে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীর শেকল খুলতে ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ উপনিবেশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে না পারা।

বিশ্বের দিকে দিকে স্বাধীনতার ঘোষক মুসলিম নেতৃবৃন্দ অবিমৃষ্যকারীর মতো স্বদেশের মুসলমানদেরকে যত না আল্লার বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন তার চেয়ে সচেষ্ট ছিলেন ইরানী, তুরানী, আরবী, আফগানী হিসেবে পরিচিত করানোর জন্য। মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা তুরস্কের নব্য স্বাধীনতাত্তোর চিত্রটি একবার বিবেচনা করুন। ইসলাম সেখানের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হলেও শাসকগোষ্ঠির কারণে তা হয়ে উঠতে পারেনি। বর্তমানেও সেখানকার সামরিক বাহিনী ইয়াহুদী স্বার্থ রক্ষায় তৎপর, মুসলিম স্বার্থ জলাঞ্জলী দিতে তৎপর। একবার আরব বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর অসহায় অবস্থায় কথা বিবেচনা করুন। ভৌগলিক স্বাধীনতা ছাড়া আর কি আছে তাদের?

www.pathagar.com

সৌদি আরবে ১৯৩০ এ তেলক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়। ১৯৪৬-এ বৃটিশ কোম্পানী তৈল উৎপাদনের দায়িত্ব নেয়। বর্তমানে সৌদি আরবের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি আমেরিকানদের হাতে বন্দী। বিগত দুই দশকে সৌদি আরবের মতো দেশে মাথাপিছু আয় কমতে কমতে অর্ধেকে নেমে এসেছে। সেখানে আমেরিকান সেনা ঘাঁটি গড়ে ওঠেছে। লক্ষ লক্ষ আমেরিকান পুরুষ-নারী সেনা সেখানে তাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যসহ বসবাস করছে। সাম্প্রতিক ইরাক কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে? আফগানিস্তান, আমেরিকা, সি আই এস ভুক্ত মুসলিম দেশসমূহ যেদিকেই তাকাবেন আপনার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

মুসলিম দেশসমূহের একমাত্র সান্ত্বনা তাদের একখণ্ড স্বাধীন ভূমি, একটি রঙ্গীন পতাকা, একদল মুসলিম নামধারী জনগণ। অথচ অর্থনীতি রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি সকল দিক থেকেই তারা কোন না কোন বিদেশী শক্তির গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ। উম্মাহর প্রায় সমস্ত অংশ যখন এ ধরনের গোলামীকে কবুল করে নিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছে তখন এই অর্থহীন ভৌগলিক স্বাধীনতার পর্দা উন্মোচন করে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনায় মানুষদের জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন একটি গোষ্ঠি। এরা জামালউদ্দিন আফগানী, শায়খ আব্দুহুর অনুসারী, হযরত শাহওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হযরত ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর অনুবর্তীগণ। এরা একদিক মুসলমানদের মাঝে আদর্শিক পরিচয় বড় করে তুলে ধরেন। তাদেরকে আধুনিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতন করেন সর্বোপরি ইসলামী হুকুমত বা খেলাফত মিন হাজিহিবুয়ন এর প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গঠন, লোক তৈরি ও বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

এই যে স্বাধীনতা-পরাধীনতা- স্বাধীনতা চক্র এই একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমরা অতিক্রম করছি। এই ক্রান্তি-কালে আজ আমাদের বুঝতে হবে বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিরোধী ইহুদী-নাসারা-মুশরিকদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের স্বরূপ, উপলব্ধি করতে হবে নয়া উপনিবেশবাদের রূপ, বুঝতে হবে দিগন্তে ইসলামের বিজয়ের যে ললিমা প্রকাশিত হয়েছে তার শক্তি ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে।

নয়া উপনিবেশ ঃ এক বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন

বিগত একশত বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এক সময় ছিলো পুঁজিবাদের জয়জয়কার। পুঁজিবাদের শোষণ-শাসনে অতিষ্ঠ পৃথিবীর মানুষ যখন মুক্তির নয়া সড়কের সন্ধান করছিলো তখন সমাজবাদ বা কমিউনিজমের উত্থান ঘটে। মার্কসের তত্ত্ব ও লেনিনের সাংগঠনিক প্রজ্ঞা একত্রিত হয়ে ১৯১৭ সালে সামন্তবাদী রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বিশাল ভূভাগ সমৃদ্ধ রাশিয়ার নেতৃত্বে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রী বলয়ের উত্থান ঘটে।

অতঃপর পৃথিবীতে সংগঠিত হয় পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ।

১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠে "জাতিসংঘ"। জতিসংঘে স্থায়ী সদস্য হয় ৫টি রাষ্ট্র যারা গোটা ক্ষমতার অধিকারী হয়। ক্রমান্বয়ে আমরা লক্ষ্য করি পৃথিবী ৫টি শিবিরে বিভক্ত হয়। আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজবাদী বিশ্ব। এই দুই বিশ্বের মাঝে চলতে থাকে ঠাণ্ডা লড়াই। এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান হয় ১৯91 সালে বিশাল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে। ৭৪ বৎসরের বিশাল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। বেরিয়ে আসে স্বাধীন মুসলিম ও খ্রীষ্টান রাজ্যসমূহ। রাশিয়ার অর্থনীতিও আস্তে আস্তে সমাজতান্ত্রিক খোলস পাল্টে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে গ্রহণ করতে শুরু করলো।

বিগত এক যুগ ধরে চলছে আমেরিকার নেতৃত্বে গোটা বিশ্বে একটি "এক বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন" বাস্তবায়নের প্রয়াস। একটি এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার আওতায় সবাইকে বন্দী করার এক তীব্র প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

ইহুদী মাসকালিমদের কথা ঃ

এ প্রসঙ্গে এ জায়গাতেই বলে নেয়া ভালো আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশপ্ত ইহুদীজাতির একটি ষড়যন্ত্রের কথা যারা যুগে যুগে অসংখ্য আল্লার নবীকে হত্যা করেছে, সীমালংঘন করেছে সকল কালে এবং বারবার চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

www.pathagar.com

১১৯২ সালে সুলতান সালাহদীন আইয়ুবী বায়তুল মাকদাসকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। মুসলিম, ইহুদী ও খ্রিষ্টান-তিন জাতির পবিত্র ধর্মীয় স্থান হিসেবে স্বীকৃত ও পরিচিত এ মসজিদে জুমআ-বারে মুসলিমগণ, শনিবারে ইহুদীগণ ও রবিবারে খ্রিষ্টানগণ এখানে প্রার্থনা করে। পরবর্তী সাতশো বছর আল আকসা ও ফিলিস্তিন থাকে সেলজুক ও মামলুক এবং অটোম্যানদের হাতে। ১৮৮৭তে তুর্কীরা প্যালেস্টাইনকে তিনটি এলাকায় বিভক্ত করে জেরুসালেম আক্কা ও নাব-লুস। ১৯১৬ তে শরীফ হোসেন তুর্কীদের হতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯১৮-র সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশরা ফিলিস্তিন দখল করে।

কিন্তু বিতাড়িত হিব্রুরা গেল কোথায়?

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় খায়বরে পরাজয়ের পর মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদীরা পূর্ব ইউরোপ, বিশেষত রাশিয়া, পোল্যান্ড, কাশ্মীর এবং পশ্চিম ইউরোপে আশ্রয় নেয়। ধর্মভিত্তিক "কোহিলট' গড়ে ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় তারা বাণিজ্য করছিল। রুশ জার নিকোলাস ওয়ান কোহিলেট ভেঙ্গে দিয়ে ইহুদীদেরকে বাধ্য করেন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাতে। ক্ষুব্ধ রাব্বিরা তরুণদেরকে দেশ ছাড়তে পরামর্শ দেন। রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালী ও পশ্চিম ইউরোপে পাড়ি জমায় তারা। বাকীরা সম্রাটের নির্দেশ মেনে কাজ শুরু করে এবং গোপনে 'মাসকালিক' বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম দেয়। মাসকালিমগণ বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে অগ্রণী হয়ে ওঠে।

আঠারোশ পঞ্চান্নতে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার ক্ষমতায় বসেন। তিনি ছিলেন ইহুদীদের প্রতি সদয়। তার উদারতায় মাসকালিমরা চিকিৎসা, প্রকৌশল, প্রশাসন এবং রাষ্ট্রনীতিতে স্থান করে নেয়। ১৮৮১ সালে জার নিহত হলে তৃতীয় আলেকজান্ডার ক্ষমতায় আসেন। তিনিও প্রথম আলেকজান্ডারের মতো ইহুদীদের ব্যাপারে বিরূপ ছিলেন না। বিপদে পড়া মাসকালিমরা কেউ যোগ দেয় সন্ত্রাসী বাহিনীতে, কেউ হয় কমিউনিষ্ট। তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ২,৫০,০০০ ইহুদী রাশিয়া ছাড়ে-যাদের দু'লাখ আশ্রয় নেয় আমেরিকায়।

সমাজতন্ত্রের উত্থানের পর পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন প্রশাসনের সকল স্তরে মাসকালিমরা ঢুকে পড়ে-যার খোঁজ ঐ দেশগুলো রাখেনি। যেমন অধিকৃত প্যালেস্টাইনের বৃটিশ ভাইসরয় স্যার হেনরী স্যামুয়েল যিনি ইহুদী অভিবাসনকে প্রকাশ্যে উৎসাহিত করেন-ছিলেন গোঁড়া ইহুদী। অথচ প্রকাশ্যে প্রায় সবারই ধারণা ছিলো তিনি একজন প্রগতিশীল খ্রিষ্টান। ওয়েইজম্যান অনেক কৌশলে তার পদায়ন করান। ঘনিষ্ঠতত্ব বন্ধু লর্ড ময়নিহান খুন হবার আগ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ইউনস্টস চার্চিল নিজেও ছিলেন স্যামুয়েলের অন্ধ সমর্থক। তার স্ত্রী তাকে বুঝিয়েছিলেন যে এটাই ন্যায়সঙ্গত। চার্চিল জানতেন না যে তথাকথিত উদার রোমান কাথলিক স্ত্রীটি তার মাসকালিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নির্ধারিত হয়ে গেলো পরাজিত পৃথিবীর বন্টন।

তুর্কী গ্রীসজাতিকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা হল। জার্মানীও রেহাই পেলো না। অবস্থা এমন হলো-আজ যে দেশটিকে আফ্রিকা বা এশিয়ায় দেখা যায়, পরের দিন সেটাকে দেখা যায় ইউরোপে। চারশো বছর যারা ছিল পৃথিবীর মধ্যভাগের শাসক সেই তুর্কীরা কলমের এক খোঁচায় হয়ে গেল দাস। সুদূর ভার্সাইয়ে বসে সারা হল এ রাজনৈতিক শিল্পকর্ম। আজারবাইজানসহ মধ্য এশিয়ার বিশাল এলাকার রঙ সবুজ থেকে লালে পরিবর্তিত হল।

মাসকালিমদের সবচেয়ে সফল প্রকল্প প্যালেস্টাইন।

ইহুদীবাদের জনক থিওডোর হার্জেলের বন্ধুত্ব বেলফোরকে বৃটেনের পররাষ্ট্র সচিবের সুউচ্চ সম্মান এনে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চরম ক্রান্তিলগ্নে, ১৯১৭-র নভেম্বরে এর বিনিময়ে তিনি দেন বিখ্যাত বেলফোর ঘোষণা বা ইহুদী নিবাস গড়ার অনুমোদন। ৬ জন যুদ্ধ উপদেষ্টা ও প্রায় ডজন খানেক অধ্যাপকের দীর্ঘ গবেষণার ফসল মাত্র ৬৭ শব্দের এই এক প্যারার ঘোষণাটি।

আরেক মাসকালিম প্রফেসর চাইম ওয়েইজম্যান তীব্র বিস্ফোরক। 'করডাইট' উপহার দিয়ে বৃটিশ রাজের কাছ থেকে চেয়েছিলেন একখণ্ড ভূমি। এই ভূমিই লিটানী নদীর তীরে অবস্থিত তাদের ভাষায় রুক্ষ-উষর প্রান্তর বাস্তবে যা সুজলা-সুফলা প্যালেস্টাইন।

ইহুদী মাসকালিমদের শাখা-প্রশাখা আজ সারা বিশ্বে বিস্তৃত।

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পর থেকে ক্রমে ক্রমে ইহুদী অভিবাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকে ফিলিস্তিনে। এসংখ্যা যখন ৩০ লাখ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৫ লাখ তখন ১৯৪৮ সালের ১৫ মে বর্ণবাদী সিসিল রেডেস এর পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হল ইসরাইল। সেদিন সন্ধ্যায়ই একে স্বীকৃতি দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

ইসরাইল নামক রাষ্ট্রটি যাকে সারা বিশ্বের মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের 'বিষফোঁড়া' নামে আখ্যা দিয়েছে এটির জন্মদানের মধ্য দিয়ে মাসকালিমদের একাধিপত্যকে মেনে নিলো তথাকথিত শান্তির ধারক বাহকগণ, ইউরোপ-আমেরিকার বৃহৎ শক্তিবর্গ।

ইহুদী মাসকালিমদের ষড়যন্ত্রের দৌড় আজ কতদূর?

বহুদূর। মনে হয় যেন দৃষ্টি সীমারও ওপারে।

বিশ্বে আজ ইহুদীর সংখ্যা মাত্র ৩০ লক্ষ। কিন্তু তাদের মাঝে পি.এইচ.ডি সম্পন্ন বিজ্ঞানীর সংখ্যা ৬০ হাজার। পৃথিবীর জ্ঞানে বিজ্ঞানে তাদের নেতৃত্ব চলছে।

সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা এদের আবিষ্কার। আজ বিশ্ব অর্থনীতির চাকা ঘুরাচ্ছে তারা। বিশ্বের সব বড় বড় নিউজ ও বিনোদন মিডিয়ার মালিক তারা। বিবিসি, সি এন এনসহ এসব মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে সেসব দেশের মানুষের মন-মানসিকতাকে।

আজ চারিদিকে তাকালে এক ধরনের হতাশা আঘাত করতে চায়-হায় পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ, আর কতদিন সমগ্র পৃথিবী ইহুদী মাসকালিমদের হাতে এভাবে বন্দী হয়ে থাকবে।

পরাধীনতার এ অদৃশ্য শেকল ছিড়তে হবে ঃ

পৃথিবীময় আজ এক নতুন শ্লোগান `Globalization' বা বিশ্বায়ন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আকাশ সমান অগ্রগতির মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়াকে আজ নাকের ডগায় ধারণ করা হচ্ছে। আমরা সবাই আজ বিশ্বগোলকে এক বিশ্ব-পল্লীর সদস্য।

আস্তে আস্তে প্রয়াস নেয়া হচ্ছে বিশ্বের সব দেশকে সব মানুষকে এক ছাতার নিচে ধারণ করার জন্য। ইহুদী স্বার্থের সবচেয়ে বড় রক্ষক আমেরিকার হাতে দুনিয়ার সকল ক্ষমতা তুলে দিয়ে তারা চায় সমগ্র বিশ্ব আমেরিকার করতলগত হোক। বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকা এ লক্ষেই তার সমস্ত কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করছে।

আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি কিভাবে ধীরে ধীরে জাতিসংঘ বা UNO আমেরিকার রন্ধনশালায় পরিণত হলো, কিভাবে আমেরিকার মত চাঁদা খেলাফী দেশ তার ইচ্ছাকে জাতিসংঘের নামে বিশ্বের দরিদ্র জনপদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে, কি করে আমেরিকা "বাগদাদের চোর" হয়েও বিশ্ব নেতৃত্বে আসীন হয়ে বসে আছে।

একটি চিত্র আজ আমাদের ভাবিয়ে তুলছে। মুসলিম দেশসমূহ কত অসহায়ের মতো আমেরিকার ইচ্ছাপূরণ করে চলছে। দেশজনতার মতামতকে উপেক্ষা করে মুসলিম তাঁবেদার সরকার সমূহ কী করে তাদের দেশে আমেরিকান সৈন্যদের উপস্থিতি মেনে নিচ্ছে। এই সৈন্যদের খরচ বহন করতে করতে একে একে অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হচ্ছেন। দেউলিয়ায় পরিণত হচ্ছে।

পরপর দুটি উপসাগরীয় যুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের আভাস বহন করছে। এদুটো যুদ্ধই হয়েছে উস্কানীদাতাদের ইন্ধনে তাদের তৈল-লিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যই একই সাথে তাদের অস্ত্র বিক্রি ও বেকার সৈন্যদের একটি সুবিধাজনক কর্মসংস্থানের জন্য। তারা মধ্যপ্রাচ্যের উপর তাদের একাধিপত্য স্থায়ী করার জন্য এসব কাজ করেছে।

অপরদিকে এগারো নয় এর পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এই সুযোগে তারা মুসলিম জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে তাদের ঈর্ষা চরিতার্থ করার অপপ্রয়াস পায়। উসামা বিন লাদেন, সাদ্দাম হোসেন কেবলমাত্র তাদের অসিলা। তথাকথিত সন্ত্রাস নির্মূলের নামে আমেরিকা যে ধ্বংসযজ্ঞ আফগানিস্তান ও ইরাকে করেছে তা কল্পনাতীত।

www.pathagar.com

এসব ঘটনার সময় দু'একজন সাহসী মানুষ কলম ধরেছেন, হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন কিন্তু চূড়ান্ত মূহূর্তে রাশিয়া, ফ্রান্সের মতো দেশসমূহ লেজ গুটিয়ে গর্তে প্রবেশ করেছে।

এসব কিসের আলামত? এসব হচ্ছে এক নতুন পরাধীনতা, স্বাধীনতাহীনতার আলামত।

আজ সব ক্ষেত্রেই বিশ্বায়নের কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে WTO- র শর্ত সমূহ মেনে নেয়ার জন্য, বলা হচ্ছে CTTB তে স্বাক্ষর করার জন্য, বলা হচ্ছে IMF এর শর্ত মেনে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা করার জন্য, হঠাৎ করে বলা হচ্ছে বাংলাদেশকে গ্যাস রফতানি করার জন্য, ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলো তুলে দেয়া হয়েছে ব্রিটিশ ও আমেরিকান তেল কোম্পানীগুলোর হাতে– এভাবেই বিশ্বায়নের প্রস্তুতি চলছে। কি লাভ হবে এ বিশ্বায়ন করে। বিশ্বায়নের নামে পৃথিবীর সবকটি দেশ, জাতি ও গোষ্ঠিকে একই কোম্পানীর ভোক্তা বানানোর এ অপ-উদ্দেশ্য বুঝতে কারো কোন বাকী নেই।

আজ সমস্ত পৃথিবী তাদের তথ্যসন্ত্রাস ও আকাশ সংস্কৃতির নগ্ন শিকার। তারা রাতকে দিন ও দিনকে রাতে পরিণত করছে। "আল জাজিরা" নামক ক্ষুদ্র প্রয়াসটি না থাকলেতো গত উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিণতি আরো ভয়াবহ হতো। তারা সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে নগ্ন সংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবলে হত্যা করার এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায় পৃথিবীবাসী এক ধরনের অলিখিত পরাধীনতার শেকলে বন্দী হতে চলেছে। এ শেকল ছেঁড়ার দিন সামনে। প্রস্তুতির সময় প্রায় শেষ।

নতুন চেতনার উন্মেষ ঃ দেশে দেশে পুনর্জাগরণের ঢেউ

মুসলিম জাতির পতনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করি ইংরেজ, আমেরিকান, ইউরোপীয়দের নতুন জাগরণ। দীর্ঘ দুই আড়াইশো বৎসর এসব জাতির উপনিবেশ হিসেবে থাকার পর পুনরায় মুসলিম জাতির মাঝে চেতনা ফিরে আসে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন ইংরেজ শাসনের যাত্রা শুরু হয় এবং ঠিক তখন থেকেই মুসলিম আলেম উলামাদের ভিতর ইংরেজ বিরোধী চেতনাও জাগরুক হয়। শাহওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর নেতৃত্বে একদল মুসলিম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকেন। ১৮৩১ সালে উপমহাদেশের অন্যতম মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে বালাকোটে খিলাফতের আদলে স্বাধীনতার ঘোষিত হয় এবং শিখদের সহযোগিতায় ইংরেজগণ এই মর্দে মুজাহিদদের নির্মমভাবে হত্যা করেন। ১৮৫৭ সালে পুনরায় ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ হয়।

যাহোক, ১৯৪৭ সালে ইংরেজগণ ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে যায়।

১৮৩১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই একশত বৎসরকে আমরা বলবো নয়া জাগরণের প্রস্তুতির শতাব্দী। একদিকে মিসরকে কেন্দ্র করে তখন আরব বিশ্বে জন্ম নেয় এক নতুন বিপ্লবী চিন্তাধারার। জামালউদ্দীন আফগানী, শায়খ আব্দুহু, রশীদ রিয়া ও ইসাঈল রাজী আল ফারুকীর নেতৃত্বে এসময় আরব বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই প্যান ইসলামিজম জন্ম লাভ করে ও জনপ্রিয়তা পায়। এসময়ই মিসরের একজন সামান্য স্কুল শিক্ষক হাসান আল বান্না তার অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতা, নৈতিক উচ্চমান ও কৌশলী কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে তোলেন আরব বিশ্বের জনপ্রিয় সংগঠন "আল ইখওয়ানুল মুসলেমুন" বা মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ।

অপরদিকে ১৯৩৩ সাল থেকে শুরু হয় একটি মাসিক পত্রিকা "তর্জমানুল কুরআন" যার সম্পাদক তরুণ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী সুদূর হায়দ্রাবাদে বসে ভারত বর্ষের মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য করণীয়, শুধু জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড নয় বরং এজন্য চাই একদল জিন্দাদীল চরিত্রবান জনগোষ্ঠি– এসব কথা নিয়ে লিখতে থাকেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪১ সালে তিনি পাকিস্তানের পাঠানকোটে আহ্বান করেন একটি সম্মেলনে যেখানে সারা ভারত থেকে ৭৫ জন ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে গঠন করেন "জামায়াতে ইসলামী"।

আরব বিশ্বে ইখওয়ানুল মুসলেমুন ও ভারতবর্ষে জামায়াতে ইসলামীর জন্ম বিগত শতাব্দীর একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ দুটি সংগঠন মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে দেশের মানুষকে ইসলামী আন্তর্জাতিকতার আহ্বান জনায়। দেশ ও

www.pathagar.com

জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের চাইতেও তাদের মাঝে হারিয়ে যাওয়া নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের আহ্বান জানিয়ে এক নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটায় এ দুটো সংগঠন।

এরই ধাক্কা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী।

বিশেষ করে ছাত্রদের মাঝে এ দুটো সংগঠনের বিপ্লবী দাওয়াত ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। নতুন বিপ্লবের জন্য যে মেধাবী তরুণ নেতৃত্বের প্রয়োজন তার আঞ্জাম চলতে থাকে সর্বত্র। ইমাম ইবনে তাইমিয়া, শায়খ আহমদ সরহিন্দ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর যে প্রচেষ্টা ইতিহাসের অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছিল এদুটো সংগঠন বিশ্বব্যাপী সেই প্রচেষ্টাকে পুনর্জীবন দান করে। নতুন করে জাগাতে থাকে জনমনে আশা ও সম্ভাবনার কথা।

এর আগের দু'একটি পাতায় মুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে অন্যদের পরিচালিত ষড়যন্ত্রের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সে ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করার জন্য এ দুটো আন্দোলন দেখা দিল এক শক্ত প্রতিবাদ হিসেবে।

এই নতুন ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের দুই মহান নায়ক শহীদ হাসানুল বান্না ও মাওলানা মওদুদী অতীতের সংস্কার আন্দোলনসমূহের ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণ করেই তাদের নতুন কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। এই আন্দোলনদ্বয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক ঃ

প্রথমতঃ তারা মুসলিম জাতির পতনের কারণসমূহ চিহ্নিত করেন। তাদের মতে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গাফলতি, কুরআন ও সুন্নাহর বিধান থেকে বিচ্যুতি, ইসলামিক আন্তর্জাতিকতাবাদ পরিহার করে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষ, নেতৃবৃন্দের ভেতর ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের তীব্রতাভাব, কথা ও কাজে প্রচণ্ড আমল, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রতি অনীহা, ঈমান ও আক্বিদার বিচ্যুতি, ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে শিরকের ব্যাপক প্রকোপ এসবই ছিল মুসলিম জাতির পতনের প্রধান প্রধান কারণসমূহ। মুসলিম জাতির অনৈক্য এ পতনকে আরো বেশি তরান্বিত করে।

দ্বিতীয়তঃ তারা এই চিহ্নিত দুর্বলতামুক্ত একটি উম্মাহ গড়ার দিকে সবিশেষ নজর দেন। তারা "উম্মাহ চেতনা" বিকাশের জন্য কলম হাতে তুলে নেন। শক্ত হাতে তারা ইসলাম থেকে বিচ্যুতির বিষয়গুলো তুলে ধরেন। পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন তথাকথিত আলেমদের বিভ্রান্তিকর চিন্তাসমূহের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করেন, মুশরিক ও মুর্তাদদের ব্যাপারে জনগণকে সজাগ করেন। এই জন্য তারা সহজ, প্রাঞ্জল, বোধগম্য ভাষায় কুরআনের তাফসির, হাদীস সংকলন ও বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের আলোকে বই পুস্তক লিখতে থাকেন।

তৃতীয়তঃ তারা 'ইসলাম' যে একটি ধর্মমাত্র নয় বরং মানবতার মুক্তির জন্য 'একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনবিধান' তা জনগণের মাঝে তুলে ধরেন। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ জাতি ভুলতে বসেছিল যে 'ইসলাম' কেবল ধর্ম নয়, পরিপূর্ণ জীবন বিধান, ইসলামের নবী কেবল ধর্ম প্রচারক নন তিনি একই সাথে রাষ্ট্রপতি, সেনানায়ক, অর্থনীতিবিদ, সমাজতান্ত্রিক, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের জনক, পিতা, স্বামী ও স্নেহময় পুত্র। এই চিন্তার দৈন্য থেকে তারা আবার মুসলিম তরুণদের উদ্ধার করেন এবং চিন্তার নতুন দিগন্ত তাদের সামনে উন্মোচিত করেন।

চতুর্থতঃ তারা দুজনই একদল 'সালেহ' লোক তৈরির দিকে নজর দেন যারা বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াতের পঙ্কে নিমজ্জিত না হয়ে আল্লাহর রঙে রঙীন হওয়ার মতো হিম্মত নিয়ে এগিয়ে আসে। যারা এ যুগে বসেও নেতৃত্বের জন্য দলাদলি করেনা বরং নেতৃত্ব পেয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসায় আর সহযোগীদের নিয়ে আল্লার দরবারে সাহায্য কামনা করে। যারা দ্বীন কায়েমকে জীবনের একমাত্র মিশন হিসাবে গ্রহণ করে ।

উভয় নেতাই তাদের অনুসারীদের মাঝে একদল যোগ্য লোক তৈরি করতে থাকেন যারা সমসাময়িক কালের প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুক্তির জোরালো জওয়াব দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারবে। এরই ফলে আধুনিক বিষয় সমূহে দখল সম্পন্ন একদল লেখক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মানুষের জন্ম হয়।

পঞ্চমতঃ এ উভয় নেতাই ব্যক্তি গঠনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সমূহ গ্রহণ করেন। তারা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করেন, সেই আলোকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলেন, জন্ম দেন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে প্রকাশনা সংস্থা, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহ। এসব লোকেরা গড়ে তোলেন হাসপাতাল, প্রকৌশলী সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহ।

www.pathagar.com

ষষ্ঠতঃ তারা উভয়েই জোর দেন শক্তিশালী মিডিয়ার উপর যার ফলশ্রুতিতে বড় আকারে মিডিয়া গড়ে না উঠলেও গড়ে উঠেছে মিডিয়া কর্মী ও মিডিয়া সচেতনতা।

সপ্তমতঃ এ দুটি আন্দোলনের প্রশিক্ষিত জনশক্তি ষাটের দশক থেকে ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে মূলত উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে। সেখানে গিয়ে তারা ইসলামী সংস্থাসমূহ গড়ে তোলে। আজ ইউরোপ আমেরিকায় বিস্তৃত ইসলামী কাজের অবস্থা যেনো বার্নাড শ'র কথারই প্রতিধ্বনি যেখানে তিনি বলেছেন- "আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই সংস্কারকৃত ইসলামকে গ্রহণ করবে। --------------- মুহাম্মদের ধর্মের সম্পর্কে আমি ভবিষ্যতবাণী করছি যে, আগামী দিনে তা গ্রহণীয় হবে। যেমন আজকের ইউরোপের কাছে তা গ্রহণীয় হতে আরম্ভ করেছে। মধ্যযুগের পাদ্রীবর্গ হয় অবজ্ঞা, নয় গোঁড়ামীর মাধ্যমে ইসলামকে কৃষ্ণতম রঙে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্ম উভয়কেই ঘৃণা করার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত।"

অষ্টমতঃ এদুটি আন্দোলনের মনুষেরাই আজকের আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছে। মাওলানা মওদূদী মরহুমের প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় রাবেতা আল আলম আল ইসলামী, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই জন্ম হয় দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক সমূহ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক জন্ম হয়। IITএর মতো গবেষণা সংস্থাসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান।

নবমতঃ এ দুটি আন্দোলনের কর্মীরাই বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী হিসেবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করে ইসলামের ব্যাপারে অনীহ আধুনিক মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটই একবার চিন্তা করুন। মাত্র দুজন মন্ত্রীর ভূমিকা ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে জনমনে আশার সঞ্চার করেছে।

দশমতঃ এ দুটো আন্দোলনের মাধ্যমে জাগরণের কর্মী তৈরি হচ্ছে নারী-পুরুষ যুবা-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী এমনকি শিশু-কিশোরদের মাঝেও। সকল মহলে ইসলামী বিপ্লবের পক্ষে জনমত তৈরি হচ্ছে। পেশাজীবী সংগঠন, বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্ত কর্মীবাহিনী, প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি ইত্যাদি মিলে দেশে দেশে বিপ্লবের উপযোগী জনশক্তি প্রস্তুতিতে সুন্দর আয়োজন রয়েছে এই আন্দোলন দুটোর।

সবচেয়ে বড় কথা এতোদিন মুসলিম দুনিয়া বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে পশ্চাদপদ ছিলো যার কারণে ইহুদীষড়যন্ত্র সম্পর্কে তারা অসচেতন ছিলো, তারা পিছিয়ে ছিল মিডিয়া সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলায়। আজ সেই অমানিশার অবসানের দিন।

বর্তমান বিশ্বে এ দুটো ধারার বাইরেও বিভিন্ন ইসলামী দাওয়াহ সংগঠনসমূহ। এসব সংগঠন জনমতকে সংগঠিত ও উজ্জীবিত করছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়ে দীপ্ত করার জন্য। এসব কাফেলা কাজ করছে ইতিবাচক ধারায়, গঠনমূলক পদ্ধতিতে অথচ এসবকেই নেতিবাচক কর্মসূচির দোহাই দিয়ে হয়রানী করা হচ্ছে। এটি যেনো সত্যের আগমনকে সইতে না পারার তাগুতী বহিঃপ্রকাশ। ইসলামের দুশমনগণ যতই চেষ্টা করুন না কেন সত্য তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশিত হবেই।

সোনালী ভোরের প্রত্যাশায়

রাতের আঁধার যত গভীর হয় ততই ঘনিয়ে আসে সুবহে সাদিক, আলোকময় শুভ্র সকাল। পৃথিবীর দিকে দিকে আজ সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্মের নাম ইসলাম, সবচেয়ে বহুল পঠিত ধর্মগ্রন্থের নাম আল কুরআন। টুইন টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপের পাশে কোন জীর্ণবস্তি থাকলে তার অধিবাসী যেমন আজ কুরআনকে বুঝতে চাইছে,তেমনি বুঝতে চাইছে প্রিন্স চার্লসের মতো রাজপুরুষরাও। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মাইকেল জ্যাকসনের বড় ভাইয়ের মত কত হতাশ যুবক আজ কুরআনের অমীয় বাণী অধ্যয়ন করে বেঁচে থাকার নতুন অর্থ, নতুন সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার গগনচুম্বী প্রাসাদের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এর অসহনীয় পুঁতি গন্ধময় অন্ধকার যতই মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ছে ততই তারা প্রাচ্য ও ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ যেনো অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া পতঙ্গের আলোর দিকে দ্রুত ছুটে যাওয়ার প্রতিযোগিতা।

www.pathagar.com

ইসলামের বিকাশ তার স্বাভাবিক গতিতেই হচ্ছে। সুবাসিত ফুল যেমন ধীরে ধীরে তার সুরভি ও রং দিয়ে পুষ্পপ্রেমিকদের আকর্ষণ করে সত্য ও সুন্দরের সন্ধানে ঘুরে ফেরা মানুষ তেমনি ইসলামের কাছেই খুঁজে পাচ্ছে তাদের কাংখিত জীবন দর্শন ও আলোকিত ঠিকানা। স্বাভাবিক কারণেই অপপ্রচারের ডামাডোলে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য একটুও হারিয়ে যাচ্ছে না বরং সময়ের ব্যবধানে সত্য স্বমহিমায় প্রতিভাত হচ্ছে। ২০০১-এর টুইন টাওয়ার ঘটনার জের ধরে পাশ্চাত্য সমাজ তাদের নেতৃবৃন্দের মিথ্যাচার ও ইসলাম বিদ্বেষের স্বরূপ জানলো, আফগানিস্তানে যে গোড়ানীতি গ্রহণ করেছে তথাকথিত শান্তির বাহকেরা তা দেখে হয়ত শয়তানও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়েছে, আর সম্প্রতি তেল, প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির লোভেমত্ত পাশ্চাত্য শক্তিধরদের নির্লজ্জ শক্তি প্রদর্শনী ও জঘন্য হত্যাকাণ্ড সভ্য দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে অবাক ও হতাশ করেছে।

এইসব প্রেক্ষাপট আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় দূর অতীতের রোম-পারস্য সাম্রাজ্যের কথা যারা জাজিরাতুল আরবের পরিবর্তনের সময় বেখবর ছিল, ইসলামের নবীর পত্রবাহককে হত্যা করেছিলো, শক্তির নেশায় উন্মত্ত হয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল অতঃপর ভাঙ্গা তলোয়ার, নাঙ্গা পা আর ছিন্ন বসনের একদল অসম সাহসী মানুষের কাছে পরাজয় মেনে নিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। শাসক গোষ্ঠীর এই পরাজয়ের বহু আগেই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো ঐসব শাসিত জনপদের মানুষেরা যারা ইসলামের মাঝেই সন্ধান পেয়েছিল মানবতার মুক্তির।

পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইসলামের কর্মীদের আজ অপেক্ষার দিন। আলোক সন্ধানী মুক্তিকামী মানুষের মিছিল কাবার যাত্রী হয়ে বসে আছে। আজ শুধু তাদের মাঝে জাগরণের গান ছড়িয়ে দেয়া। ঘুমন্ত মানুষ যেমন সুন্দর সকালে আলোর পাখিদের গানে জেগে ওঠে তেমনি আমাদের নিরলস প্রয়াস জাগিয়ে তুলবে সমস্ত মৃত জনপদকে।

আমরা জানি না পৃথিবীর কোন জনপদটি আজ পরিপূর্ণ ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত, কোথায় আমরা দেখতে পাবো একবিংশ শতাব্দীর নতুন মদিনা যেখান থেকে হেজাজের কফেলা বেরিয়ে আসবে লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে, কিন্তু আমরা জানি সমস্ত পৃথিবী আজ উন্মুখ হয়ে বসে আছে সেই জনপদকে স্বাগত জানাতে, নেতৃত্বের আসনে বসাতে যা অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে শান্তি ও স্বস্তির ঠিকানা আল কুরআনের সমাজ হিসেবে, স্বাধীনতার নতুন প্রতীক হয়ে, পরাধীনতার সকল বাঁধন ছিন্ন করে।

www.pathagar.com

যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রাণের দাবি

আবদুস শহীদ নাসিম

১। শিক্ষা কি?

আল কুরআন থেকে জানা যায়, নবীগণ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নিজ নিজ জাতির সামনে পেশ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ আল কুরআন এবং তাঁর নিজের বাণী হাদীস থেকে শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়।

শিক্ষা কি? শিক্ষার সংজ্ঞা কি? তাৎপর্য কি? আর প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বলতে কি বুঝায়? প্রথমে এসম্পর্কে কয়েকটি শব্দ ব্যাখ্যা করতে চাই। যেসব শব্দ ব্যবহার করে 'শিক্ষা' বুঝানো হয় সেগুলোর বিশ্লেষণ শিক্ষার মর্ম বুঝার সহায়ক হবে। যেমন কোনো বস্তুকে বুঝতে হলে তার উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা একান্ত জরুরি।

ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার প্রতিশব্দ হলো Education. Education শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হলো ঃ শিক্ষাদান ও প্রতিফলন, শিক্ষাদান শিক্ষা। Educate মানে ঃ to bring up and instruct to teach to train অর্থাৎ প্রতিপালন করা ও শিক্ষিত করিয়া তোলা, শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করানো।[১]

Joseph T. Shipley তাঁর `Dictionary of word Origins' -এ লিখেছেন, Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Edex' এবং 'Ducer-Duc' শব্দগুলো থেকে। শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ হলো, যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা। আরেকটু ব্যাপক অর্থে 'তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া' এবং 'সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে দেয়া।'

একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, Education শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনার পথ নির্দেশক।[২]

আরেকজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন ঃ

Education denotes the realization 'of innate human potentialities of individuals through the accumulation of knowledge,"[৩]

কুরআন হাদীস এবং আরবি ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সে শব্দগুলা এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এ ক্ষেত্রে পাঁচটি শব্দের ব্যবহার সুবিদিত। সেগুলো হলো ঃ

১. তারবীয়াহ تربية ২. তা'লীম تعليم ৩. তা'দীব تأديب ৪ তাদরীব تدريب ৫. তাদরীস تدريس

এই শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ ঃ

تربية শব্দটি নির্গত হয়েছে ربو শব্দ থেকে। ربو মানে ঃ Increase, to grow, to grow up, to exeed, to raise, rear, bring up, to educate, to teach, instruct, to bread, to develop, argument.

আর تربية মানে ঃ Education, bringing up , Instruction, Pedagogy, Breeding, Raising. [৫]

تعليم শব্দটি গঠিত হয়েছে علم থেকে। তা'লীম تعليم মানে ঃ Information, Advice, Instruction, Direction, Teaching, Training, Schooling, Education, Apprenticeship. [৬]

تأديب [তা'দীব] শব্দটি গঠিত হয়েছে أدب [আদব] শব্দ থেকে। 'আদব' أدب মানে ঃ Culture, Refinement, Good breeding, Good manners, Social graces, Decorum. এ অর্থবহ [আদব] শব্দটি থেকেই গঠিত হয়েছে تأديب শব্দ। তাই তা'দীব শব্দের মধ্যে একদিকে যেমন এইসব অর্থও নিহিত রয়েছে, অন্যদিকে তা'দীব দ্বারা Education এবং Discipline ও বুঝায়।[৭]

تدريب [তাদরীব] মানে ঃ Habitation, Accustoming, Practice, Drill, Schooling, Training, Coaching, Tutoring.[৮]

تدريس[তাদরীস] শব্দটি গঠিত হয়েছে درس [দরস্] শব্দ থেকে। তাদরীস মানে ঃ To study, to learn, to teach, to instruct, to wipe out, to blot out, to thrash out, tution.[৯]

আভিধানিক অর্থ থেকেই পরিষ্কার হলো, এই পরিভাষাগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দদ্বয় অত্যন্ত প্রশস্ত ভাব ব্যঞ্জনাময়। তৃতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিশেষভাবে আচরণগত সুশিক্ষাদান অর্থে। চতুর্থ শব্দটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাংখিত অভ্যাস গড়ে তোলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পঞ্চম শব্দটি ব্যবহৃত হয় পঠন, পাঠন, শিক্ষাদান, পাঠদান এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে অনাকাংখিত অভ্যাস ও অবস্থা দূরীকরণ অর্থে।

এই পরিভাষাগুলো থেকে শিক্ষার সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ও ব্যাপক পরিধি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এই পাঁচটি পরিভাষার মর্মার্থ সাজিয়ে লিখলে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। আভিধানিক অর্থ থেকে এই পরিভাষাগুলোর মর্ম নিম্নরূপ দাঁড়ায় ঃ

১. প্রবৃদ্ধি দান করা/বৃদ্ধি করা/ বড় করে তোলা।
২. উন্নত করা/উঁচু করা/অগ্রসর করানো।
৩. পূর্ণতা দান করা/মহত্তর করা/মহান করা/প্রস্ফুটিত করা।
৪. জাগিয়ে তোলা/উত্থিত করা/উজ্জীবিত করা।
৫. নির্মাণ করা/প্রতিষ্ঠিত করা/ গড়ে তোলা।
৬. লালন পালন করা/প্রতিপালন করা।
৭. শিক্ষাদান করা/শিক্ষিত করে তোলা।
৮. অভ্যাস করানো/অনুশীলন করানো/হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া/চর্চা করানো/নিয়মানুবর্তিতা শেখানো।
৯. পরামর্শ দেয়া/শিক্ষাপূর্ণ আদেশ দেয়া/জ্ঞাপন করা/উপদেশ দেয়া।
১০. অনাকাংখিত আচরণাদি থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে শাসন করা/সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্যে শাসন করা।
১১. অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করা/সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা/জন্মগত শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে প্রস্ফুটিত ও উদ্দীপ্ত করে দেয়া।
১২. সম্প্রসারিত করা/একটু একটু করে খোলা/বিকশিত করা।

www.pathagar.com

১৩. পথ প্রদর্শন করা/পথ নির্দেশনা দান করা/সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।

১৪. প্রেরণা দেয়া/উদ্বুদ্ধ করা/উদ্দীপ্ত করা/উৎসাহ প্রদান করা।

১৫. সন্ধান দেয়া/সংবাদ দেয়া/তথ্য প্রদান করা।

১৬. শিক্ষাদান পূর্বক নিয়মানুগ করানো।

১৭. আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান।

১৮. শিক্ষানবিশিতে ভর্তি হওয়া।

১৯. সংস্কার করা/সংস্কৃতবান করা/সুসভ্য করা/সংশোধন করা/ঘসে মেজে পরিচ্ছন্ন করা/ নির্মল করা।

২০. শালীনতা, ভদ্রতা শোভনতা, শিষ্টাচার এবং সম্মানজনক ও মর্যাদা ব্যঞ্জক আচার ব্যবহার শেখানো।

২১. ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও অমায়িক আচরণ শেখানো।

২২. আদব কায়দা শিক্ষাদান/উন্নত জীবন প্রণালী শেখানো।

২৩. উন্নত নৈতিক আচরণ শিক্ষাদান/সচ্চরিত্র শিক্ষাদান।

২৪. প্রথা ও রীতিনীতি অভ্যস্ত করানো।

২৫. মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক ধাত পরিগঠন করা।

২৬. কর্মদক্ষ করানো/কর্মোভ্যস্ত করানো/কৌশল শেখানো/নিপুণতা অর্জনে সহায়তা করা।

২৭. অধ্যয়ন করা/দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশের সাথে পাঠ করা/স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে অধ্যয়ন করা।

২৮. বিচার বিবেচনা করা/চিন্তাভাবনা করা/গবেষণা করা/পুংখানুপুংখ পরীক্ষা করা/অনুসন্ধান করা।

২৯. উদ্ভাবন করা।

৩০. বিদ্যার্জন করা/পাণ্ডিত্য অর্জন করা/ শেখা/জানা/দক্ষতা অর্জন করা।

আরবি ও ইসলামী পরিভাষায় শিক্ষার জন্য যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, এ হলো সেগুলোর বাংলা অর্থ ও মর্ম। এর মধ্যে একেবারে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ থেকে আরম্ভ করে মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ বিকাশ উন্নয়ন, পরিশীলতা ও দক্ষতা অর্জনের ব্যাপকতা রয়েছে। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও মনীষীদের মতামত আলোচনা করলেও দেখা যায়, তাঁদের কেউ কেউ শিক্ষার খুব সংকীর্ণ অর্থ করেছেন। আবার কারো কারো দৃষ্টিতে শিক্ষার পরিচয় পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মূলত শিক্ষা মানুষের পুরো জীবন পরিব্যাপ্ত। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপকতা পরিব্যাপ্ত। মানুষ তার পূর্ণাংগ জীবনে যা কিছুই আহরণ করে, আত্মস্থ করে, তা শিক্ষার মাধ্যমেই করে। যে কোনো জ্ঞানার্জনের মাধ্যমই হলো শিক্ষা।

২. কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য

এবার জানা যাক শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? প্রথমেই আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য তালাশ করবো কুরআন থেকে। তারপর হাদিস থেকে। কুরআন বলে ঃ

১. "তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকেই যেনো কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভের জন্যে বেরিয়ে পড়ে, অতঃপর ফিরে গিয়ে যেনো নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে করে তারা [ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে] বিরত থাকতে পারে।" [সূরা আত তাওবা ঃ ১২২]

২. "কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান এবং নবুয়্যত দান করবেন আর এগুলো লাভ করে সে মানুষকে বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সেতো বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাও।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯]

৩. "সেখানে তারা আমার এমন এক দাসকে পেলো, যাকে আমি আপন রহমতে ধন্য করেছি আর নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি। মূসা তাকে বললো ঃ আমি কি আপনার সংগে থাকতে পারি, যাতে করে আপনাকে যে সত্যের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে আপনি তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেন?" [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৫-৬৬]

www.pathagar.com

৪. "এই জ্ঞান লাভ করো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।" [সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯]

৫. "এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট একত্রিত করা হবে।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২০৩]

৬. "এই জ্ঞানার্জন করো যে, তোমরা যা করো আল্লাহ্ অবশ্যই তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।" [সূরা বাকারা ঃ ২৩৩]

৭. "এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদের সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার বস্তু আর আল্লাহর কাছে রয়েছে অবশ্যই বড় পুরস্কার।" [সূরা আনফাল ঃ ২৮]

৮. "জেনে নাও যে, কেবল আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক। উত্তম অভিভাবক তিনি আর উত্তম সাহায্যকারী।" [সূরা আনফাল ঃ ৪০]

৯. "এই জ্ঞানার্জন করো যে, দুনিয়ার জীবনটা একটা খেল তামাশা ও চাকচিক্য মাত্র আর পরস্পরে গৌরব করা এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র।.... বিপরীত পক্ষে রয়েছে পরকাল। সেখানে আছে কঠিন আযাব আর আছে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষ।" [সূরা আল হাদীদ ঃ ২০]

১০. "আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরা তাঁকে ভয় করে।" [সূরা ফাতির ঃ ২৮]

১১. "জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোকেরা বলে ঃ আমরা এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি। এর সবটুকুই আমাদের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। শিক্ষাতো কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে। তারা প্রার্থনা করে ঃ প্রভু! তুমিই যখন আমাদের সঠিক পথে এনে দিয়েছো, তখন তুমি আমাদের মনে কোনো প্রকার কুটিলতা আর বক্রতা সৃষ্টি করে দিওনা। তোমার রহমতের ভান্ডার থেকে আমাদের দান করো। কারণ প্রকৃত দাতা তো তুমিই। আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবে, যে দিনের আগমনে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো ভংগ করেননা অংগীর।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ৭-৯]

১২. "তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত করে আর তাদেরকে আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়।" [সূরা আল জুময়া ঃ ২]

'হিকমাহ' মানে-জ্ঞানবিজ্ঞান, কর্মকৌশল, কর্মপ্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।

১৩. "আমি আমার রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে তাঁদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদন্ড, যাতে করে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।" [আল হাদীদ ঃ ২৫]

১৪. "কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা বললো ঃ তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়, ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে তো আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম।" [সূরা কাসাস ঃ ৮০]

আল কুরআনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হলো ঃ

১. মানুষকে তার স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহর দাস হিসেবে তৈরি করা।
২. দীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধি হাসিল করা।
৩. সত্যকে জানা ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।
৪. তাওহীদের জ্ঞানার্জন করা।
৫. পরকালকে জানা এবং পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
৬. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং আল্লাহর পুরস্কারের আকাংখী হওয়া।
৭. আল্লাহকে অভিভাবক বানাবার যোগ্যতা অর্জন।
৮. আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
৯. আল্লাহর ভয় অর্জন।
১০. সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।
১১. আল কুরআনের মর্ম উপলব্ধি।

www.pathagar.com

১২. কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতা লাভ করা।
১৩. মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ।
১৪. মানব সমাজকে সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন।
১৫. ঈমানের ভিত্তিতে সৎকর্ম অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জন এবং এরি মাধ্যমে আল্লাহর পুরস্কার লাভের যোগ্য হওয়া।
১৬. সূরা আল বাকারার ২৪৭ নম্বর আয়াতে শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।
১৭. একই আয়াতে মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।

মোটকথা, কুরআনের দৃষ্টিতে শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হলো, আল্লাহকে জানা, আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের মুক্তির জন্যে নিজেকে তৈরি করা। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল বানানো এবং মানবতাকে সত্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে ঃ

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতারা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, গর্তের পিপীলিকা এবং পানির মৎস পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করে, যে মানুষকে কল্যাণকর শিক্ষা দান করে।" [তিরমিযি]
২. "বিশ্বের দিক দিগন্ত থেকে মানুষ তোমাদের কাছে ছুটে আসবে দ্বীনের মর্ম জ্ঞান উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা তাদের কল্যাণকর উপদেশ [শিক্ষা] দান করবে।" [তিরমিযি]
৩. "যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি তা পার্থিব স্বার্থে অর্জন করে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করবেনা।" [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]
৪. "প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ লোকেরাই [কুরআন সুন্নাহর] এই জ্ঞানকে বহন করবে। তারা এ থেকে সীমা লংঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ এবং অজ্ঞ লোকদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিদূরিত করবে।" [বায়হাকি]
৫. "ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণে লিপ্ত থাকা অবস্থায় যে লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, বেহেশতে তার ও নবীদের মাঝে পার্থক্য হবে মর্যাদার একটি মাত্র স্তর।" [দারমি ঃ হাসান বসরি]
৬. "তোমরা যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা দ্বীনের বিধি বিধান ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো। তোমরা কুরআন শিখো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দান করো।" [দারমি]

রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসগুলো থেকে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করলাম। হাদীসগুলোর আলোকে আমরা জানতে পারলাম, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. মানব কল্যাণ।
২. সুশিক্ষা বিস্তার।
৩. আল্লাহকে জানা ও আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।
৪. আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায় জানা।
৫. কুশিক্ষা নির্মূল করা ও শিক্ষা সংস্কার করা।
৬. ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করা।
৭. কর্তব্য পরায়ণ হওয়া।
৮. কুরআনের আলো বিস্তার।

www.pathagar.com

৩. আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের দেশে এখনো মূলত সেই ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। একটি হলো ট্রেডিশন্যাল মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আর অপরটি ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিবর্জিত আর অপরটি ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত। একই জাতির লোকেরা দুই ধারায় শিক্ষিত হচ্ছে। দুইটি ধারার দিকদর্শন দুই বলয়ে অবস্থিত। এক ধারার শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আরেক ধারার শিক্ষার্থীরা সুধারণা পোষণ করেনা। আদর্শ মুসলিম জাতি গঠনের জন্যে এর কোনো ধারাই এখন আর উপযুক্ত নয়। উভয় ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

ক) সাধারণ বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা

ইংরেজরা আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে গেছে সেটাকেই আমরা বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বলছি। এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিরেট কতিপয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। তাই এটাকে 'বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা, বলাটাই যুক্তিযুক্ত।

ইংরেজ শাসকরা এদেশে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, যার উদ্দেশ্য ছিলো ভারতীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে একদল শিক্ষিত মানসিক গোলাম ও প্রভুভক্ত লোক তৈরি করা, যারা জাতিগতভাবে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু মানসিকভাবে হানাদার শাসক ইংরেজদের ধ্যান ধারণায় পরিগঠিত হবে।

বৃটিশরা এসেছিল এদেশে শাসন শোষণ করতে। তাই এদেশীয়দের মধ্য থেকে তাদের এমন একদল লোক প্রয়োজন ছিলো, যারা তাদেরকে প্রভু মনে করবে, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, তাদের আচার আচরণ ও চিন্তা দর্শনকে চমৎকার মনে করবে এবং একান্ত অনুগত বাধ্যগত দাসের ন্যায় দেশ পরিচালনার কাজে তাদের সেবা সহযোগিতা করবে। যে ব্যক্তি তাদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে যতো বেশি নিষ্ঠার সাথে সেবা করবে সে নিজেকে ততোবেশি গৌরবান্বিত মনে করবে।

তাদের নিজেদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো, তা ছিলো রাজ্য শাসন, রাজ্য বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা দর্শন বিস্তারের উপযোগী লোক তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রণীত।

সুতরাং নিজেদের দেশে তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, তা থেকে তৈরি হচ্ছিলো সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত লোক আর জবর দখল করা দেশগুলোতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে তা থেকে লাভ করছিল প্রভুভক্ত ও আনুগত্য পরায়ণ লোক। এভাবেই তারা শাসক ও সেবক শ্রেণীর লোক তৈরি করছিল। তাদের চালু করে যাওয়া সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের দেশে এখনো চালু আছে। এই বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থাটিই আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে চালু রয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের একটি স্বতন্ত্র ও আর্দশ সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এ শিক্ষা আমাদের জাতিকে মানসিকভাবে করেছে বহুগামী। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, কিন্তু আমাদের চিন্তাধারা বিচিত্রগামী। এই শিক্ষার অসংখ্য ত্রুটি আছে। তবে এর প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ** বৃটিশদের চালু করে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কার ও মেরামতের কাজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারা নিরেট আল্লাহ বিমুখ জড়বাদী দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পৃথিবী এবং এই মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এর জবাব নাস্তিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিংবা সংশয়বাদী ধারণা পেশ করা হয়েছে।

    এই বিশ্বজগতের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনিই যে গোটা মহাবিশ্ব অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিচালনা করছেন, তিনিই যে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবন যাপনের জন্যে জীবন দর্শন ও জীবন বিধান দিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভংগি অনুপস্থিত।

২. **ঈমানী দর্শন বর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ** আধুনকি শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে সঠিক জীবন দর্শন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্, আল্লাহর একত্ব, রিসালাত, আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াত, পরকাল, আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি ঈমানী দর্শনের ধারণা বিবর্জিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শবাদী মানুষ তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

www.pathagar.com

এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরকাল বিমুখ দুনিয়া পূজারী মানুষ তৈরি করে। মানুষকে তার শাশ্বত জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা এখানে নেই। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ অকল্যাণ, জীবনের আসল ব্যর্থতা ও সার্থকতা জানবার ব্যবস্থা এখানে নেই। ঈমান বিবর্জিত বস্তুবাদী দর্শনই এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

৩. **জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা ঃ** আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারাই যেহেতু আল্লাহ্ বিমুখ ও ঈমান আকীদা বিবর্জিত দর্শনর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আদর্শিক জীবন বিধান ও জীবন পদ্ধতি লাভ করার তো কোনো প্রশ্নই আসেনা। মহান আল্লাহ্ অহী ও নবুয়্যতের মাধ্যমে মানুষের জন্যে যে হিদায়াত ও জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থা সে সম্পর্কে নীরব। শুধু নীরবই নয়, বরং বিরূপ। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা শিক্ষিত হচ্ছে, তারা না ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে, না সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠতে পারছে আর না জীবন যাপনের সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে। এর ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে বহুরংগী জীবন যাপনের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

৪. **প্রকৃত লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ** ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মাঝে এক আল্লাহর গোলামি করার প্রবণতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তিলাভের প্রেরণা সৃষ্টি করা, আল্লাহ্ প্রদত্ত সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে নিজেদেরকে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন এবং খিলাফত পরিচালনা এবং মানবতার সেবা করার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভাবধারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা জীবনের কোনো মহৎ লক্ষ্য অর্জন করেনা এবং উপরোল্লিখিত শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনা।

৫. **নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা ঃ** এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে ছেড়েছে। গোটা জাতিকে নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। এখানে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির কোনো মানদন্ড নেই। আদর্শ ও লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফল এ রকমই হয়। যে শিক্ষা ব্যবস্থা এক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেনা, পরকালের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করেনা, আদর্শ জীবন পদ্ধতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করেনা, সে শিক্ষা ব্যবস্থাতো আদতেই মেরুদন্ডহীন। এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার কুফলে আমাদের জাতি দিন দিন নৈতিক অধঃপতনের দিকে তলিয়েই চলেছে।

৬. **নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ব্যর্থতা ঃ** আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বৃটিশদের মানসিক দাস আর অনুগত সেবক তৈরি করার জন্যে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে স্বাধীন দেশ ও জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবার আশা করা যায়না। নিজ দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে আত্মত্যাগী শিক্ষিত মানুষ এখান থেকে বের হবার আশা করা যায়না। তাইতো দেখা যায়, জাতির মেধাবী লোকেরা স্বদেশ থেকে বিদেশকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

৭. **জাতীয় ঐক্য ও সংহতি [National Consensus] সৃষ্টিতে ব্যর্থতা ঃ** এ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে বহু মত ও পথের অধিকারী বানিয়ে দেয়। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মানসিকভাবে পরস্পরের শত্রু হয়ে গড়ে উঠে। ছাত্র জীবন শেষে তারা বিভিন্ন মত ও পথে পরিচালিত হয় এবং জাতিকেও বিভিন্ন পথ ও মতের দিকে ধাবিত করবার চেষ্টা করে। ফলে জাতির মধ্যে দিন দিন হানাহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনৈক্য প্রসারিত হচ্ছে। ঐক্য ও সংহতির বন্ধন একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে। জাতি অসংখ্য মত ও পথের অনুসারী হয়ে পড়েছে।

৮. **সংকীর্ণ মতপার্থক্য** [Fanatic dissentions] সৃষ্টি ও লালন করা এ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৯. **সন্ত্রাস ঃ** এ শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক দেউলিয়াত্বের কারণে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সন্ত্রাস আজ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এখনকার শিক্ষকরা পর্যন্ত সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

www.pathagar.com

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত জীবনবোধ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

১১. এ শিক্ষা ব্যবস্থা স্বার্থপর, স্বার্থান্বেষী নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগির লোক তৈরি করছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি অকল্যাণকর বৈশিষ্ট হলো সহশিক্ষা। সহশিক্ষা শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ইসলামী জীবনবোধ ও মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার চরম কুফল জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

১২. **দুর্নীতির প্রসার ঃ** দুর্নীতি আমাদের জাতি সত্তার অংশে পরিণত হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে জঘন্য ঘুষখোর, চোরাকারবারী, মানুষের অধিকার হরণকারী, আইনকানুন ও নিয়মশৃংখলা লংঘনকারী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, স্বজনপ্রীতিকারী, জুলুমবাজ, মদখোর, জুয়াবাজ, ফাঁকিবাজ, প্রতারক, চোর ডাকাত ইত্যাদি। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, আদর্শ মানুষ তৈরির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। আর আমাদের ভাগ্যে জুটেছে এর বিপরীত ফল। আমরা এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছি, যা দুর্নীতি শিক্ষা দিচ্ছে এবং এর শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির কাছে দক্ষ হয়ে বেরুচ্ছে।

১৩. **ধর্মীয় শিক্ষার লেজুড় ঃ** অবস্থার প্রেক্ষিতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ধর্মহীন ভাবধারার সাথে 'ইসলামিয়াত' ও 'ইসলামের ইতিহাসের' লেজুড় জুড়ে দেয়া হয়। ইসলামিয়াতকে নিচের শ্রেণীগুলোতে কখনো ঐচ্ছিক, কখনো বাধ্যতামূলক রাখা হয়। উচ্চ শ্রেণীতে ইসলামিয়াত ও ইসলামের ইতিহাস ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়।

'ইসলামের ইতিহাস' নামে এমন ইতিহাস ছাত্রদের পড়ানো হয়, যাতে ইসলামকে বিকৃত এবং ইসলামের ইতিহাসকে স্বার্থপরতা ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যারা পাস করে বের হয় তারা ইসলামের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। বরং অনেকেই একেবারে ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে বের হয়। ইংরেজ শাসকরা মুসলিম যুবকদের ইসলাম বিদ্বেষী বানাবার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ইসলামের ইতিহাস বিভাগ চালু করে। অমুসলিমদের লেখা ইতিহাস এখানে ছাত্রদের পড়ানো হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে বৃটিশরা 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার' নীতি গ্রহণ করে।

'ইসলামিয়াত' বা 'ইসলামী শিক্ষা' নামে যে বিষয়টি চালু করা হয়েছে তাতে ইসলামের পূর্ণাংগ ধারণা দেয়া হয়না।

খ. মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের দেশে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার দু'টি ধারা চালু আছে। একটি হলো 'দরসে নেজামি' পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মূল আদর্শ দেওবন্দ মাদ্রাসা। অপরটি হলো আলীয়া পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সূচনা হয় কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ পদ্ধতি শ্রেণী ভিত্তিক এবং এতে আধুনিক শিক্ষার কিছুটা লেজুড় লাগানো হয়েছে। এই দুই ধারার মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে মৌলিক তফাত খুব কমই। মূলত উভয় ধারাই মুসলিম শাসন আমলে ভারতবর্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো, তারই শিক্ষাক্রমের অনুসারী।

মোটকথা, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ও জরাজীর্ণ। মুসলিম শাসনামলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো যুগোপযোগী। তখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই সরবরাহ হতো রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সামরিক বিভাগের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী কুটনীতিকসহ সকল শ্রেণীর দায়িত্বশীল লোক।

এরপর বৃটিশরা এলো। তারা তাদের ধাঁচের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই রাষ্ট্রে কর্মচারী হবার উপযোগী লোক তৈরি করবার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে।

গোটা বৃটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব নিয়ে চলতে থাকে। বৃটিশরা চলে যাবার পর দেশ স্বাধীন হলো। পাকিস্তান নামের স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রাচীনত্ব নিয়েই সে এখানো ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন হয়। দেশ বিভক্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার বিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগির মধ্যে পরিবর্তন আসে। কিন্তু মাদ্রাসা

www.pathagar.com

শিক্ষা ব্যবস্থা তার সেই প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিক্ষাক্রমকে বুকে ধারণ করে পাহাড়ের মতো অটল অবিচল হয়ে পড়ে আছে আপন স্থানে।

ফলে যুগ ও কালের যতোই পরিবর্তন হতে থাকলো ততোই এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে থাকলো। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুতে থাকলো, সমকালীন সমস্যাবলী ও জীবনধারার সাথে তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। এখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তাদের জন্যে মসজিদের ইমামতি, মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষকতা, স্কুলের ধর্ম শিক্ষকের পদ অলংকরণ আর ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কের তুফান ছুটানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নোক্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দ্বারা জর্জরিত ঃ

১. মূল শিক্ষা ব্যবস্থাটিই বহু শতাব্দীকালের প্রাচীন এবং বর্তমান কালের কার্যকারিতা বর্জিত।

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যুগের চাহিদার অনুপূরক নয়।

৩. এখানে যুগোপযোগী রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচারনীতি, কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা দানের কোনো ব্যবস্থা নেই। এগুলো শেখার জন্যে মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে মাদ্রাসা পাস করার পর পুনরায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। তাও সকল ক্ষেত্রে এবং সকলের জন্যে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়না।

৪. এখানে প্রাচীন ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপরই অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজা এখানে সম্পূর্ণ বন্ধ।

৫. এখানে কুরআনের প্রাচীন তাফসীরই পড়ানো হয়। তাও পূর্ণাংগ কুরআন পড়ানো হয়না। কুরআনের উপর গবেষণাধর্মী পড়ালেখার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই।

৬. হাদীস শাস্ত্রেরও একই অবস্থা। হাদীসের উপর গবেষণাধর্মী পড়ালেখার কোনো ব্যবস্থা নেই। হাদীস যাচাই বাছাই করার মতো যোগ্যতা অর্জন করবার কোনো সুযোগ এখানে নেই।

৭. ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এখানে নেই। ফলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করবার শিক্ষা ও কর্মপন্থা জানা যায়না।

৮. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সিভিল সার্ভিসের জন্যে লোক তৈরি হয়না। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হবার যোগ্য লোক তৈরি হয়না। কুটনীতিক তৈরি হয়না। শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি হয়না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ তৈরি হয়না। রাষ্ট্রনায়ক তৈরি হয়না। ফলে এখান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার 'কী পোস্ট'গুলোতে তাদের স্থান হয়না।

৯. এখান থেকে যারা শিক্ষালাভ করে বেরুচ্ছে, তারা সমাজে সত্যিকারভাবে মর্যাদাবান হতে পারছেনা। ধর্মীয় কারণে কিছুটা ভক্তি শ্রদ্ধা তারা লাভ করেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও সামাজিক পদমর্যাদায় তারা অতিষ্ঠিত হতে পারছেনা। ফলে সমাজে তাদের ছোট ও হেয় হয়ে থাকতে হয়।

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যে দক্ষ জনশক্তি লাভ করা যায়না, সে কারণে মাদ্রাসাগুলো সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও বঞ্চিত।

১১. মাদ্রাসাগুলোতে যারা শিক্ষা দান করেন, তারাও অদক্ষ। তাদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও কোনো উপযোগিতা নেই।

১২. মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা শিক্ষালাভ করে বের হয়, অদক্ষতা ও কর্মহীনতার কারণে তারা ব্যাপকহারে ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সারাদেশে ধর্মীয় কোন্দল জাল বিস্তার করে আছে।

১৩. সামগ্রিকভাবে জাতি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি হতাশ ও আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। যেহেতু ধর্মীয় পরিমন্ডলের বাইরে এখান থেকে শিক্ষা লাভকারীরা সমাজ পরিচালনা ও সমাজে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন করেনা, সেজন্যে অভিভাবকরা সাধারণত তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় ভর্তি করাননা। কেবল তিনটি কারণে মাদ্রাসায় পড়তে আসে ঃ

www.pathagar.com

ক. একান্ত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করার কামনায়।

খ. মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করার পর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার নিয়্যতে।

গ. গরীব লোকরা আর্থিক অনটনের কারণে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠায়।

এই তিনটি কারণে যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। ছাত্রের অভাবে বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। টিকে থাকার জন্যে বাধ্য হয়ে বহু মাদ্রাসাকে ছাত্র সংখ্যা যা নয়, তার চাইতে বাড়িয়ে দেখাতে হচ্ছে।

এ থেকেই বুঝা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সামগ্রিভাবে অনাস্থা কত প্রবল এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা সেকেলে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে।

৪. মেরামত করে কাজ হবেনা

আধুনিক বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার এইসব দুর্গতি দেখে বিভিন্ন সময় এগুলোকে মেরামত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলোতে উর্দূ মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো। বাংলাদেশ আমলে আলীয়া পদ্ধতিতে বাংলা মাধ্যম চালু করা হয়েছে। দরসে নিযামি পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে এখনো সংস্কার করেনি। বিভিন্ন সময় আলীয়া পদ্ধতি বাংলা, ইংরেজি, অংক, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং কোথাও কোথাও কিছু কিছু শ্রেণীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এগুলো খুব একটা খাপ খায়নি। ফলে এসব সংস্কার দ্বারা মূল অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও বিভিন্ন সময় সংস্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন ধরনের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন বিষয় ও বিভাগ চালু করা হয়েছে। কিন্তু বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভাবধারায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

৫. প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের

আসলে এ ধরনের আংশিক মেরামত, সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা ফল হবেনা। প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, জাতির কল্যাণ ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের দায় দায়িত্ব নিজেদের উপর। নিজেদের জাতিকে উন্নত করে গড়ে তোলা এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিজেদের।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার শতকরা সাতাশিভাগ নাগরিক মুসলমান। এখানকার মানুষ অত্যন্ত ইসলাম প্রিয় আল্লাহভক্ত ও ধর্মভীরু।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ পিছে পড়ে আছে। জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের সম্পদ কম। আমাদের জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মুসলিম হিসেবে আমাদের আছে গৌরবান্বিত ইতিহাস। আছে মহান ঐতিহ্য। এক উন্নত অনুপম ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধিকারী জাতি আমরা। আমাদের আছে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা।

আমাদের কাছে আছে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন দর্শন ও জীবন বিধান। আমাদের জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পূর্ণ নির্ভুল। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির কাছে নির্ভুল জীবন বিধান নেই।

সারা বিশ্বে আমাদের সোয়াশো কোটি মুসলমান ভাই আছে। তারা আমাদের অংশ। তারা আমাদের সাহায্যকারী ও সহযোগী।

এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমাদের দেশে চালু করতে হবে নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রণয়ন করতে হবে নতুন শিক্ষানীতি, নতুন কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যতালিকা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলো গতিশীল থাকতে হবে নদীর স্রোতধারার মতো।

www.pathagar.com

এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের একটি আদর্শ ও সুসংহত জাতিতে পরিণত করবে। আমাদের জাতিকে প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলবে। আমাদের জীবনকে সামগ্রিক উন্নতির শিখরে আরোহণ করাবে। স্বাধীন মর্যাদাবান জাতি হিসেবে টিকে থাকতে শিখাবে। আমাদেরকে পরকালের মুক্তির পথে পরিচালিত করবে। দক্ষতার সাথে দেশ ও জাতিকে পরিচালনার যোগ্যতা দান করবে।

৬. ইসলামী শিক্ষানীতি একটি প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ মুসলমানের দেশ। এখানকার ৮৭% নাগরিক মুসলিম। এদেশের মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর ইসলাম প্রিয়। এখানকার মুসলমানরা আল্লাহ্‌, আল্লাহর রসূল এবং ইসলামের নিদর্শনাবলীর জন্যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনা। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের মানুষের প্রাণের দাবি। ইসলামী শিক্ষানীতি চালু করার ক্ষেত্রে এখানে কোনো সমস্যাও নেই। কারণ ঃ

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম।
২. বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ (১ক) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছেঃ 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।'
৩. এদেশের ৮৭% নাগরিক মুসলমান।
৪. এদেশের মুসলমানরা কাজেও ইসলামের ভক্ত অনুরক্ত এবং ইসলামের জন্যে জান দিতেও প্রস্তুত।
৫. এদেশের মানুষ ইসলামের অবমাননা বরদাশত করেনা।
৬. এদেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার ও সরকার প্রধান সকলেই মুসলমান।
৭. প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরাই মুসলমান।
৮. মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক মুক্তি ও উন্নতির ক্ষেত্রে যে ধর্মের বিকল্প নেই, একথা আজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী এবং অনেক রাষ্ট্রনায়ক কর্তৃকও স্বীকৃত হয়েছে। আর ধর্মের মধ্যে ইসলামই যে সর্বাধিক উদার, বাস্তব, পূর্ণাংগ ও প্রগতিশীল একথাও স্বীকৃত হয়েছে।
৯. তাছাড়া যেহেতু, মূলতই ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মূলনীতি ও নির্দেশনা এতে রয়েছে এবং এটি একটি উদার ও সর্বজনীন ব্যবস্থা।
১০. এটি স্বয়ং মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা এবং
১১. ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার ব্যাপারে যোগ্য ও দক্ষ প্রচুর বিশেষজ্ঞ এখানে বর্তমান রয়েছে।

সুতরাং বাংলাদেশের শিক্ষানীতি অবশ্যই ইসলামের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া একান্ত জরুরি।

৭. ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী কি হবে, সে সম্পর্কে একটু আগেই আমরা কুরআন হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করে এসেছি। তার আলোকেই আমরা এখানে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা নীতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টসমূহ হবে নিম্নরূপ ঃ

১. শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ ও এই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, মালিক, মনিব, শাসক, মা'বুদ সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্বশীল মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, আস্থাশীল, অনুগত ও বিনীত করে তোলা তথা তাদেরকে এক আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা।
২. শিক্ষার্থীদেরকে রিসালাতে বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মাঝে মুহাম্মদ (সা) কে সর্বশেষ নবী ও রসূল হিসেবে মানার এবং তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।
৩. শিক্ষার্থীদের পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মধ্যে পরকালের সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করার স্বচ্ছ জ্ঞান ও বুঝ সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে পরকালের মুক্তির আকাংখা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করা।
৪. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

www.pathagar.com

৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহর দাস (আব্দ) ও প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রেরণা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র বিবেকবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক চেতনা জাগ্রত করে দেয়া।

৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মোপলব্ধি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপর্যালোচনার ভাবধারা সৃষ্টি করা।

৮. সময় ও সমাজ চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ, জীবন ও কর্মমুখী, সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা।

৯. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

১০. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা।

১১. জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা।

১২. সময় ও যুগের চাহিদা মাফিক দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ, লেখক, বিচারক, শিক্ষক, সৈনিক, সমাজকর্মী, প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সকল ক্ষেত্র ও বিভাগ পরিচালনার উপযুক্ত লোক তৈরি করা।

১৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা।

১৪. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা (Creativity) বিকশিত করা। তাদের মধ্যে ইজতেহাদী যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

১৫. সৎ, চরিত্রবান, নীতিবান ধার্মিক ও বিবেকবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা। উৎপাদন ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা।

১৬. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তি লক্ষ্যের মাঝে সমন্বয় সাধনের যোগ্যতা অর্জন, জীবনের পূর্ণত্ব অর্জন এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন।

১৭. নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানা এবং তা সংরক্ষণ ও বিকাশের যোগ্যতা ও প্রেরণা লাভ করা।

১৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

৮. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য

এখানে আমরা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের একটি রূপরেখা পেশ করতে চাই। এ রূপরেখা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তবে মৌলিক নির্দেশনামূলক। ভবিষ্যতে যারা আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব লাভ করবেন, এটি তাদের খানিকটা হলেও সহায়তা করবে বলে আশা করি।

১. **জ্ঞানের মূল উৎস 'ওহী'র জ্ঞান ঃ** ওহী খোদায়ী জ্ঞান লাভের মাধ্যম। বাংলা ভাষায় জ্ঞানের বাহক বই। 'বই' শব্দটিও এসেছে 'ওহী' থেকে। মূলত 'বই' ওহী'র রূপান্তর। এভাবে ঃ ওহী>বহি>বই।

এই ওহীই জ্ঞানের মূল উৎস। ওহী হলো, মানব জাতির ইহ ও পারলৌকিক সর্বাংগীন উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে নবী রসূলদের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা বা হিদায়াত।

আল কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী। এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। সুতরাং আল কুরআনই মানবজাতির জন্যে জ্ঞানের মূল সূত্র, মূল উৎস। আল কুরআনকেই শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর গোটা শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমকে এ মানদন্ডের ভিত্তিতে সাজাতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ নির্ভুল ভিত্তির উপর। রসূলের (সা) সুন্নাহ আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তিনিও সে ব্যাখ্যা করেছেন ওহীর ভিত্তিতে, নিজের খেয়াল খুশিমতো নয়। সুতরাং রসূলের (সা) সুন্নাহকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

কুরআন সুন্নাহর মুলনীতি ও মানদন্ডের ভিত্তিতে সাজানো শিক্ষা ব্যবস্থাই কেবল মানবতার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কারণ তা জ্ঞানের মূল সূত্র থেকে উৎসারিত হয়। আর এটাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার কথা।

www.pathagar.com

আল কুরআনকে তাল্লাহ তা'আলা হুদাল্লিন্নাস 'মানুষের জীবন যাপনের সঠিক পথনির্দেশ' বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং মানুষকে তার জীবন যাপনের সঠিক পথ জানতে হলে কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কুরআনের জ্ঞানার্জনকেই সর্বাদিক গুরুত্ব দিতে হবে। আর হাদীস ও সুন্নাতে রসূল যেহেতু কুরআনেরই প্রাসংগিক জিনিস, তাই কুরআনের সাথে সুন্নাহকেও অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

২. **শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা ঃ** 'মাতৃভাষা' তথা 'জাতীয় ভাষা' শিক্ষাদানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জ্ঞানের সকল উৎস এবং সব ভাষা থেকেই জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে তা বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে 'জাতীয় ভাষায়'। নবী রসূলরা প্রত্যেকেই জাতির জনগণের ভাষায় শিক্ষাদান করেছেন ঃ

"আমি যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছি সে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছে স্বজাতির ভাষায়, যেনো সে সমস্ত উপদেশ আহ্বান তাদের খুলে বলতে পারে" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪)

৩. যেহেতু জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত হয়েছে, তাই আরবি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রাথমিক স্তরেই আল কুরআন পড়তে শিখাতে হবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দান করতে হবে।

৫. উচ্চতর শ্রেণীসমূহে এবং উচ্চ শিক্ষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হবে। তাছাড়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. দ্বীনি ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

৭. শিক্ষা হবে সর্বজনীন, সহজলভ্য ও উন্মুক্ত।

৮. প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক।

৯. শিক্ষা হবে প্রয়োগমুখী, জীবনমুখী ও কর্মমুখী।

১০. শিক্ষকতার পেশা হবে সবচে' সম্মানীয়। শিক্ষকরা হবেন সত্যের সাক্ষ্য।

১১. শিক্ষকদের নৈতিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ হবে বাধ্যতামূলক।

১২. পাঠক্রম ও পাঠসূচিতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য সম্ভার ও বিশ্ব দৃষ্টিভংগি (World outlook) সৃষ্টির সহায়ক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৩. প্রাথমিক স্তর থেকেই সুন্দর আচার আচরণ তথা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে।

১৪. পাঠ্যসূচিতে ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করতে হবে।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও সামরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৬. পুরুষদের মতো নারীদের শিক্ষাও হবে বাধ্যতামূলক।

১৭. অবাধ সহশিক্ষা থাকবেনা।

১৮. মসজিদসমূহকেও শিক্ষায়তনে পরিণত করা হবে।

১৯. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে চিরন্তন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে গতিশীল (Dynamic)। শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্গত এমন (in built) ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম, পরিসর, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস অনায়াসেই করা সম্ভব হয়।

২০. শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে ঈমান ও আদর্শিক মূল্যবোধ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বিশ্বাসের চেতনাকে।

২১. শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয়টাই সমগুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

২২. শিক্ষাদান পেশা নয়, মিশন।

২৩. অর্জিত জ্ঞান অবশ্যই চরিত্র ও কর্মে প্রয়োগ করতে হবে।

২৪. ইসলাম আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষাকেই উৎসাহিত করে।

২৫. শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান উভয়টাই ইবাদত।

www.pathagar.com

আমাদের সংস্কৃতি : প্রেক্ষিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

মতিউর রহমান মল্লিক

এক : 'আমাদের সংস্কৃতি' সম্পর্কে দু'টি কথা বলবার আগে শুধু সংস্কৃতি নিয়ে একটু পর্যালোচনার দরকার আছে। দরকার আছে এই জন্যে যে, কেবল 'সংস্কৃতি'র-ই বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে 'আমাদের সংস্কৃতি'র একটি অবকাঠামো আপনা-আপনিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'সংস্কৃতি' শব্দটি 'সংস্করণ' না হয় 'সংস্কার' এই বিশেষ্য পদ থেকে সংগঠিত। আর 'সংস্কার' অর্থ হচ্ছে- শুদ্ধিকরণ, শাস্ত্রীয় নীতিমালা এবং অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পবিত্রকরণ, শোধনকরণ অথবা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকরণ, নির্মলকরণ, অলংকরণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান, মেরামতকরণ ইত্যাদি।

সংস্কৃতির ইংরেজী পরিভাষা হচ্ছে- Culture কালচারের সোজাসুজি অর্থ চাষ করা, কর্ষণ করা। সেই জন্য চাষকৃত জমিকে বলা হয় Cultured Land আবার পরিমার্জিত মানুষকে বলা হয় Cultured man.

'সাকাফাহ' সংস্কৃতির আরবী পরিভাষা। সফল হওয়া, শিক্ষা পাওয়া, প্রশিক্ষণ পাওয়া ইত্যাদি হচ্ছে সাকাফাহর বাংলা অর্থ।

দুই : উপরের বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে অন্তত এতটুকু পরিষ্কার হলো- সংস্কৃতি একটি বিশুদ্ধ বিষয় বরং একটি শুদ্ধতম তাৎপর্যকে সে মান্য করে। সে আরো মান্য করে একটি বহি:প্রকাশের এবং একটি অন্ত:প্রকাশের প্রগাঢ়তাকে- যা মানুষের যথার্থ পরিচিতি। আর 'মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি।'

সেই জন্যই বলা হয়েছে : 'যে ব্যক্তি বা সমষ্টি আপন চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারার মধ্য দিয়ে নিজেকে সজ্জিত, নন্দিত, পরিশীলিত ও সমাদৃত করতে পারে- তাকে বলা হয় সংস্কৃতিবান ও সভ্য। সৃষ্টির সেরা মানুষ। তার এ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখা ও এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতির।'

কেননা, Culture is the development of inner characteristics of a nation which differentiate it from other nations.

আবার : Culture is that process through which the inner qualities develope.

তেমনিভাবে : Culture starts from faith a particular faith creates special qualities.

অবশ্য শিল্প এবং সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে :

Art is not Culture. art is the expression of idels in various forms. poetry. music. dance. archrtecture. painting etc.

অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে :

To call dance and music Culture is to give a good name to bad things.

এইচ. জে. লাস্কির একটি মন্তব্য খুব অর্থবহ :

Culture is that what we are.

সংস্কৃতি সম্পর্কে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ভাবনাকে সামনে রাখতে পারি। তিনি বলেন-

১. নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, বিচিত্র করো- এই কালচারের আদেশ....

www.pathagar.com

২. 'সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ- নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা।'

সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বদরুদ্দীন ওমর বলেন- জীবন চর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা তার আহার-বিহার, চলাফেরা, তার শোকতাপ, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা-সাহিত্য-ভাষা, তার দিন-রাত্রির হাজারো কাজকর্ম, সবকিছুর মধ্যেই তার সংস্কৃতির পরিচয়।

ইউনেস্কো সম্মেলনে জাতিসংঘ একটি চমৎকার সংজ্ঞা গ্রহণ করেছিলো :

'ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই একমাত্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়, মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অংগ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অংগ।

সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করে। আমরা যে বিশেষভাবে যুক্তিবাদী মানুষ, যে মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে এবং ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমরা মূল্য নিরূপণ করি এবং ভাল-মন্দের মধ্যে নির্বাচন করতে শিখি। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়ে নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বোধসম্পন্ন, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে, অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করে দক্ষতা অর্জন করে।'

তিন : সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি তাৎক্ষণিক রেখাচিত্র আঁকার জন্যে আমরা কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নজরুলের সমূহ- সৌজন্যে আমাদের সংস্কৃতি বোঝবার জন্যে ঐ কবি কাজীরই দ্বারস্থ হওয়া উচিৎ। দ্বারস্থ হওয়া উচিৎ তাঁর রচনার, তাঁর ভাষণ-অভিভাষণের।

"ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি স্বীকার করি, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন, ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে।" (কাজী নজরুল ইসলামের পত্র। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে লেখা)।

আমাদের সংস্কৃতি কি আর কবি নজরুলের সংস্কৃতিই বা কি; তা বোঝবার জন্যে ঐ একটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

একজন পাকা রাঁধুনীর জন্যে যেমন সারা হাড়ির ভাত টিপে টিপে সিদ্ধ হয়েছে কি না দেখবার জন্যে পরখ করার দরকার হয় না; একজন বোদ্ধা পাঠকের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত তথ্যসূত্রটি তেমনি কোন কাজে লাগতে পারে। তবুও কবি কাজীর আরো কিছু বক্তব্য আমরা তুলে ধরলাম :

১. আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম, যেমন করে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরার খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়-দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রান্বিত ভাইরা। (মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা)।

২. আমাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান- আরাফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে এখানে ভীড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না- ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব- এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানে তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল জলে হারিয়ে যায় চিরদিনের তরে! আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের মত আমাদেরও কালচারের, সভ্যতার, জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন। আমাদের মত শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্খা জীবন অঞ্জলির মত করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে। (মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা)।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু স্বপ্নই দেখেননি, বরং শান্তি-নিকেতনের মত আরেকটি সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার তাগিত করেছেন। যে কেন্দ্রটি হবে আমাদের কেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে চর্চা হবে আমাদের ঐতিহ্যের, আমাদের স্বাতন্ত্র্যের। সেই কারণে তিনি নিজের জাতিকে সতর্ক করেছিলেন এইভাবে :

'বাঙলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।#

www.pathagar.com

কালজয়ী জীবন ব্যবস্থা ইসলাম

জীবন ব্যবস্থা কি?

মানুষ নদী নয়, তাই নদীর ন্যায় তার পথ মাটির চড়াই-উতরাইয়ের ভিতর দিয়ে আপনা আপনিই সুনির্দিষ্ট হয়ে যেতে পারে না। মানুষ বৃক্ষ নয়, বৃক্ষের মত তার পথ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নির্ধারিত হতে পারে না। মানুষ নিছক পশুও নয়, পশুর জন্য কেবল জন্মগত প্রকৃতির পথ নির্দেশই যথেষ্ট, মানুষের জন্য নয়। মানুষ যদিও পরজীবনের একটি বিরাট অংশে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তবুও সে তার জীবনের অন্যান্য অসংখ্য বিভাগে পশুর ন্যায় কোন বাঁধাধরা নিয়মে এক কদমও চলতে পারে না। বস্তুত এই বিভাগসমূহে তার সম্মুখে অসংখ্য পথের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে থাকে। তাকে তা হতে একটি পথ নির্বাচন করে গ্রহণ করতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের চিন্তাশীল মস্তিষ্কের সম্মুখে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য অসংখ্য জটিল বিষয় উপস্থাপন করে; কিন্তু সেগুলি কোন স্পষ্ট সমাধান পেশ করে না। সে বিষয়গুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে সুষ্ঠু মীমাংসা করে নিতে মানুষের জন্য একটি সুস্পষ্ট চিন্তা পদ্ধতির প্রয়োজন। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে ইন্দ্রিয় নিচয়ের সাহায্যে অসংখ্য তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান মানুষের সম্মুখে মস্তিষ্কে জড়ো হয়। কিন্তু সেগুলি একেবারে বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল হয়ে থাকে। প্রকৃতি সেগুলোকে সুশৃংখল ও সুসংঘবদ্ধ করে দেয় না। তাই সে জ্ঞানরাশিকে সুসংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মানুষের জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট পথ আবশ্যক। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের স্বভাব তার নিকট অসংখ্য বিভিন্ন দাবি পেশ করে, কিন্তু সেই দাবিগুলো পূর্ণ করার কোন সুনির্দিষ্ট পথ সে পায় না। এই কারণে মানুষের ব্যক্তিগত আচার-আচরণের জন্য একটি মূলনীতি নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তার পারিবারিক জীবনের জন্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য, অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য, দেশ ও রাষ্ট্রের শৃংখলা বিধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এবং জীবনের অন্যান্য অসংখ্য বিভাগের জন্যও একটি সুনির্দিষ্ট পথ অপরিহার্য। যে পথে মানুষ কেবল ব্যক্তিগতভাবেই নয়, একটি দল, একটি জাতি, একটি গোষ্ঠী হিসেবেও চলতে পারবে। কাজেই বলা যায়, দুনিয়াতে মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা অপরিহার্য।

মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন ব্যবস্থার রূপ

আসলে বিরাট মানবতার জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন এমন একটি জীবন ব্যবস্থার, যাতে জেনে বুঝে এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব-অনুধাবন করে এক ব্যাপক সর্বজনীন, চিরস্থায়ী ও সনাতন নীতির বুনিয়াদ কায়েম করা যাতে পারে যাকে নিয়ে মানবতা বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র বিবর্তিত পরিস্থিরি মধ্যে অতীব স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে পারে, সেই পরিস্থিতি হতে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান করাও সম্ভব হয় জীবনের রাজপথে সংকুচিত হয়ে নয় বরং অব্যাহত গতিতে তার মঞ্জিলে মাকসুদে গিয়ে উপনীত হতে পারে।

www.pathagar.com

এইরূপ জীবন ব্যবস্থাকে মানুষ নিজেই রচনা করতে সক্ষম মানুষের জন্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা একান্তভাবে অপরিহার্য, উপরে তার বাস্তব রূপ এবং পরিচয় দেয়া হয়েছে।

জীবন ব্যবস্থার অর্থ এমন একটি সর্বব্যাপক চিরন্তনী ও মৌলিক বিধান যা সর্বাবস্থায় মানুষের পথনির্দেশ করতে পারে। যা মানুষের চিন্তা ও গবেষণা, চেষ্টা-সাধনা এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সঠিক দিক নির্ণয় করতে পারে এবং তাকে ভুল অভিজ্ঞতা অর্জনে সময়, শ্রম, শক্তি ব্যয় হতে রক্ষা করতে পারে। এই জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই যে, মানুষ নিশ্চিত রূপ জেনে নিবে তার এবং এই বিশ্ব প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব কি? এবং এই বিশাল বিশ্বে তার অবস্থান কোথায়? তারপর তাকে জানতে হবে, এই দুনিয়ার জীবনই কি একমাত্র জীবন, না ইহা সমগ্র জীবনের একটি প্রাথমিক অধ্যায় মাত্র? মানুষের এই অবিশ্রান্ত যাত্রা এর শুধু জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, না ইহজীবন এক সীমাহীন দীর্ঘ সফরের এক অধ্যায় মাত্র। অতঃপর তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে জীবনের একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা প্রকৃত পক্ষেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হতে পারে, যার জন্য মূলত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা প্রত্যেকটি ব্যক্তি, প্রত্যেকটি দল এবং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র মানবতা সকল কালেই, কোন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করতে পারে।

এরপর মানুষের নৈতিক চরিত্রের জন্য এমন এক সুদৃঢ় ও সামগ্রিক নিয়ম পদ্ধতি আবশ্যক, যা প্রকৃতির সমগ্র বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে এবং সমগ্র সম্ভাব্য অবস্থার উপর কাল্পনিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে খাপ খেতে পারে। কারণ এরূপ হলেই সে এই নিয়ম পদ্ধতির ভিত্তিতে নিজের স্বভাব চরিত্র গঠন করতে পারে; সেই নিয়ম পদ্ধতির পথনির্দেশ জীবন পথের প্রত্যেক মঞ্জিলে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অবস্থা ও সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করতে পারবে। ফলে বিবর্তনশীল অবস্থা ও নিত্যঘটিত সমস্যাবলীর সংগে নতুন নতুন চরিত্রনীতি রচনা আবশ্যক হবে না; অন্য কথায় নীতিহীন ও সুবিধাবাদী হয়ে জীবনযাপন করতে সে বাধ্য হবে না।

তারপর মানুষের জন্য এমন পূর্ণাংগ ও ব্যাপক তমদ্দুনিক নীতি আবশ্যক, যা মানব সমাজের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য এবং তার সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিরচিত হবে। তাতে অতিরিক্ত গোঁড়ামী কিংবা শৈথিল্য এবং অসংগত কার্যক্রমের কোন অবকাশ থাকবে না। তাতে সমগ্র মানুষের সামগ্রিক স্বার্থ এবং সুবিধার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি থাকবে। তা অনুকরণ করে যেন প্রত্যেক যুগে মানব জীবনের প্রত্যেক দিকের বাস্তব রূপায়ন, পুনর্গঠন এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা ও সাধনা করা সম্ভব হয়।

মানুষের জন্য কতকগুলি সুস্পষ্ট কর্মনীতি আবশ্যক যা সে সবর্জনীন চিরস্থায়ী পক্ষ হিসাবে অনুকরণ করতে পারবে এবং যা এই 'আদ্-দ্বীন' নির্ধারিত জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নৈতিক আদর্শ, সামাজিক ও তমদ্দুনিক নীতি এবং কর্মসীমার সাথে মানুষের জীবনকে যুক্ত করে রাখতে পারবে।

এক্ষণে আমাদের বিশেষভাবে বিচার করে দেখতে হবে যে, এ ধরনের কোন জীবনব্যবস্থা যদি মানুষ নিজেই আল্লাহর সহায়তা ভিন্ন রচনা করতে চেষ্টা করে, তবে সেই চেষ্টা কোনক্রমেই কি সফল হতে পারে? বর্তমান যুগে যারা বড় গলায় নিজেদের রচিত 'দ্বীন' বা জীবনব্যবস্থা পেশ করছে এবং সে জন্য পরস্পর মারাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছে তারাও এমন দাবি করতে পারে না যে, তাদের কারো দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা মানুষ হিসেবে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কারো 'দ্বীন' গোত্রীয় ও জাতিগত, কারো 'দ্বীন' বিশেষ কোন ভৌগলিক অঞ্চলের জন্য, কারো 'দ্বীন' শ্রেণীগত, কারো 'দ্বীন' অতীত যুগের এক প্রয়োজন অনুসারে রচিত হয়েছিল, কাজেই তা অনাগত যুগের অবস্থা ও সমস্যার সমাধানে কিছুমাত্র কার্যকরী হবে কিনা, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কারণ যে যুগ এখন চলছে, তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন এখনো যাচাই করে দেখা হয় না। কাজেই মানুষ এ ধরনের কোন জীবনব্যবস্থা রচনা করতে সমর্থ হচ্ছে কিনা সে প্রশ্ন আমি করবো না। আমি জিজ্ঞাসা করবো যে, মানুষ এ প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে কি?

মানুষের উপায় উপাদানের বিশ্লেষণ

মানুষের জন্য 'দ্বীন' বা জীবনব্যবস্থা রচনা করার মাত্র চারটি উপায় ও পন্থা মানুষের আয়ত্তাধীন রয়েছে। প্রথম উপায় হচ্ছে মানুষের ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয় মানুষের বুদ্ধি, তৃতীয় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্থাৎ বিজ্ঞান চতুর্থ হচ্ছে অতীত অভিজ্ঞতা সমূহের ঐতিহাসিক সম্পদ।

www.pathagar.com

ইচ্ছাশক্তি

প্রথমে মানুষের ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক। প্রশ্ন হচ্ছে ইহা কি মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পারে? এই শক্তিটি যদিও মানুষের প্রেরণা লাভের প্রকৃত উৎস, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর মূল প্রকৃতিতে যেসব দুর্বলতা বিদ্যমান, তার কারণে ইহা কিছুতেই মানুষের পথপ্রদর্শন করার যোগ্য হতে পারে না। শুধু পথপ্রদর্শন করাতো দূরের কথা, ইহা মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকে পর্যন্ত অনেক বিভ্রান্ত করে থাকে। নানাবিধ শিক্ষাদীক্ষা ও ট্রেনিং দেয়ার পর এই শক্তিকে যতদূরই আধুনিক, তেজস্বী ও জ্যোতিষ্মান করে তোলা হোক না কেন, কোন গুরুতর ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব এর উপর যখনই ন্যস্ত করা হবে, তখনি ইহা শতকরা অন্তত নিরানব্বইটি অবস্থায় ভ্রান্তিপূর্ণ ফায়সালা দিবে, তাতে সন্দেহ নাই। কারণ এর অভ্যন্তরে যেসব ভাবধারা বর্তমান পাওয়া যায় তা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে না বরং বঞ্চিতকে কোন না কোন প্রকারে অবিলম্বে লাভ করার জন্য অনুকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ইহা মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাভাবিক দুর্বলতা বিশেষ। কাজেই এই শক্তি একজন ব্যক্তিরই হোক কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণীর হোক অথবা রুশোর কথা অনুযায়ী সর্বজনীন ইচ্ছাশক্তিই (general will) হোক না কেন, মানুষের জন্য কোন জীবনব্যবস্থা রচনার উপযোগী যোগ্যতা স্বভাবতই কোন ইচ্ছাশক্তির নেই। অধিকন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি মানব জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব, তার লক্ষ্য গতি ও পরিণতি সম্পর্কিত উচ্চতর সমস্যাগুলির কোন সমাধানই দান করতে পারে না।

বুদ্ধি

এক্ষণে মানুষের বুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যাক। বুদ্ধির ক্ষমতা অসাধারণ, তার যোগ্যতা ও প্রতিভা অনস্বীকার্য। মানব জীবনে তার গুরুত্ব এবং মর্যাদাও কেহ উপেক্ষা করতে পারে না। পরন্তু মানুষের অভ্যন্তরে ইহা অত্যন্ত তীব্র প্রেরণাদায়ক শক্তি, তাও স্বীকার না করে উপায় নাই। কিন্তু সমস্যা এই যে, মানুষের জন্য জীবনব্যবস্থা রচনা করার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হলে তা করবে কার বুদ্ধি?... জায়েদের বুদ্ধি... না বকরের বুদ্ধি? না সমগ্র মানুষের বুদ্ধি? ..... না মানুষের বিশেষ কোন দল বা শ্রেণীর বুদ্ধি? বর্তমান যুগের মানুষের বুদ্ধি? ..... না অতীত কোন যুগের মানুষের বুদ্ধি?... নাকি অনাগত যুগের মানুষের বুদ্ধি?.... আর এই প্রশ্ন না হয় নাই করলাম কারণ এর সঠিক জওয়াব দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে সহজ একটি প্রশ্ন করতে চাই। মানব বুদ্ধির চৌহদ্দী পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখলে মানুষের জীবনব্যবস্থা রচনা করার মত বিরাট ও জটিল কাজ তার উপর ন্যস্ত করা কি কোন ক্রমেই শোভা পায়? বস্তুত কোন কিছু সম্পর্কে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্তরূপে নির্ভর করে পঞ্চ ইন্দ্রিয় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের উপর, ইহা ভুল তথ্য সংগ্রহ করলে বুদ্ধি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য। তা অসম্পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করলে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণই হবে এবং যেসব ব্যাপারে ইন্দ্রিয় কোন তথ্যই সংগ্রহ করতে পারবে না বুদ্ধির আত্মজ্ঞান থাকবে সে সব ব্যাপারে তা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করারই দুঃসাহস করবে না। আর তা অন্ধ ও দাম্ভিক হলে অন্ধকারে কাষ্ঠনির্মিত তীর নিক্ষেপ করে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। যে বুদ্ধির পরিধি এত সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ, মানব জাতির তথ্য একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা রচনা করার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না। জীবন ব্যবস্থা রচনা করার জন্য গোড়াতেই যে উচ্চতর সমস্যাগুলির সমাধান অপরিহার্য, ইন্দ্রিয় নিচয় তার একটিরও কোন সমাধান পেশ করতে পারে না। তবে কি এ সব সমস্যার সমাধান করা হবে অবাস্তব ধারণা বিশ্বাস, অমূলক কল্পনা, খেয়াল এবং কুসংস্কার ও আজগুবি কিচ্ছা কাহিনীর উপর নির্ভর করে? 'আদ্-দ্বীন' বা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনার জন্য সেসব স্থায়ী নৈতিক মূল্য নির্ধারণ সংগ্রহ করতে একেবারে অক্ষম। এমতাবস্থায় মানব বুদ্ধি বিশুদ্ধ খাঁটি ও পরিপূর্ণ নৈতিক শূন্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হবে বলে কিছুমাত্র ভরসা করা যায় কি? তদ্রূপ জীবন ব্যবস্থা রচনার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় বিষয়ের আমি উল্লেখ করছি, তজ্জন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্ভুল, বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই মানব বুদ্ধি কোন ব্যাপক ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে সক্ষম নয়। উপরন্তু মানব বুদ্ধির সাথে ইচ্ছাশক্তি বলতে আর একটা বস্তু শনি গ্রহের ন্যায় স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বিরাজ করছে। তা বুদ্ধিকে কোন সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রতি পদক্ষেপে বাধা প্রদান করে এবং তাতে সহজ ও সঠিক পথে চলার গতি ব্যাহত করে বাঁকা ও ভুল পথে পরিচালিত না করে ছাড়ে না। কাজেই মানব বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সংগৃহীত তথ্যের সুবিন্যাসে এবং তদ্দ্বারা বুদ্ধি প্রদান করার ব্যাপারে কোনরূপ ভুল করবেনা বলে যদি ধরে নিয়া হয়, তবুও তার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা নিয়ে জীবন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা রচনার ন্যায় বিরাট দায়িত্ব বহন করার কোন ক্ষমতাই নেই। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। এ দায়িত্ব তার ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিলে একদিকে যেমন তার ওপর যুলুম করা হবে, অন্যদিকে নিজের উপরও যুলুম কম করা হবে না।

বিজ্ঞান

এক্ষণে তৃতীয় উপায়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। বিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকেই বুঝায়। মানব বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, অতি প্রাত্যহিক ও জড় অতীত সমস্যাবলী সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নাই। যেহেতু সে নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যের জগতে পৌছার কোন অবলম্বন আসলেই মানুষের করায়ত্তে নয়। অধিকন্তু তার প্রত্যক্ষ ও সরাসরি পর্যবেক্ষণ করার এবং অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও জ্ঞানরাশির সাহায্যে এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা মানুষের নাই। যাকে কোনরূপ 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। জীবন ব্যবস্থা (আদ্-দ্বীন) রচনার জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা করা সর্বপ্রথম অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে অবস্থিত। তার পরে নৈতিক মান নির্ধারণ, তমদ্দুন ও সংস্কৃতির মূলনীতি নির্বাচন এবং ভ্রান্ত পথ হতে বিরত রাখার জন্য সীমা নির্দেশ করার কর্তব্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধা করা যায় কিনা- এই প্রশ্ন অবশ্য জাগতে পারে। কিন্তু তার উপর পাল্টা প্রশ্ন এই উঠবে যে, তা যদি সম্ভব বলে ধরে নেয়া যায়, তা হলে কোন ব্যক্তির বা দলের অথবা কোন কালের বিজ্ঞান এ কাজ সমাধা করবে? কাজেই অর্থহীন বিতর্কে না গিয়ে আমরা শুধু নীতি হিসেবে বিষয়টির আলোচনা করে দেখব। প্রথমে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব যে, নিছক বৈজ্ঞানিক পন্থায় এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কি কি বুনিয়াদি শর্ত রয়েছে। সেজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হল মানুষ এই দুনিয়াতে যেসব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন বসবাস করছে, সে সমস্ত নিয়মের তত্ত্বজ্ঞানের পরিপূর্ণ সমাহার। তার পরে তার নিজের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা লাভও আবশ্যক। তৃতীয়ত এদের বিশ্ব প্রাকৃতিক এবং মানবিক এই উভয় প্রকারের জ্ঞান তথ্যের সমাহার একত্রীভূত হওয়াও অপরিহার্য। এবং এমন একটি পরিপূর্ণ মননশক্তির আবশ্যক যা এ তথ্য সমাহারকে পরস্পর শ্রেণীবিন্যাস করে তা দ্বারা সুষ্ঠু নিয়মে যুক্তি প্রয়োগ করে মানুষের জন্য নৈতিক পুণ্য, সমাজ ও তমদ্দুনিক নীতি নির্ধারণ এবং সর্বপ্রকার ভুলভ্রান্তি হতে তাকে বাঁচার উপায় নির্দেশ করার কাজ করবে। কিন্তু সত্য বলতে কি, এই শর্তগুলি পূরণ করে এতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সংগ্রহ করা যেমন আজ পর্যন্ত আদৌ সম্ভব হয় নাই, অনুরূপ আরো পাঁচ হাজার বৎসর পরেও তা কখনো সম্ভব হতে পারে বলে কোন আশাও করা যায় না।

ইতিহাস

মানুষের জ্ঞান অর্জনের সর্বশেষ উপায় হচ্ছে ইতিহাস। অন্য কথায় তাকে বলা যেতে পারে অতীত মানুষের অভিজ্ঞতা সমূহের ঐতিহাসিক সঞ্চয় কিংবা আমলনামা। মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনার মত বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য ঐতিহাসিক জ্ঞান সম্পদ মোটেই যথেষ্ট নয়। অতীতকাল হতে ইতিহাসের এই সম্পদ পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও ব্যাপকতার সাথে আমাদের নিকট পৌছিয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন আমি তুলতে চাই না। পরন্তু এহেন ঐতিহাসিক সম্পদের সাহায্যে মানুষের জন্য জীবন ব্যবস্থা রচনা করবে কোন ব্যক্তি?

অতীত বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কোন তারিখ পর্যন্ত ঐতিহাসিক রেকর্ড মানুষের জীবন ব্যবস্থা রচনার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারবে?

মানুষের জ্ঞান লাভের উপায়সমূহের যে বিশ্লেষণ আমি করলাম তা যদি সত্য হয়, তা হলে এখন আমি আমার সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে পারি যে, মানুষ নিজের জন্য এসব উপায়ের সাহায্যে অসম্পূর্ণ, অবাস্তব, ভুলত্রুটিতে পরিপূর্ণ আঞ্চলিক কিংবা সাময়িক কোন ব্যবস্থা রচনা করতে সমর্থ হতেও পারে, কিন্তু মানুষের পক্ষে এই উপায়ে কোন পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (আদ্-দ্বীন) রচনা করা একেবারেই অসম্ভব। পূর্বেও তা সম্ভব ছিল না, আজও সম্ভব নয় এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্য এর সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরাশ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মানব রচিত জীবন ব্যবস্থার স্বরূপ

জীবনের কর্মক্ষেত্রে মানুষকে কত বস্তুরই সংস্পর্শে আসতে হয় তার প্রত্যেকটির প্রকৃতির গুণাগুণ ও অবস্থা এবং তার সাথে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সর্বত্র ক্রমেই একটি সুস্পষ্ট মত নির্দিষ্ট করে নেয়া একান্তই আবশ্যক। পূর্বেই এসব নির্দিষ্ট না করে কোন

www.pathagar.com

একটি জিনিসকেও কোন কাজে প্রয়োগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই মত মূলত ভুল কি নির্ভুল সে প্রশ্ন গৌণ, কিন্তু মত যে একটি নির্দিষ্ট করে নিতে হয়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আর এ নির্ধারণের পূর্বে কোন বস্তুর সাথে বিরূপ ব্যবহার ও আচরণ করতে হবে কার সাথে কিরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করতে হতে চূড়ান্তভাবে তার ফায়সালা করাও কিছুতেই সম্ভব নয়।

মানুষ এ পৃথিবীর উপর নিজেকে বর্তমান দেখতে পায়। তার একটি শরীর বা দেহও রয়েছে। তাতে অসংখ্য প্রকার শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিভা নিহিত রয়েছে। তার সম্মুখে আকাশ ও পৃথিবীর এক বিশাল বিস্তৃত এলাকা বিদ্যমান, তাতে রয়েছে অসংখ্য প্রকার দ্রব্যসামগ্রী মানুষের মধ্যে তা ব্যবহার করার এবং নিজের প্রয়োজনে তা হতে উপকৃত হওয়ার মত শক্তি পুরোপুরি বর্তমান রয়েছে। তার চতুর্দিকে রয়েছে অসংখ্য মানুষ, জন্তু উদ্ভিদ, গুল্ম, লতা, প্রস্তর ইত্যাদি। এসবের সাথে মানুষের জীবন নানা দিক দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রথমে নিজের সম্পর্কে, অন্যান্য জন্তু, বস্তু ও দ্রব্য সামগ্রী সম্পর্কে এবং তাদের সাথে তার নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন মত ঠিক না করে তাদের প্রতি কোনরূপ আচরণ অবলম্বন করা মানুষের দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে কি? তার উপর কোনরূপ দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে কি হয় নাই, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী না কারো অধীন, কারো অধীন হয়ে থাকলে সে কার অধীন কার নিকট তাকে জবাবদিহি করতে হবে, এ পার্থিব জীবনের কোন পরিণতি আছে কি নাই, থাকলে তা কি প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর ঠিক না করে এবং এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে নিজের জীবনের জন্য কোন পথই মানুষ বেছে নিতে পারে না। এ বিশ্ব প্রকৃতির স্বরূপ এবং এর ব্যবস্থা কোন ধরনের এবং এখানে অবস্থান কোন স্তরে, তা ঠিক না করে কোন মানুষই সমষ্টিগত এ দুনিয়ার সাথে কোনরূপ ব্যবহার করতে পারে না।

আর এসব প্রশ্নের কোন না কোন উত্তর চেতনায় হোক কি অচেতনায়, পৃথিবীর মানুষের মনে বর্তমান থাকেই। এর উত্তর ঠিক করতে মানুষ একান্তভাবে বাধ্য। প্রত্যেকটি মানুষই ঐ সব প্রশ্নের অত্যন্ত অস্পষ্ট ও মোটামুটিভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর নিশ্চয়ই স্থির করে নেয়। ফলে তার জীবনের যে নীতিই হোক না কেন, তা যে ঐ সত্যেরই অনিবার্য পরিণতি তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না।

এ প্রশ্নসমূহ মানব জীবনের মৌলিক সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে এসবের উত্তর ঠিক করার পূর্বে সমাজ ও সভ্যতার জন্য কোনরূপ বিধান এবং মানব সমষ্টির জন্য কোনরূপ কার্যসূচি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এক কথায় ঐ প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী সমগ্র সমাজ সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর নির্ধারণের একটি উপায় হচ্ছে নিজের বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করা এবং তদলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে উক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ এবং তার সাথে অনুমান ধারণার যোগ করে একটি নীতি ঠিক করা। তৃতীয় পন্থা হচ্ছে পয়গম্বর, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ, প্রত্যক্ষভাবে নিগূঢ় সত্য জ্ঞানের ধারক হওয়ার দাবি করে উক্ত প্রশ্নাবলীর যে উত্তর দিচ্ছেন তা গ্রহণ করা।

উল্লিখিত প্রত্যেকটা পথই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রত্যেকটি উত্তর হতে একটি বিশেষ আচরণ নীতি লাভ করা যায়, একটি বিশেষ নৈতিক আদর্শ এবং সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে।

প্রথমতঃ নির্ভেজাল জাহেলিয়াত

নিছক বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে মানুষ যখন উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর লাভ করতে চেষ্টা করে তখন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তা এ যে, সৃষ্টি জগতের এ বিরাট ও বিস্ময়কর ব্যবস্থা নিছক একটি আকস্মিক ঘটনার বাস্তব প্রকাশ মাত্র। এর পশ্চাতে কোন সদিচ্ছা বা মহৎ উদ্দেশ্য বর্তমান নাই, ইহা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অস্তিত্ব লাভ করছে। নিজস্ব শক্তির সাহায্যে এর কার্যক্রম চলছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজে নিজেই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোন স্বত্বাধিকারী কোথাও বর্তমান নাই। আর তা থাকলেও মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নাই। মানুষকে এক প্রকার জন্তু বলে মনে করা হয় এবং সম্ভবত এক দুর্ঘটনার ফলেই এ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে বলে ধারণা করা হয়। মানুষকে পৃথিবীতে জীবন্ত ও বিচরণশীল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে নানাবিধ ইচ্ছা, বাসনা ও লালসা রয়েছে। তার প্রকৃতি নিহিত শক্তি তা চরিতার্থ করার জন্য অহর্নিশ প্রবলভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তার অংগ প্রত্যংগ অস্ত্র সরঞ্জাম রয়েছে, সে সবের সাহায্যে তার অন্তর্নিহিত লালসা বাসনা চরিতার্থ করা যেতে পারে। সমগ্র দুনিয়া অফুরন্ত দ্রব্যসামগ্রীর একটি ভাণ্ডার ব্যতীত আর কিছুই নয়। মানুষ তার উপর হস্ত প্রসারিত করবে এবং নিজের ইচ্ছামত দ্রব্যসামগ্রী হস্তগত করবে, পৃথিবীর ইহাই একমাত্র কাজ। এর উপর এমন কোন শক্তিসম্পন্ন ও কর্তৃত্বশীল সত্তা নাই, যার নিকট মানুষের

www.pathagar.com

জবাবদিহি করতে বাধ্য হতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য আইন বিধান লাভ হতে পারে। সত্য জ্ঞান ও পথনির্দেশ লাভের এমন কোন উৎস কোথাও নাই। ফলত মানুষ স্বাধীন, দায়িত্বহীন ও স্বাধিকার সমন্বিত এক সত্তা। নিজের জন্য প্রয়োজনীয় আইন বিধান রচনা করা, তার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের ব্যবহার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা এবং পৃথিবীতে কর্মনীতি নির্ধারণ করা তাদের নিজেদেরই কাজ।

ব্যক্তিগত জীবনে উক্তরূপ দৃষ্টিভংগি ও জীবন দর্শন গ্রহণ করার ফলে মানুষ প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি স্বাধীন। স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন কর্মপন্থা গ্রহণ করে সে নিজেকে নিজের, নিজ দেহ ও দৈহিক শক্তিসমূহের একচ্ছত্র মালিক মনে করতে শুরু করে। নিজের ইচ্ছামতই তার প্রয়োগ ও ব্যবহার করে। পৃথিবীর যে বস্তুই তার করায়ত্ত হবে, যে লোকদের উপর তার কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে, এ বস্তুবাদী ব্যক্তি তার সাথে তার মালিক হিসেবেই ব্যবহার করবে। তার নিজের হৃদয় মনে কোন নৈতিক অনুভূতি, দায়িত্বজ্ঞান ও জবাবদিহি করার ভয় হবে না, যা তার বল্গাহারা জীবনধারা কিছুমাত্র ব্যাহত করতে পারে। সেখানে বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা কিছুই নাই কিংবা তা থাকা সত্ত্বেও তাকে উপেক্ষা করে নিজ ইচ্ছামত কাজ করা সম্ভব। সেখানে এ মত ও জীবন দর্শনের অনিবার্য ফলে সে অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতকতা দুর্নীতি পরায়ণ, কুপ্রবৃত্তিশীল, জন্মপাপী ও ধ্বংসকারী অবশ্যই হবে। স্বভাবতই সে হবে স্বার্থপর, জড়বাদী ও সুবিধাবাদী। তার নিজের প্রবৃত্তির লালসা বাসনা ও পাশবিক প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাওয়া ভিন্ন তার জন্ম ও জীবনে আর কোন লক্ষ্যই থাকে না। এবং যেসব জিনিস তার এ জীবন উদ্দেশ্যের আনুকূল্য করবে কেবলমাত্র তা-ই তার দৃষ্টিতে মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য বলে গৃহীত হবে।

এ ধরনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের সমন্বয়ে যে সমাজ গঠিত হবে তার অবস্থা হবে এমন যে- সকল অবস্থায়ই আসল আইন প্রণয়নকারী হবে মানুষ। আর নিছক ইচ্ছা, লালসা, বাসনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সকল প্রকার আইন রচনা এবং তার রদবদল করা হবে। সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদী দৃষ্টিতে সকল কাজের নীতি নির্ধারণ ও পরিবর্তন করা হবে। সর্বাপেক্ষা অধিক ধূর্ত, শঠ, শক্তিশালী, কপট, প্রতারক মিথ্যাবাদী, পাষাণমনা এবং পাপিষ্ঠ আত্মার লোকই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় আধিপত্য লাভ করতে পারবে। এদের উপর অর্পিত হবে সমাজের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা ও অধিকার। এদের বিধানগ্রন্থে শক্তিরই নাম হবে সত্য আর দুর্বল বাতিল বলে অভিহিত হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কখনো সামন্তবাদ ও জায়গীরদারী প্রথার বিস্তার ঘটবে, কখনও পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্র এর স্থানে এসে দাঁড়াবে, আবার কখনো মজুর শ্রমিকগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাদের নিজেদের নিরংকুশ একনায়কত্ব কায়েম করবে। সেখানে কোন সুবিচারপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না।

শিরক মিশ্রিত জাহেলিয়াত

বিশ্বপ্রকৃতির এ বিরাট ব্যবস্থা যদিও কোন রব ব্যতীত চালু হওয়া সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এর খোদা একজন মাত্র নয়, তারা অসংখ্য, বহু। বিশ্বজগতের বিভিন্ন শক্তির গোড়ার সূত্র বিভিন্ন খোদার হাতে নিবদ্ধ। মানুষের সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, সাফল্য, ব্যর্থতা, লাভ-লোকসান ইত্যাদি অসংখ্য ঐশ্বরিক সত্তার অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এ মতাদর্শ অবলম্বনকারীগণ আন্দাজ অনুমানের সাহায্যে উক্ত খোদাসুলভ শক্তিসমূহের উৎস ও অবস্থান নির্ধারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছে। ফলে এ অনুসন্ধান ব্যাপদেশে যে যে শক্তির উপরই তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, তাদেরকেই এরা 'খোদা' মনে করেছে। এ মত গ্রহণ করার পর মানবজীবনে যেরূপ আচরণ স্বতই কার্যকরী হয়, তার পরিচয় নিম্নরূপ।

প্রথমতঃ এর ফলে মানুষের সমগ্র জীবন অবাস্তব আন্দাজ অনুমানের পাদপীঠে পর্যবসিত হয়। মানুষ তখন বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিসম্মত পন্থা ব্যতীত নিছক আন্দাজ অনুমানের সাহায্যে অসংখ্য বস্তুকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করতে শুরু করে। তারা অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক পন্থায় মানুষের ভাগ্যের উপর ভাল কিংবা মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম বলে মনে করে। এ জন্য মানুষ উক্ত মতের বিশ্বাসী ব্যক্তি ভাল প্রভাবের অবাস্তব আশায় এবং মন্দ প্রভাবের অবান্তর ভয়ে নিমজ্জিত হয়ে নিজের বিপুল শক্তি অর্থহীনভাবে অপচয় করে। কোথাও কোন সমাধির প্রতি আশা পোষণ করতে শুরু করে ইহা তাদের অসাধ্য কাজ সুসম্পন্ন করে দিবে। কোথাও কোন দেবতার উপর ভরসা করা হয় এবং সে মানুষের ভাগ্য ভাল করে দিবে বলে আশা করা হয়। কোথাও এতটুকু কুলক্ষণ দেখতে পেলে এদের মন ভেঙ্গে পড়ে, হতাশায় কাতর হয়। এই

www.pathagar.com

জিনিসই তার মতবাদ, চিন্তাধারা এবং তার চেষ্টা সাধনাকে স্বাভাবিক কাজ হতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করে এক সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক পথে পরিচালিত করে।

দ্বিতীয়তঃ এ মতের কারণেই পূজা পাঠ, মানত, উপহার, অর্ঘ এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের এক দীর্ঘ কর্মতালিকা রচিত হয়ে পড়ে। আর তাতে জড়িত হওয়ার কারণে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার একটি বিরাট অংশ অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যয়িত হয়।

তৃতীয়তঃ এই মুশরিকী কল্পনা পূজার কুসংস্কারে যারা নিমজ্জিত হয়, ধূর্ত ও শঠ ব্যক্তিগণ তাদেরকে নিজের প্রতারণা জালে আবদ্ধ করে অর্থ লুণ্ঠন করার বিরাট সুযোগ লাভ করতে পারে। ফলে কেহ রাজা বা বাদশাহ হয়ে বসে এবং সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার সাথে নিজের বংশের সম্পর্ক দেখিয়ে লোকদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করে যে, তারাও অন্যতম খোদা আর তোমরা তাদের দাস। কেহ পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও পীর হয়ে বসে। তাবীজ তুমার, ঝাড় ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র এবং সাধনা বা জাল বিস্তার করে আর লোকদের মনে এ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে চায় যে, আমাদের এ সব জিনিস অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক উপায়ে তোমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে, দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারে, ব্যথা-বেদনা প্রশমিত করতে পারে। এর পর এসব চতুর লোকের পরবর্তী বংশ একটা স্থায়ী ও স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন পরিবার বা শ্রেণীতে পরিণত হয়।

চতুর্থতঃ এ মতাদর্শ যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-সাহিত্য এবং পূর্ণাংগ সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতির জন্য কোন স্থায়ী ও স্বতন্ত্র ভিত্তি উপস্থিত করতে পারে না, অনুরূপভাবে এহেন কাল্পনিক খোদাদের নিকট হতে মানুষ অনুসরণযোগ্য কোন প্রকার জীবন ব্যবস্থাও লাভ করতে পারে না। মানুষ এ কাল্পনিক খোদাদের অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের আশায় পূজা উপাসনা ও কয়েকটি নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান যথারীতি পালন করতে থাকবে। এ খোদাদের সাথে সম্পর্ক এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

বৈরাগ্যবাদ

এ মতাদর্শের গোড়ার কথা হল পৃথিবী এবং মানুষের শারীরিক সত্তা স্বয়ং মানুষের জন্য একটি 'শাস্তি ক্ষেত্র বিশেষ'। আর মানুষের আত্মাকে একটি দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর ন্যায় পিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। বস্তুজগতের সাথে একটি জড় সম্পর্ক বর্তমান থাকায় মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, ইচ্ছা-বাসনা এবং প্রয়োজনীয় যা কিছুই রয়েছে মূলত তা সবই বন্দীদশার শৃংখল বিশেষ। এ পৃথিবী এবং এর দ্রব্যসামগ্রীর সাথে মানুষ যতই সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে, ততই তার এ শৃংখলের বন্ধন দৃঢ়তর হবে এবং সে ততোধিক কঠোর শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এ শাস্তি হতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে জীবনের সকল প্রকার সম্পর্ক সম্বন্ধ ও ধান্ধা ঝামেলা পরিপূর্ণ সাফল্যের সাথে এড়িয়ে স্বাভাবিক লোভ-লালসা ও ইচ্ছা কামনাকে কঠোরভাবে অবদমিত করা, স্বাদ আস্বাদন পরিহার করা, শারীরিক প্রয়োজন এবং প্রবৃত্তির দাবি ও প্রেরণাকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করা। রক্ত মাংসের বাস্তব সম্পর্কের কারণে হৃদয় মনে যে প্রেম ভালবাসার উদ্রেক হয়, পূর্ণরূপে তার মূলোচ্ছেদ করা এবং এ শত্রুকে (মন ও দেহকে) কঠোর ও অন্তহীন কৃচ্ছ্র সাধনার সাহায্যে এমনভাবে নিয়োজিত করা যেন আত্মার উপর তার কোনরূপ প্রভাব প্রভুত্ব আদৌ স্থাপিত হতে না পারে। এর ফলে আত্মার লঘু ও পবিত্র হতে এবং মুক্তির উচ্চতম মার্গে উড্ডীন হওয়ার শক্তি লাভ করতে পারবে।

এ মতাদর্শের যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা হলো -

প্রথমত ঃ এর প্রভাবে মানুষের সমগ্র ঝোঁক প্রবণতা সমষ্টিবাদ হতে ব্যষ্টিবাদের দিকে এবং সমাজ ও সভ্যতা হতে বর্বরতার দিকে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ পৃথিবী এবং জীবনধারা হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কোন জৈবিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। তার সমগ্র জীবন অসহযোগ ও সম্পর্কহীনতার বাস্তব প্রতিমূর্তিতেই পরিণত হয়। তার চরিত্র সম্পূর্ণ নেতিবাচক ভাবধারায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ এ মতাদর্শের প্রবল প্রভাবে সমাজের উত্তম ও সৎ লোকেরা পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জন একাকীত্বের নিভৃততম কোণে আশ্রয় লয় এবং নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করে। ফলত পৃথিবীর সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্তৃত্বপূর্ণ কাজকর্মের চাবিকাঠি সমাজের সর্বাপেক্ষা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত ঃ সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এ মতের যে প্রভাব আবর্তিত হয় তার ফলে লোকদের মধ্যে নেতিবাচক নৈতিকতা, সমাজবিরোধী ভাবধারা এবং নৈরাজ্যব্যঞ্জক মতবাদ সৃষ্টি হয়। তাদের কর্মশক্তি ও কার্যদক্ষতা ক্ষীণ হতেও ক্ষীণতর হয়ে

www.pathagar.com

যায়। অত্যাচারীদের জন্য তারা সহজভোগ্য হয়ে পড়ে এবং সকল দুর্ধর্ষ নিপীড়ক সরকার তাদেরকে অতি সহজেই হস্তগত করে নিতে পারে।

চতুর্থত ঃ মানব প্রকৃতির সাথে এ বৈরাগ্যবাদী জীবনদর্শনের চিরস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রায়ই ইহা সংগ্রামে পরাজিত হয়। ইহা পরাজিত হলে নিজের দুর্বলতা গোপন করার জন্য তারা নানা ফন্দি ও কূটকৌশলের সাহায্যে আত্মপ্রতারণা করতে বাধ্য হয়।

নবী ও রাসূল (সাঃ) আনীত বিধান ইসলাম

মানব জীবনের মৌলিক প্রশ্নাবলীর জবাব লাভ এবং বুনিয়াদী সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য ইহা হচ্ছে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ উপায়। আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ এসব প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন, মানব জীবনের মৌলিক সমস্যার যে সমাধান দেখিয়েছেন, আন্তরিকতার সাথে তাই পূর্ণরূপে গ্রহণ করার নামই হচ্ছে ইসলাম।

নবীগণ বলেন, মানুষের চতুর্দিকে বিদ্যমান এ বিরাট বিশাল বিশ্বভুবন, মানুষ যার একটি অংশ, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল নয়। ইহা এক শৃংখলাপূর্ণ সুসংঘবদ্ধ ও নিয়মতন্ত্র সম্মত সাম্রাজ্য বিশেষ।

আল্লাহ তায়ালাই ইহা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এর মালিক। সমগ্র বিশ্বজগত একটি সার্বিক ব্যবস্থার অধীনে। এখানকার সমগ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র কেন্দ্রীয় শক্তির হস্তে নিবদ্ধ। সেই উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা ভিন্ন এই প্রাকৃতিক জগতে অন্য কারো বিধান চলে না। বিশ্ব ব্যবস্থার যত শক্তিই কর্মনিরত হয়ে আছে, তা সবই এক কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধীনে এবং অনুগত। তার বিধান ও নির্দেশের বিরোধিতা করা কিংবা তার অনুমতি ব্যতীত নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা কারো নাই। এ সঠিক ব্যবস্থায় কোনরূপ স্বাধীনতার ও দায়িত্বহীনতার আদৌ অবকাশ নাই।

মানুষের এ জগতে জন্মগত প্রজা হওয়া তার ইচ্ছাসাপেক্ষ নয় বরং প্রজা হিসাবেই তার জন্ম হয়েছে। আর প্রজা ভিন্ন অন্য কিছু হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। অতএব নিজের জন্য জীবন ব্যবস্থা রচনা করা এবং নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করার কোন অধিকারই তার নাই।

মানুষ নিজে বিশ্বভুবনের কোন কিছুরই মালিক নয়। কাজেই মালিকানা ব্যবহারের পদ্ধতি তার রচনা করার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। অনুরূপভাবে মানুষের চতুষ্পার্শ্বে দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে যেসব দ্রব্যসামগ্রী বর্তমান রয়েছে, জমি, জন্তু, পানি, উদ্ভিদ, গাছ-পালা, গুল্মলতা, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার মালিকানা। মানুষ এর মালিক নয়। কাজেই সে সবের উপর নিজের ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার মানুষের নেই। বরং প্রকৃত মালিক এসব ব্যবহার করার জন্য যে নিয়ম বিধান রচনা করে দিয়েছেন, তদনুযায়ী ইহা ব্যয় ব্যবহার করা মানুষের কর্তব্য।

কিন্তু আল্লাহর সেই বিধান কি? পয়গম্বরগণ বলেন, যে জ্ঞান হতে আমরা দুনিয়ার অবয়ব এবং মানুষের নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পেরেছি, সেই সূত্র হতে আমরা আল্লাহর বিধানও পেয়েছি। আল্লাহ নিজেই আমাদের এ জ্ঞান দান করেছেন এবং দুনিয়ার সমগ্র মানুষকেও এ দিক দিয়ে পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ও অবহিত করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছেন।

পয়গম্বরগণ আরো বলেন, আপাত দৃষ্টিতে নিখিল বিশ্ব প্রকৃতির সমগ্র কাজ সুষ্ঠু, সুসংবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতে দেখা যায় বটে। কিন্তু কোথাও কোন পরিচালক পরিদৃষ্ট হয় না, তার কর্মচারী কোনখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলে মানুষ এখানে এক প্রকারের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের অবকাশ অনুভব করে, মানুষ এখানে মালিকের ন্যায় আচরণ করতে পারে। প্রকৃত মালিক ভিন্ন অপরের সম্মুখে দাসত্ব ও আনুগত্যের অনুভূতিতে মাথাও নত করতে পারে। আর সকল অবস্থায়ই তার জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অব্যাহতভাবে লাভ করতে সক্ষম হয়। সকল প্রকার কাজের সুবিধা লাভ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহিতার প্রতিফল সংগে সংগে পায় না। মূলত ইহা সব মানুষের পরীক্ষার জন্য করা হয়েছে। মানুষকে যেহেতু জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেক, উদ্ভাবন ও নির্বাচন শক্তি দান করা হয়েছে; এ কারণেই প্রকৃত মালিক, (রাজাধিরাজ) নিজেকে এবং নিজের অদৃশ্য রাষ্ট্রব্যবস্থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রেখেছেন। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত এ শক্তিসমূহের বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যবহার কিভাবে করে তার পরীক্ষা ও বাছাই করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি, নির্বাচন স্বাধীনতা এবং এক প্রকারের স্বরাজ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন মানুষ যদি তার জন্মগত প্রজা হওয়ার কথা হৃদয়ংগম করে এবং সাগ্রহে ও স্বেচ্ছায় এ মর্যাদাকেই গ্রহণ করে, তবেই মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তার এ পরীক্ষায় সফলকাম হতে পারবে।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে প্রজা হওয়ার মর্যাদা যদি মানুষ বুঝতে না পারে কিংবা বুঝতে পেরেও বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করে, তবে পরীক্ষায় তার ব্যর্থতা অনিবার্য। অথচ এ পরীক্ষার জন্যই মানুষকে দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। দুনিয়ার অসংখ্য জিনিসই মানুষের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে একটি জীবনব্যাপী সময় তাকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

পয়গম্বরগণ ইহাও বলেছেন যে, পার্থিব জীবন যেহেতু একটানা ও নিরবচ্ছিন্ন একটি পরীক্ষার মুহূর্ত, কাজেই কাজকর্মের প্রকৃত হিসাব এই দুনিয়ায় হবে না, কোন প্রতিফল শাস্তি বা সম্মানও এখানে লাভ হবে না।

মানুষ এ দুনিয়াতে যা কিছু জ্ঞান লাভ করে তা যে কোন পুণ্যের প্রতিফলই হবে এমন কোন কথা নাই। তা মানুষের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার প্রমাণও নয়। মূলত তা পরীক্ষার সরঞ্জাম বিশেষ। ধন-সম্পদ, সন্তান, প্রজননশক্তি, রাষ্ট্র সরকার, জীবনযাপনের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সবকিছুই শুধু পরীক্ষার জন্য মানুষকে দান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ এই সব প্রয়োগ ও ব্যবহার করে নিজেদের ভাল কিংবা মন্দ কর্মক্ষমতার বাস্তব প্রমাণ পেশ করবে। অনুরূপভাবে দুঃখ-কষ্টে, ক্ষতি আঘাতে, মানুষের বর্তমান জীবনে যা কিছু সংঘটিত হয় তাও কোন পাপ কাজের শাস্তি নয়। তাদের কতকগুলি নিছক পরীক্ষা স্বরূপ। আর কতগুলি হয় প্রকৃত অবস্থার বিপরীত মত নির্ধারণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনিবার্যরূপে। সেই জন্য প্রকৃত, নির্ভুল ও একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে পারলৌকিক ফলাফল। পৃথিবীর এই অবকাশের মুহূর্তে, এই পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার পর আর একটি জীবন রয়েছে। তখন পার্থিব জীবনের প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে যাচাই করা হবে আর এই পরীক্ষায় কে সাফল্য লাভ করল, কে ব্যর্থকাম হল, তার চূড়ান্ত ফায়সালা তখনি করা হবে। পারলৌকিক জীবনের সাফল্য অসাফল্য কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। প্রথম এই যে, মানুষ নিজের দৃষ্টি ও যুক্তিবিন্যাস প্রতিভার নির্ভুল প্রয়োগের সাহায্যে আল্লাহ তায়ালাকে প্রকৃত ও একমাত্র ব্যবস্থাপক, আইন রচয়িতা এবং তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জীবন বিধানকে যথার্থ আল্লাহর বিধান বলে জানতে পারল কিনা। দ্বিতীয় এই যে, এই নিগূঢ় সত্য জেনে নেয়ার পর পথ নির্বাচনের অধীনতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রসহকারে আল্লাহ তায়ালার বাস্তব প্রভুত্ব এবং তার শরীয়তী বিধানের সম্মুখে মাথা নত করল কিনা।

ইসলাম

মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে নবীদের উপস্থাপিত এই মতাদর্শ একটি পরিপূর্ণ মতবাদ। তার সমগ্র দিক ও বিভাগ পরস্পর জড়িত, পরস্পরের মধ্যে যুক্তিসংগত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এর একটি অংশ অপরটির বিপরীত বা বিরোধী নয়। এর ভিত্তিতে বিশ্বের সকল প্রকার ঘটনাবলীর পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং বিশ্বপ্রকৃতির নিদর্শনসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দান অত্যন্ত সহজ। এই শর্তের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় না এমন কোন জিনিস কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। অতএব ইহা একটি বৈজ্ঞানিক মত এবং এর যে সংজ্ঞাই দেওয়া হোক না কেন, এই মত সম্পর্কে তা নিঃসন্দেহে প্রযোজ্য হবে।

পরন্তু কোন গবেষণা, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ বা বাস্তব অভিজ্ঞতাই এই মতকে আজ পর্যন্ত 'ভ্রান্ত' প্রমাণ করতে পারে নাই। প্রমাণিত ভ্রান্ত মতবাদসমূহের মধ্যে একে কোন মতেরই গণ্য করা যায় না। এর ভিত্তিতে জাহেলিয়াতের জীবনদর্শন থেকে মূলগতভাবে পৃথক একটি স্বতন্ত্র জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। এ জীবনদর্শন বিশ্বজাহান ও মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিপুল তথ্যাবলী জাহেলিয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে সংকলন ও পরিবেশন করে। জীবনের সমস্ত ব্যাপারে সে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগী এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে- প্রাণশক্তি ও মৌলিকতার দিক দিয়ে জাহেলী উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভংগীর সংগে তার কোন সামঞ্জস্য নেই। সে একটি পৃথক নৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে জাহেলী নৈতিকতার সংগে তার কোন সম্পর্ক নেই। আবার ঐ তাত্ত্বিক ও নৈতিক বুনিয়াদের উপর যে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মিত হয় তা হয় সমস্ত জাহেলী সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য একটি পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এ শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ জাহেলিয়াতের শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতিসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। যার ফল হল এই যে, এই সভ্যতার শিরা-উপশিরায় যে প্রাণশক্তি সক্রিয় তা এক সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন খোদার কর্তৃত্ব, আখেরাত বিশ্বাস এবং মানুষের অধীনতা ও দায়িত্বশীলতার কথা ঘোষণা করে বিশ্ব প্রকৃতির যে নিয়ম আমরা দেখতে পেয়েছি সেই দিক দিয়েও এই মত খুবই সত্য বলে মনে হয়। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিরাট ও ব্যাপক নিয়ম-শৃংখলা এবং তার সুসংঘবদ্ধতা দেখিয়ে স্বতই মনে হয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই মনে হবে যে, নিশ্চয়ই এর কোন ব্যবস্থাপক রয়েছেন। এরূপ মনে না করার মূলে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে এই সুসংবদ্ধ নিয়ম-শৃংখলা একে একটি কেন্দ্রভিত্তিক ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

একজন স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধিকারী পরিচালক থাকার জন্য বিশ্বাস করাই বুদ্ধিসম্মত মান হয়। একে বিকেন্দ্রীক মনে করা এবং এর অসংখ্য পরিচালকের অধীনে চলার কথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশ্ব প্রকৃতির এই বিস্ময়কর ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, যৌক্তিকতা এবং নির্ভুল বুদ্ধির যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তদদৃষ্টে ইহাকে একটি সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থা মনে করাই অধিকতর যুক্তিসংগত। ইহাকে উদ্দেশ্যহীন এবং শিশুর খেলনা মনে করার মূলে কোনই যুক্তি থাকতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত এই বিশ্ব প্রকৃতির ব্যবস্থাকে আমরা যদি একটি বাস্তব রাজ্য এবং মানুষকে এই বিরাট সুসংঘবদ্ধ ব্যবস্থার একটি অংশ বলে মনে করি, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে, এই নিয়ম-শৃংখলাপূর্ণ ব্যবস্থার অধীন মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার ও স্বাধীনতার কোনই অবকাশ থাকতে পারে না। এই পৃথিবীতে প্রজা হওয়াই মানুষের সঠিক মর্যাদা। এইদিক দিয়েও উল্লিখিত মতটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। বাস্তব কার্যকারিতা সম্পর্কে বিচার করলেও ইহা একটি বাস্তব কর্মোপযোগী মত বলেই প্রতিপন্ন হয়। এই মতের ভিত্তিতে মানবজীবনের একটি পূর্ণাংগ ও ব্যাপক কর্মসূচি তার খুঁটিনাটিসহ খুব সহজেই রচিত হতে পারে। দর্শন, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য ও শিল্প, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, যুদ্ধ-সন্ধি, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এক কথায় জীবনের সকল দিক বিভাগ এবং সকল প্রয়োজন ও সমস্যার জন্য একটি গণতন্ত্রও স্থায়ী ব্যবস্থা এরই ভিত্তিতে লাভ করা সম্ভব। ফলে মানব জীবনের কোন বিভাগই কর্মনীতি নির্ধারণের জন্য এই মতাদর্শের বাইরে যাওয়ার কোনদিনই প্রয়োজন দেখা দিবে না।

এই মতাদর্শের ভিত্তিতে মানুষের এই পার্থিব জীবন কিরূপে গঠিত হয় এবং তার ফলাফলই বা কিরূপ এখন তাই আমাদের বিচার্য। এই মতবাদ ব্যক্তিগত জীবনকে অন্যান্য জাহেলী মতবাদ সমূহের সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন এবং খুবই সুসংঘবদ্ধ ও শৃংখলাপূর্ণ করে তোলে। এই মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ এই যে, মানুষ তার দেহ তার যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর কোন একটি বস্তুকেও নিজের মালিকানা সম্পদ মনে করে তার সাথে স্বাধীনভাবে আচরণ করবে না বরং আল্লাহর মালিকানা মনে করে তাঁরই আইন ও বিধানের ভিত্তিতে তার ব্যবহার করবে। তার লব্ধ প্রত্যেকটি জিনিসকেই আল্লাহর আমানত মনে করবে এবং এই আমানতের হিসাব তাঁর নিকট দিতে হবে যার নিকট কোন কাজ, মনের কোন গোপন ইচ্ছাও অজ্ঞাত নয় এবং এই কথা মনে করেই তাকে ব্যবহারে আনবে। এরূপ সচেতন মানুষ যে সকল সময় এবং সকল অবস্থায়ই একটি আদর্শের নিষ্ঠাবান অনুসারী হবে তাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ ব্যক্তি কখনই বল্গাহারা ও প্রবৃত্তির দাস হতে পারে না। অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। এমন ব্যক্তির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা সম্ভব। শৃংখলা রক্ষা ও নিয়মতন্ত্র অনুসরণের ব্যাপারে কোন বাহ্যিক চাপের প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করবে না। সেই জন্য একটি বিরাট শক্তিসম্পন্ন নৈতিক বাঁধন ও সংযম অনুভূতি জেগে উঠে। ফলে যেসব অবস্থায় কোন পার্থিব শক্তির নিকট জবাবদিহি করার কোনই আতংক থাকে না, তখনও এই শক্তি তাকে সততা, ন্যায় ও সত্যের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। বস্তুত সমাজের লোকদের সর্বাধিক বিশ্বাসভাজন করে তুলবার জন্য আল্লাহর ভয় ও আমানতদারীর অনুভূতি অপেক্ষা উত্তম ও কার্যকরী উপায় অন্য কিছু হতে পারে না। অধিকন্তু এই মত মানুষকে কেবল সংগ্রামী ও অবিশ্রান্ত চেষ্টানুবর্তী করে তোলে না, এর যাবতীয় চেষ্টা সাধনাকে স্বার্থপরতা আত্মপূজা অথবা জাতিপূজার পংকিলতা হতে পবিত্র করে সততা ও সত্যবাদিতা এবং উচ্চতর নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য পথে নিয়ন্ত্রিত করে। যে ব্যক্তি মনে করে যে, এই দুনিয়ায় তার আগমন উদ্দেশ্যহীন নয়, কোন বিরাট কাজ সম্পাদনের জন্যই তাকে প্রেরণ করা হয়েছে, তার জীবন কেবল নিজের জন্যই কিংবা তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের জন্যই নয় বরং তার জীবন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তোষমূলক কাজে একান্তভাবে নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তাকে বিনা হিসাবে রেহাই দেওয়া হবে না, তার সময় ও ক্ষমতার কতখানি কোন কাজে ব্যয় করা হয়েছে তার হিসাব নেয়া হবে। এই কথা যার মনে সতত জাগ্রত থাকবে, তার তুলনায় অধিক পরিশ্রমী ফলপ্রসূ সুষ্ঠ ও নির্ভুল চেষ্টানুবর্তী ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। কাজেই এই মতাদর্শ যতদূর উত্তম ও আদর্শ ব্যক্তি গঠন করে, তদপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি চরিত্রের ধারণা করা যায় না।

সামগ্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এর পরীক্ষা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সর্বপ্রথম কথা এই যে, এই মতাদর্শ মানব সমাজের ভিত্তিমূলকেই সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দেয়। এই মত অনুযায়ী সমগ্র মানুষ আল্লাহর প্রজা এবং এই দুনিয়ার ক্ষেত্রে সকলের মর্যাদা, সকলের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধালাভের সম্ভাবনা সকলের পক্ষেই সমান। কোন ব্যক্তি কোন পরিবার কোন শ্রেণী, কোন জাতি, কোন বংশের জন্য অন্যান্য মানুষের উপর কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য নাই, নাই কোন বৈষম্যমূলক

www.pathagar.com

অধিকার। এইভাবে মানুষের প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মূলোচ্ছেদ করা হয়। এবং রাজতন্ত্র, জায়গীরদারী, সামন্তবাদ, অভিজাততন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পোপতন্ত্র প্রভৃতি জাহেলী মতাদর্শ হতে যেসব মারাত্মক দোষত্রুটি ও ব্যাধি সৃষ্টি হয়, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করলে তারা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ইহা বংশীয়, গোত্রীয়, ভৌগোলিক, আঞ্চলিক এবং বর্ণভিত্তিক বৈষম্য বিদ্বেষের মূলোৎপাটন করে। কারণ এই সব মারাত্মক ব্যাধিই মানব সমাজে আবহমানকাল যাবত রক্তপাত ও যুদ্ধ সংগ্রামের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ইসলামী মতাদর্শের দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, সমগ্র মানুষ এক আদর্শের সন্তান এবং আল্লাহর বান্দাহ। এ সমাজে গোত্র, ধন-সম্পত্তি কিংবা বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বৈষম্য করা হয় না। নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা এবং আল্লাহর ভয় থাকা না থাকার ভিত্তিতে এই পার্থক্য হতে পারে। আল্লাহভীতি যার মধ্যে সর্বাধিক, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, সত্যের জন্য সংগ্রামশীলতার দিক দিয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবেন। ইসলামী সমাজে কেবল তারই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হবে।

এইরূপে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধ কিংবা পার্থক্য বৈষম্যের ভিত্তিতে এই দৃষ্টিভংগীর মধ্যে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। সমাজক্ষেত্রে মিলন বিচ্ছেদের যে মান বা কারণ মানুষ নিজেরা আবিষ্কার করেছে তা বিশ্ব মানবতাকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করে, এই খণ্ডসমূহের মধ্যে দুর্লজ্ঘ প্রাচীরও খাড়া করে নেয়। যেহেতু বংশ, স্বদেশ, জাতীয়তা কিংবা বর্ণ প্রকৃতির পরিবর্তন করা মানুষের সাধ্যাতীত। এদের মধ্যে একটির অন্তর্ভুক্ত মানুষ কোনক্রমেই অন্যটির মধ্যে গণ্য হতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইসলামী মতাদর্শে মানুষের মধ্যে মিলন বিচ্ছেদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার এবং তাঁর বিধান পালনের উপর। কাজেই সৃষ্টির দাসত্ব পরিত্যাগ করে যারা স্রষ্টার বন্দেগী শুরু করবে এবং তাঁর রচিত আইনই একমাত্র আইন হিসাবে গ্রহণ করবে। তারা সকলেই একটি জামায়াতের মধ্যে গণ্য হবে। আর যারা এরূপ করবে না তারা ভিন্ন দলভুক্ত হবে। এইভাবে মানব সমাজের সকল প্রকার পার্থক্য বৈষম্য বিলুপ্ত হয়ে একটি মাত্র পার্থক্যই থেকে যায়। আর এই পার্থক্য সকলেই লজ্ঘন করতে পারে। কারণ আকীদা বিশ্বাস ও জীবনযাপনের রীতিনীতি পরিবর্তন করে একটি দল হতে অপর দলের মধ্যে শামিল হওয়া প্রত্যেকের পক্ষেই সহজ।

এসব সংশোধন সংস্কারের পর মতাদর্শের ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে উঠে, তার মনোবৃত্তি মানসিকতা ভাবধারা ও সমাজের গঠন অবয়ব আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর রাষ্ট্র মানব প্রভুত্বের ভিত্তিতে নয় আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্বের বুনিয়াদেই স্থাপিত হয়। এখানে প্রকৃতভাবে আল্লাহরই শাসন কায়েম হয়, আল্লাহরই আইন জারি এবং কার্যকরী হয়। মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করতে থাকে। এর ফলে প্রথমত মানুষের হুকুমাত এবং মানুষের আইন রচনার অধিকারজনিত সমস্ত দোষত্রুটি নিমিষেই দূর হয়। দ্বিতীয়ত এই মতাদর্শের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার ফলে আর একটি বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তা এই যে, রাষ্ট্রের সমগ্র ব্যবস্থাই ইবাদত ও তাকওয়ার পূত ভাবধারায় পুতপবিত্র হয়। রাষ্ট্রনেতা ও জনগণ সকলেই সমানভাবে অনুভব করতে থাকে যে, তারা আল্লাহর হুকুমাতের অধীন জীবনযাপন করছে। এবং গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবহিত আল্লাহর সংগেই তাদের প্রত্যেকটি ব্যাপার প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। করদাতা আল্লাহরই কর দিচ্ছে মনে করে তা আদায় করে এবং তার গ্রহণকারী ও খরচকারী উভয়েই নিজেদেরকে তার আমানতদার মাত্র মনে করে। একজন সিপাহী হতে বিচারপতি ও গভর্নর পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মচারীই ঠিক সেই মানসিকতার সাথে কর্তব্য করে যেরূপ মনোভাব নিয়ে তারা সালাত আদায় করে। তাদের পক্ষে একই প্রকার আল্লাহভীরুতা এবং সেই জন্য শংকাপূর্ণ মনোভাবের প্রয়োজন। গণপ্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে সন্ধান করা হয় আল্লাহর ভয়, আমানতদারী, বিশ্বাসপরায়ণতা, সততা ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী। এর পরিণামে সমাজের সর্বাধিক উন্নত ও উত্তম নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিগণই নেতৃত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হন। রাষ্ট্রক্ষমতা তাদেরই হাতে অর্পণ করা হয়।

সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই মতাদর্শ আল্লাহভীরুতা নৈতিক পবিত্রতার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবধারা প্রবাহিত করে। আত্মপূজার পরিবর্তে আল্লাহানুগত্যের প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে এক আল্লাহর সম্পর্কই মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহর আইনই পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত, সুসংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল করে। এই আইন যেহেতু সেই মহান সত্তাই রচনা করেছেন যিনি সকল প্রকার স্বার্থপরতা ও নফসের খাহেশাতের পংকিলতা হতে পবিত্র; সর্বজ্ঞ, পরম বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিমান, তাই তার

www.pathagar.com

রচিত আইনে অশান্তি ও উচ্ছৃংখলতা, জুলুম পীড়ন ও ভাঙন বিপর্যয়মূলক কোন ব্যবস্থাই বিন্দুমাত্র স্থান পায় নাই। উপরন্তু মানব প্রকৃতির সকল দিক এবং মানুষের সকল জৈবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইহা রচিত হয়েছে।

বিশ্ব ইতিহাসের এক অধ্যায়ে এই মতাদর্শের তত্ত্বে একটি সমাজ একটি সমষ্টিগত জীবন, একটি উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে বিশ্ব মানবের সম্মুখে তার বাস্তবতার স্পষ্ট নিদর্শন স্থাপন করা হয়েছে। আর ইতিহাসও এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, এই আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তিদের তুলনায় উত্তম লোক মানব সমাজে আর কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই এবং এর ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্র অপেক্ষা কোন রাষ্ট্রই আজ পর্যন্ত নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের পক্ষে কল্যাণকর প্রমাণিত হয় নাই। এই রাষ্ট্রের প্রজা সাধারণের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল। প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাতে পারে। এক বেদুইন নারী ব্যভিচারের দরুন অন্তসত্তা হয়েছিল। ইসলামী শরীয়াতে এই পাপের দণ্ড যে সংগেসার (প্রস্তর খণ্ডের আঘাত দ্বারা মৃত্যুদণ্ডাদেশ) এর ন্যায় ভয়াবহ তা সে ভাল করেই জানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজেই হযরত (সাঃ) এর দরবারে হাজির হয় এবং অপরাধের দণ্ড দানের জন্য অনুরোধ করে। তাকে সন্তান প্রসবের পরে আসার জন্য বলে দেওয়া হয়। এবং কোন মুচলেকা বা জামানত ব্যতীতই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে সন্তান প্রসবের পর সে পুনরায় উপস্থিত হয় এবং উপযুক্ত দণ্ডাদেশের জন্য দাবি জানায়। কিন্তু এবারেও তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং সন্তানকে স্তন্যদান ও লালন পালন করার পর পুনরায় আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে আবার সে মরুভূমির দিকে প্রত্যাবর্তন করে কিন্তু কোন পুলিশ পাহারার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। স্তন্য দানের নির্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ার পর আবার ফিরে আসে এবং কৃত অপরাধের দণ্ডদানে তাকে পবিত্র করে দেওয়ার প্রার্থনা জানায়। অতঃপর তাকে সংগেসার' পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এইভাবে যখন তার মৃত্যু ঘটে তখন তার জন্য আল্লাহর নিকট রহমতের দোয়া করা হয়। এই সময় সহসা এক ব্যক্তি বলে উঠে, মেয়েলোকটি বড় নির্লজ্জ ছিল। তখন উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ এই নারী যেভাবে তাওবা করেছে অনুরূপ তাওবা যদি সকল দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিই করত, তবে তাদেরকেও ক্ষমা করা হত।

বস্তুত ইসলামী সমাজে নাগরিকদের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য। আর রাষ্ট্র ও সরকারের বৈশিষ্ট্য ছিল আরও বিরাট। কোটি কোটি টাকার আয়সম্পন্ন এবং ইরান, সিরিয়া ও মিসরের ন্যায় বিপুল ধন ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ রাজ্যের বায়তুলমালের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার রাষ্ট্রপ্রধান মাসিক বেতনস্বরূপ মাত্র দেড়শত টাকা গ্রহণ করতেন। আর নাগরিকদের মধ্যে ভিক্ষা গ্রহণের যোগ্য একজন লোক খুঁজেও পাওয়া যেত না।

আল্লাহর বিধান পরীক্ষার মাপকাঠি

কোনটি আল্লাহর বিধান আর কোনটি নয়- তা পরিমাপ করার চারটি মাপকাঠি হচ্ছে–

১. মানুষের চিন্তাধারার প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে জ্ঞানের ভ্রান্ত ও সসীমতা অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তমান পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহর ব্যবস্থায় সীমাহীন জ্ঞান এবং সঠিক ও নির্ভুল তত্ত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত যে ব্যবস্থা আল্লাহর তরফ হতে হবে তার কোন কথাই কোন কালের বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হবে না। কিংবা সেই সম্পর্কে কোন দিনই এ কথা বলা যাবে না যে, 'ব্যবস্থাদাতা' ব্যাপারটির সকল দিক যথাযথভাবে বিচার করে দেখেন নাই।

২. দ্বিতীয় দুর্বলতা হচ্ছে দৃষ্টিভংগীর সসীমতা ও সংকীর্ণতা। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থায় চিন্তা ও দৃষ্টি ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে।

৩. তৃতীয় বিশেষত্ব, তাতে বিজ্ঞান ও বুদ্ধি মানুষের আবেগ, উচ্ছ্বাস ও বাসনা লালসার সাথে কোথাও না কোথাও সন্ধি বা ষড়যন্ত্র করছে বলে পরিষ্কার মনে হবে। আল্লাহর ব্যবস্থা ইহা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাতে স্বচ্ছ জ্ঞান বুদ্ধি এবং অনাবিল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় উজ্জ্বল রূপে দেখতে পাওয়া যায়। তার আদেশ নির্দেশে কোথাও আবেগ উচ্ছ্বাস ও একদেশদর্শিতার আবিলতা মোটেই পরিলক্ষিত হবে না।

www.pathagar.com

৪. চতুর্থ দুর্বলতা, যে জীবনব্যবস্থা সে নিজে রচনা করবে তাতে পক্ষপাতিত্ব, মানুষে মানুষে অবাঞ্ছনীয় বৈষম্য এবং অবৈজ্ঞানিক বুনিয়াদ একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের ভাবধারা অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তমান পাওয়া যাবে। কারণ প্রত্যেকটি মানুষেরই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কোন কোন মানুষের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ভাবাবেগের দুর্বলতা থাকেই এবং তার ফলেই মানুষ একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থা রচনা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থা এসব কলুষতা হতে সর্বতোভাবে মুক্ত ও পবিত্র।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য

দুনিয়ায় যত রকম ধর্ম রয়েছে তার প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে। অথবা যে জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন ঈসায়ী ধর্মের নাম রাখা হয়েছে তার প্রচারক হযরত ঈসা (আঃ) এর নামে। বৌদ্ধ ধর্মমতের নাম রাখা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বৌদ্ধের নামে। জরদশ্‌তি ধর্মের নামও হয়েছে তেমনি তার প্রতিষ্ঠাতা জরদশ্‌তের নামে। আবার ইয়াহুদী ধর্ম জন্ম নিয়েছিল ইয়াহুদ নামে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে। দুনিয়ায় আরো যেসব ধর্ম রয়েছে, তাদেরও নামকরণ হয়েছে এমনিভাবে। অবশ্যি নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা জাতির সাথে তার নামের সংযোগ নেই। বরং ইসলাম শব্দটির অর্থের মধ্যে আমরা একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাই, সেই গুণই প্রকাশ পাচ্ছে এ নামে। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন এক ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, কোন এক জাতির মধ্যে এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোন বিশেষ ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির সম্পত্তি নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইসলামের সৃষ্টি করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কওমের যেসব খাঁটি ও সৎলোকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া গেছে, তাঁরা ছিলেন মুসলিম। এ ধরনের লোক আজো রয়েছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা
২. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন
৩. ইসলাম পরিচিতি

সংকলনে– হামিদা আক্তার কাজলী

www.pathagar.com

মুক্তির সোনালী পতাকা

শাহিমা খানম হেপী

ওঠো, জাগো সতর্ক করো
ওগো মুসলমান
ফেরাউনেরা আজ উঠেছে জেগে
পাহাড়, পর্বত আর সমুদ্রের নীলাচল
ওদের বিষশ্বাসে অত্যুক্ত
অভয়ারণ্য বলে কিছু নেই কোথাও আজ।
লাখো মজলুমানের রক্তের ফোয়ারায়
কি অবাক স্বাচ্ছন্দে ওরা গা ভাষায়
পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি দখলের সুদূর ষড়যন্ত্রে
ওরা রুজী করে রেখেছে মুক্ত বিহঙ্গগুলোকে
ছটফট করতে করতে যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে
একদা নীলাকাশে ডানা মেলা সফেদ পায়রা শাবক।
তোমার শাহাদত অঙ্গুলি আজ
শক্ত করে বাঁধা সোনার শিকলে
মিথ্যার সুব্যাসন তোমাকে রাঙাচ্ছে অহেতুক
অথচ তুমি! কি নির্বিকার
যোজন যোজন ক্রোশ পরাজয়ের গ্লানি নিয়েও
কি নিদারুণ ঘুমের জগতে তুমি।
আর তো সময় নেই বসে থাকবার
এবার ঘুরে দাঁড়াও, ওগো যুগের রাহবার
চিরন্তন মুক্তিকে স্বাগত জানাতে
খুলে ফেলো আবদ্ধ খঞ্জর
মুক্ত বিহঙ্গের ডানায় ভর দিয়ে
ছেদ কর ঘুমন্ত আকাশ।
প্রভুর প্রশান্ত জমিনে
যারা ছড়াচ্ছে বিষাক্ত আগুন
প্রকাশ্য রাজপথে যারা
হত্যা, গুম আর লুণ্ঠন করে বেড়ায়
যাদের দুঃসাহস আজ আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে
আরও বহুদূর যেতে উদ্যত
ওদের লৌহচক্ষু উপেক্ষা করে
শক্তভাবে প্রস্তুত হও।
দেখবে মুক্তির স্বর্ণালী পতাকা
তোমারই হাতে উড়বে
কারণ প্রভুর স্নেহাসিক্ত জমিনে
উত্তাপ সৃষ্টিকারী নমরুদেরা
বরাবরই কাপুরুষ
ইতিহাসের পাতা খুললেই
মিলবে এর প্রমাণ।

www.pathagar.com

বিশেষ নিবন্ধ

পলে পলে মোর প্রিয় পরমায়ু হয়ে এল নিঃশেষ
শেষে দেখিতে দেখিতে এসেছে ঘনায়ে অন্তিম নিমেষ।
স্বপনের মত কত সাল মাস হেলায় হারায় তনু,
ক্ষণকাল পরে সহসা অচিরে বাজিবে মরন বেনু
ধিক! এ জীবন বৃথায় ক্ষেপিনু না করিনু ভাল কাজ
সম্মুখে মোর দীর্ঘ সফর পাথেয় কোথায় আজ?

www.pathagar.com

নতুন জাহিলিয়াতের অবসানে প্রয়োজন মহানবীর (সা) পদাংক অনুসরণ

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

একে একে উল্টাতে থাকুন মানব ইতিহাসের পাতাগুলো। নিবদ্ধ করুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নিয়োজিত করুন গভীর অভিনিবেশ। অস্পষ্টতার আড়াল থেকে উঁকি দেবে স্বচ্ছতার রূপালী রেখা। রূপালী পর্দায় ভেসে ওঠবে অনেক কথা। পড়ে নিন ইতিহাস। জেনে নিন সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির তত্ত্ব কথা। আলো আর আঁধারের টাগ-অব-ওয়ার। প্রথম মানুষ ও প্রথম নবীর যুগেই এর সূচনা। এর পর নদীর স্রোতের মতো গড়িয়ে এগিয়ে গেছে কালস্রোত। স্রোত ধারা থেমে যায়নি। এখনো ঘটেনি সেই টাগ-অব-ওয়ারের পরিসমাপ্তি।

আলোকিত মানুষ, পরিশীলিত সমাজ ও উন্নত সভ্যতা বিনির্মাণের অংগীকার নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নবী-রাসূলগণ। পক্ষান্তরে, বিভ্রান্ত মানুষ, কলুষিত সমাজ ও অধঃপতিত সভ্যতা গড়ার সংকল্প নিয়ে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিলো হিংসা-পরায়ণ ইবলীস ও তার অনুসারীরা।

ইতিহাস বলে, মানুষ যখন সাড়া দিয়েছে নবী-রাসূলদের আহ্বানে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে পবিত্রতা-অনাবিলতার আবহ, মুছে গেছে মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টিকারী ভেদ-রেখা, সমাজ ও সভ্যতায় নারী পেয়েছে মর্যাদার আসন, বিদূরিত হয়েছে রাজনৈতিক জুলুম, নিশ্চিত হয়েছে অর্থ-সম্পদের অভিপ্রেত আবর্তন ও সুষম বন্টন, বিকশিত হয়েছে সু-সংস্কৃতি, সর্বত্র প্রবাহিত হয়েছে মুক্তির সুবাতাস, মুক্তি-প্রাপ্ত মানবতা পুলকিত হয়েছে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জোয়ারে অবগাহন করে।

ইতিহাস আরো বলেন, ইবলীসের প্ররোচনায় প্রতারিত মানুষ যখন তার পথে পথ চলা শুরু করেছে তখন সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে অপবিত্রতার দুর্গন্ধ, সৃষ্টি হয়েছে মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান, নারী পরিণত হয়েছে লুটের ও ভোগের সামগ্রীতে, রাজনৈতিক জুলুমের স্টীমরোলার চালানো হয়েছে মানুষের ওপর, অগণিত মানুষের কাছ থেকে ছেঁকে নিয়ে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়েছে মানবরূপী একদল শকুন, অপ-সংস্কৃতির বিষবাষ্পে পীড়িত হয়ে পড়েছে মানুষ, নানাবিধ বন্ধনের অকটোপাস ভেংগে দিয়েছে মানুষের পাঁজর এবং দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনটন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ভয়-ভীতি মানুষকে নিক্ষেপ করেছে এক অসহনীয় শ্বাসরুদ্ধকর ভয়াবহ পরিস্থিতির ঘূর্ণাবর্তে।

বেশি দূরের নয়, মাত্র সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগেকার ইতিহাসটা এবার খুলে ধরুন।

জাহিলিয়াতের উন্মত্ত দানব পিষে মারছিলো দুনিয়ার মানুষকে। তার উগ্রতা, হিংস্রতা ভীষণভাবে আতংকিত করে তুলেছিলো মানুষকে। বিজয় কেতন উঁচুতে ধরে ইবলীস ও তার অনুসারীরা নৃত্য করছিলো মহানন্দে। কী করুণ দশাই না তখন মানবতার!

একসময় আঁধার রাতের সমাপ্তিলগ্নে প্রভাতের বিচ্ছুরিত আলোর মতো আলকুরআনের আলো ছড়িয়ে দিলেন এক মহামানব, মুক্তি পাগল মানুষের মুক্তির দিশারী মহানবী মুহাম্মদ (সা)।

www.pathagar.com

মহানবী (সা) শুনালেন, মানুষ শুধু মানুষই নয়, মানুষ বিশ্বজাহানের মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতিনিধি। কী অনুপম উচ্চারণ! সেই উচ্চারণ প্রতিধ্বনিত হলো বিবেকবান প্রতিটি মানুষের অন্তরে। তারা এতোকাল ছিলো দিশাহারা, হতোদ্যম। এবার তারা কেশর নেড়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠা সিংহের মতো জেগে ওঠলো মহা উদ্দীপনা নিয়ে।

মানুষের এই জাগরণে বিচলিত হয়ে পড়ে ইবলীস ও তার অনুসারীরা। তারা শুরু করে প্রতিক্রিয়া। লোভ-প্রলোভন, অপবাদ-অপপ্রচার ও নির্যাতন-নিপীড়ন- সব হাতিয়ারই তারা প্রয়োগ করলো সত্যের পথের অকুতোভয় সৈনিকদের বিরুদ্ধে। কোনই লাভ হলো না। আল্লাহর পথের পথিক যারা তারা তো পরাভব মানতে পারে না। মহানবীর (সা) সান্নিধ্যে থেকে গড়ে ওঠেন একদল ইস্পাত-কঠিন মানুষ। এদেরকে টাকা দিয়ে কেনা যেতো না, নারী লোভ দেখিয়ে আদর্শচ্যুত করা যেতো না, পদ লোভ দেখিয়ে দলচ্যুত করা যেতো না, নিপীড়ন চালিয়ে দাওয়াত ইলাল্লাহর কর্তব্য পালন থেকে নিবৃত্ত করা যেতো না।

আল্লাহ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিলো সুস্পষ্ট। তদুপরি জাহান্নামের ভয়াবহতা ও জান্নাতের নিয়ামাত সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী। আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করে জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে জান্নাতে একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্য তাঁরা ছিলেন লালায়িত। তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে প্রতিনিধিত্বের সুমহান কর্তব্য পালন করেই আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা সম্ভব। আর আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্যই নিবেদিত ছিলো তাঁদের সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ। আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য তাঁরা সব কিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত ছিলেন, এমনকি নিজের জীবনটাও।

মহানবীর (সা) নেতৃত্বে অনাবিল চরিত্রের অধিকারী আল্লাহ প্রেমিক সংঘবদ্ধ এই সংগ্রামী মানুষগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নতুন সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের সুযোগ দিলেন। অচিরেই তাঁরা গড়ে তোলেন আলো ঝলমল, তুলনাহীন এক সমাজ ও সভ্যতা। সংযোজিত হয় সভ্যতার ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়।

পৃথিবীতে আবার নতুন করে জেঁকে বসেছে জাহিলিয়াত। আজ আবার মানবতা সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার। পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক-কোন একটি ক্ষেত্রেও মানুষের নেই এতোটুকু স্বস্তি। সর্বত্র চলছে ইবলীসের অনুসারীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। পর রাজ্য দখল ও লুণ্ঠনের মহোৎসব।

সন্দেহ নেই, পৃথিবী এই দুর্ভোগের অবসান চায়। মুক্তি চায়। কিন্তু মুক্তির প্রেসক্রিপশন তাদের জানা নেই। এই প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদের (সা) একনিষ্ঠ অনুসারীরা।

ইসলাম-বিদ্বেষী চক্রের প্রচার যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় যাঁরা কম্পমান, তাদের অপ-প্রচারে প্রভাবিত হয়ে যাঁরা মানসিকভাবে পরাজিত, তাদের উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর মুখোমুখি হতে যাঁরা শংকিত এবং ইসলামী পেরেস্ত্রোইকা রচনা করতে যাঁরা ব্যস্ত তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন।

এমন একদল মানুষের পক্ষেই এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করা সম্ভব যাঁরা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের আলোকে নিজেদেরকে রাঙিয়ে নিতে পেরেছেন, যাঁরা একনিষ্ঠভাবে আলকুরআনের অনুসারী, যাঁরা কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পদাংক অনুসরণে সংকল্পবদ্ধ, যাঁরা আল্লাহর সন্তোষ হাছিলের জন্য তাঁদের সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত এবং যাঁরা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে দাওয়াত-ইলাল্লাহর কাজে নিবেদিত প্রাণ।

তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা যেই দিন গণ-মানুষের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করতে পারবে, সেই দিন পরাজয় ঘটবে ইবলীসের অনুসারীদের। আলো আর আঁধারের টাগ-অব-ওয়ারের সেই দিন ঘটবে পরিসমাপ্তি। দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ার পরিস্থিতি ইংগিত দিচ্ছে, সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়।

www.pathagar.com

নারী নির্যাতন দেশে দেশে

শামসুন্নাহার নিজামী

নারীরা সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নারী মা, নারী স্ত্রী, নারী কন্যা। একটা পরিবারে কন্যাসন্তান না থাকলে পরিবার শ্রীহীন হয়ে যায়। যদিও পুত্র সন্তান লাভের আশায় (বংশ রক্ষার খাতিরে?) মানুষ হাপিত্তেশ করে স্ত্রীকে দায়ী করে তালাক পর্যন্ত দেয় কিন্তু সন্তানের মহব্বতকে অস্বীকার করা কঠিন। সংসারকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে, মায়া মমতা দিয়ে ভরিয়ে রাখার জন্যে নারীর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এই নারীই যখন পুরুষের পাশবিকতার শিকার হয়-যখন এই নারীকেই নির্মম অত্যাচারের পর হত্যা করা হয় তখন সামান্য সময় হলেও প্রত্যেক মানুষের মন বেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠে। যে মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে-অসহায় শিশুটিকে দুধ পান করিয়েছে নিজের আরামকে হারাম করে তাকে লালন পালন করেছে সেই মায়ের জাতি নারীরা যখন নির্যাতনের শিকার হয় তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতির যুগে মানবতা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রতিদিনের খবরে খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠতরাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে। মানবতা মনুষ্যত্বের এ দুর্দিনে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে এর প্রতিকার। বিশেষ করে নারী নির্যাতন বন্ধের উপায় বের করার জন্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সভা সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম। গড়ে উঠেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা সমিতি, সংস্থা ও সংগঠন। এমনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে দক্ষিণ এশীয় নারীদের নিগ্রহ রোধে ঢাকায় একটি প্রতীক আদালত বসেছিল। এই আদালতের জুরি বোর্ড নারী পাচার ও নিগ্রহ রোধে ১২ দফা সুপারিশ মালা পেশ করেছে। এই আদালতে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নারীরা অংশগ্রহণ করেছে। বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি এই আদালতে যোগ দেন। জুরি বোর্ডের অন্যতম সদস্য সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকার ফাস্টলেডি উইনী ম্যান্ডেলা তার এক বিবৃতিতে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে নারী পাচার ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেন। একটি সমাজে পুরুষ নারী উভয়েরই প্রয়োজন। এই নারী পুরুষকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বি করে দাঁড় করানো কখনোই সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হতে পারেনা। দক্ষিণ এশীয় নারী আদালত শুনেছে পাচার হওয়া নারীদের দুর্ভাগ্য ও নিপীড়নের কাহিনী। তারা এ কাহিনী শুনে এগুলোকে অবিশ্বাস্য, নৃশংস আর ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেছেন। আসলেই এ বর্ণনা এত ভয়াবহ যে আইয়্যামে জাহেলীয়াতের নৃশংসতাকেও হার মানায়। আধুনিক সমাজে নারীরা ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার বর্ণনা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়। দৈনিক জনকণ্ঠে (১৬/৮/২০০৩) "কর্মজীবী মহিলারা যৌন হয়রানির শিকার হন যেভাবে" শিরোনামে কিছু কর্মজীবী মহিলার দুরবস্থার বর্ণনা এসেছে। কর্মক্ষেত্রে তারা সহকর্মী, বস্ সবার কাছেই যৌন নিপীড়নের শিকার। বিভিন্ন শ্রেণীর অনেকগুলো জরীপ এসেছে এখানে। পুরুষ সহকর্মীরা পোশাক আশাক নিয়ে মন্তব্য করে। টেবিলে অশালীন পত্রিকা রেখে যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। জরীপে বলা হয়েছে এদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

অভিযোগ করে কোন লাভ হয় না। বরং উল্টো চাকুরী চলে যায় অনেক ক্ষেত্রে। অনেকেই আবার রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এ অপকর্ম সম্পাদন করেন।

পতিতাবৃত্তি নারী নির্যাতনের একটি নিকৃষ্ট ধরন। কেউ স্বেচ্ছায় এ পেশায় আসে না। পরিস্থিতির শিকার হয়েই মানুষ এপথে এসে থাকে। সম্প্রতি অত্যন্ত Sofsticated উপায়ে এ পেশা চলছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে নারীরাই এর হোতা। সম্প্রতি 'রীতা' নামের মেয়েটি হত্যার পর অনেক তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সে নিজে যেমন উশৃঙ্খল জীবন যাপন করত তেমনি অন্যান্য মেয়েদেরকে এ পথে এনে টাকা রোজগার করত। সমাজের উঁচু মহলে তার চলাফেরা ছিল। ঢাকা থেকে চিটাগাং পর্যন্ত বিভিন্ন বড় বড় হোটেলে সে মেয়ে সাপ্লাই দিত। এভাবে অনেক মেয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

নারী পাচারের সঙ্গে পতিতাবৃত্তি, মাদক ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি সন্ত্রাস হত্যাকাণ্ডও এগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইত কিছুদিন আগে সুন্দরী মডেল কন্যা তিন্নি নিহত হল। কথিত অপরাধী অভি এখনও দেশে ফিরতে পারছে না। এভাবে বর্ণনা করলে কলেবর বাড়বে অনেক। সেদিকে না যেয়ে আমরা এবার ফিরে আসব নারী নির্যাতনের আসল কারণ নির্ণয়ের দিকে।

নারী নির্যাতনের আসল কারণ হচ্ছে মানুষ এবং সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর দেয়া স্বভাব ধর্ম বা বিধান লঙ্ঘন। আল্লাহ পাক সমগ্র দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। সব কিছুই তার নিয়ম মেনে চলছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই দেখা যায় আল্লাহর নিয়মের অনুসরণ করছে। এজন্য কোথাও কোন বিশৃংখলা নেই। মানুষের সমাজও যদি আল্লাহর নিয়মের অনুসরণ করত তাহলে সেখানেও শান্তি বিরাজমান থাকত। যুগে যুগে আল্লাহপাক রসূলগণের মাধ্যমে যে বিধান দিয়েছেন তা অত্যন্ত বাস্তব, মানব প্রকৃতির সাথে অত্যন্ত বেশি সামঞ্জস্যশীল। এ নিয়ম লঙ্ঘন করে মানুষ যখনই তার মনগড়া পথে চলে তখন সমাজে নেমে আসে অশান্তি।

বর্তমানে নারী সমাজসহ গোটা মানবতার যে করুণ চিত্র আমরা দেখছি তা সবই খোদায়ী আইন লঙ্ঘনেরই ফল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মেয়েদেরকে মেয়ে হিসাবেই তৈরি করেছেন আর পুরুষকে তৈরি করেছেন পুরুষ হিসাবে। মেয়ে যেমন মা, স্ত্রী, কন্যা তেমনি পুরুষ পিতা, স্বামী, পুত্র। স্বামী যেমন স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তেমনি স্ত্রীকেও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। বিয়ের মাধ্যমে যে সংসার জীবনের সূচনা হয় সে সংসারে পুত্র কন্যাসহ একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা যেমন স্বামীর দায়িত্ব তেমনি দায়িত্ব স্ত্রীরও।

এটাই আল্লাহর বিধান এই সংসার নামক ছোট্ট পৃথিবীকে সুন্দর করার বিধান যেমন কোরআনে আল্লাহপাক দিয়েছেন তেমনি শেষ নবী রসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে বাস্তবে দেখিয়েছেন। নারী পুরুষের উশৃঙ্খলতা এ সংসারকে জাহান্নামে পরিণত করে। এর ফলে Affected হয় সন্তান সন্ততি। পরিণামে তারা পরিণত হয় সমাজের জঞ্জাল হিসাবে। ধ্বংস নামে নীতি নৈতিকতার-সভ্যতার। এ ধ্বংসাত্মক পথে পা যারা বাড়িয়েছে তারা নিজেরাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। বুঝতে পেরেছে তাদের ভুল। পাশ্চাত্যের আধুনিকাদের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের শীর্ষ মহিলা বুদ্ধিজীবী Marbit Margan বলেন,

"Be nice to your husband stop nagging to him and understand his needs.

- Total woman গ্রন্থ ইউরোপের নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা, ঘর-বিরাগী ও ঘর ভাঙা অভিনেত্রী Jean Sebeng এর মৃত্যু পরবর্তীকালে তার ডাইরীর শেষ লাইনে পাওয়া যায় ঃ "I wish I had stayed home"

-Times of India Nov. 8. 1981

বৈবাহিক জীবন পদদলিত করে Glamour জগতের বিচরণকারী মার্কিন উপন্যাস "The lonely lady" এর নায়িকা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যে Bitter truth এর সন্ধান পান তা হলো ঃ

"That fame has a way of fading and friends a way of disappearing when they are most needed"

www.pathagar.com

পশ্চিমা জগতের সৌন্দর্যের রানী "মেরেলিম মনরো" চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। প্যারিসে প্রতিরাতে ১০ হাজার নারী ৪০ হাজার পুরুষের যৌন লালসার শিকার হয়। সেখানে কুকুর হত্যার বিচার হলেও নারী হত্যার বিচার হয় না।

১৯৯৪ সালের এক জরীপ অনুসারে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান শীর্ষে। দ্বিতীয় ইংল্যান্ড, তৃতীয় কানাডা, চতুর্থ জার্মান, পঞ্চম ফ্রান্স-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু চিত্র

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাম্পত্য কলহে নিহত নারীদের ৬০ শতাংশ নারীদের হাতে নিহত হয়।

* প্রতি ৩ মিনিটে ১ জন নারী ধর্ষিত হয়।

* প্রতি ঘণ্টায় ১৬ জন নারী ধর্ষণকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

* প্রতি ১৮ সেকেন্ডে ১ জন নারী নির্যাতিত হয়।

"কৃষ্টি ও রুচির দিক থেকে যারা বৃটিশ তারা দেখেও দেখে না। শুনেও শুনে না ইংল্যান্ড, আমেরিকার নারীদের বুকফাঁটা কান্না আর আর্তনাদ। শকুনরা মরা গরুর গোশত যেভাবে টেনে টেনে খায়, সেভাবেই তাদের সমাজে নারীকে নিয়ে ভোগের টানাটানি চলে। এই টানাটানিতে যারা আরামবোধ করে তারা পতঙ্গের মত আগুনে ঝাপ দেয় আগুনকে আগুন জেনেও।"

-১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৯৮টি মহিলা কলেজ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার সংখ্যা মাত্র ১৩টি। ১৯৯০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার অকল্যান্ড শহরে একটা মহিলা কলেজে সহশিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত যখন কর্তৃপক্ষ নেয় তখন ছাত্রীরা রীতিমতো বিলাপ ও আর্তনাদ জুড়ে দেয়। ১শ' ৩৫ একর পরিমাণ আয়তন বিশিষ্ট কলেজ ক্যাম্পাসের দেয়াল সহশিক্ষা বিরোধী দেয়াল লিখনে ভরে যায়। বহু ছাত্রী এমন সব টি শার্ট পরে যাতে লিখা ছিল সহশিক্ষার চেয়ে মরণ ভাল। মেয়েরা কান্নার সাথে বলে সহশিক্ষার চেয়ে মরণ অনেক ভাল। আমরা আর ভোগের শিকার হতে চাই না। অবাধ নারী শিকারের ধকল আমরা সহ্য করতে পারছি না। যতক্ষণ কলেজে থাকি ততক্ষণ হামলা থেকে মুক্ত থাকি।"

[ক্রন্দনরত ছাত্রীদের ছবিসহ এই খবর বিস্তারিতভাবে ছাপা হয় হেরাল্ড ট্রিবিউনের ৬/৫/১৯৯০ সংখ্যায়]

বর্তমানে দেশে বিদেশে সর্বত্র নারী নির্যাতন অনেক বেড়েছে। বেড়েছে খুন, অপহরণসহ, আরও অনেক হিংসাত্মক সব ঘটনা। এ অবস্থার অবসান করতে হলে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে সেই শাশ্বত পথে যে পথ শুধু আখেরাতের শান্তির পথই দেখায় না বরং দুনিয়াতেও দেয় অনাবিল সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধি। বিশ্বব্যাপি প্রতিষ্ঠা করতে হবে কোরআনের শাসন যা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল।

www.pathagar.com

পরিবার মানব-সভ্যতা বিনির্মাণের অপরিহার্য উপাদান

ফজিলা তাহের মিতু

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন,

"ঐ সৌভাগ্যবান পুরুষটি যিনি একজন সৎকর্মপরায়ণ ও আদর্শবান স্ত্রী পেয়েছেন তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি ও হৃদয়ংগম করতে পেরেছেন যে, একজন পুরুষের জীবনে নারী কতবেশী প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারে।"

এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে, শুধুমাত্র একজন পুরুষের জীবনেই নয়, একটি দেশ একটি জাতি এবং একটি সভ্যতার শান্তি স্থিতি বিকাশের ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে নারী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর। এমন কি এ পৃথিবীর সূচনালগ্নে সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) এর জীবনে বিবি হাওয়ার (আঃ) উপস্থিতি ছিলো অত্যাবশ্যক। তা না হলে আজকের বিশ্বের এ মানব সভ্যতার অস্তিত্বই কল্পনা করা সম্ভব হতো না। হয়তো বা তাই বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন : সমস্ত পৃথিবীটাই সম্পদে পরিপূর্ণ, তারমধ্যে কল্যাণকর ও উত্তম (নিয়ামত) হলো চরিত্রবান নেক্কার স্ত্রী।" স্ত্রীজাতির সঠিক মূল্যায়নের জন্যে এর চেয়েও কোন উত্তম বক্তব্য বিশ্বের ইতিহাসে আছে কি?

পরিবার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পরিবার হচ্ছে মানব সভ্যতার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী জীবনাদর্শের মূলভিত্তি। হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টির সময় থেকেই মানুষের পারিবারিক জীবনের সূচনা পর্ব শুরু হয়। সে হিসেবে পরিবার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা নিজেই প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা ও মূলনীতি দান করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"পবিত্র মহান সেই সত্তা যিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ ও মানব জাতির মধ্য হতে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে যে সম্পর্কে তোমরা কিছুই জান না।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৬ আয়াত)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন ঃ

"প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি। সম্ভবত তোমরা হৃদয়ংঙ্গম করতে পারবে।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৪৯ আয়াত)

আয়াতের শেষাংশে এই যে, হৃদয়ঙ্গম করা বা অনুধাবন করা কিংবা সম্ভবত তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে অত্যন্ত আবেগময় এ আহ্বান। আমরা কি চিন্তাভাবনা করতে পারি পবিত্র কোরআনের এমনি অনেক আহ্বানের মধ্যে আমাদের জীবনের কত যে তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা ও রহস্য লুকিয়ে আছে যা সত্যিই অত্যন্ত চমৎকৃত।

www.pathagar.com

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা সূরা নিসার প্রথম আয়াতের প্রথমাংশে বলেন ঃ

"হে মানব জাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের দু'জন থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেক পুরুষ ও নারী।"

আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথাই এখানে ব্যক্ত করেছেন। দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র প্রাণ অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আয়াতের পরের অংশটুকু সহজেই অনুমেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়াকে একত্রে বেহেশ্‌তে থাকার ব্যবস্থাও করেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

"হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছে খাও। তবে ঐ গাছের কাছে যেও না। তাহলে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে।" (সূরা আরাফ ঃ ১৯ আয়াত)

আমাদের মনে-প্রাণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঐ বিশ্বাস সদা জীবন্ত রাখতে হবে যে, ইসলাম সমগ্র মানব জীবনের জন্যে একটি ইনসাফপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের অন্যান্য সকল দিকের ন্যায় এতে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনেও এক অনুপম সুন্দর সহজ সরল জীবনানুগ বিধান আল্লাহ পাক দান করেছেন। বিয়ে হচ্ছে বর ও কনের মধ্যে এক পবিত্র সামাজিক চুক্তি। জীবনের এক চমৎকৃত অধ্যায়। বিয়ের প্রধান শর্ত হচ্ছে ইজাব-কবুল, মোহরানা, সাক্ষ্য ও প্রকাশ্যে ঘোষণা। বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে যে সম্মিলিত জীবন ধারার সূচনা হয় তারই ফলে একটি পরিবার গঠিত হয় এবং এ পরিবার থেকেই একটি নতুন বংশের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে ঐ পরিবারের সদস্যগণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন দায়দায়িত্ব পালনেও এগিয়ে আসে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারই হচ্ছে মানব সভ্যতা বির্নিমাণের অপরিহার্য উপাদান। সে জন্যে প্রতিটি মানব সন্তানেরই জীবনে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অনেক বেশি। পরিবার গঠনের মৌলিক উপাদান হচ্ছে বিয়ে। আর বিয়ের এমনি সুন্দর বিধান না থাকলে মানুষ ও পশুতে কোনই পার্থক্য থাকতো না। এবং সমগ্র মানব জাতিই এক কঠিন স্থবিরতার শিকারে পরিণত হতো। আমাদের জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ প্রিয় নবীজি (সাঃ) সহ প্রায় সকল নবী-রাসূলগণই বিয়ে করেছিলেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পূর্বে রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করেছি।" (সূরা রায়াদ ঃ ৩৮)

শুধু তাই নয়, একে আল্লাহ পাক এক উত্তম নিদর্শন বলেও উল্লেখ করেছেন। যেমন–

"তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহৃদয়তা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে।" (সূরা রুম ঃ ২১ আয়াত)

তাই আমাদেরকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস নিয়ে জীবন চলার পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত যে, ইসলামের শুরু থেকেই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যে ও তাৎপর্য নিয়ে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের দর্শন গড়ে উঠেছে। মানুষের প্রকৃতি বা ফিতরাতের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখেই ইসলামী জীবনাদর্শ যাবতীয় আইন প্রণয়ন করেছে। তাই স্বাভাবিক জীবনের উন্নয়ন ও গতিশীলতার মধ্যে তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করা সম্ভব। জীবনের বাস্তবতাকে ইসলাম অধিক গুরুত্ব দেয় বলেই আল্লাহ তা'য়ালা নারীর প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ঠিক তেমনিভাবে পুরুষের দায়িত্বও ভিন্ন। দায়িত্ব কর্তব্য ভিন্ন হলেও সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে উভয়েই সমান। আমরা যদি ইসলামী বিধি-বিধান ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটা মুসলিম পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিকের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করি তাহলে এ সত্য অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, সেখানে পুরুষের তুলনায় নারীগণ অধিক সৌভাগ্যের অধিকারী। মুসলিম পরিবারের একজন সত্যিকার মা, বধূ, কন্যা ও জায়ার যে অপরিসীম মর্যাদা সম্মান ও স্বাধীনতা তা এই বিশ শতকের অত্যাধুনিক ইউরোপীয় নগ্ন সভ্যতার নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের প্রবক্তাগণ কল্পনাও করতে পারে না। তা সত্ত্বেও কুরআনের কিছু আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরী করে বলে থাকে যে, ইসলামে পুরুষদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা নারীদের থেকে বেশী। তার মধ্যে

www.pathagar.com

একটি হচ্ছে সূরা নিসার ৩৪ নম্বর আয়াত। প্রকৃত অর্থে আয়াতটি পারিবারিক জীবনে নারীদের পক্ষে আরো অধিক মর্যাদা ও এ ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহের দাবী রাখে। পরিবারিক জীবনে স্ত্রীসহ বৃদ্ধ পিতামাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা ও সকল সদস্যের দায়দায়িত্ব প্রধানত: একজন পুরুষের উপরই ন্যস্ত থাকে। ঠিক এমনিভাবে ইসলামের ছোট বড় সকল মূলনীতিগুলোর মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আবর্তে আবর্তিত হতে হতে আজকের মুসলিম পরিবারগুলোর এমনি দৈন্যদশা যে এতে ইসলামের কোন একটি শিক্ষাও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নেই। বেশী নয় বিগত মাত্র সাত/আট দশকের ইতিহাসের পাতা উল্টালে সহজেই বুঝা যাবে কত যে সূক্ষ্মভাবে আমরা ঈমান হারিয়েছি তা আমরা নিজেরাই জানি না। যে জিনিস যেখানে হারায় সেখানে তালাশ করাই অধিক বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা যদি বলি ঈমান-আমল আমরা সর্বপ্রথম ঘরে হারিয়েছি তাহলে একটুকুও বাড়িয়ে বলা হবে না। তাই ঘরেই প্রথম ঈমান আমলকে তালাশ করতে হবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মহান আল্লাহ পাকের দেয়া জীবন বিধানও তাই বলে। কেননা, হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়াকে শুধুমাত্র পারিবারিকভাবে জীবন যাপন এবং মানব বংশ বিস্তার করার জন্যেই পাঠানো হয়নি। এ পৃথিবীর অঙ্গনে সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খিলাফতের মহান দায়িত্বের যথাযথ আঞ্জাম দেয়ার উদ্দেশেই এত আয়োজন ছিলো। তাই পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ইকামতে দ্বীনের দায়িত্বের সার্বিক প্রচেষ্টায় যত্নবান হওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত। বিশ্বের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ব্যক্তিত্ব নবীজি (সাঃ) এর মহিয়সী জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) এর অত্যন্ত চমৎকৃত পারিবারিক জীবনেও আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই। কেননা, এর সুফল সুদূরপ্রসারী। পারিবারিক পরিমণ্ডলে ইসলামী অনুশাসন কায়েম করতে পারলেই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ অধিক সহজ ও প্রশস্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। হয়তো সে জন্যেই বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে প্রতিটি পরিবারকে দ্বীনের দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

প্রচন্ড ঝড়ের তীব্র আঘাতে গাছের পাতাগুলো যেভাবে বৃন্তচ্যুত হয়ে ঝরে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মায়ের জাত নারী সমাজটাও যেন তাদের পারিবারিক জীবনের ঐতিহ্যের বৃন্ত থেকে ছিটকে পড়েছে। কি অসম্ভব দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত সমাজে তারা একটা প্রচন্ড শক্তিতে আবির্ভূত হচ্ছে। এর পরিণাম আর যাই হোক ঘরে বাইরে, অফিস আদালতে, মাঠে ময়দানে কলকারখানায় তাদের শুধু সরব পদচারণাই নয়, তারা আজ জীবিকার অন্বেষণে কর্মতৎপর, প্রতিবাদী কেউবা বিদ্রোহী। একই অঙ্গে কত রূপে যে বাঙ্গালী নারী সমাজের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তার কোন শেষ নেই। তারা আজ মডেল কন্যা, সেল্‌সম্যান, মিস্ রূপসী, রিসিপ্‌শনিষ্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারী, যৌনসঙ্গী, যৌনকর্মী, দেহপসারিনী, হিরোইনসেবী, সন্ত্রাসীদের গডমাদার, পকেটমার, মহিলা খদ্দের ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বড় বড় হোটেল এবং তথাকথিত অভিজাত সমাজের অন্তরালে যে বেশ্যাবৃত্তি তা আরো অধিক ভয়াবহ।

আসলেই নারীরা আজ বিজয়িনী, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। ইতিহাস সাক্ষী কত নারী যে কত মহাবীরকে ধরাশায়ী করেছে, কত সাধকের ধ্যান ভঙ্গ করেছে তার কোন হিসেব নেই। সুন্দরী হেলেনের জন্যেই নাকি ঘটে যায় সেই ভয়ংকর ট্রয়ের যুদ্ধ যার মধ্যে জড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল হারকিউলিস্ ও প্যারিসের ন্যায় বীরেরা। আর রূপহীনা সিম্পসনের জন্যে সিংহাসন ত্যাগ করেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অষ্টম এডওয়ার্ড।. এতো ইতিহাস। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজ। কত নিদারুণ আর ভয়ঙ্কর চিত্র। লিখতে মন চায় না। শুধু বলবো, আমরা কি সামান্য ভেবে দেখতে পারি, যে পথে ছুটেছে নারী তাতে জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনা মিলবে কি আদৌ।

তবে হ্যাঁ, এতো পৃথিবীর পথভ্রষ্টা নষ্টা নারীদের ইতিহাস বা সামান্য খন্ড চিত্র। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা নিয়ে সম্পূর্ণ একটি নতুন সুন্দর সুস্থ পৃথিবী গড়ার সুদৃঢ় অঙ্গিকার নিয়েই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সেই সাথে অতীত ইতিহাসের ঈমানদার মহিয়সী মুসলিম মহিলাদের জীবন কথাও আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হবে। আমরা কি ভাবতে পারি বিবি হাজেরার কি অপরিসীম ধৈর্য সবর, ত্যাগ-তাকওয়া ও সাহসের ন্যায় সৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটলে বিশ্বের বিস্ময় যমযম কূপের ন্যায় নিদর্শন সৃষ্টি হতে পারে। এমনিভাবে বিবি আছিয়ার মর্মস্পর্শী দোয়া। এমন কি নবী (সাঃ) এর বিপ্লবী দাওয়াতে ঈমান এনে যিনি সর্বপ্রথম নবুওয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তিনি পৃথিবীর সকল নারী জাতির গৌরব উম্মুল মু'মিনীন খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করার পরম সৌভাগ্যের

www.pathagar.com

অধিকারীও ছিলেন একজন নারী বিবি সুমাইয়া (রাঃ)। এমনি অসংখ্য মহিলা সাহাবীদের জীবনী আমাদের-সামনে আছে যা নাকি আজ আমাদের বাস্তব জীবনে নিয়ে আসতে হবে। কেননা, পরিবার সমাজ সভ্যতা বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক। একটি সমাজের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং সৎ চরিত্রবান সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একজন ঈমানদার মায়ের ভূমিকাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোতে একজন মা যখন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা বা গর্ভধারণ করেন তখন ডাক্তার থেকে শুরু করে আত্মীয় আপনজনগণ কত যে সাবধান বাণী উপদেশ আদেশ দান করেন। খাওয়া চলাফেরা বিশ্রাম বহু কিছু। একজন মা তার গর্ভের সন্তানের কল্যাণ কামনায় পেরেশানী তো থাকবেনই। তাই সব কিছুতেই সতর্কতা অবলম্বন নিঃসন্দেহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিশুর মাকে তার গর্ভের শিশুর আত্মিক; মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কল্যাণের জন্য কি কি দায়িত্ব পালন করা দরকার তার আদেশ উপদেশ বাণী খুব কমই দেয়া হয়। অথচ গর্ভ সঞ্চারিত হবার পর থেকে মা যে সৎ আমল অথবা খারাপ আমল করেন তাই শিশুর মানসিক ও আত্মিক পুষ্টিতে বিরাট প্রভাব ফেলে। তখন মায়েদের অধিক কোরআন অধ্যয়ন প্রয়োজন। এর প্রভাব কল্পনাতীত। যেমন- একজন গর্ভবতী মা যদি মানসিক প্রশান্তির সাথে অধিক মনযোগ সহকারে তখন সূরা 'আল ইমরান' তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন করেন তবে সন্তান দায়ী ইলাল্লাহর সৎ গুণাবলীর অধিকারী হবে। এমনিভাবে সূরা লোকমান অধ্যয়ন করলে সৎ চরিত্রের অধিকারী হবে। আবার সূরা 'ইউসুফ অধ্যয়ন করলে ধৈর্য, সবর তাকওয়া ও ইল্‌মের অধিকারী হবে শিশু। আসল কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালাকে যে যেরূপ ভাবে পাবার চিন্তা করবে আল্লাহও তার কাছে সে রূপই। বিষয়টি আমি এজন্যেই উল্লেখ করেছি যে, এমনি ধরনের অনেক বিষয়কে পারিবারিক জীবনে আমরা গুরুত্ব না দেয়ার ফলে তার ভয়াবহ পরিণাম যে কি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তা তো আমরা প্রত্যক্ষ করেই যাচ্ছি।

নিবন্ধের পরিধির কথা চিন্তা করে আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই প্রায় শেষ করতে হচ্ছে। তার পরেও আল্লাহ সুব্‌হানাহু তা'য়ালা পারিবারিক জীবনের শান্তি স্থিতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে স্বামীদের উদ্দেশ্য করে যা বলেছেন তার উল্লেখ না করে পারছি না।

তিনি বলেন ঃ "এবং তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। তারা যদি তোমাদের মনের মতো না হয় তবে হতে পারে যে, তার কোন বিষয় তোমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু আল্লাহ তাতেই তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" (সূরা আননিসা ঃ ১৯)

উক্ত আয়াতটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সত্যিই বিস্ময়কর। আল্লাহ পাক পারিবারিক জীবনের কত সুন্দর প্রেমময় রহস্যটিই না এতে ব্যক্ত করেছেন। কেননা প্রত্যেক পুরুষ-ই চায় বউটি তার সুন্দরী হোক। এই হোক, সেই হোক। এটা নাকি তাদের স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্ত্রীটি যদি সুন্দরী না হয় কিংবা তার মধ্যে যদি এমন কোন ত্রুটি থাকে যার দরুন সে স্বামীর মনের মতো হতে পারছে না। তা হলেও কি তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়? এক্ষেত্রে আল্লাহ সহসা কোন সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলছেন। বরং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পথ অবম্বন করাই অধিক কল্যাণকর বলেছেন। অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রী সুন্দরী নয় কিন্তু তার মধ্যে স্বামীপ্রেম, ধৈর্য, সবর, ত্যাগ, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সত্যবাদিতাসহ এমন কতকগুলো আকর্ষণীয় ও মনমুগ্ধকর গুণাবলীর সমাহার থাকে যা দাম্পত্য জীবনকে অধিক অর্থবহ ও আনন্দদায়ক করে তোলে। স্ত্রী যদি তার এ ব্যক্তিত্ব ও গুণগুলোর প্রকাশের সুযোগ পায় তা হলে যে স্বামী একদিন স্ত্রী অসুন্দর হবার কারণে মন-খারাপ করে বসেছিলো সেই তাঁর জন্যে ব্যাকুল প্রাণ ও পাগলপ্রায় হতে পারে। আসলে ঈমানদার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া এটাও আল্লাহ তা'য়ালারই ইচ্ছে ও রহমতের জন্যেই হয়ে থাকে। এমনি সুন্দর ও প্রেমময় সম্পর্কের আদর্শে প্রতিটি পরিবারই হোক নবীজি (সাঃ) এর জীনাদর্শ প্রতিষ্ঠার মূল কেন্দ্রবিন্দু। দয়াময় আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন। আমীন।#

www.pathagar.com

অপসংস্কৃতির অক্টোপাসে আজকের ছাত্রী সমাজ

সাবিকুন্নাহার মুন্নী

সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা শুধুমাত্র বিনোদনকেই বুঝে থাকি। বাস্তবে তা নয়। সংস্কৃতি একটি জাতির সামগ্রিক কার্যকলাপের একটি বাস্তব চিত্র। সংস্কৃতি মানুষের প্রাণ স্পন্দনের মতই এক অপরিহার্য অস্তিত্ব। প্রাণস্পন্দন না থাকলে যেমন একটি দেহের কোন মূল্য থাকেনা তেমনি কোন জাতির সংস্কৃতি না থাকলে সে জাতিও একটি প্রাণহীন জাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। সংস্কৃতি অতীত ও বর্তমানের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করে থাকে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে মরিয়ম জামিলা বলেছিলেন বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অনেক বেশী ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের ভাষায়-A victory without war. অন্যের দেশ দখলের এমন মাধ্যম যার প্রতিরোধে কেউ এগিয়ে আসে না। এ ব্যাপারে আবুল মনসুর আহমাদ বলেছেন- রাজনৈতিক আগ্রাসনের চাইতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অধিক মারাত্মক। কারণ রাজনৈতিক আগ্রাসন সাধারণ চোখে ধরা যায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বেলায় তা সম্ভব নয়।

দুনিয়ায় যত জাতি রয়েছে সংস্কৃতিও ততই গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ধর্মপ্রাণ মুসলমান। আলকোরআন ও হাদিসই হচ্ছে মুসলমানদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। আবহমানকাল থেকেই এদেশের রয়েছে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আজ যেন অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, বিজাতীয় অনুকরণ-অনুসরণ ও অনৈতিকতা যেন ক্রমশ একটা স্থায়ী আসন করে নিতে যাচ্ছে। চতুর্দিক ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ধোঁয়ায়। এদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও সরকারিভাবে জাতীয় সংস্কৃতির সম্প্রসারণের জন্য কোন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ভিন্ন জাতির অপসংস্কৃতিকে জাতির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

সংস্কৃতি বলতে কি বুঝি ? 'সংস্কৃতি' শব্দটি সংরক্ষণ বা সংস্কার বিশেষ্যপদ থেকে গঠিত। সংস্কার শব্দটি বিশ্লেষণ করলে যেসব অর্থে ব্যবহার করা যায় তাহলো শোধন, পরিষ্করণ সংক্রিয়া, উৎকর্ষ সাধন সংশোধন মেরামত, মার্জনা, পরিশীলন, অনুশীলন, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, শুদ্ধি। শিক্ষা অথবা চর্চা দ্বারা লব্ধ। বিদ্যা-বুদ্ধি শিল্পকলা রুচি নীতি। মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ। একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা। কোন জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্পসাহিত্য, বিশ্বাস, সমাজনীতি ইত্যাদি। অর্থাৎ সংস্কৃতির অর্থ সুসভ্য আচরণ, শিষ্টাচার ও উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ যার ভিত্তি হবে জ্ঞান প্রজ্ঞা। মানুষের চিন্তা ও কর্মে একটি পরিচ্ছন্ন রূপ ফুটিয়ে তোলাই সংস্কৃতির মুখ্য কাজ। জীবনের অনভিপ্রেত চিন্তা ও কর্ম পরিত্যাগ করে সুস্থ সুন্দর শুদ্ধজীবন যাপন করার নামই হচ্ছে সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর এমাজউদ্দিন বলেছেন, "আমি অথবা আমরা What we are. যে আচার আচরণে, পোষাক পরিচ্ছদে, খাদ্যাভ্যাসে, বিশ্বাসে আমি যা এই তো আমার সংস্কৃতি।

কবি রুহুল আমীন খান বলেছেন "আমার হৃদয়ের যে চেতনা, যে বিশ্বাস বা বোধের লক্ষণ করি তাই আমাদের বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাই সংস্কৃতি।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য কল্যাণকর সবকিছুই সংস্কৃতির অংশ। তবে আমাদের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সেটাকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

সংস্কৃতির ইংরেজী প্রতিশব্দ Culture শব্দটি এসেছে জার্মান Cultura থেকে। আর এই Culture অর্থ কর্ষণ বা Cultivation, তাই দেখা যাচ্ছে ইংরেজী Culture শব্দের মধ্যে যেমন Cultivation এর ভাব বিদ্যমান তেমনি বাংলা সংস্কৃতি শব্দের মধ্যেও রয়েছে সংস্কার প্রয়াস। একই ভাবে আরবী তমুদ্দুন শব্দ এসেছে মাদাদুন তথা নাগরিক জীবন থেকে যার মধ্যে উন্নত জীবনের প্রয়াস নিহিত।

সংস্কৃতি বা Culture এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে E.B Tylor বলেছেন–Culture is that complex whole which includes Knowledge, belief, art, moral low, custom and after capabilities and habits acquired by man as a member of society - অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জ্ঞান বিশ্বাস, শিল্পবোধ, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য সামর্থ্য ও অভ্যাসসমূহের সেই জটিল সমষ্টি যা সে সমাজের সদস্য হিসেবে আয়ত্ত করে।

সংস্কৃতি বা কালচার কথাটি উচ্চারণের সাথে একটি মার্জিত উন্নত ও পরিশীলিত রুচির কথা আমাদের মনে ভেসে ওঠে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমেদ বলেছেন ব্যক্তি বা ইন্ডিভিজুয়্যালের যা ব্যক্তিত্ব বা পার্সোনালিষ্ট, সমষ্টি বা কমিউনিটির তাই কালচার, অর্থাৎ ব্যক্তির নিজস্বত্তা যেমন তার পার্সোনালিটি তেমনি জনসমষ্টির নিজস্বত্তার নামই কালচার।

তাই বলা যায় যে, কোন মানুষের বৈশিষ্টাকে যেমন তার পার্সোনালিটি বলা যায়, তেমনি কালচার তথা সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে একটি সমাজ বা জাতির বৈশিষ্ট্য মন্ডিত বিষয় গুণাবলী।
সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ তার এ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখা ও এ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তার প্রয়োজন সংস্কৃতির। সংস্কৃতি মানুষেরই আছে। অন্য জীবের সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতি ঃ

যেহেতু সংস্কৃতি অর্থ হচ্ছে সংস্কার করা, পরিশুদ্ধ করা আর এ সংস্কার হচ্ছে জীবনের সংস্কার এ পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, জীবনের অনভিপ্রেত চিন্তা ও কর্ম পরিত্যাগ করে সুস্থ সুন্দর শুদ্ধ জীবন যাপন করার নামই হচ্ছে সংস্কৃতি সেহেতু ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামী শরীয়তের বুনিয়াদের মানুষের সামগ্রিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতা বুঝায় মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই ইসলামী সংস্কৃতির আওতাভুক্ত যা মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (সা) এর পদাংক অনুসারিত, নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত হয়।

এক কথায় ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা হলো কোরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ। ইসলামী সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আল্লাহমুখীতা, পবিত্রতা, নৈতিকতাবোধ, মানবতাবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ।

ইসলাম এসেছে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। মানুষের চিন্তা ও কর্মের এ পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টাকেই বলা যায় সামগ্রিক অর্থে সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

মানুষের আচার ব্যবহার থেকে শুরু করে জীবনের সামগ্রিক কার্মকাণ্ড যে বিশেষ প্যাটার্নে গড়ে তোলার জন্য ইসলাম প্রচেষ্টা চালায় সত্যিকার অর্থে সে বিশেষ প্যাটার্নে জীবন গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তা বিশুদ্ধ ও সংস্কৃতিবান হতে পারে না।

www.pathagar.com

কারণ ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ফলে ইসলাম ছাড়া জীবন পরিচালনা মানেই হচ্ছে অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা পরিচালিত হওয়া আর অপূর্ণাঙ্গ বিধান দ্বারা জীবন পরিচালনার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অসঙ্গতি ও ত্রুটিপূর্ণ জীবন যাপন করা। স্বাভাবিকভাবেই এ জীবন অপসংস্কৃতির শিকার হতে বাধ্য। এজন্যই বলা হয় পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া ছাড়া পরিপূর্ণ সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব নয়।

অপসংস্কৃতি কি?

অপসংস্কৃতি হচ্ছে যা একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্বভাবের বিপরীত অথবা সাংস্কৃতিক আদর্শের বিরুদ্ধ অথবা যা কল্যাণকে পরানুখ করে বা বিধ্বস্ত করে তাই অপসংস্কৃতি।

অর্থাৎ জাতির নিজস্ব স্বভাব প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যের স্বভাব প্রকৃতির অনুসরণ যা সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে তাই অপসংস্কৃতি। মনে রাখতে হবে যে সময়ের সাথে শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে একটি জাতির মধ্যে কল্যাণকর যে পরিবর্তন তা অপসংস্কৃতি নয় অর্থাৎ যে পরিবর্তন অকল্যাণকর তাই অপসংস্কৃতি। মুসলমানরা অপরের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে নিলেও সেটি শুধুমাত্র এসব ক্ষেত্রেই সীমিত যা তাদের জীবনবোধ, জীবনচেতনা, আকীদা বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কোথায়ও এই নীতি বিচ্যুতি ঘটার মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রাধান্য পেলে সেটাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যাবে না। কারণ কোন সংস্কৃতি কোন মুসলমান চর্চা করলেই সেটা ইসলামী সংস্কৃতি হয় না। মহানবী এ প্রসঙ্গে বলেছেন "কেউ অপরজাতির (বিশ্বাস জনিত কাজ ও আচার আচরণের) অনুকরণ করলে সে সেইজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।"

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত কোন দেশের স্থানীয় সংস্কৃতির যে অংশটুকু এ মৌল বিশ্বাসের অনুকূল, ইসলামে সেটুকু তার নিজের সংস্কৃতির সাথে একীভূত করে নেয়া যায়।

স্থানীয় সংস্কৃতির কোন অংশ ইসলামের অনুকূল বা প্রতিকূল কোনটাই নয় অর্থাৎ ইসলামের সাথে বিরোধহীন নয় সেটাও ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে শামিল হতে পারে।

স্থানীয় সংস্কৃতির যে অংশটুকু ইসলামী বিশ্বাস ও চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত সে অংশটুকু ইসলামী সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত নয়।

আমাদের আজকের স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এটা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের জাতিসত্তার মূলে ইসলামের রয়েছে ঐতিহাসিক অবদান। যে কোন জাতি সত্তার স্বাতন্ত্রের সার বস্তুই হচ্ছে তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। কোন জাতি যখন তার এ বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক গুণগুলো হারিয়ে ফেলে, তখন তার স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তার তাকিদ বা স্বপ্নও আর ধরে রাখতে পারে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তার "ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন- "হিন্দুইজম ইজ দ্যা মেইন কারেন্ট অফ ইন্ডিয়ান কালচার।" হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুতত্ত্ব হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ। একইভাবে যদি আমরা আমাদের সংস্কৃতির দিকে তাকাই তাহলে দেখবো ইসলাম ইজ দ্যা মেইন কারেন্ট অফ বাংলাদেশী কালচার। বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ইসলাম।

অপসংস্কৃতির অক্টোপাসে বাংলাদেশী নারী সমাজ

মানব সভ্যতার বিকাশ, উন্মেষ, প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দুই নারী। সমাজের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী বলেই এক্ষেত্রে নারীদের স্বতন্ত্র ভূমিকা অনস্বীকার্য। একজন শিক্ষিত, ধর্মভীরু ও সংস্কৃতিবান ছাত্রী আগামী দিনে উপহার দিতে পারে সৎ ও নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক নাগরিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বল্গাহীন স্রোতে আজকের ছাত্রী সমাজ অনৈতিকতা ও আদর্শহীনতায় দারুণভাবে হতাশাগ্রস্ত। পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনতা ও প্রগতিবাদ নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় এবং অপসংস্কৃতির বিষক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট শিক্ষাদানের প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম , আগামীদিনের আশা-ভরসার তরুণ ছাত্রীসমাজ।

বর্তমান ছাত্রী সমাজ আজ মুসলিম দেশের ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ। আজকে অধিকাংশ ছাত্রীদের পোশাক আশাক, চলনে বলনে, চিন্তা চেতনায় মুসলমানিত্বের কোন ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র গঠনের সুযোগের অভাবে একতরফাভাবে শুধু আধুনিক শিক্ষা পেয়ে কিছু সংখ্যক ছাত্রী তথা মেয়েদের মনমগজ চরিত্র বিকৃত হয়ে গেছে। নারী স্বাধীনতার নামে মহিলাদেরকে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের পাশবিক লালসা চরিতার্থের উপকরণ হিসেবে তারা ব্যবহৃত হচ্ছে।

পরিবার সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানে মা, বোন, স্ত্রীদের ভূমিকাই বেশী। আমাদের সমাজে মহিলাদের দায়-দায়িত্বের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রধান দায়িত্ব হলো, তাকে আল্লাহপাক যে প্রকৃতি দিয়ে যে পরিবেশে সৃষ্টি করেছেন তা মেনে নিয়ে সে পরিবেশে কাজ করা। মায়ের প্রকৃতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীজাতির মধ্যে দিয়েছেন। মা-বাবার গৃহ ছেড়ে তার স্বামীরগৃহে যাওয়া নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন এবং স্বামীগৃহে স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন একজন নারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। একজন মা সন্তানের শুধু সন্তানের স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠনের সহায়তা করেন না। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা-চেতনা, মন-মগজ মেজাজ ও রুচি গঠনে একা ভূমিকা পালনের দায়দায়িত্ব মায়ের উপরই বর্তায়। নারী জাতিকে মা হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে, শুধু ইঞ্জিনিয়ার বা কৃষিবিদ হওয়ার জন্য নয়। কোন মা যদি তার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ইসলামের সীমানার ভেতরে থেকে অন্যান্য দায়িত্ব পালনেও সমর্থ হয়। তাহলে কতইনা ভাল কাজ করলেন। একজন মহিলা ডাক্তার হয়ে মহিলাদের চিকিৎসা করবেন, শিক্ষক হয়ে শিশুদের এবং মহিলাদের শিক্ষা দিবেন আল্লাহ পাক সে যোগ্যতাও তাদের মধ্যে দিয়েছেন। পুরুষের কর্মক্ষেত্রের মত নারীর কর্মক্ষেত্রও প্রশস্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার একক। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর যোগ্যতা অত্যন্ত কার্যকর। যেসব চাকুরীতে গেলে সন্তানের প্রতি দৃষ্টি রাখা যায় না, লালনে পালনে ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষাদান সম্ভব হয় না এবং ইসলামের সীমা লংঘন ছাড়া যে চাকুরী করা যায় না, এমন চাকুরীতে মহিলাদের না যাওয়াই ভালো। অথচ আজকের নারীরা সম অধিকারের নামে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নারী তার নিজ কর্মক্ষেত্রের সীমা থেকেই বাদ পড়েছে। পরিণতিতে নারী তার আসল মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে ।

পাশ্চাত্য স্টাইলে নারী মুক্তির অন্তরালে নারীকে আজ টেনে নামানো হয়েছে রাস্তাঘাটে। নারী ক্ষমতায়নের রঙিম কাসুম দেখিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে তাদেরকে প্রকৃতি ও স্বভাব বিরোধী নিকৃষ্ট এমন সব কর্মসংস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধকরা হচ্ছে যা তার জন্য অবমাননাকর কলকারখানায়, লোহা লক্করের টানাটানি, হাতুড়ী বাটাল নিয়ে রাস্তা ভাঙ্গার কাজ, দালান-কোঠা তৈরীতে ইট সিমেন্ট, বালির বোঝা টানা ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঠেলে দিচ্ছে।

পাশ্চাত্য ভংগুর সমাজের অনুসরণ-অনুকরণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার নামে এমন জ্ঞান নারী সমাজকে দেয়া হচ্ছে যার বদৌলতে নারীরা পরিবারকে শৃংখল মনে করে সন্তান ধারণের স্বাধীনতাকে যথেচ্ছচারের স্বাধীনতা বলে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। স্বামী সংসার এবং বিয়ে ছাড়াই স্বনির্ভর জীবনযাপনের চিন্তা করছে। নারীর মর্যাদা ও অধিকারের নামে পরিণাম চিন্তা না করেই Gender equlity দাবীতে তারা আজ সোচ্চার। আমাদের নারী সমাজ কেন চিন্তা করে দেখছেন না আজকে নারীপ্রগতি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী উচ্চকণ্ঠ সেখানে আজ পর্যন্ত কেন কোন মহিলাকে তারা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেননি?

অপসংস্কৃতির পাগলা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের নারী তথা ছাত্রীসমাজ আমরা সেথায় ছুঁটে চলছি তা কি একবারও ভেবে দেখেছি ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার মুসলিম সমাজের নারীর ঐতিহ্যবাহী ভূমিকার কথা ভুলে গিয়ে তার অনুকরণ অনুসরণের পরিবর্তে বিজাতীয় চিন্তা, চেতনার দাসত্ব করছি। ফলশ্রুতিতে সমাজ গড়ার কারিগর তরুণরা তরুণীরা আজ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। কাজের বুয়াদের ক্রোড়ে কিংবা ডে কেয়ারে লালিত পালিত সন্তান তথা আজকের তরুণ, তরুণীরা তাদের সোনালী অতীত সম্পর্কে কিছুই জানে না। নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে নেই তাদের কোন ধারণা। আকাশ সংস্কৃতির সুবাদে তারা ভুলে যেতে বসেছে নিজেদের সত্যিকার পরিচয়। তরুণ-তরুণীরা অভ্যস্ত হয়েছে নাচ, গান আর নির্লজ্য নীল ছবিতে রিমোট টিপে চলে যাচ্ছে এক চ্যানেল থেকে আরেক চ্যানেলে মুহূর্তে ডুব দিচ্ছে ইন্টারনেট নামক গভীর সমুদ্রে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশে চালু হয়েছে সুন্দরী প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি। "লজ্জা নারীর ভূষণ" এই প্রবাদটি কত তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যায় সেই প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত আমাদের কলেজ ভার্সিটির মেয়েরা। তাইতো যে কবির কাব্যে আমরা আমাদের সংস্কৃতির শিকড় খুঁজে পাই।

কবি আজকের মেয়েদের সজাগ সতর্ক ডাক দিয়েছেন-
"আগের দিনে লজ্জা ছিল
লজ্জা এখন কোথায়
কে আর টানে তোর মত বল
ঘোমটা খানা মাথায়
কে আর করে কথায় কথায়
নয়ন দু'টি শত

মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত" এই ঘোষণার মাধ্যমে প্রায় পনেরশত বছর আগে আল্লাহর রাসূল অপসংস্কৃতির গাঢ় অন্ধকার আগল ভেঙ্গে যে সত্যশ্রয়ী সাংস্কৃতিক চেতনা উপহার দিয়েছিলেন আজকের নারী সমাজ আমরা নিজেদের কর্মেই নিজেদেরকে আবারও জাহিলিয়াতের যুগের মত মাথার স্থান পায়ে এনে দিয়েছি। তাইতো ফ্যাশন বিলাসিতায় পড়ে হাটে, ঘাটে মাঠে, দোকানে উত্তেজক পোশাক পরে অঙ্গ প্রদর্শনী করে বেড়িয়ে সিনেমা থিয়েটারে ক্লাবে ভোগের পাত্রী হয়ে থাকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। নিজেকে ভোগের পাত্রী হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে সাজিয়ে উঠছে বিউটি পার্লারের দোকান। তরুণীর ভীড় উপচে পড়ছে এগুলোতে। রূপচর্চায় যোগ হয়েছে নানা পদ্ধতি নানা মাত্রা। যোগ্যতার যেই গ্রহণযোগ্য। জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বাহন বাংলাদেশে টেলিভিশনে শেখানো হচ্ছে-"ফেয়ার এন্ড লাভলী মেখে এয়ার হোস্টেস্ হয়ে কিভাবে বাবা-মার অবলম্বন হওয়া যায়।' অথচ প্রিয় রাসূলের ঘোষণা "উত্তম চরিত্রবান সন্তান হচ্ছে মা বাবার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের একমাত্র অবলম্বন" এমন মুসলিম সমাজেই আমাদের বাস আজকে সেখানে মডেলিং প্রষ্টিটিউশনেও পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে নারীকে পণ্যের মানে নামিয়ে আনা হয়েছে। যা শুধু সভ্যতা বিরোধীই নয় মানবতা বিরোধীও। বিজ্ঞাপনে এমন কোন দিক নেই-চা, কোল্ড ড্রিংক্স, বিস্কুট, চকলেট, চানাচুর, নুডুলস, চুলের তেল, রান্নার তেল, শ্যাম্পু, সিমেন্ট, ঘরের টিন, টয়লেট ক্লিনারেও নারীই হচ্ছে মডেল। আফসোস গন্ধরাজ মেখে রেশমকালো চুল উড়িয়ে নেচে চলা সেই মেয়ের জন্য মরে গিয়েও অপসংস্কৃতির প্রচারণা থেকে যে রক্ষা পায়নি।

বর্তমান থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর আর ফিলিপাইনের মত আমাদের নারীরাও পর্যটন শিল্পে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে। আজকের মুক্ত নারীকে কাঁচামাল বানিয়ে Sex Industry র মাধ্যমে জাতীয় আয় বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। যৌনতাকে চলছে শিল্পে রূপদানের অপপ্রয়াস। উগ্র বিলাস ও ফ্যাশনের মোহে ছুটে চলা বৃন্তচ্যুত তরুণীদের বলছি
" ম্যানি কিউর করা সুদৃশ্য চোখে
সোনালী রৌদ্রের ঝিকিমিকি
পামকরা পরিপাটি চুলে কৃত্রিম রং
এর ছোঁয়ায়
মাসকারা স্পর্শে ভ্রমরকৃষ্ণযুগল
মোহমায় চোখ
একি! বেদনার ছায়া
তোমার স্নিগ্ধ মুখার যে!
অঢেলসম্পদ, শত ভোগ বিলাসেও।

অতৃপ্ত তুমি, তোমার মুখ! এভাবে বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে অপসংস্কৃতির কড়ালগ্রাসে আত্মাহুতি দিচ্ছে কত শত তরুণীরা। পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছে অশান্তি, বেড়েছে দুর্যোগে-দুর্ভোগ। মেয়েদের উচ্ছৃংখলতা ও বেহায়াপনায় শিকার হচ্ছে যুব সমাজ।

সিনেমা টেলিভিশন, ডিস্, অশ্লীল পত্রপত্রিকা ইত্যাদির সর্বক্ষেত্রে নারীর খোলামেলা উপস্থাপন নারী জাতির সম্মানকে করেছে ধুলায় লুণ্ঠিত আর নারীরা জাতি গঠনের মহান দায়িত্ব থেকে সরে গিয়ে নিজেকে পণ্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করতে সদা তৎপরতা চালাচ্ছে। নিজেকে পুরুষের সামনে রূপনীয় ও মোহনীয় করে তোলাই যেন তাদের প্রধান কাজ। ফলশ্রুতিতে চালু হয়েছে বৈষম্য সংস্কৃতির। থার্টি ফাষ্ট নাইটে তরুণীকে বিবস্ত্র করার সংস্কৃতি।

অথচ আল কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন "তোমরা জাহিলিয়াতের মত তোমাদের রূপ --- বাইরে প্রদর্শন করে বেরিও না।"

আমাদের সমাজে তরুণরা তরুণী আর তরুণীরা তরুণ সাজতেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ববকাটিং চুল আর প্যান্ট শার্টে চলাই যেন আমাদের তরুণীদের স্বাভাবিক কাল্‌চার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোও তারই প্রকাশ। মুসলমান হিসেবে মেয়েদের সতর ঢেকে চলাতো দূরের কথা বরং বর্তমানে পাজামা মেয়েরা টাখনুর উপর পর্যন্ত পরাকেই যেন সুন্নত হিসেবে নিয়েছে।

আমাদের দেশের নারী সমাজের নগ্নতা, বেহায়পনা আজ পাশ্চাত্য নারী সমাজকেও হার মানিয়েছে এ কারণে যে-পাশ্চাত্য সমাজ যেভাবে চলছে সেটা হয়তো নৈতিকতার মানদণ্ডে খারাপ মনে হচ্ছে তবে এধরনের চলাফেরা কিন্তু তাদের ধর্ম কৃষ্টি ও কালচার বিরোধী নয়। কিন্তু আমাদের এধরনের লাইফ ষ্টাইল একদিকে যেমন নৈতিকতার দৃষ্টিতে খারাপ তেমনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও হারাম, কাল্‌চার বিরোধী।

আজকের সমাজে সংস্কৃতিকে অনেকে স্থুল বিনোদনের ড্রয়ারে বন্দী করতে চান। তারা মনে করেন সংস্কৃতি হলো প্রেমের উপন্যাস বা ঢোল তবলার টোকা।তাদের জন্য বলতে হয় সংস্কৃতি নিছক স্থুল বিনোদনই নয় সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির মানস প্রবণতা, অনুষ্ঠানময় সামাজিকতা, শিল্প সাহিত্যের কারু কৃর্তি, ধর্মের প্রকৃতি ঐতিহ্যের সমুন্নতি এক কথায় সংস্কৃতি হচ্ছে জাতির বিশ্বাস ও মূল্য বোধের কর্মময় সুচিময় অতিব্যঞ্জনা।

অথচ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে সংস্কৃতি চর্চার নামে, অপসংস্কৃতির সয়লাবে ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয়ের এক লোমহর্ষক চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। মঙ্গল প্রদীপ, রাখিবন্ধন, পীর পূজা, কবর পূজা, শিখা চিরন্তনের নামে অগ্নিপূজা, মূর্তি সংস্কৃতি রাধাকৃশীল, সিঁদুর-তিলকচন্দন, আল্পনা অঞ্জলী, পরকীয়া প্রেম, অবাধ যৌনতা, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ফ্যাশন শো, লিভ টুগেদার, সেক্স ওয়ার্কার, ভ্যালেন্টাইন ডে, এপ্রিল ফুল উদযাপন, পুষ্পস্তবক মোনাজাতের পরিবর্তে শোকপ্রকাশে নীরবতা পালন, কালো পতাকা উত্তোলন নরনারীর কর্মদম ইত্যাদি শুধুমাত্র ধর্মবিরোধীই নয় সংস্কৃতি বিরোধীও।

আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালনকে সংস্কৃতির অংশ বানিয়ে নিয়েছে। তরুণরা ফুল দিয়ে বরণ করছে তরুণীদের বর-বধু সেজে নেচে গেয়ে র‍্যাগ ডে পালন করছে। নববর্ষে তরুণের কপালে চন্দন টিপ এঁকে দিয়েছে, হনুমান, কমর শেয়ালের মুখোশ পরে মিছিল করে যেন স্মরণ করছে "একদিন হনুমান ছিলামরে ------এ ------এ--- --একদিন হনুমান ছিলাম রে। এ হচ্ছে বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতির নমুনা। যারই অংশ হিসেবে থার্টি ফাস্টনাইটে বাঁধনরা বস্ত্রহরণের শিকার হচ্ছে। প্রেমের বলী হিসেবে হাজারো তিন্নিকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হচ্ছে।

মুসলিম তরুণ-তরুণীদের এ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লামা ইকবালের কণ্ঠে

"তোমার অস্তিত্ব পুরোপুরি ফিরিংগীর প্রকাশ
কেননা তাদের কারিগরের হাতে গড়া তুমি
কিন্তু তোমার এমনটির দেহ পিঞ্জর খুদী শূন্য
তুমি শুধু অস্ত্রশূন্য স্বর্ণাভ খাপ।"

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী অন্তসার শূন্য জীবনে সে দেশের নারীরা আজ ক্লান্ত। জীবনের মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে তারা আজ হোটেলে বারে মদকেই চির সঙ্গী করে নিয়েছে। ফিরে আসছে তারা আবার ইসলামের দিকে। আজকে ইস্রাইলি সমাজে যেখানে প্রায় প্রতি তিন ঘরে একজন মেয়ে তার বাবার দ্বারা সতীত্ব হারাচ্ছে সেখানে দাবী উঠেছে পারিবারিক ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের প্রয়োগের ব্যাপারে অথচ আমাদের মুসলমানদের ব্যক্তির মধ্যে নেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম।

www.pathagar.com

আজকের চলচ্চিত্র ও সাহিত্য অঙ্গনে নেই এতটুকু নিজস্বতা, নকল পুচ্ছ লাগিয়ে আমরা সবাই ময়ূর সাজতে ব্যর্থ চেষ্টা করছি। অথচ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন-"আমাদের ঘরও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ আমাদের আশা ও ভরসা লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদীস মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে, হিন্দুরা সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে।"

তাই মুসলমান হিসেবে আজকে চলচ্চিত্র, শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে যে আগ্রাসন চলছে তা তরুণ সমাজের মেধা ও মননকে গলাটিপে হত্যা করছে। পরজীবী প্রাণীতে পরিণত করছে। অচিরেই তা বন্ধ করতে না পারলে এদেশের তরুণ/তরুণীদের বাঁচানো যাবে না। প্রতিবেশী দেশ থেকে স্রোতের বেগে যে বই পত্র ম্যাগাজিন আমদানি হচ্ছে তা আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির গোলামে পরিণত করছে । বিজাতীয় নকল বেশ ধারণ করতে গিয়ে আমরা আজ নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে যেতে বসেছি। চিত্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা, মিশরের রুপালী পর্দায় যিনি কম্পন সৃষ্টি করেছিলেন ঢেউ তুলেছেন, তিনি ছায়াছবির দুনিয়া থেকে ইসলামী দুনিয়ায় ফিরে এসেছেন। সেই শামসুল বারুদী বলেন-

"আমার জন্য সে জগত ছিল স্বপ্নময়। সেটা এমন এক জগত যাকে অনেকেই সীমাহীন জৌলুসময় জীবন বলে মনে করেন।

জীবনকে ভোগ করার আর বিলাসে ডুবে যাওয়ার সব রকমের উপকরণ সে জগতে বিদ্যমান। এমন জীবন একজন মুসলমান কখনো বরণ করে নিতে পারে না, কুৎসিত সে জীবন, কৃত্রিম আলোতে, ভোগ আর বিলাসের নরকীয় কীট সেখানে খেলা করে। আমি ছিলাম সে জাতির এক বাসিন্দা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ তরুণ, তরুণীদের বিশ্বাস চিন্তা -চেতনা, পোশাক-আশাক, চলন বলন,আচার আচরণে তারই ছাপ পড়ছে।

অপসংস্কৃতি রোধে করণীয় ঃ

অপসংস্কৃতির এই আগাছায় জাতি আজ হুমকির মুখে।এই আগাছার মূল্যেৎপাটন করতে না পারলে মুসলিম জাতি হিসেবে অস্তিত্ব মুছে যাবে। তাই এ অবস্থা মোকাবেলায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য যা করণীয় -

* ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা
* নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা
* সহ-শিক্ষা ও সহ কর্মক্ষেত্রের পথ বন্ধ করা
* অপসংস্কৃতির মূল্যেৎপাটন করে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা বাড়াতে হবে।
* গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমুন্নত করার লক্ষ্যে আমাদের ইতিবাচক ও গঠনমূলক সাহিত্য চর্চা ও স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও সুস্থজীবন কর্মের ভিত্তিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি মৌল কাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
* দেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে অনাচার ও নৈরাজ্য মুক্ত করতে হবে।
* হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে হবে।

তাই সবশেষে অপসংস্কৃতির অক্টোপাসে আবদ্ধ নারী সমাজকে বলছি- ফিরে দাঁড়াও ম্লান সন্ধ্যার পাখীরা, অপসংস্কৃতির রোধে সুস্থ ও মননশীল সংস্কৃতির বিকাশে ফিরে দাঁড়াও, রুখে দাঁড়াও। চলো-

অপসংস্কৃতির আগল ভেঙ্গে চুড়ে আজ
শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভিজবো সবাই
নব্য জাহেলিয়াতের প্রহর কেটে
গোলাপের সৌরভে ভরাবো হৃদয়
জীবনের প্রান্তরে, ভোরের আলো
ফুটাবো নবারুন সাজ
নূতন স্বপ্নে নূতন রঙ্গে
রাঙাবো সমাজ আজ ॥

www.pathagar.com

দৈনন্দিন জীবনাচরণে ইসলাম

আলেয়া বেগম সুমী

দুনিয়ায় অসংখ্য মানুষ রয়েছে। রয়েছে প্রত্যেক মানুষের জন্য ধর্মীয় আচার আচরণের অনুষ্ঠান। গাছের মূলে যেমন বীজ তেমন সকল কাজের মূলেই রয়েছে বিশ্বাস।

মূলত বিশ্বাসের দরুন মানুষের কর্ম পৃথক হয়। ঈমানই মুসলমানদের জীবনে মূল চালিকাশক্তি, ঈমান দুর্বল হলে আমল দুর্বল হয়। ঈমান মজবুত হলে আমল তদ্রূপ মজবুত হয়। একজন মুসলমান তার ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সকল কিছু মহান আল্লাহর নির্দেশানুসারে করতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ মানুষকে তার পছন্দনীয় কাজ করা ও তার আদেশ পালন করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করিনি।" – সূরা আল যারিয়াত : ৫৬

তাই মানব জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী হতে হবে। আর তা হলে ইবাদত বলে গণ্য হবে। এই ইবাদত হল দুনিয়ার জীবন ও পরকালের জীবনে সাফল্য ও সুখ শান্তি অর্জনের একমাত্র পন্থা। যুগে যুগে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণই এ ইবাদতের পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে গিয়েছেন। নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পাওয়া এ বিধান মেনে চলার মাধ্যমে মানব প্রকৃতি শান্তি পেতে পারে। আমরা দেখি আল্লাহর এই বিশাল প্রকৃতি সর্বদা তারই নির্দেশ ও হুকুম মেনে চলছে। তাই তাদের মাঝে কোন বিশৃংখলা দেখা যায় না। তাছাড়া আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সূচনায় একটি মর্যাদা দিয়েছেন। আর সে সম্মান ও মর্যাদার পদবী হল মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহর এ প্রতিনিধির দায়িত্ব যেন মানুষ সুচারুরূপে পালন করতে পারে সে জন্য তাকে কিছু যোগ্যতা দিয়েছেন যেমন ঃ

১. তার দৈহিক অবয়ব সুসামঞ্জস্যশীল করে তৈরি করেছেন।
২. তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি দিয়েছেন। যা দ্বারা সে বিচার বিবেচনা করতে পারে।
৩. চিন্তাশক্তি বা বিবেক।
৪. পৃথিবীর সকল কিছু তারই অধীন করেছেন।

আল্লাহ বলেন–

তোমরা কি দেখনি যা কিছু আসমানে আছে- আর যা কিছু জমীনে আছে আল্লাহ তার সবকিছুকেই তোমাদের অধীন বানিয়ে দিয়েছেন। তার প্রকাশ্য ও গোপন নেয়ামতসমূহ তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। – সূরা লুকমান ঃ ২০

www.pathagar.com

তাই মানুষের কোন স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করার কোন সুযোগ নেই। মূলত মুসলিম শব্দের অর্থই হল আত্মসমর্পণ করা। একজন মুমীন ঈমান এনে কালিমার বাক্যগুলো উচ্চারণ করার মাধ্যমে সে এ কথা জাহির করে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুর কাছে সে মাথা নত করবে না। এ বিশ্বাস তার মধ্যে এমন দৃঢ় প্রত্যয়, ধৈর্য ও অধ্যাবসায় সৃষ্টি করে যা তাকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে সাহায্য করে।

এখানে একটি নৌকার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আমরা জানি হাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নৌকা কখনও বিপদের সম্মুখীন হয় না। তাই একজন ঈমানদার ব্যক্তি যখন আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে তখন সে তার জীবনের চলার পথে সকল ক্ষেত্রে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে। ফলে তার জীবনে নেমে আসে অনাবিল সুখ ও শান্তি। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর নির্দেশের কোন তোয়াক্কা না করে নির্বিঘ্নে চলে তার জীবনে নেমে আসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আমাদের এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যু একদিন না একদিন আমাদের এ জীবনের যবনিকা টেনে শেষ জীবনে পৌঁছে দিবে। জবাব দিতে হবে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের। এ দিকগুলো সামনে রেখে আসুন দেখা যাক তাহলে একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন কেমন হওয়া উচিত।

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব হল তার চরিত্রে। উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন করার জন্য রাসূল (সাঃ)কে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মত হতে হবে। একজন মুসলিম তার দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের মৌলিক নির্দেশ তথা ফরজ, ওয়াজীব, হালাল হারামগুলো অবশ্যই নিষ্ঠার সাথে পালন করবে।

সে তার প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনায় যা মেনে চলবে তা হলো–

১. আল্লাহর অনুগত হওয়া

একজন মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনের শুরুই হবে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যের স্বীকৃতির মাধ্যমে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"নামায দ্বীন ইসলামের ভিত্তি। যারা নামায কায়েম করে তারা দ্বীনকেই কায়েম রাখে, আর যারা নামায ছেড়ে দেয় তারা দ্বীনের ভিত্তি চূর্ণ করে দেয়।"

রাসূল (সাঃ) আরও বলেন–

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয় সে কুফরী করে।"

মূলত নামাযের মাধ্যমে একজন মুসলমান রুকু, সিজদা, কেয়াম, তসবীহ, কেরাত ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে এ ওয়াদা করে যে দুনিয়াতে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবে এবং খোদার নাফরমানি সে করবে না।

বান্দা আল্লাহর কাছে এ ওয়াদা ও চুক্তি করে থাকে ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, দ্বিপ্রহরের সামান্য পরেই, কর্মব্যস্ত বিকাল বেলা সূর্যাস্তের পরপরই এবং রাত্রির কিছু অংশ পার হয়ে গেলে।

এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি এভাবে পরিশুদ্ধ হয় যার কথা রাসূলের হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়। রাসূল (সাঃ) বলেন–

"তোমাদের কারো বাড়ির নিকটে যদি নদী থাকে, আর সে যদি তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার গায়ে ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবাগণ বলেন "না কখনই থাকতে পারে না"। রাসূল (সাঃ) পুনরায় বললেন ঠিক এভাবে যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার ঠিকমত নামায আদায় করে তার মধ্যে কোন গুনাহ থাকতে পারে না।"

কাজেই নামাযের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সাথে শুধু আল্লাহর সম্পর্কই তৈরি হয় না বরং ব্যক্তি জীবনকে পাক, পবিত্র ও দোষমুক্ত করে তোলে। তাই নামাযের মাধ্যমে হবে দিনের শুরু। আমরা যখন যে কাজেই থাকি না কেন নামাযের সময় হলেই আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে হবে। কেননা এরই মাধ্যমে মানুষের দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা অর্জিত হয়।

মহান আল্লাহ বলেন–

নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর। আর আমাকে স্মরণের জন্যে সালাত কায়েম কর।" –সূরা দোহাঃ ১৪

www.pathagar.com

২. কুরআন তেলাওয়াত

কুরআন তেলাওয়াত হবে মুমীন জীবনের সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায় একমাত্র শান্তি লাভের মাধ্যম।

রাসূল (সাঃ) বলেন, 'বান্দা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে,

প্রবল ইচ্ছা আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতার সাথে কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। কেননা কুরআনই আমাদের সংবিধান, তাই একজন মুমীন সর্বদা কুরআনের মাধ্যমে নিজের জীবনের করণীয় পন্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকে।

নবী করীম (সাঃ) বলেন–

"কুরআন পাঠকারীকে কিয়ামতের দিন বলা হবে যে, ধীর গতিতে এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরে সুসজ্জিত করে দুনিয়ায় যেভাবে কুরআন পাঠ করতে ঐভাবে কুরআন পাঠ কর। এবং প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে একস্তর উপরে উঠতে থাক, তোমার বাসস্থান তোমার তেলাওয়াতের শেষ আয়াত স্থল। (তিরমিযী)

এ জন্য আমাদের করণীয় হল–

১. বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা।
২. কুরআন তেলাওয়াতের জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময় বেছে নেয়া।
৩. অর্থ বুঝে পড়ার জন্য অন্তত দিনে ৩০ মিঃ সময় দেয়া।

৩. পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধাংশ, এ পরিচ্ছন্নতা দরকার যেমন আত্মিক তেমনি দৈহিক। আত্মার পরিশুদ্ধতা হল আত্মাকে কুফর, শিরক, নাফরমানি ও গোমরাহি অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, পুতঃ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং শারীরিক পবিত্রতা হল অপবিত্র জিনিস থেকে নিজেকে পবিত্র করা।

সকল ধরনের নাজাসাত থেকে পরিচ্ছন্ন থাকা, সপ্তাহে একদিন ন্যূনতম গোসল করতে হবে। অজু ও গোসল হল পবিত্রতার মাধ্যম। নিয়মিত নখ কাটা ও পরিষ্কার রাখা ও মেসওয়াক করার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, নবী (সাঃ) বলেছেন- আমি যদি উম্মাতের কষ্টের কথা চিন্তা না করতাম, তাহলে তাদের প্রত্যেক অযুর সময় মেসওয়াক করতে বলতাম।

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে তিনি ধুলাবালি মিশ্রিত ময়লা কাপড় পরিধান করে এলোমেলো চুলে এসেছেন। তখন তিনি বললেন এর কাছে কি এমন কিছু নেই। যার দ্বারা কাপড় ধুয়ে পরিধান করে আসতে পারে। এবং মাথা আঁচড়িয়ে আসতে পারে।"

তাই এমন নোংরা পোশাক পরিধান করা ঠিক নয়। যা অপরের ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে।

মাথা পরিপাটি রাখা ও হাঁচি দেয়ার সময় মুখে রুমাল দেয়া উচিৎ।

৪. পোশাক পরিচ্ছেদ

মহান আল্লাহ বলেন–

"হে আদম সন্তানগণ! আমি তোমার জন্য পোশাক নাযিল করেছি। যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে। এবং যা সৌন্দর্যের উপকরণ। আর তাকওয়ার পোশাকই উত্তম।" – সূরা আ'রাফ : ২৬

পোশাক পরিধানের ২টি উদ্দেশ্য

১. ইজ্জত আবরু ঢেকে রাখা
২. সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।

পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। একজন ব্যক্তির পোশাকের মাধ্যমে তার রুচি, ব্যক্তিত্ব, কৃষ্টি বা স্বভাব ফুটে ওঠে।

আল্লাহ মানুষকে সুন্দর আকৃতি ও দেহ কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান তার বান্দারা সুন্দর পোশাক পরিধান করুক। তাই পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া আছে যা আমাদের মেনে চলতে হবে।

এমন পোশাক পরিধান করা উচিৎ যাতে সতর ঢাকা থাকে সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। নারীর পোশাক পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক নারীর পরিধান করা বাঞ্ছনীয় নয়। মুসলমানের জন্যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় নিদর্শন বহনকারী

www.pathagar.com

পোশাক পরিধান করা ইসলাম অনুমোদন করে না। অথচ মুসলমানদের কৃষ্টি-কালচার আজ তা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। ইসলাম সহজ সরল ও সাদাসিধে চালচলন ও পোশাক পরিচ্ছদ এবং শালীনতাকে পছন্দ করে। যে সব পোশাকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় তাকে অপছন্দ করে।

একটি কথা মনে রাখা দরকার। পোশাক আল্লাহর এক বিরাট স্মারক চিহ্ন। যা তিনি অন্যান্য সৃষ্টিকে দেননি। তাই এই নেয়ামত স্মরণ করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

রাসূল (সাঃ) যখনই কোন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন তিনি সে পোশাকের নাম ধরেও দোয়া করতেন–

"হে আল্লাহ! তোমার শোকর, তুমি আমাকে এ কাপড় পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার নিকট উহার কল্যাণকারীতার প্রত্যাশী, কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাপড় তৈরি করা হয়েছে। আর আমাকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। এ কাপড়ের মন্দ থেকে, কাপড় যে মন্দ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে সে মন্দ থেকে।" – আবু দাউদ

পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। এমন আটসাঁট ও পাতলা কাপড় পরিধান করা ঠিক নয় যা দ্বারা শরীরের গঠন প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন "যারা কাপড় পরিধান সত্ত্বেও উলঙ্গ থাকে তারা জাহান্নামী। তারা অপরকে সম্মোহিত করে। আর নিজেরা ও অপরের উপর সম্মোহিত হয়। তাদের মাথা প্রসিদ্ধ বুখ্ত নগরের উটের চোটের ন্যায় বাঁকা অর্থাৎ এরা চলার সময় অহংকার বশত ঘাড় হেলিয়ে দুলিয়ে চলে। এসকল ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধী পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধী বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে।"

আজ মুসলমানদের পোশাকের দিকে তাকালে দেখা যাবে অনেকেই পোশাক যত ফিটিংস এবং খাট হবে ততই যেন নিজেকে smart বলে ভাবতে থাকে।

পোশাক সর্বদা নিজের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুযায়ী পরিধান করা উচিত। এমন পোশাক পরিধান করা ঠিক না, যা দ্বারা অহংকার বা আড়ম্বর প্রদর্শিত হয়। এবং অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের অর্থের প্রাচুর্য প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়। আবার নিকৃষ্টমানের পোশাক পরিধান করে সম্বলহীনের বেশ ধারণ করাও ঠিক নয়।

আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা পুরান, ছিঁড়া, তালি দেওয়া কাপড় পরিধান করে, যাতে সম্বলহীনের বেশ ধারণ করে, এবং এটাতে পরহেজগারী বলে মনে করে। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয় বরং যারা রুচিশীল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে তাদেরকে দুনিয়াদার বলে সমালোচনা করে।

হযরত আবু আহওয়াছ (রাঃ) এর পিতা নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সাঃ) এর দরবারে অত্যন্ত নিম্নমানের একটি কাপড় পরিধান করে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি কোন ধন-সম্পদ আছে? আমি বললাম জ্বি আছে। তিনি বললেন কি ধরনের সম্পদ আছে। আমি বললাম আল্লাহ আমাকে উট, ঘোড়া, বকরী, গোলাম ইত্যাদি সর্বপ্রকার ধনসম্পদই দান করেছেন। তিনি বললেন আল্লাহ তোমাকে সর্বপ্রকার ধন-সম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। তবে তোমার শরীরেও তার দান ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ থাকা উচিত।" – মেশকাত

অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতে শোকরিয়া আদায় করতে হবে।

একবার প্রখ্যাত সূফী হযরত আব্দুল হাসান আলী শাযালী অত্যন্ত উত্তম ধরনের কাপড় পরিহিত ছিলেন। দুনিয়া ত্যাগী অপর এক সূফী তাঁকে এমতাবস্থায় দেখতে পেয়ে প্রতিবাদ করে বললেন যে, আল্লাহ ওয়ালাদের অত মূল্যবান জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করার কি প্রয়োজন? হযরত শাযালী বললেন, উত্তম। ভাই এটা হল মহান প্রতাপশালী মহাশক্তিশালী আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। আর তোমার এ সহায়, সম্বলহীনতা হলো ভিক্ষুকের ছবি, তুমি নির্বাক অবস্থার দ্বারা মানুষের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করছ। প্রকৃতপক্ষে ছেঁড়া-ফাটা, পুরান, তালি দেয়া নিম্নমানের পোশাকে যেমন পরহেযগারিতা নেই ঠিক তেমনি পরহেযগারিতা নেই অত্যন্ত মূল্যবান, গৌরবময় পোশাক পরিধানের মধ্যেও। পরহেযগারিতা মানুষের নিয়ত ও সার্বিক চিন্তাধারার ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃত সত্য হল মানুষ তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতানুযায়ী মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সমতা রক্ষা করে চলবে।

এ প্রসঙ্গে অন্য আর এক হাদিস স্মরণ করা যায়–

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" এক ব্যক্তি ওঠে বললো- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক ব্যক্তিই তো এটা চায় যে, তার কাপড়খানা সুন্দর হোক, তার জুতা জোড়া উত্তম হোক। নবী (সাঃ) বললেন, আল্লাহ সুন্দর তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।

উপরোক্ত ঘটনা এবং হাদিসের মাধ্যমে পোশাকের ধরন জানতে পারলাম। শুধু তাই নয় সুন্দর পরিপাটি জীবন হবে মুসলমানের জীবন।

একদিন নবী করীম (সাঃ) মসজিদে ছিলেন। এমতাবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চুল দাড়ি নিয়ে একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করলো। নবী (সাঃ) তাকে হাত দ্বারা চুল দাড়ি ঠিক করার ইঙ্গিত করলেন। নবী করীম (সঃ) বললেন, মানুষের চুল দাড়ি এলোমেলো থাকার চেয়ে পরিপাটি করে নেয়া কি উত্তম নয়?

তা না হলে এমন অবস্থায় মনে হয় সে যেন শয়তান।"-মেশকাত

উপরোক্ত হাদিসগুলোর মাধ্যমে আমরা পোশাকের একটি নমুনা পেলাম। যা মানার মাধ্যমে আমাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

৫. খাদ্য ও পানীয়

আল্লাহ পাক মানুষকে তার স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। সকল প্রাণীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এর জন্য কোন হালাল হারাম বিধান নেই। যেহেতু মানুষ আল্লাহর মর্যাদা সম্পন্ন সৃষ্টি। তাই যেনতেন খাবার তার জন্যে নয় বরং সবচেয়ে সুস্বাদু কল্যাণকর জিনিস রাখা হয়েছে মানুষের জন্যে।

মহান আল্লাহ বলেন-

"হে মানব জাতি! পৃথিবীর বুকে যে হালাল ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য আছে, তা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

ইসলাম কেবল সেই সব জিনিসকে হারাম করেছে যা অপবিত্র আর তা হল মানুষের জন্য অকল্যাণকর।

(ক) মৃতপ্রাণী (অর্থাৎ যে সব প্রাণী যবেহ ছাড়া প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যুবরণ করেছে)
(খ) আল্লাহর নাম ছাড়া যে সব প্রাণী যবেহ করা হয়েছে।
(গ) যেসব প্রাণী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে
(ঘ) শূকর
(ঙ) মাংসাশী প্রাণী।
(চ) বন্য পশু- যে প্রাণীকে শিকার করেছে।
(ছ) প্রবাহিত রক্ত
(জ) এ্যালকোহলযুক্ত সকল ধরনের পানীয় যেমন- বিয়ার, মদ, হুইস্কি, স্পিরিট ইত্যাদি।

উপরোক্ত জিনিসগুলো আল্লাহ খেয়ালী বসে নিষিদ্ধ করেননি বরং তা মুসলমানদের জন্য অকল্যাণকর।

একটি সুস্থ ও শান্তিময় সমাজের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ইসলাম সকল পাপাচারের মূলোৎপাটন করতে চায়।

তাই একজন মুসলিম সর্বদা খাবারের ক্ষেত্রে ইসলামের এ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবে। সেই সাথে খাবারের সময়ও কিছু শিষ্টাচার মেনে চলবে। যেমন ঃ খাবার শুরু করার পূর্বে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। খাবার শেষে দোয়া পাঠ করবে। হারাম খাবার পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে হবে।

ডান হাত দিয়ে খাবে। খাবার শুরুর পূর্বে ও পরে হাত ধুয়ে নিবে। পুরোপুরি পেট না ভরে খাওয়া উত্তম। পানি বা অন্যান্য কোমল পানীয় এক নিঃশ্বাসে খাওয়া উচিত নয়। বরং থেমে খাওয়া উচিত।

বর্তমান সমাজের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন ধরনের হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোতে অনেককে খেতে দেখা যায়। তাদের খাবারের ধরন দেখে মুসলিম হিসেবে তাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ব্যক্তি চরিত্র সংশোধনীর জন্য ইসলাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব বর্ণনা করে দিয়েছে। তাই অনেকে একত্রে খেতে বসলে যারা

www.pathagar.com

দেরিতে ও ধীরে ধীরে খায় তাদের প্রতি খেয়াল রেখে খেতে বলেছে। যাতে যতটুকু খাবার আছে তাতে সবাই সমানভাবে পায় এবং অন্যজন খাবার গ্রহণে সংকোচবোধ না করে কিংবা অল্প খেয়ে ওঠে না যায়। খাবারের সময় অপ্রয়োজনীয় কথা বলা উচিত নয়। এতে খাদ্য গ্রহণে সমস্যা হতে পারে।

হাদিসে বলা হয়েছে–

পান করার সময় কেউ যেন পান পাত্রে শ্বাস না ফেলে।" – বুখারী

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন "মুমীন এক অন্ত্রনালীতে খায়। আর কাফের সাত অন্ত্র নালীতে খায়।"

৬. লেনদেন

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় করা অপরিহার্য। ইসলাম স্বেচ্ছাচারী হয়ে যে-কোন পন্থায় অর্থ আয় ও ব্যয় করাকে সমর্থন করে না।

রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন- নিজেদের হাতে উপার্জনের চাইতে উত্তম খাদ্য আর কেউ খায়নি। আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আঃ) নিজের হাতে শ্রম করে খাদ্য গ্রহণ করতেন। অন্য একটি হাদিসে আরো বলা হয়েছে। "যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে সে তা থেকে সদকা করলে তা কবুল হবে না, এবং নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণে ঐ অর্থ ব্যয় করলে তাতে বরকত হবে না। আর ঐ সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার দোযখের দরজা হবে।"

তাই একজন মুসলমান প্রতিদিন যা উপার্জন করবে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমা লংঘিত হচ্ছে কিনা তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ইসলামে হারাম পথে অর্থ উপার্জনের যেমন অনুমতি নেই তেমনি নেই হারাম পথে ব্যয়েরও।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

তারা বলেন ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল ও রিবাকে হারাম করেছেন। –বাকারা : ২৭৫

ইসলাম একদিকে যেমন সুদ, ঘুষকে হারাম করেছে তেমনি অন্যের অর্থ সম্পদ আত্মসাত করাকে সমানভাবে ঘৃণা করে। ব্যক্তি তার উপার্জিত টাকা-পয়সা ধন-সম্পদের একক মালিকানা। বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ রিবা, কিন্তু এটি এমন একটি মারাত্মক জীবাণু, যা কিনা ব্যক্তির সম্পদকে কলুষিত করে। যাকাত যেমনিভাবে অর্থকে করে তোলে পবিত্র ও সমৃদ্ধ। তদ্রূপ এ রিবা ও সুদের মাধ্যমে গরীবদের সম্পদ ধনীদের হাতে তুলে দিয়ে সম্পদকে কলুষিত করে। একারণে সুদমুক্ত অবস্থায় ব্যবসা, বাণিজ্য চাকরি, বাকরি করা দরকার। অনেকে মনে করে সমাজে সকল জায়গায়ই অনাচারে ভরে আছে। সুদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা তেমন দোষের কিছু নয়। আসলে এটি ভুল। কেননা এর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দ্বারা যা করা হবে তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থলে অকল্যাণ ডেকে আনবে। এবং সুদী ব্যক্তির অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত খাবার খেয়ে কখনও কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। তাই এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ থেকে অবশ্য অবশ্যই দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির দিকে মুখ তুলে দেখবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না যে মিথ্যা শপথ রেখে নিজের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করতে চেষ্টা করেছে।"

অন্য হাদিসে আছে সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদের সাথে থাকবে। তাই ব্যবসায়ী যারা তাদের উচিত মিথ্যা শপথ না করা, নম্র ব্যবহার, সত্য বলা ও ওয়াদা রক্ষা করা, কাউকে কর্জে হাসানা দিলে তা উত্তমরূপে নেয়া, দিতে না পারলে ক্ষমা করে দেয়া। তবে যদি দেয়ার সামর্থ্য থাকে তবে অনর্থক ঘুরানো ঠিক নয়।

৭. নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ায়

মহান আল্লাহ বলেন- "তারা কি দেখেনি যে আমি রাতকে সৃষ্টি করেছি যেনো তারা তাতে সুখ ও শান্তি ভোগ করে আর দিনকে উজ্জ্বল হিসেবে। নিঃসন্দেহে এতে মুমীনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

এ আয়াতে বুঝা যাচ্ছে দিনের আলোতে কায়িক পরিশ্রমের জন্যে ও রাতকে আল্লাহ বিশ্রামের জন্য বানিয়েছেন। আল্লাহ প্রত্যেকটি নিয়মের সাথে রেখেছেন কল্যাণ। যারা অলসতার কারণে দিনে ঘুমিয়ে কাটায় অথবা অত্যধিক আনন্দ উল্লাস ও খেল তামাশায় মত্ত হয়ে সারারাত জেগে কাটায়, তারা প্রকৃতির কৌশলকে হত্যা করছে।

www.pathagar.com

অতিরিক্ত আরাম আয়েশ ইসলাম পছন্দ করে না। এক্ষেত্রে ইসলামের কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "সন্ধ্যার সময় ছোট শিশুদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেবে না। কেননা ঐ সময় শয়তানরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, শোয়ার পূর্বে বিছানা ঝেড়ে শুতে হবে।

হাদিসে বলা হয়েছে-

"রাতে তোমাদের যখন কেউ বিছানা থেকে ওঠে বাইরে যায় এবং জরুরি কাজ সেরে পুনঃ বিছানায় ফিরে আসে, তখন নিজের মাথার তহবন্দের একমাথা দিয়ে তিনবার বিছানা ঝেড়ে নিবে। কেননা সে জানেনা যে তার প্রস্থানের পরে বিছানায় কি এসে গিয়েছে।"

একজন মুমিন ব্যক্তি সর্বদা ঘুমানোর পূর্বে আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাতে যাবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন-

যে ব্যক্তি বিছানায় বিশ্রাম করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের কোন সূরা পাঠ করে, আল্লাহ তার নিকট একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন যে সে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তাকে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বিপদ থেকে পাহারা দিয়ে থাকে। সে যে কোন সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হোক না কেন।

তিনি আরো বলেন ঃ

"মানুষ যখন বিছানায় যায়, তখন একদল ফিরিশতা ও একজন শয়তান তার সাথে পৌঁছে। অতঃপর ফেরেশতা বলে ভাল কাজের মাধ্যমে তোমার কর্ম শেষ কর। আর শয়তান বলে মন্দ কাজ দ্বারা তোমার কর্ম শেষ কর। যখন যে ভাল কাজ অর্থাৎ আল্লাহর নাম স্মরণ করে ঘুমায় তখন ফেরেশতা তাকে সারারাত পাহারা দিবে। অন্যথায় শয়তান পাহারা দিবে।"

ঘুমানোর সময় ডান কাত হয়ে ঘুমানো উচিত। ঘুম মৃত্যুর সমতুল্য। তাই ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ দোয়া পড়া মুমীনের কর্তব্য।

একজন মুমীন ব্যক্তি শেষ রাতে ওঠে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে। তাই রাতে অযথা সময় নষ্ট না করে, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ব্যবস্থা করা উচিত অনেকে রাতের বেলা টি.ভি ও বিচিত্র ধরনের চ্যানেল দেখে অযথা সময় নষ্ট করে। ফলে ফজরে ওঠা তো সম্ভব হয়ই না বরং দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে রিযিক লাভের সময়কেও নষ্ট করে থাকে।

৮. আচার ব্যবহার/ পারস্পরিক আচরণ

ইসলাম একটি উন্নত নৈতিক চরিত্র ও সুসভ্য জাতি গঠনের অঙ্গীকারের নাম। তাই এর মাঝে রয়েছে শিষ্টাচার ও পারস্পরিক মজুবত ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার পন্থা। এগুলো হল-

ক. সালাম বিনিময় ঃ

মহান আল্লাহ বলেন- "কেউ যখন তোমাদেরকে সম্ভাষণ করে তখন তার চেয়েও উত্তম সম্ভাষণ কর, অথবা অনুরূপভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা নিসা ঃ ৮৬)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিন বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ সে সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হও। আর তোমরা পুরোপুরি মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিব না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করো। (মুসলিম)

সালাম দেয়া সুন্নত এবং উহার জবাব দেয়া ওয়াজিব। সালামের শব্দ যতবেশি হবে নেকীও ততবেশি। এ সালামের মাধ্যমে এক মুসলমান অন্য মুসলিমের কল্যাণ কামনা করে থাকে।

সালামের পর মোছাফাহা করা দ্বারা আরো বেশি সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

যদিও সালাম হচ্ছে মুসলমানদের প্রথম সম্ভাষণ তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে যেমন-

কোন বৈঠক চলাকালীন সময়। কেননা এতে শ্রোতা এবং বক্তা উভয়ের কাজে ব্যাঘাত ঘটে থাকে।

খাওয়ার সময়, বাথরুমে থাকা অবস্থায়, নামাজরত অবস্থায়।

www.pathagar.com

খ. অনুমতি গ্রহণ ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তির একটি আলাদা স্বকীয়তা রয়েছে। তাই ইসলামী শিষ্টাচার হল বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ না করা। মহান আল্লাহ বলেন–

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর ও গৃহবাসীদেরকে সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আশা করা যায় যে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। তোমরা যদি গৃহে কাউকে না পাও তাহলে অনুমতি দেয়ার পূর্বে তাতে তোমরা প্রবেশ করো না।"

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আরো বলেছেন–

"তোমাদের গৃহে তোমাদের শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন।"

এ শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। তাই এ অনুমতি চাওয়ার বিধানে উপকারিতা হল–

প্রথমতঃ মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয়তঃ যখন কোন ব্যক্তি অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনিতভাবে কারো সাথে সাক্ষাত করবে, তখন প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্ন সহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার চেষ্টা করবে।

তৃতীয়তঃ বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করলে পর্দা লঙ্ঘন হবে এবং গৃহবাসী অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকলে সাক্ষাত প্রার্থীর প্রতি বিরক্ত হবে এবং তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।

তাই কারো গৃহের দরজা খোলা থাকলেও উচিত দরজাটি বন্ধ করে নক করা অথবা দূরে থেকে অনুমতি নেয়া। প্রবেশ করা যাবে না। অথবা উঁকিঝুঁকি দেয়া যাবে না। আবার অনুমতি নিয়ে প্রবেশের কথা বলায় যখন তখন অনুমতি চাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিছু সময় আছে যা ব্যক্তির একান্ত বিশ্রামের সময় এ সময়গুলোতে যাওয়া ঠিক নয়।

রাসূল করীম (সাঃ) নিম্নলিখিত নিয়ম কানুন চালু করেছিলেন-

১. রাসূলে (সাঃ) ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এই অধিকারকে শুধু ঘরে প্রবেশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই বরং তিনি উহাকে একটি সাধারণ অধিকার রূপে গণ্য করেছেন। এই দৃষ্টিতে অপরের ঘরের মধ্যে তাকানো, বাহির হতে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ এমনকি চিঠিপত্রও অনুমতি ছাড়া পাঠ করা নিষিদ্ধ হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'চক্ষু যখন ভিতরে চলে গেল তখন নিজে প্রবেশ করার অনুমতি চাওয়ার কি অর্থ হতে পারে?" – আবু দাউদ।

২. ফিকাহবিদগণ দৃষ্টি নিক্ষেপের ন্যায় ঘরের কথা শুনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এটিও মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারে হস্তক্ষেপ।

৩. কেবল অন্যের ঘরে প্রবেশের ব্যাপারে যে অনুমতি নিতে হবে এমন নয়। নিজের মা ও বোনের ঘরে প্রবেশ করতে হলেও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন "নিজের মায়ের নিকট যেতে হলেও কি অনুমতি নিতে হবে? তিনি বললেন- হ্যাঁ। সে বলল "আমি ছাড়া তার খেদমত করার আর কেউ নেই। এখন প্রত্যেক বারই কি অনুমতি নেব?" তখন রাসূল (সাঃ) বললেন "তুমি কি তোমার মাকে উলংগ অবস্থায় দেখা পছন্দ করবে? তখন লোকটি বলল, না। তখন নবী (সাঃ) বললেন, "তবে অনুমতি নিয়ে যাও।"

৪. অবশ্য কারো ঘরে কোন আকস্মিক বিপদ দেখা দিলে তখন অনুমতি নেয়ার হুকুম প্রযোজ্য নয়। যেমন ঃ ঘরে আগুন লেগে গেলে অথবা চোর ঢুকলে। এরূপ অবস্থায় সাহায্য প্রদানের জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যেতে পারে।

৫. অনুমতি চাওয়ার নিয়ম হল প্রথমে সালাম করবে, অতঃপর নিজের নাম বলে পরিচয় দেবে এবং ভিতরে আসার জন্য অনুমতি চাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বলতেন- "আসসালামু আলাইকুম হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), ওমর ঘরে আসবে কি?"

৬. অনুমতি নেয়ার জন্য রাসূল (সাঃ) তিনবার ডাক দেয়ার নিয়ম করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তিনবার ডাক দিলেও যদি কোন জবাব পাওয়া না যায় তবে ফিরে যাও।

www.pathagar.com

৭. অনুমতি হয় গৃহকর্তা নিজে দেবে অথবা অপর কোন দায়িত্বসম্পন্ন লোক।

৮. কারো শূন্য ঘরে প্রবেশ জায়েজ নয়। অবশ্য যদি ঘরের মালিক কাউকে অনুমতি দিয়ে থাকে তবে ভিন্ন কথা। যেমন যদি সে বলে যে, আমি উপস্থিত না থাকলেও আপনি আমার কামরায় বসবেন। কিংবা সে অন্যত্র থেকে আপনার আগমন বার্তা শুনে যদি বলে আপনি বসুন, আমি আসছি। নতুবা ঘরে কেউ নেই কিংবা ভেতর হতে কেউ কথা বলে না এরূপ অবস্থায় বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করা জায়েজ নয়।

৯. কেউ যদি কারো সাথে দেখা করতে না চায় বা অস্বীকার করে ব্যস্ততার দরুন সাক্ষাতে অপারগ বলে ক্ষমা চায় তবে এতে কোন দোষ নেই। এরূপ করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। এ অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। কাউকে সাক্ষাতে বাধ্য করা কিংবা দরজায় শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তার অসুবিধা সৃষ্টি করার কোন অধিকার নেই।

১০. কারো বসবাসের জায়গা নয় এবং সেখানে কোন কাজ বা কাজের জিনিস থাকলে প্রবেশ করতে অনুমতির প্রয়োজন নেই। যেমনঃ হোটেল, মুসাফিরখানা, মেহমানখানা, সরাইখানা, ডাক্তারখানা, দোকানপাট ইত্যাদি। যেখানে লোকদের প্রবেশ ও যাতায়াতের যাবতীয় অনুমতি রয়েছে।

অতএব আমাদের কর্তব্য অন্যের ঘরে প্রবেশ করার সময় প্রথমে সালাম করা, অতঃপর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা।

গ. কথাবার্তা

মহান আল্লাহ বলেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। মুমিনগণ তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা তা টেরও পাবে না। যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্যে শোধিত করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" -সূরা হুজরাতঃ ৪

রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাযত করে রাখার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। আমি তার বেহেশত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে পারি।" (বুখারী)

কথাবার্তা এমন একটি অস্ত্র যা দ্বারা কখনও মানুষকে বুলেটের ন্যায় বিদ্ধ হয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়া যায় আবার তা দ্বারা মানুষের শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করা যায়। তাই হাদিসে এ ব্যাপারে কঠোরতা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনে রাসূলের উদাহরণের মাধ্যমে বুঝা গেল কোন মজলিসে অথবা যখন তখন বড়দের বিরক্ত করা যাবে না। মুরুব্বীদের কথা বলার ধরন বুঝে ধীরে ধীরে বলতে হবে। কণ্ঠস্বরকে উঁচু করে কথা বলা বেয়াদবি হয় অন্য দিকে নিজের আমলেরও ঘাটতি এসে যায়। কথাকে কখনও ইনিয়ে বিনিয়ে বলা ঠিক নয় যেন অন্যের মনে কুচিন্তা হয়। অথবা এতটা কর্কশভাবেও বলা যাবে না যা দ্বারা ভীতির সঞ্চার হয়।

পবিত্র কোরআনের সূরা হুজরাতে এ আয়াত শ্রবণ করার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কসম! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানি অনুরূপ কথাবার্তা বলব।

হযরত ওমর (রাঃ) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হত।

"হযরত আবু যার (রাঃ) কে লক্ষ্য করে রাসূল (সাঃ) বলেন, যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর, প্রতি গোনাহর পরে একটি করে নেকী করবে তাতে করে গোনাহ মুছে যায়। আর মানুষের সাথে মধুর ব্যবহার করবে।"

"মুসলমান ভাইয়ের সাথে হেসে কথা বলা ও একপ্রকার সদকা।" (তিরমিযী)

হাদিসে আরো বলা হয়েছে-

"সকল গুনাহ হতে বেঁচে থাকার উত্তম উপায় হল জিহ্বাকে সংযত রাখা। তাই ইসলামের সৌন্দর্য রক্ষার্থে এবং নিজের সম্মান বৃদ্ধির লক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বাদ দিতে হবে।

বিনয় ও নম্রতা একজন মুসলমানের চরিত্র গঠনের অন্যতম মাধ্যম। সর্বদা সত্য কথা বলার চেষ্টা করতে হবে।

হাদিসে এসেছে-

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি বিনয়ভাব অবলম্বন করে আল্লাহ তার মর্তবা বৃদ্ধি করে দেন এবং অবশেষে তাকে আলা ইল্লীয়িন অর্থাৎ সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌছে দেন।"

মুসলমানদের জীবন উদ্দেশ্যপূর্ণ। তাই জীবনের একটি মুহূর্তকেও বেহুদা নষ্ট করা ঠিক নয় অথবা টিভি, ভিসিপি বিভিন্ন চ্যানেল দেখা বন্ধ করে বেহুদা সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঘ. রোগী দেখতে যাওয়া

সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতিশীলতা সমাজে সুখ, শান্তি বয়ে নিয়ে আসে। মূলত এটি এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের দ্বীনি অধিকার আর আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের একটি অপরিহার্য দাবি। আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাহদের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না।

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ৬টি অধিকার আছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এগুলো কি কি? তিনি বললেন ঃ

১. তোমরা যখন অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করো তখন তাকে সালাম কর।
২. সে তোমাকে যখন দাওয়াত করবে তখন তার দাওয়াত গ্রহণ কর।
৩. সে যখন তোমার নিকট সৎ পরামর্শ চায় তখন তার শুভ কামনা কর এবং সৎ পরামর্শ দাও।
৪. তার যখন হাঁচি আসে আর সে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তখন তুমি জবাবে 'ইয়ার হামুকাল্লাহ' বল।
৫. সে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার পরিচর্যা কর।
৬. সে যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা। (মুসলিম)

হাদিসে আরো বলা হয়েছে–

যখন কোন বান্দাহ তার মুসলমান রুগ্ন ভাইকে রুগী দেখতে পায় অথবা তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যায় তখন একজন উচ্চস্বরে চিৎকারকারী আকাশ থেকে চিৎকার করে বলেন, 'তুমি বেহেশতে ঠিকানা করে নিয়েছো।" - তিরমিযী

মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন স্বাভাবিকভাবে মানসিক দুর্বলতা তাকে বেশি অসুস্থ করে তোলে। এমতাবস্থায় কাছের মানুষ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের সংস্পর্শ তাকে জীবন্ত করে তোলে। তাই ইসলামে এ ব্যাপারে সুন্দর নিয়ম করে দিয়েছে এতে রোগীর এবং যিনি দেখতে যান উভয়েরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

রাসূল (সাঃ) যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তার কাছে যেয়ে বসতেন, কুশলাদী জিজ্ঞাসা করতেন, শিয়রে বসে মাথায় হাত রেখে রোগ মুক্তির দোয়া করতেন এবং রোগীকে উপদেশ দিতেন ধৈর্যধারণ করার জন্যে কেননা এর বিনিময়ে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

ঙ. সাক্ষাতের সময়

যখন কারো সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করবে তখন তার সাথে আগে আলোচনা করে সময় নির্ধারণ করে নেয়া ভাল। অসময়ে কারো নিকট যাওয়া ঠিক নয়, এর দ্বারা অন্যের সময়ও নষ্ট হয় এবং সাক্ষাৎ প্রার্থীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে যাওয়া এবং সাধ্যমত কিছু হাদিয়া নিয়ে যাওয়া, এতে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

যার কাছে সাক্ষাতে আসা হয় তার উচিত হাসিমুখে তাকে বরণ করা, কাছে বসানো, কুশলাদী জিজ্ঞাসা করা এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তার কথা শ্রবণ করা ও তার প্রয়োজন পূরণে যত্নবান হওয়া।

আবার সাক্ষাত প্রার্থীরও যখন তখন কারো নিকট যাওয়া ঠিক নয়। অথবা বেহুদা কথা বলে সময় নষ্ট না করে নিজ প্রয়োজন শেষ করে চলে আসা। এতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন- "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবেনা যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে।

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে"-

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর জন্য ভালবাসল, আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দান করল এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে বিরত রাখলো সে তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিল।" - আল হাদিস

৯. সাজসজ্জা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুন্দর তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। তাই একজন মুমিন ব্যক্তির সর্বদা তার পোশাক-পরিচ্ছেদ, চাল-চলন, কথা-বার্তায় সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো উচিত। তবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টায় এমন সব কাজ করা ঠিক নয় যাতে আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন-

হে নবী! মুমীন পুরুষদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটি তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। আর হে নবী, মুমীন স্ত্রীলোকদের বল, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজসজ্জা না দেখায় কেবল সে সব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং যেন নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এই লোকদের সামনে: তাদের স্বামী, পিতা, নিজের পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রী থেকে, নিজেদের দাসী, সেসব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্যকোন রকম গরয নেই, আর সেসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়নি, তারা নিজেদের পা জমীনের ওপর মারিয়ে চলাফেরা করবে না, এভাবে, নিজেদের যে [illegible] তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মু'মীন লোকেরা, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। –সূরা আন নূর : ৩০-৩১

এ আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে অতিরিক্ত সাজসজ্জা নিয়ে বের হওয়া নিষিদ্ধ। মহিলাদের ক্ষেত্রে বের হবার সময় নিজ সৌন্দর্যকে ঢেকে বের হতে হবে।

আজকের সমাজে পত্র-পত্রিকাগুলোতে নারী নির্যাতনের যে চিত্র আমরা পেয়ে থাকি তার জন্য [illegible] সৌন্দর্য প্রকাশ করাই দায়ী। এ কারণে ইসলাম এক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে যে রূপ বা সৌন্দর্য দিয়েছেন তাতে হস্তক্ষেপ করা মারাত্মক গুনাহ। আজকাল আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়ে কৃত্রিম [illegible] বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলছে। এগুলো হারাম।

ইসলাম প্রত্যেকের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপদেশ দিয়েছে। তাই ত্বকের যত্ন নেয়া, চুল, দাঁত, নখের সৌন্দর্যে [illegible] কোন প্রসাধনী ব্যবহার করা এতে দোষ নেই। তবে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন করা এক ধরনের ঔদ্ধত্যতা ছাড়া আর কিছু নয়।

এগুলো হল শরীরে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে নানা চিত্র অংকন করানো এবং দাঁত শানিত করানো।

হাদিসে বলা হয়েছে-

যে মেয়েলোক দেহে উল্কি করে, যে তা করায় যে দাঁত শানিত বানায় এবং যে তার বানাতে বলে, এ সব কয়টি শ্রেণীর লোকের ওপর রাসূল (সাঃ) অভিসম্পাদ করেছে।" –মুসলিম

হাদিসের আরো বলা হয়েছে-

"দাঁতসমূহের মধ্যে ফারাক ও খোদাই করায় যে সব স্ত্রীলোক সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, তাদের উপরও রাসূল (সাঃ) অভিসম্পাত করেছেন। কেননা তারা আল্লাহর সৃষ্টি স্বাভাবিক অবস্থাকে বিকৃত করে দেয়।

মূলত আল্লাহ যা দেন নি তা করে নেয়া বা পরিবর্তন করা উভয়টি লোকদের ধোঁকা দেয়া ও কৃত্রিমতার নামান্তর। তবে যদি কারো দেহে কোন ত্রুটি থাকে এবং তা দূর করার জন্য যদি অপারেশন করা হয় তা দোষণীয় নয়।

ভ্রূ সরুকরণ

মাত্রাতিরিক্ত রূপ, সৌন্দর্য অর্জনের আরও একটি পন্থা হল ভ্রূ প্লাক করা। এটিও ইসলামে সম্পূর্ণ রূপে হারাম। রাসূল (সাঃ) বলেন- যে স্ত্রীলোক চুল বা পশম উপড়ায় এবং যে করে তারা উভয়ের ওপর অভিশাপ।"

www.pathagar.com

১০. বন্ধুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্ট পেলেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফসকে বেরোয় আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে আছে আরো অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো যদি তোমরা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।" – আল-ইমরান ঃ ১১৮

সর্বদা সৎ ও নেককার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, বন্ধু নির্বাচনে ও কথার প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, যাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বাড়াচ্ছেন তারা দ্বীন ও চারিত্রিক দিক থেকে আপনার জন্য কতটুকু উপকারী হতে পারে?

রাসূল (সাঃ) বলেছেন–

"মানুষ তার বন্ধুর দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা করা দরকার যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।"

চলার পথে কখনও কোন কাজে বিরোধ হলে তর্কবিতর্ক না করে সুন্দরভাবে আপোষ করার চিন্তা করতে হবে। সমস্যাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। প্রতিহিংসার মন-মানসিকতা কমিয়ে ফেলা দরকার। একজন মুসলমান কখনও সে অন্য ভাই এর অকল্যাণ কামনা করতে পারে না। ইসলামের এ মহৎ দিকটি সামনে রেখে যদি মুসলমানদের জীবনাচরণ হয় তাহলে সমাজ অনেক সুন্দর হবে। শুধুমাত্র ১ টাকা ২ টাকার জন্যে বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন হতে পারে না। রাসূল (সাঃ) বলেন তোমাদের প্রত্যেকেই আপন ভাইয়ের আয়না। সুতরাং সে যদি তার ভাইয়ের মধ্যে কোন খারাপ কাজ দেখে তা হলে তার থেকে দূর করে দেবে।"

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) এর মাঝে কিছু শক্ত ধরনের কথাবার্তা হয়ে গেল। পরে হযরত আবু বকর এটাকে অন্যায় অনুভব করলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে নবী করীম (সাঃ) এর দরবারে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ও ওমর এর মধ্যে কিছু মতবিরোধ হয়ে গিয়েছে আমি রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম ফলে কিছু শক্ত কথা বলে ফেলেছি। কিন্তু আমি লজ্জিত হয়ে ওমরের কাছে ক্ষমা চেয়েছি কিন্তু ওমর আমাকে ক্ষমা করেনি। আমি অস্থির হয়ে আপনার দরবারে এসেছি। নবী (সাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন এবং ক্ষমা করে দিবেন।" ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)ও নিজের ভুল বুঝতে পারলেন আর তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে হযরত আবু বকরের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন, সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে আবু বকর রাসূল (সাঃ) এর দরবারে তিনি রাসূলের দরবারে চলে আসলেন। হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখে নবী (সাঃ) এর মুখমণ্ডলে রাগের চিহ্ন দেখা গেল। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) খুব ভয় পেয়ে গেলেন এবং অনুনয় বিনয় ও মিনতি সহকারে হাঁটু গেড়ে বসে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওমরের কোন দোষ নেই। সমস্ত অন্যায় আমারই। আমিই বেশি বলেছি। আমিই তাকে ভাল-মন্দ বলেছি। এ দেখে নবী করীম (সাঃ) বললেন–

"আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের নিকট যখন পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন তখন সকলে আমাকে অস্বীকার করেছে হযরত আবু বকর আমাকে স্বীকার করেছে, প্রাণ ও ধন-সম্পদ আমার জন্য উৎসর্গ করে আমার সাথী হয়েছে। তারপর এখন কি আমার সাথীকে দুঃখ দিয়ে ছাড়বে?" এ হল বন্ধুত্বের নিদর্শন।

১১. আতিথেয়তা

রাসূল (সাঃ) বলেন-

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা তাদের মেহমানের আতিথেয়তা করা উচিত।" (বুখারী, মুসলিম)

আতিথেয়তা করার মধ্যে ঐ সকল বস্তুই অন্তর্ভুক্ত যা মেহমানের সম্মান ও শ্রদ্ধা, শান্তি ও সুখ, নীরবতা ও আনন্দ এবং আবেগের জন্য প্রয়োজন হয়, হাসিমুখ ও উৎফুল্লতার সাথে অভ্যর্থনা করা সম্মান ও শ্রদ্ধা করা।

নবী করীম (সাঃ) নিজে মেহমানদারী করতেন এবং নিজ হাতে বেড়ে খাওয়াতেন।

ইসলামের মেহমানের জন্য সময় সীমা হল সর্বোচ্চ তিন দিন। মেহমানদের প্রতি যেমন দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে তেমনি মেহমানদেরও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে তারা যেন কোন বাড়িতে গেলে কিছু তোহফা নিয়ে যায় এবং তিন দিনের বেশি না থাকে। এবং মেজবানদের জন্য সম্পদ বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি মাগফিরাত ও রহমতের জন্য দোয়া করে।

www.pathagar.com

মেহমানদের জন্যে তার সম্মানার্থে উত্তম খাবার ও যত্নের ব্যবস্থা করতে হবে। যাবার সময় হাসিমুখে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে সালাম দিয়ে বিদায় জানাতে হবে।

একদা রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশে একজন আনসারী সাহাবী এক মেহমানকে নিজ ঘরে আতিথেয়তার জন্যে নিয়ে গেলেন। তিনি গৃহে যেয়ে স্ত্রীকে বললেন এ মেহমানকে আতিথেয়তা কর। তার স্ত্রী বললেন, "আমার নিকট তো শুধু শিশুদের উপযোগী খাদ্য আছে।" সাহাবী বললেন শিশুদের কোন প্রকারে ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও আর মেহমানের সামনে যখন খাবার রাখবে তখন কোন অজুহাতে বাতি নিভিয়ে দেবে এবং মেহমানের সাথে খেতে বসে যাবে সে যেন বুঝতে পারে যে, আমরাও তার সাথে খাবারে শরীক আছি।

এভাবে মেহমান তো পেট ভরে খেয়ে নিলেন আর পরিবারের লোকের সারা রাত উপবাসে কাটালেন। ভোরে এ সাহাবী যখন নবী (সাঃ) এর দরবারে হাজির হলেন তখন নবী (সাঃ) দেখেই বললেন, তোমরা উভয়েই রাতের বেলায় তোমাদের মেহমানের সাথে যে সৎ ব্যবহার করেছো তা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। -বুখারী, মুসলিম

১২. চলার পথে

চলার পথে একজন মুমীন এমনভাবে হাঁটবে যা দেখে তাকে রুগ্ন ব্যক্তি কিংবা অধিক কর্মব্যস্ত তা না বুঝা যায়। অর্থাৎ মধ্যম গতিতে চলতে হবে। নিচের দিকে তাকিয়ে চলতে হবে সদর্পে পা ফেলে নয়। জুতা পরিধানে উভয় পায়ে অথবা খালি পায়ে যাবে তথাপি এক পায়ে জুতা দিয়ে হাঁটা ইসলাম পছন্দ করে না। রাস্তার হক রক্ষা করে চলার চেষ্টা থাকবে। রাস্তার হক ৬টি–

১. দৃষ্টি নিচে রাখা।
২. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।
৩. সালামের জবাব দেয়া।
৪. ভাল কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা।
৫. পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখানো।
৬. বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা।

মহিলারা প্রয়োজনে ঘর হতে বের হবার সময় শরীরকে আবৃত করে চলবে যাতে তাদের রূপ সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয়ে পড়ে।

১৩. দুঃখ ও শোকে

দুনিয়ার জীবনে কোন মানুষ দুঃখ-শোক, বিপদাপদ, ব্যর্থতা ও লোকসান থেকে অভয় ও নিরাপদ থাকতে পারে না। অবশ্য মুমিন ও কাফিরের কর্মনীতিতে এ পার্থক্য রয়েছে। কাফের দুঃখ ও শোকের আধিক্যের কারণে জ্ঞান ও অনুভূতি শক্তি হারিয়ে ফেলে।

নিরাশ হয়ে পড়ে এমন কি অনেক সময় শোক সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু একজন মুমিন ব্যক্তি যে কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনায় তারা ধৈর্য হারা হয় না বরং ধৈর্য ও দৃঢ়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলতে থাকে যা হয়েছে তা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে। নিশ্চয় এতেও কল্যাণ রয়েছে।

আল্লাহ বলেন–

যে সকল বিপদাপদ পৃথিবীতে আপতিত হয় এবং তোমাদের ওপর যে সকল দুঃখ কষ্ট পতিত হয় এ সকল বিষয় সংঘটিত করার পূর্বেই এক পুস্তক (লিপিবদ্ধ, সংরক্ষিত ও গৃহীত অবস্থা) থাকে। নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ। যেনো তোমরা তোমাদের অকৃতকার্যতার ফলে দুঃখ অনুভব না কর।"

তাই তাকদীরের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে একজন মুমীন।

নবী করীম (সাঃ) বলেন, "যখন কোন বান্দাহ বিপদে পড়ে বলে তখন আল্লাহ তাআলা তার বিপদ দূর করে দেন, তাকে পরিণামে উত্তম পুরস্কার দান করেন আর তাকে উহার প্রতিদান স্বরূপ তার পছন্দনীয় বস্তু দান করেন।"

একজন মুমীন সামান্য কষ্টেও আল্লাহকে স্মরণ করবে।

www.pathagar.com

একবার নবী করীম (সাঃ) এর চেরাগ নিভে গেলে তিনি দোআ পাঠ (ইন্না...... রাজিউন) করলেন। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন. ইয়া রাসূলুল্লাহ চেরাগ নিভে যাওয়াও কি কোন বিপদ? আল্লাহর নবী বললেন হ্যাঁ, যার দ্বারা মুমিনের কষ্ট হয় উহাই বিপদ।"

এ সম্পর্কে হাদিসে আরো বলা হয়েছে-

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, পরীক্ষা যত কঠিন ও বিপদ যত বড় হয় তার প্রতিদানও তত সহজ ও বিরাট হয়। আল্লাহ যখন তাঁর কোন দাসকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। সুতরাং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা ঐ পরীক্ষার কারণে আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। -তিরমিযী

নবী (সঃ) বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তানের মৃত্যু হয় তখন আল্লাহ তার ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দাহর সন্তানের জান কবজ করেছ? তারা উত্তরে বলেন হ্যাঁ তিনি আবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার কলিজার টুকরোর প্রাণ বের করেছ? তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি আবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তখন আমার বান্দাহ কি বলল? তারা বলেন, এ বিপদের সময়ও সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, আমার ঐ বান্দাহর জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর। আর ঐ ঘরের নাম রাখ বাইতুল হামদ। -তিরমিযী

কাজেই একজন মুমীন কখনও শোকে এমন কোন কথা বলবে না যা দ্বারা আল্লাহর নাফরমানি হয়। চিৎকার করে কাঁদা, বুক চাপড়ানো জায়েজ নেই। এমনকি কোন মৃত বাড়িতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা নাজায়েজ।

অন্যের দুঃখে একজন মুমীন দুঃখ প্রকাশ করবে এবং সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা ও সমবেদনা সান্ত্বনা দান করবে।

হাদিসে আছে- যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা প্রদান করল সে এমন পরিমাণ সওয়াব পাবে যে পরিমাণ সওয়াব বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি পাবে।"

রাসূল (সাঃ) যখন কোন বিষয়ে অধিক চিন্তিত হয়ে যেতেন তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে "সুবহানাল্লাহিল আযীম" আর যখন অধিক কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন তখন ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বলতেন।

এছাড়া বিভিন্ন দোয়া পড়া উচিত।

১৪. দায়িত্ব ও কর্তব্য

নিজের উত্তম চরিত্র ও নম্র স্বভাবের পরীক্ষা ক্ষেত্র হল পারিবারিক জীবন। পরিবারের লোকদের মাঝেই সব সময় সম্পর্ক থাকে আর ঘরের অকপট জীবনেই স্বভাব ও চরিত্রের প্রতিটি দিক ফুটে ওঠে। ঐ ব্যক্তিই পূর্ণ মুমীন যে পরিবারের লোকদের সাথে উত্তম চরিত্র, হাসিমুখ ও দয়া সুলভ ব্যবহার করে। পরিবারের লোকদের অন্তর আকর্ষণ করবে এবং স্নেহ ও ভালবাসা প্রদান করবে।

পরিবারের সদস্য হল মা, বাবা, ভাই বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, তাদের প্রতি নজর দিতে হবে। জীবনের কিছু কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলের পর মানুষের ওপর সবচেয়ে বড় অধিকার হল পিতা-মাতার।

হযরত আবু উমামা বলেছেন, একব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সন্তানের ওপর পিতামাতার কি অধিকার? তিনি বললেন, মাতা-পিতাই তোমার বেহেশত এবং দোযখ।" -ইবনে মাজাহ

তাই সন্তানদের এমন কোন কাজ করা ঠিক নয় যা দ্বারা পিতা-মাতার সম্মান নষ্ট হয়। পিতা-মাতার সাথে সর্বদা নম্র ব্যবহার করা এবং সর্বদা সেবাযত্ন ও আর্থিক অভাব পূরণ করা সন্তানের কর্তব্য।

হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় ভোর করল যে, আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র কুরআনে মাতা-পিতা সম্মানে যে নির্দেশ দান করেছেন তা পালনে আল্লাহর আনুগত্য করেছে তা হলে সে এমন অবস্থায় ভোর করল যে, তার জন্যে বেহেশতের দু'টি দরজা খোলা। আর মাতা-পিতার মধ্যে থেকে একজন জীবিত থাকলে এক দরজা খোলা। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় ভোর করল যে, মাতা-পিতা সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তাহলে সে এমন অবস্থায় ভোর করল যে, তার জন্যে

www.pathagar.com

দোযখের দুটি দরজা খোলা আর মাতা-পিতার মধ্য থেকে একজন জীবিত থাকলে দোযখের একটি দরজা খোলা সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল আয় আল্লাহর রাসূল! মাতা-পিতা যদি তার সাথে সীমা অতিক্রম করে তবুও কি? রাসূল (সাঃ) বললেন তবুও। এভাবে তিনি ৩ বার বললেন।

তাই মাতা-পিতার জন্যে সবকিছু ব্যয় করতে হবে ধনসম্পদ যা আছে তার সবই। অনেকে আজকের সমাজে দেখা যায় সন্তান যখন অর্থ উপার্জন করে নিজে সংসারী হয় তখন পিতামাতাকে তেমন ভালবাসতে ও তাদের জন্যে খরচের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা জানা যায়।

একবার নবী করীম (সাঃ) এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে তার মাতাপিতা সম্পর্কে ফরিয়াদ করল যে আমার পিতা যখন ইচ্ছা তখনই আমার ধন-সম্পদ নিয়ে নেয়।

নবী (সাঃ) তার পিতাকে ডেকে পাঠালেন। এক বৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তি লাঠি ভর দিয়ে এসে উপস্থিত হলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে বলা আরম্ভ করল ঃ "আয় আল্লাহর রাসূল! এক সময় এমন ছিল যখন এ ছিল দুর্বল ও অসহায় আমি ছিলাম শক্তিমান। আমি ছিলাম ধনী আর এ ছিল শূন্য হাত। আমি কখনও আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল আর এ সুস্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী। আমি শূন্য হাত আর এ ধনী। এখন এ তার সম্পদ আমার থেকে লুকিয়ে রাখে। বৃদ্ধের এ সকল কথা শুনে দয়াল নবী কেঁদে দিলেন আর বৃদ্ধের ছেলেকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি ও তোমার ধন সম্পদ সবই তোমার পিতার।"

কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। যে পিতামাতা আমাদের একদিন শরীরেরে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আদর স্নেহের মাধ্যমে সক্ষম করলেন তাদের ভুলে গেলে চলবে না। এক শ্রেণীর নির্বোধ লোক আছে যারা বিয়ের পর অনেক পরিবর্তন হয়ে যায় তখন পিতামাতার দায়িত্ব কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে স্ত্রীর প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে এবং এক পর্যায়ে স্নেহময়ী মা-বাবা হতে পৃথক হয়ে যায়, তাদের খোঁজখবর নেয়া তো দূরের কথা অনেক সময় তাদের বিভিন্ন কাজে ভুল বুঝে থাকে। অসহায় মা-বাবা তখন আদরের সন্তানকে ভুলে যায় না নীরবে নিবৃতে চোখের পানি ফেলে। হায়! এ চোখের পানি যদি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় তাহলে এর পরিণাম কি হবে তা যদি তারা বুঝত।

অপর দিকে পিতামাতার কর্তব্য হল সন্তান জন্ম দানের পর থেকে সুন্দর নাম রাখা ও উত্তম আদব ও সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া।

তেমনিভাবে স্বামী স্ত্রী, একে অপরের পরিপূরক। সর্বদা উভয়ই উভয়ের চাহিদা, মান মর্যাদা অনুযায়ী চলার চেষ্টা করতে হবে। যে সকল কারণে স্বামী অসন্তুষ্ট হতে পারে এমন কোন কথা বা কাজ করা বাঞ্ছনীয় নয়। স্বামীর সম্পদ, সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তব্য।

সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদীক্ষার উত্তম আচরণ শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পিতামাতার। তাই একজন সন্তান জন্মের পর পিতামাতার কর্তব্য হল তার সুন্দর নাম রাখা এবং প্রতিটি বয়সে তাকে তার কার্যাবলীতে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। যেন বড় হয়ে এ সন্তান দেশ ও জাতির সম্পদে পরিণত হতে পারে। সন্তান গঠনে মায়ের ভূমিকা বেশি। তাই নেপোলিয়ান বলেছিলেন- "আমাকে একজন আদর্শ মা দাও তাহলে আমি তোমাদের একটি আদর্শ জাতি উপহার দিব।"

পরিবারের সংকীর্ণ পরিধির বাহিরে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা একজন ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না। তাই আত্মীয়ের সুখে দুঃখে, অভাব অনটনে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে হবে।

সংসারের কাজের প্রয়োজনে অনেক সময় গৃহ পরিচারিকার প্রয়োজন হয়। তাদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামের নিয়ম মেনে চলতে হবে। রাসূল (সাঃ) এক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের উত্তমরূপে ভরণপোষণ দিতে। নিজেরা যা খাবে, পরবে সেরূপ পোশাক পরিধান করাবে, থাকার ব্যবস্থা করবে কখনও প্রহার করা যাবে না। যদি পছন্দ না হয় তাহলে মুক্ত করে দিতে হবে। পত্র-পত্রিকাগুলোতে দেখা যায় গৃহপরিচারিকার লোমহর্ষক নির্যাতন এবং মৃত্যু। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন তারা কোন মানুষই না যেন সমাজের এক অবাঞ্ছিত অংশ। একজন মানুষ দুর্বল বলে তার সাথে এত অমানবিক আচরণ করা

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তির অধিকার নেই। এ ব্যাপারে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির সচেতন হওয়া দরকার তেমনি দরকার আমাদের আইনের যথার্থ প্রয়োগ।

এছাড়াও একজন মুমীন ব্যক্তির যা অর্জন ও বর্জন করা দরকার তা নিম্নরূপ ঃ

যা অর্জনীয় ঃ

১. সর্বদা আল্লাহর স্মরণকারী।
২. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারী।
৩. ওয়াদা রক্ষা, আমানতের খেয়ানতকারী না হওয়া।
৪. দিনে আল্লাহর সৈনিক রাতে ইবাদতকারী।
৫. প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সৈনিক হওয়া।
৬. আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয়ে দুনিয়ার জীবনকে সময়োপযোগী করে ব্যবহার করা।
৭. সর্বদা জান্নাত লাভে আকাঙ্ক্ষিত এবং জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা।
৮. সর্বদা তওবা ও ইসতেগফার করা।
৯. বেশি বেশি জিকিরে অভ্যস্থ হওয়া।
১০. শরীর, স্বাস্থ্য, মনকে কলুষতামুক্ত রাখা।

যা বর্জনীয় ঃ

১. মিথ্যা বলা।
২. গীবত, গোয়েন্দগিরি ও সন্দেহ না করা।
৩. প্রতারণা, অপব্যয় বর্জন করা
৪. ঔদ্ধতা, কার্পণ্য ও মজুদদারী বর্জন করা
৫. দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা পরিহার করা
৬. বিদ্রূপ ও উপহাস না করা
৭. মুনাফিকী পরিত্যাগ করা
৮. মদ, জুয়া, রিবা, হতে দূরে থাকা
৯. ব্যভিচার ও চুরি হতে বেঁচে থাকা
১০. দুনিয়া পূজারী না হওয়া।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা কেবল মাত্র কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয় বরং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে রয়েছে এর পদচারণা। এ দিকনির্দেশনাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে মানার মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজ মুসলমানদের জীবনে ইসলামের এ শিষ্টাচার নেই বললেই চলে। মুসলমান হিসেবে তারা যে অন্যান্য মানুষের চাইতে পৃথক উম্মত তারা ভুলে গেছে। তাই দেখা যায় তারা হালাল-হারাম জানে না। চুরি, ডাকাতি, লেনদেন, ছল-চাতুরীর মালপত্র বিক্রি সকল অপরাধে মুসলমানদের লিপ্ত থাকতে দেখা যায় শুধু তাই নয় এ অবস্থা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মাঝে দেখা যায়। পোশাক, ওঠা-বসা, চলাফেরা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সবকিছুতে আজ মুসলমানরা, বিজাতীয় ও বিধর্মীদের কাছ থেকে ধার করছে। ইসলামের আজ সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, শাসননীতি সবই বাদ তদস্থলে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশের অনুকরণ আজ সর্বত্র। অথচ মুসলমানদের আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন ইসলামকে দুনিয়ায় প্রচার-প্রসার করতে। এ অবস্থার কারণে আজ মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত হতে হচ্ছে। কোথাও বা হতে হচ্ছে রাজ্যহারা। ইসলামের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে আল্লাহর সাহায্য ও মদদ পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই আজ আমাদের ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে মানার অঙ্গীকার করা দরকার। তবে অজ্ঞতার মধ্যে নয় ইসলামী জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই তা মানার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। আমিন ॥

www.pathagar.com

অভিযান

শামীমা রহমান

ছবি আঁকা আগের মতো হয় না আর
রংতুলি কিংবা পেন্সিলের আঁকিবুকি
উড়ন্ত বকের সারি, আধফোটা ভোর
গাছ আর আকাশের নিলীম সম্মেলন
গ্রাম্য নবান্ন উৎসবের ধানের পালার
সোনালী আয়োজন, রংচে বাহারী বেমানান
পোশাকে কৃষাণীর উঠোনে পিঠে উৎসব, কিংবা
খাল বিল ভরে উপচে পড়া বরষার স্রোত
এখন কেন যে তুলিতে ধরা দেয় না
জানি না।
কত বিরক্তি ভরা চোখে চৈতালী
রোদের ঝাঁঝ সহ্য করেছে মন
ধু-ধু-শূন্য ফসল কাটা মাঠ
এখন কেন যে আবেগ আনে না
ক্যানভাসে; প্রশ্ন করো না কেউ!
আমি জানি না, আমি এখোনো আঁকিয়ে কিনা
শুধু এতটুকু বলতে পারব যে....
ক্যানভাসে রং তুলির আঁচড় বড্ড মেকী মনে হয়,
মনে হয় তুচ্ছ এ পরিশ্রম, বড্ড বেশী অপচয়।
তাই- তুলি ছেড়ে দিয়ে মনের কৌটায়
জমা জলছাপ রং নির্দ্বিধায় ছেড়ে
দিয়েছি। আপন মননের প্রাচুর্যে
ভরা সমস্ত শৈল্পিক বিচ্ছুরণে
তাইতো অবাধে বাংলার কিশোরীর রংভরা
চোখে আঁকি যুদ্ধ বিধ্বস্ত হাজারো শিশুর
যন্ত্রণাদগ্ধ চিৎকার.. ভয়াল আর্ত
সব হারানোর বেদনা....
এদেশেরই প্রাণভরা শিশুদের টুকটুকে গালে
একে দেই- তাদেরই ক্ষুধার্ত মুখ
আঘাতে উড়ে যাওয়া হাত... কিংবা
পড়ে থাকা সারে সারে লাশের ছবি....
জানি না দোষ করেছি কি না বাংলার
তরুণীদের স্বপ্নভরা আকাশে, বর্বর
জাহেলী আগ্রাসনের বিমূর্ত কালো
থাবার নি:সংশ দগদগে ছবি এঁকে
স্বাধীনতার নামে উলঙ্গ পরাধীনতার
লম্বা চওড়া শেকলের বাস্তব ছবি এঁকে।
কিংবা বুকভরা মমতা ঢাকা মায়ের আঁচলে
সম্ভ্রমহারা বোনের হাহাকার তুলে...।

www.pathagar.com

এই বাংলার ফসল কাটা মাঠে এঁকে চলেছি
অবিরাম, অত্যাধুনিক বোমারু জান্তবদের
আঘাতে ঝলসে যাওয়া মুসলিম সভ্যতার
পুরাতন ঐতিহ্য..... মরুভূমির বালিতে মিশিয়ে
দেওয়া একটি প্রাচীন নগরী....
বুকফাটা কান্না আর নীরব চলমান আকুতি
তোমরা বাধা দিও না! আমি চাই
ফসল কাটার ফাঁকে– আটোপৌরে
ব্যস্ততায় বাংলার কৃষক সে ছবি দেখে
নিক- জেনে নিক তার শেকড়
উদ্ধার করুক গন্তব্যের সু-কঠিন রাস্তা
ক্যারিয়ার গঠনের অদম্য পরিশ্রমের
স্রোতে, গা ভাসাতে ভাসাতে ছুটে যাওয়া,
তরুণীর দল, তাদের আকাশে দেখুক
আমারই সে আঁকা ছবি...
রং চে স্বপ্নগুলো বাঁক ফিরিয়ে নিক
ফিরিয়ে নিক তাদের লক্ষ্য হেরার
আলোর দিকে...
টুকটুকে গালগুলো, দোল দিয়ে
দেখয়ে দিক সে পৈচাশিক ধ্বংসযজ্ঞ।
যদি তাতে জনতার সাগর
ছুটে চলে... ছুটে চলে
ভেঙ্গে দিতে জাহেলী সভ্যতার ঔদ্ধত্য
তোমরা আঁকতে দাও সে ছবি
তোমরাও একে যাও... আমার তোমার
সবার ছবিগুলো যদি এমনি আঁকা হয়ে যায়
বিশ্বাস কর! রংতুলির আহ্বান শুধু কাগজে নয়
প্রতিটি মনের ক্যানভাসে এঁকে দিতে পারো
তাদেরই হারালো ঐতিহ্যের টুকরো টুকরো ছবি
সে ছবিগুলো নিশ্চয় তৈরি করবে
ঈমান দীপ্ত চওড়া বুক
ফালা ফালা করে কেটে ফেলার
জন্য শত্রু নিশান
তৈরি হবে দেখো হাজারো নওজোয়ান
যারা... নিকষ জাহেলী রাত ফুড়ে এনে দেবে
এনে দেবে নতুন রাঙা প্রভাতে
প্রগাঢ় পবিত্র দিন
আর জান্নাতি জগত
আমার আঁকার এ অন্যরকম অভিযান
তারপর, কাগজের ক্যানভাস উর্বর করব আবার!

www.pathagar.com

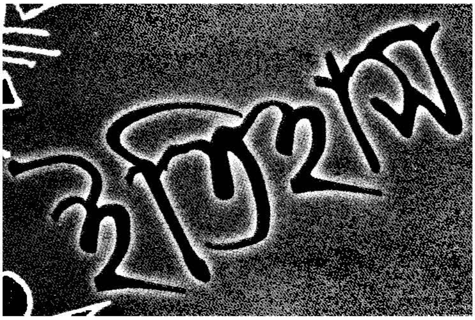

www.pathagar.com

তিমির রাতের সীমানা মাড়িয়ে
আসেনি তখনো সূর্যোদয়,
দিকে দিকে শুধু রিক্ত রোদন
চেতনার প্রাণ লুপ্তপ্রায়।
তখনো গায়নি ভোরের পাখিরা
ছোটেনি আলোর তীব্রবান,
তখনো জাগেনি ঘুমের পাড়া
অতৃপ্ত মন ক্লান্ত প্রাণ।
কিছু কিছু মুখ বুক বেঁধে ফের
তবু সাহসের পাল তোলে,
দৃপ্ত শপথের রক্তনাচে যে
গ্লানির সকল দুঃখ ভুলে।
ছোট ছোট বোধ, প্রাণের সুতোয়
মুক্তোর দানা মালা গাঁথে,
ঈমানী জগৎ হাতছানি দেয়
নয়া স্বপ্নে ঘর মাতে।
কোরআনের রঙে রাঙবে জগত
তাইতো তাদের হালধরা,
ঝরাবেই সব জঞ্জাল যারা
শুধিতে করুণ এই ধরা।
শুরু থেকে সেই, এই অবধি
কোরআনের পথে পথ চলা,
আঁধারের রাত আসবেই ভোরে
দৃপ্ত শপথে এই কাফেলা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ২৫ বছর অতিক্রম করে আজ তারুণ্যের জ্যোতিতে ভাস্বর। যুগের রাহবার এ সংগঠনের সঠিক ইতিহাসে প্রকাশ আজ সময়ের দাবি। এ চিন্তাকে সামনে রেখে গঠন করা হয় ইতিহাস ঐতিহ্য কমিটি। মূলত এই কমিটিই প্রাথমিক এবং মূল কাজ সম্পাদন করে। তারাই বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সংগ্রহ করেছেন পুরাতন অনেক নথিপত্র।

এ কমিটিতে যারা ছিলেন–

প্রধান	:	আমেনা বেগম
সদস্যা	:	সৈয়দা আসমা আক্তার
"	:	রোকেয়া বেগম রীনা
"	:	নাজমুন নাহার এ্যানী
"	:	নাজমুন নাহার নাজমা

পরবর্তীতেগঠন করা হয় আরেকটি কমিটি। সেখানে সদস্যা হিসাবে ছিলেন–

প্রধান	:	আলেয়া বেগম সুমী
সদস্যা	:	কোহিনূর আখ্‌তার সীমা
	:	আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি
	:	নাজমুন নাহার নাজু।

এ কমিটি তৎকালীন সময়ে যারা কাজ করেছেন তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন এবং তার ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করেন এ ইতিহাস।

তথ্যের সীমাবদ্ধতা, নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের অনুপস্থিতি এ সবের মধ্য দিয়েই কাজ করতে হয়েছে ইতিহাস ঐতিহ্য কমিটিকে। তবুও সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে যতটুকু তৌফিক দান করেছেন, এ জন্যই তার দরবারে জানাই শুকরিয়া।

www.pathagar.com

ভোরের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পূর্বকোণে উদিত হয়েছে সূর্য। তমসাবৃত ঘোরে কালো আঁধিয়ার পর্দা ছিড়ে চারিদিকে আলোকিত করবেই।

এ আলো সত্যের আলো
এ আলো অন্যায়কে সরাবার আলো
এ আলো জান্নাতের অপার্থিব আলো।

১৯৭৮ সাল। মাত্র ১১ জন সেই অপার্থিব আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে শুরু করল তাদের পথচলা।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক প্রতিকূল স্রোত চারিদিকে। এই স্রোতের বিপরীতে ভাসাতে হবে তরী। হাল ধরতে হবে দক্ষ হাতে, দিক রাখতে হবে একদম ঠিক। সেই ৭৮ সালে গড্ডালিকা স্রোতের প্রবাহে ভেসে চলা অসহায় ছাত্রীসমাজকে সত্য-সুন্দর আলো ঝলমল পথ দেখিয়ে দেয়ার শক্ত ও কঠিন কাজ হাতে নেয় এই ১১ জন। ১১ জন একই বৃন্তে ১১টি পাপড়ি। সেই বৃন্তসমেত পাপড়ি দলের নাম ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। মানব প্রকৃতির সঠিক আদর্শ ইসলামকে সকল ছাত্রীর মাঝে প্রতিষ্ঠিত করাই এদের মূল লক্ষ্য।

১৯৭৮ সালে ইডেনের বুকে শুরু হয় ছাত্রীসংস্থার প্রথম পদযাত্রা। সময়ের পরিক্রমায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি.র ক্যাফেটেরিয়াতে ১৫ জুলাই ঘোষিত হয় এ সংগঠনের নাম ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। তখন এ সংগঠনটি ছিল শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক। কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ ভিত্তিক কাজ করা ছাত্রীদের পক্ষে কতটুকু সম্ভবপর, তা ছিল সংশয়পূর্ণ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের সামাজিক বাধা অতিক্রম করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়া ছাত্রীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা তা ছিল প্রশ্নবোধক। কিন্তু তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, টি. এস. সি. তে একটি ইসলামী ছাত্রীসংগঠনের আত্মপ্রকাশের খবর পত্র-পত্রিকায় স্থান পায় এবং প্রকাশিত এ খবরেই এ সংগঠনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে সাড়া দেন এদেশের বিভিন্ন জেলার সচেতন ছাত্রীগণ। তারা আহ্বায়িকা কমিটির সাথে যোগাযোগ শুরু করেন চিঠির মাধ্যমে। এভাবে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মেলে সর্বপ্রথম পাবনা, চিটাগাং, বরিশাল, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলা থেকে। নিয়মিত পত্র যোগাযোগই ছিল তৎকালীন যোগাযোগের সর্বোত্তম ও সহজতম উপায়, যার মাধ্যমে সব এলাকায় কাজ চলছিল একই কর্মসূচি ও সংবিধানের ভিত্তিতে।

প্রথম কমিটি ঃ

১১ জনের সমন্বয়ে গঠিত আহ্বায়িকা কমিটি।
আহ্বায়িকা : খোন্দকার আয়েশা খাতুন
যুগ্ম আহ্বায়িকা : নাসিম হামিদা বানু

সদস্যা :

১. মারজিয়া বেগম
২. নুরুন্নিসা সিদ্দিকা
৩. মনোয়ারা সুলতানা
৪. উম্মে সালমা মুন্নী
৫. নাহিদ আঞ্জুম
৬. নুরজাহান বেগম
৭. আনোয়ারা বেগম
৮. ফজিলা বেগম মিতু
৯. হাসিনা বেগম।

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম ৮ সদস্যা বিশিষ্ট পরামর্শ সভা গঠিত হয় এবং এই ৮ সদস্যাই এ সংগঠনের প্রথম সদস্যা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১. খোন্দকার আয়েশা খাতুন
২. নাসিম হামিদা বানু
৩. মারজিয়া বেগম
৪. নুরুন্নিসা সিদ্দিকা
৫. ফজিলা বেগম মিতু
৬. কামরুন্নেসা মাকসুদা
৭. মাহমুদা খাতুন
৮. নুরুন নাহার।

প্রথম সেক্রেটারীয়েট সদস্যা যারা ছিলেন, তারা হলেন :

সভানেত্রী	- খোন্দকার আয়েশা খাতুন
সাধারণ সম্পাদিকা	- নুরুন্নিসা সিদ্দিকা
দফতর সম্পাদিকা	- মাহমুদা খাতুন
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	- নাসিম হামিদা বানু
প্রচার সম্পাদিকা	- মারজিয়া বেগম
সাহিত্য সম্পাদিকা	- ফজিলা বেগম মিতু।

প্রথম পরামর্শ সভার অধিবেশন

১৯৭৯ সাল, ১০ জুন, সকাল ১০:৩০ মিনিট।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রথম পরামর্শ সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নীতি নির্ধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ সভা ছাত্রীসংস্থার একমাত্র সংস্থা। প্রথম অধিবেশনে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা হল–

সংক্ষিপ্ত কার্যবিরনী

১. বিভাগীয় সম্পাদিকা নিয়োগ ও দায়িত্ব বণ্টন।
২. বর্তমান কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ।
৩. আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ।
    ক. পরিচিতি প্রকাশ
    খ. প্রতীক বা মনোগ্রাম তৈরি করা।
    গ. ব্যাংক একাউন্ট খোলা।
    ঘ. সিলেবাস প্রণয়ন।
    ঙ. সংবিধান প্রণয়ন।

প্রথম সেক্রেটারীয়েট বৈঠক

৬ জুলাই ১৯৭৯ শুক্রবার, সকাল ১১টায়

১ম সেক্রেটারীয়েট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৪ নয়াপল্টন লেনস্থ অফিসে। ৬ জনই উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল–

১. সেক্রেটারীয়েটের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা।
২. গত মাসের পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও রিপোর্ট পেশ।
৩. এ মাসের পরিকল্পনা গ্রহণ।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয়করণ

এ সংগঠনের পথ পরিক্রমায় ১৯৭৯ সালে ৬,৭ ডিসেম্বরে সর্বপ্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও তখন কেন্দ্রীয়করণ হয়নি তথাপি সম্মেলনটিতে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকার বাইরের দায়িত্বশীলা বোনেরা তাদের ডাকা হলে বিভিন্ন জেলা থেকে এ সুমহান ডাকে আন্তরিক সাড়া দেয়। এ সম্মেলন প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠন হওয়া যতটা সংশয়পূর্ণ ছিল তা আসলে ততটা নয়। এ প্রেক্ষাপটে এ আন্দোলনের সুমহান বার্তা চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই বাংলাদেশভিত্তিক কেন্দ্রীয় সংগঠন কায়েম করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয়করণ করা হয় ১৯৮১ সালে টি.এস.সিতে এবং এ সংগঠনের নাম হয় ইসলামী ছাত্রীসংস্থা থেকে "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা"।

পরিচিতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কাজের ব্যাপকতায় প্রয়োজন হয়ে পড়ে পরিচিতির।
তৎকালীন সাধারণ সম্পাদিকা নুরুন্নিসা সিদ্দীকা বর্তমান পরিচিতির প্রথম সংস্করণ তৈরি করেন।
১৯৭৯ এর শেষ দিকে এবং ১৯৮০ এর শুরুর দিকে এই পরিচিতি প্রকাশ করা হয়।

কর্মপদ্ধতি

যে কোন সংগঠনের মজবুতির জন্য তার সামগ্রিক কাজের পদ্ধতি সামনে থাকা প্রয়োজন। ইসলামী ছাত্রীসংস্থা যেহেতু ইসলাম প্রচার প্রসারের সুমহান দায়িত্ব পালন করার প্রত্যয়ে তার যাত্রা শুরু করেছিলো, তাই শাশ্বত জীবন বিধান আল ইসলাম তথা কোরআন হাদিসের আলোকেই এ সংগঠনের কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হবে। আর এ বিষয়টিকে সামনে রেখে প্রথম কর্মপদ্ধতির খসড়া তৈরী করেন এ. কে. এম. নাজির আহমেদ। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত তাই বিস্তারিত একটি কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন হয় যার ১ম সংস্করণ করেন সাধারণ সম্পাদিকা নুরুন্নিসা সিদ্দিকা। ১৯৮৩ সালে প্রথম এই কর্মপদ্ধতি প্রকাশিত হয়।

সংবিধান

১৯৮১ সালের ২৯ অক্টোবর।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ দিন।
এদিন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার সংবিধান এ সংগঠনের প্রথম কেন্দ্রীয় সদস্যা সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
উক্ত সম্মেলন ১৪০২ হিজরীর ১লা মহররম মোতাবেক ১৯৮১ সালের ২৯শে অক্টোবর এবং ১৩৮৮ সনের ১২ই কার্তিক রোজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়।
ঐ তারিখ থেকেই এ সংবিধান কার্যকর বলে উক্ত সম্মেলনের ঘোষণা করা হয়।
এ সংবিধানের ধারা হয় ২৫টি।
এর পূর্বেই সংবিধানের আরেকটি খসড়া করা হয়েছিল। সেই সংবিধান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। এ. কে. এম. নাজির আহমদের লেখা ছিল এবং ৮/৯টি ধারা ছিল, পরে সংশোধন করে ২৫টি ধারা করা হয়। ৮১তে এবং পরে কাজের প্রসারতা বৃদ্ধি পেলে কিছু সংশোধনী এনে বর্তমান সংবিধানের সর্বশেষ সংস্করণ করা হয় ১৯৯৮ সালে।

ছন্দময় পথচলা

এ সংগঠনের কার্যক্রম সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতির আলোকে হয়ে আসছে। ইসলামের শাশ্বত কর্মসূচির আলোকে ছাত্রীসংস্থা যে তিন দফা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

প্রথম দফা কর্মসূচি

ছাত্রীদের মধ্যে দ্বীন ইসলামের সঠিক ধারণার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার

তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে, নেক আমল করে আর ঘোষণা দেয় আমি মুসলিম।' – হামিম আস সাজদাহ-৩৩

কোরআনের এ শাশ্বত ঘোষণার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা পালন করছে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম। নিম্নে-এর কিছু উল্লেখ করা হলো :

www.pathagar.com

কোরআন তাফসীর ক্লাস, সাধারণ সভা, সংবর্ধনা, নবীন বরণ, বিশেষ ছাত্রী সমাবেশ, শিক্ষিকা ও সুধী সমাবেশ, ঈদ পুনর্মিলনী, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

শাখাগুলো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে এ অঙ্গনে পদচারণা করে থাকে। উল্লেখযোগ্য কিছু গোষ্ঠীর নাম তুলে ধরা হলো :

১.	রাইয়্যান শিল্পীগোষ্ঠী	ঢাকা	১৯৮০-১৯৮১
২.	হেরার রশ্মি শিল্পীগোষ্ঠী	রাজশাহী	১৯৮০-১৯৮১
৩.	রেনেসাঁ শিল্পীগোষ্ঠী	খুলনা	
৪.	কাফেলা শিল্পীগোষ্ঠী	পাবনা	
৫.	সত্যের সন্ধানী শিল্পীগোষ্ঠী	বরিশাল	১৯৯২
৬.	চেতনা শিল্পীগোষ্ঠী	রংপুর	১৯৯২
৭.	মৃত্তিকা শিল্পীগোষ্ঠী	চট্টগ্রাম	১৯৯২
৮.	তরঙ্গমালা শিল্পীগোষ্ঠী	জামালপুর	১৯৯২
৯.	ব্যতিক্রম শিল্পীগোষ্ঠী	রাজশাহী	
১০.	অন্বেষা শিল্পীগোষ্ঠী	নারায়ণগঞ্জ	

শাখা কর্তৃক প্রকাশিত নিয়মিত সাহিত্য সাময়িকী :

ঢাকা মহানগরী	প্রত্যয় (সিরাত সংকলন)
	উন্মেষ (কিশোর পত্রিকা)
চট্টগ্রাম মহানগরী	উসওয়াতুন হাসানা (সিরাত সংকলন)
খুলনা মহানগরী	প্রত্যাশা (ইসলামী শিক্ষা দিবস)
রাজশাহী মহানগরী	ফুলের কলি, প্রেরণা
সিলেট শহর	সিরাজুম মুনিরা (সিরাত সংকলন)
যশোর শহর	প্রতিচ্ছবি (সিরাত সংকলন)
কুমিল্লা শহর	আবে হায়াত
পাবনা শহর	স্পন্দন
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মরুঝরণা
গাজীপুর	প্রতিধ্বনি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সৃজন
ঢাকা মেডিকেল	বিপরীত শব্দাবলী
চট্টগ্রাম	বিপরীত স্রোতধারা

হ্যাণ্ডম্যাগাজিন :

ঢাকা মহানগরী	পরিবর্তন
খুলনা মহানগরী	প্রত্যাবর্তন
রংপুর শহর	চেতনা
দিনাজপুর	ইকরা
রাজশাহী মহানগরী	প্রেরণা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	আলোক বর্তিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	প্রতীতি, অনন্যা
ঠাকুরগাঁও শহর	সত্যের দ্বীপ
বরিশাল শহর	জাগরণ

এছাড়াও অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য পত্রিকা ও হ্যাণ্ডম্যাগাজিন প্রকাশ করে আসছে।

www.pathagar.com

শিশু বিভাগ

দাওয়াতী কার্যক্রমের একটি অন্যতম অংশ শিশু বিভাগ। এ বিভাগ আলোর পাখি নামে বিভিন্ন শিশুদের নিয়ে নানা কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। যেমন : শিক্ষামূলক আসর, বিনোদনমূলক আসর, প্রতিযোগিতামূলক আসর ইত্যাদি।

২য় দফা কর্মসূচি

ইসলাম প্রিয় ছাত্রীদেরকে সুসংগঠিত করে উন্নত নৈতিক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দান।

তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেওনা। -ইমরান : ১০৩

কোরআনের এ দাবি পূরণে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা সংঘবদ্ধ হয়েছে সকল ছাত্রীদের নিয়ে আর তাই এ সংগঠনের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি সংগঠন ও প্রশিক্ষণ।

সংগঠন : আল্লাহ তো ঐ সমস্ত লোকদের ভালবাসেন যারা তার পথে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন সীসাঢালা প্রাচীর। (সূরা আসসফ-৪)

সংগঠনের মৌলিক একক ইউনিট। কোন এলাকা বা প্রতিষ্ঠানে সংগঠনের প্রাথমিক তৎপরতা চালানোর মতো কর্মী এবং প্রাথমিক সদস্যা থাকলে সেখানে ইউনিট গঠন করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এই ইউনিট গঠন করার মাধ্যমে সংগঠনকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

"তিনিই উম্মীদের মধ্য থেকে তাদের জন্য একজনকে রাসূল (সাঃ) রূপে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আবৃত্তি করেন আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিভাব এবং হিকমাত ইতিপূর্বে এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।" (জুমুআ-২)

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীংস্থা উন্নত নৈতিক জীবন যাপনের লক্ষ্যে প্রতিটি ছাত্রীকে আদর্শ মুসলিম নারীরূপে গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর তাই তো হাতে নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যেমন : কর্মী বৈঠক, গ্রুপ প্রশিক্ষণ, শিক্ষা বৈঠক, শিক্ষা শিবির ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়ভাবে সম্মিলিত বড় বড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মূলত প্রত্যেকের আত্মগঠন ও আত্মিক পরিশুদ্ধি আনয়নের পাশাপাশি সাংগঠনিক আভ্যন্তরীন মজবুতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়, যার মাধ্যমে ব্যক্তির আমূল পরিবর্তন করে সত্যিকার আল্লাহর প্রিয়বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা যায়।

সর্বপ্রথম যেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল এ স্বর্ণালী আলোকচ্ছটা

১৯৭৮-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ১২টি ইউনিট গঠিত হয়–

১. ইডেন কলেজ ইউনিট
২. ওয়ারী ইউনিট
৩. সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ
৪. মগবাজার ইউনিট
৫. রায়েরবাজার ইউনিট
৬. তেজগাঁও ইউনিট
৭. রোকেয়া হল ইউনিট
৮. মালিবাগ ইউনিট
৯. ঢাকা মেডিকেল ইউনিট
১০. আজিমপুর ইউনিট
১১. শামসুন নাহার হল ইউনিট
১২. সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ইউনিট।

www.pathagar.com

ঢাকার বাইরেও ১৯৭৮-৭৯ তেই ছড়িয়ে পড়ে এ সংগঠন- নয়টি জেলায় কাজ হয় সর্বপ্রথম এবং ১৭টি ইউনিট গঠিত হয়।

বরিশাল	১.	ঝালকাঠি
	২.	বরিশাল শহর
	৩.	সরিকল
	৪.	গৌরনদী
পাবনায়	৫.	গোপালপুর
খুলনা	৬.	খুলনা শহর
কুমিল্লা	৭.	কুমিল্লা
নোয়াখালী	৮.	ফেনী
চট্টগ্রাম	১০.	চট্টগ্রাম শহর
	১১.	ফতেহাবাদ
ফরিদপুর	১২.	ফরিদপুর শহর
	১৩.	নড়িয়া
	১৪.	সিতাকুণ্ড
যশোর	১৫.	যশোর শহর
সিলেট	১৬.	সিলেট শহর
ময়মনসিংহ	১৭.	কিশোরগঞ্জ

বর্তমান অবস্থা :

জিলা শাখা	৬৯টি
শহর শাখা	৬৯টি
থানা শাখা	১০৭টি

মোট ইউনিট সংখ্যা – ১১৯১

তৃতীয় দফা- কর্মসূচি :

ছাত্রীসমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ।

এই তৃতীয় দফা কর্মসূচি মূলত সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার। এ পর্যন্ত ছাত্রীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা নিম্নোক্ত কর্মসূচি পালন করেছে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন- বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলোতে সংসদ নির্বাচনে ছাত্রীসংস্থা ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্যানেল দিয়ে থাকে। জয়লাভ করেছে এতে কখনো কখনও বা প্রচুর ভোট পেয়ে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে।

বিভিন্ন সেশনে যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রীসংস্থা ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তার তালিকা–

সেশন	প্রতিষ্ঠান	আসন
১৯৭৯-৮০	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	মহিলা আসন ১টি
	খুলনা কমার্স কলেজ	পূর্ণ প্যানেলে

www.pathagar.com

১৯৮০-৮১ ইডেন কলেজ

১৯৮১-৮২ ৮টি প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে

খুলনায় ৫টি কলেজে

ঢাকা শহর ২টি কলেজ

চট্টগ্রাম মেডিকেল-১টি কলেজে

সেশন	প্রতিষ্ঠান	আসন
১৯৮৬-৮৭	জামালপুর সরকারী মহিলা কলেজ	ধর্মীয় সম্পাদিকা
	সুফিয়া কামাল মহিলা কলেজ, মাদারীপুর	V.P. ও ধর্ম সম্পাদিকা
	নাজিমুদ্দীন সরকারী মহাবিদ্যালয়	৪টি আসন
	রংপুর কারমাইকেল কলেজ	৩টি আসন
	চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ	৩টি আসন
	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ	৩টি আসন
	খুলনা বি. এল কলেজ	কমনরুম সম্পাদিকা
	ধামরাই সহশিক্ষা কলেজ	
	ইডেন মহিলা কলেজ	
	কুষ্টিয়া মহিলা কলেজ	
	সিলেট মহিলা কলেজ	
	কুমিল্লা মহিলা কলেজ	
	মোমেনশাহী আনন্দমোহন কলেজ	
১৯৮৮-৮৯	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ	
	চট্টগ্রাম সরকারী মহসিন কলেজ	
	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	
১৯৮৮-৯০	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	৪টি আসন
	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	১টি আসন
	মোমেনশাহী মেডিকেল কলেজ	২টি আসন
	বরিশাল মেডিকেল	
	সিলেট মেডিকেল কলেজ	মহিলা সম্পাদিকা
	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	১টি আসন
	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	মহিলা সম্পাদিকা

www.pathagar.com

১৯৯১-৯২	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	মহিলা সম্পাদিকা
	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	মহিলা সম্পাদিকা
	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	কমনরুম সম্পাদিকা
	ইডেন মহিলা কলেজ	কমনরুম সম্পাদিকা
	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	মহিলা সম্পাদিকা
১৯৯২-৯৩	সরকারী বি.এম. কলেজ	মহিলা সম্পাদিকা
	দিবানৈশ কলেজ	মহিলা সম্পাদিকা
	সরকারী বি. এল, কলেজ	মহিলা সম্পাদিকা
১৯৯৩-৯৪	সরকারী খুলনা বি. এল কলেজ	সম্পাদিকা, সহ: সম্পাদিকা
	সিলেট সরকারী তিব্বতীয়া কলেজ	মহিলা সম্পাদিকা
১৯৯৪-৯৫	চৌদ্দগ্রাম সরকারী ডিগ্রী কলেজ	প্রধান সম্পাদিকা
১৯৯৫-৯৮	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ	ছাত্রী মিলনায়তন
১৯৯৮-৯৯	৬টি কলেজে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।	
২০০০-২০০২	পাবনা এডওয়ার্ড	ছাত্রী কমনরুম
	জামেয়া কাসেমিয়া মহিলা মাদ্রাসা	ভি.পি. ও কমনরুম
	নরসিংদী সরকারী কলেজ	ছাত্রী মিলনায়তন
	ভাওয়াল বদরে আলম ডিগ্রী কলেজ	পাঠাগার সম্পাদিকা
	ফরিদপুর রাজেন্দ্র ও ইয়াসীন কলেজ	ছাত্রী মিলনায়তন
	টঙ্গী ডিগ্রী কলেজ	সদস্যা পদ

বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সভানেত্রী এবং সেক্রেটারিয়েট হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন :

সেশন ১৯৮০-৮১

সভানেত্রী	খোন্দকার আয়েশা খাতুন
সাধারণ সম্পাদিকা	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
বায়তুলমালও সমাজকল্যাণ	মাহমুদা খাতুন
সাংগঠনিক	মার্জিয়া বেগম
অফিস	রাবেয়া বেগম
সাহিত্য ও ...	ফজিলা বেগম মিতু
প্রচার	কামরুন্নেসা মাকসুদা

সেশন ১৯৮১-৮২

সভানেত্রী	খোন্দকার আয়েশা খাতুন
সাধারণ সম্পাদিকা	রাবিয়া খাতুন
সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণ	মাহমুদা খাতুন
বায়তুলমাল, সাহিত্য ও সমাজকল্যাণ	ফজিলা বেগম মিতু
অফিস	নাহিদ আঞ্জুম
প্রচার	কামরুন্নেসা মাকসুদা

সেশন ১৯৮২-৮৩

সভানেত্রী	খোন্দকার আয়েশা খাতুন
প্রধান সম্পাদিকা	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
প্রচার ও অফিস	কামরুন্নেসা মাকসুদা
বায়তুল ও সমাজকল্যাণ	নাহিদ আঞ্জুম

সেশন ১৯৮৩-৮৪

সভানেত্রী	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
প্রধান সম্পাদিকা	রাবিয়া খাতুন
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	আয়েশা সিদ্দিকা
প্রচার ও অফিস	নুরুন্নাহার

www.pathagar.com

সেশন ১৯৮৪-৮৫

সভানেত্রী	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
প্রধান সম্পাদিকা	রাবিয়া খাতুন
অফিস সম্পাদিকা	নুরুন্নাহার
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	শাহীন আক্তার আঁখি

সেশন ১৯৮৫-৮৬

সভানেত্রী	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
প্রধান সম্পাদিকা	রাবিয়া খাতুন
সাংগঠনিক সম্পাদিকা	কামরুন্নেসা মাকসুদা
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	নূরুন্নাহার
অফিস সম্পাদিকা	শাহীন আক্তার আঁখি

সেশন ১৯৮৬-৮৭

সভানেত্রী	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
প্রধান সম্পাদিকা	হাবীবা চৌধুরী সুইট
অফিস ও হল সম্পাদিকা	কামরুন্নেসা মাকসুদা
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	নূরুন্নাহার
সাহিত্য সম্পাদিকা	শাহীন আক্তার আঁখি

সেশন ১৯৮৭-৮৮

সভানেত্রী	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
প্রধান সম্পাদিকা	হাবীবা চৌধুরী সুইট
অফিস ও প্রচার	হোসনেয়ারা বেগম
বায়তুলমাল ও প্রশিক্ষণ	আয়েশা সিদ্দিকা
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক	শাহীন আক্তার আঁখি

সেশন ১৯৮৮-৮৯

সভানেত্রী	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
প্রধান সম্পাদিকা	হাবীবা চৌধুরী সুইট
অফিস ও প্রশিক্ষণ	আয়েশা সিদ্দিকা
প্রচার সম্পাদিকা	ফেরদৌস আরা খানম
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	সালমা সুলতানা
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক	শাহীন আক্তার আঁখি

সেশন ১৯৮৯-৯০

সভানেত্রী	ডাঃ হাবীবা আক্তার চৌধুরী সুইট
প্রধান সম্পাদিকা	ডাঃ শাহনূর বেগম
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	মাসরুবা খাতুন
অফিস ও প্রশিক্ষণ	আয়েশা সিদ্দিকা
প্রচার ও প্রকাশনা	সালমা সুলতানা

সেশন ১৯৯০-৯১

সভানেত্রী	শামীমা ইয়াসমিন লায়লা
প্রধান সম্পাদিকা	ফেরদৌসী খানম
কলেজ ও বায়তুলমান	হোসনেয়ারা বেগম
প্রশিক্ষণ ও প্রচার	শাহেদা চৌধুরী
স্কুল ও অফিস	সাঈদা রুম্মান

সেশন ১৯৯১-৯২

সভানেত্রী	শামীমা ইয়াসমিন লায়লা
প্রধান সম্পাদিকা	ফেরদৌসী খানম
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	হুমায়রা পারভীন আফু
স্কুল ও মেডিকেল	শাহেদা চৌধুরী
প্রচার প্রকাশনা	হোসনেয়ারা বেগম
অফিস ও প্রশিক্ষণ	ফাতেমা খাতুন

সেশন ১৯৯২-৯৩

সভানেত্রী	শামীমা ইয়াসমিন লায়লা
প্রধান সম্পাদিকা	সাঈদা রুম্মান
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	হুমায়রা পারভীন আফু
বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ	ফেরদৌসী খানম
স্কুল ও মেডিকেল	শাহেদা চৌধুরী
প্রচার প্রকাশনা	সালমা সুলতানা
অফিস সম্পাদিকা	ফাতেমা খাতুন

সেশন ১৯৯৩-৯৪

সভানেত্রী	সাঈদা রুম্মান
প্রধান সম্পাদিকা	নাজমুন্নাহার নীলু
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	উম্মুল খায়ের সুফী
অফিস ও প্রশিক্ষণ	ফাতেমা খাতুন
মেডিকেল বিভাগ	শাহেদা চৌধুরী
প্রচার প্রকাশনা	উম্মে সালমা
স্কুল বিভাগ	মাহবুবা আহমেদ মিমি

www.pathagar.com

সেশন ১৯৯৪-৯৫

সভানেত্রী	সাঈদা রুম্মান
প্রধান সম্পাদিকা	নাজমুন্নাহার নীলু
বায়তুলমাল ও কলেজ বিভাগ	উম্মুল খায়ের সুফী
অফিস সম্পাদিকা	ফাতেমা খাতুন
প্রচার প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ	উম্মে সালমা
বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল	নাজমুন্নাহার নীলু
স্কুল বিভাগ	মাহবুবা আহমেদ মিমি

সেশন ১৯৯৫-৯৬

সভানেত্রী	নাজমুন্নাহার নীলু
প্রধান সম্পাদিকা	ফাতেমা খাতুন
বায়তুলমাল ও কলেজ	হোসনে আরা বেগম
অফিস ও প্রচার প্রকাশনা	সৈয়দা আসমা আক্তার
স্কুল বিভাগীয় সম্পাদিকা	মাহবুবা আহমেদ মিমি
সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগ	নাজমা ফেরদৌসী

সেশন ১৯৯৬-৯৭

সভানেত্রী	নাজমুন্নাহর নীলু
প্রধান সম্পাদিকা	আমেনা বেগম
বায়তুলমাল ও কলেজ	হোসনেআরা বেগম
প্রচার প্রকাশনা ও বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল	সৈয়দা আসমা আক্তার
অফিস বিভাগ	রোকেয়া বেগম রীনা
স্কুল ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক	নাজমুন নাহার এ্যানী

সেশন ১৯৯৭-৯৮

সভানেত্রী	নাজমুন্নাহার নীলু
প্রধান সম্পাদিকা	আমেনা বেগম
অফিস ও প্রচার প্রকাশনা	সাবিকুন্নাহার মুন্নী
সাহিত্য সাংস্কৃতিক	রোকেয়া বেগম রীনা
স্কুল বিভাগীয় সম্পাদিকা	নাজমুন নাহার এ্যানী
কলেজ ও মেডিকেল বিশ্বঃ	নাজমুন্নাহার নাজমা
বায়তুলমাল সম্পাদিকা	মাহবুবা খাতুন শরীফা
প্রশিক্ষণ বিভাগ	আমেনা বেগম

সেশন ১৯৯৮-৯৯

সভানেত্রী	সাবিকুন্নাহার মুন্নী
সেক্রেটারী জেনারেল	সাবিহা পারভীন
বায়তুলমাল ও কলেজ	মাহবুবা খাতুন শরীফা
বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল	রোকেয়া বেগম রীনা
অফিস বিভাগ	হামিদা আক্তার কাজলী
প্রচার প্রকাশনা বিভাগ	কোহিনূর আক্তার সীমা
স্কুল ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক	হাসিনা আহমেদ

সেশন ১৯৯৯-২০০০

সভানেত্রী	সাবিকুন্নাহার মুন্নী
সেক্রেটারী জেনারেল	সাবিহা পারভীন
সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও অফিস বিভাগীয় সম্পাদিকা	উম্মে খালেদা জাহান
বায়তুলমাল ও কলেজ বিভাগ	মাহবুবা খাতুন শরীফা
বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল	হামিদা আক্তার কাজলী
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগীয়	কোহিনূর আক্তার সীমা
সাহিত্য সাংস্কৃতিক	হাসিনা আহমেদ
স্কুল বিভাগীয় সম্পাদিকা	হামিদা রুম্মান
প্রশিক্ষণ বিভাগীয়	সাবিহা পারভীন

সেশন ২০০০-০১

সভানেত্রী	উম্মে খালেদা জাহান
সেক্রেটারী জেনারেল	আলেয়া বেগম সুমী
সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
প্রচার প্রকাশনা বিভাগীয়	কোহিনূর আক্তার সীমা
বায়তুল ও কলেজ বিভাগীয়	মাহবুবা খাতুন শরীফা
স্কুল বিভাগীয় সম্পাদিকা	হামিদা রুম্মান
অফিস, মেডিকেল ও বিশ্বঃ	আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি
সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগীয়	হাসিনা আহমেদ
প্রশিক্ষণ বিভাগীয়	আলেয়া বেগম সুমী
মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয় -	সৈয়দা শামিম আরা হক

www.pathagar.com

সেশন ২০০১-০২

সভানেত্রী	উম্মে খালেদা জাহান
সেক্রেটারী জেনারেল	আলেয়া বেগম সুমী
সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও প্রচার প্রকাশনা	কোহিনূর আক্তার সীমা
বায়তুলমাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল বিভাগ	হামিদা আক্তার কাজলী
স্কুল বিভাগীয় সম্পাদিকা	হামিদা রুম্মান
অফিস বিভাগীয় সম্পাদিকা	আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি
কলেজ ও দাওয়াতী এলাকা	মাহবুবা খাতুন শরীফা
সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগ	আছিফা বেগম
প্রশিকক্ষণ বিভাগ	আলেয়া বেগম সুমী

সেশন ২০০২-০৩

সভানেত্রী	উম্মে খালেদা জাহান
সেক্রেটারী জেনারেল	আলেয়া বেগম সুমী
সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও প্রচার প্রকাশনা বিভাগ	কোহিনূর আক্তার সীমা
বায়তুলমাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল বিভাগীয় সম্পাদিকা	হামিদা আক্তার কাজলী
অফিস বিভাগীয় সম্পাদিকা	আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি
স্কুল বিভাগীয় সম্পাদিকা	হামিদা রুম্মান
সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগ	আছিফা বেগম
কলেজ ও দাওয়াতী এলাকা	শাহনাজ পারভীন
প্রশিক্ষণ বিভাগীয় সম্পাদিকা	আলেয়া বেগম সুমী

আর এভাবেই মহান আল্লাহ সুবাহান তা-আলার অশেষ মেহেরবাণীতে ছন্দময় পথচলার মাধ্যমে গৌরবোজ্জ্বল ২৫টি বছরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলছে ছাত্রীসংস্থা- ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিভিন্ন সময়ে যারা কেন্দ্রীয় সভানেত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন–

খোন্দকার আয়েশা খাতুন	ঃ	১৯৭৮-৭৯	—	১৯৮২-৮৩
নূরুন্নিসা সিদ্দিকা	ঃ	১৯৮৩-৮৪	—	১৯৮৮-৮৯
ডাঃ হাবিবা চৌধুরী সুইট	ঃ	১৯৮৯-১৯৯০		
শামীমা ইয়াসমিন লায়লা	ঃ	১৯৯০-৯১	—	১৯৯২-৯৩
সাঈদা রুম্মান	ঃ	১৯৯৩-৯৪	—	১৯৯৪-৯৫
নাজমুন নাহার নীলু	ঃ	১৯৯৫-৯৬	—	১৯৯৭-৯৮
সাবিকুন্নাহার মুন্নী	ঃ	১৯৯৮-৯৯	—	১৯৯৯-২০০০

www.pathagar.com

স্মৃতি বার বার কথা কয়

ফেলে আসা দিনগুলো সব মনে পড়ে যায়... ।

খোন্দকার আয়েশা খাতুন

সেশন

'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা' আমার হৃদয়েরই অপর নাম। আমার অন্তর, আমার জীবনকে আমূল পরিবর্তনকারী একটি বিপ্লব। এর সূচনালগ্ন সত্যিই আজও আমার কাছে বিস্ময়কর। ছোটবেলা থেকেই বই পড়তাম। পড়তে খুবই ভাল লাগতো। বলা যায় নেশা। এই অধ্যয়নে সমাজ বিপ্লব সংস্কারমূলক আন্দোলন এমনি গল্প উপন্যাসে আমার আগ্রহ ছিল বেশি। বিশেষভাবে মহিলাদের কাজ, ভূমিকা, অবদান গভীর উৎসাহের সাথে পড়তাম। নিজেকে সে আসনে দেখতাম। মনে পড়ে 'মহিয়সী নারী' নামক একটি বই পড়েছিলাম। 'মাদামকুড়ি', 'ফ্লোরেন্স নাইট এঙ্গেল', 'বেগম রোকেয়া', এমনি ধরনের প্রখ্যাত মহিলাদের জীবনী বইটিতে স্থান পেয়েছিল। সেই বইটি পড়ে তীব্রভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম। কিছু একটা করার ঐকান্তিকতা সৃষ্টি হয়েছিল আমার মধ্যে। মনে হতো সবাই তো অনেক কিছু করেই ফেলেছে এখন আমি আর কি করবো, কিভাবে করবো? এ চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল। জানিনা আল্লাহ হয়তো এ ঐকান্তিকতাকেই কবুল করে নিয়েছিলেন আমার অজান্তে।

ঐতিহ্যবাহী এক মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। আব্বা তাবলীগ করতেন। পুরো পরিবারে সবাই ছিলেন ইসলাম প্রিয়। পারিবারিক সূত্রে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও ইসলাম সম্পর্কে ধারণা ছিল গতানুগতিক। আমি যখন ক্লাস সিক্স-এ পড়ি আমার সহোদর ভাই জনাব এ কে এম শাহ্ আলম ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেন ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালীন সময়ে। সেই সাথে আমার বড় বোনের দুই ছেলেও ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে জড়িত হয়।

ক্লাস সিক্স থেকে সেভেন এইট পর্যন্ত সময়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে বেশ অস্থিরতা দেখা যায়। আবদুল মালেক ভাই ইসলামী শিক্ষা কারিকুলাম প্রবর্তনের আন্দোলনে শহীদ হন। তখন ঘটনাগুলো কিছুই না বুঝলেও অবস্থাভাবে মনে পড়ে কবি ফররুখ আহমদ সাহেবের মেয়ে নাসরিন ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে অত্যন্ত জোরালোভাবে বক্তৃতা করেছিলেন। আব্দুল মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের ঘটনা এমন আবেগময় ভাষায় তুলে ধরেছিলেন যে, সিদ্ধেশ্বরী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বাধ্য হয়েছিলেন ছাত্রীদের নিয়ে শোকসভা করতে এবং ছুটি দিতে। এসব কিছু আমার উপরে রেখাপাত করলেও সঠিকভাবে বুঝতে এবং কিছু করতে সময় লেগেছিল প্রায় ৮/৯ বছর।

এর মধ্যে রাজনীতির পটভূমি পরিবর্তন হয়েছে। উপমহাদেশের ইতিহাসে সংগঠিত হয়েছে আরেক স্বাধীনতা যুদ্ধ। বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পেয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। অব্যাহত পড়াশুনায় প্রগতিবাদী হয়ে উঠেছি আমি। চীন রাশিয়া প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে মনের অলিন্দে। নামায,

www.pathagar.com

রোযাও অব্যাহত আছে। স্বাধীনতার ফল অটো প্রমোশনে ক্লাস এইট থেকে বলতে গেলে ক্লাস টেনে এসে গেলাম। ঢাকা শহর ছেড়ে মফস্বলের গভ: গার্লস স্কুলে পড়ি। এ সময়েই সেখানকার ছাত্র ইউনিয়নের স্কুল শাখার সাহিত্য সম্পাদিকা নিযুক্ত হই, যদিও কথাটা পরিবারের সবার কাছে গোপন রাখি। পরবর্তীতে ইডেন কলেজে আই এস সিতে পড়াকালীন প্রথমে ছাত্রলীগ নেত্রী যাকে 'ইন্দিরা' নামে ডাকা হতো তার এবং তার কর্মী মমতাজের মাধ্যমে ছাত্রলীগ এ যোগদানের প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তুলনামূলকভাবে অনেকটা উন্নত ব্যক্তিত্ব, ভাল আচরণ আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী হাসিনা ও সংসদের সাহিত্য সম্পাদিকা মেহতাব আপার সাথে জড়িয়ে পড়ি। ইন্টারমিডিয়েট-এর শেষের দিকেই এক সময় বুঝতে পারি যে, আমি আমার দু'ভাগ্নে বিশেষ করে বাদলের আদর্শিক টার্গেটে রয়েছি। এরা ইতিমধ্যে আবার পুনর্গঠিত হয়ে ছাত্রদের মধ্যে কাজ শুরু করেছে 'ছাত্র ইসলামী মিশন' নামে।

পরীক্ষা শেষে দেশের বাড়িতে অফুরন্ত সময় বই পড়েই কাটাই। এ সময়ে আমাদের মেজ বোনের শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে গেলে তিনি আমাকে সরাসরি মেয়েদের মধ্যে ইসলামী কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। এই ভাই ছাত্রসংঘের সাথে ছিলেন। আমি তার সেই দাওয়াত কবুল করার আগে জানা বোঝার তৈরী হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া জরুরি মনে করি। তিনি আমাদের তার বই এর সংগ্রহ থেকে কিছু বই দেন। কিছু বই-এর নাম বলেন। আব্বার সংগ্রহে অনেক বই ছিল। আমি দিন রাত সে সব ইসলামী বই পড়তে থাকি। সাথে আব্বার কাছ থেকে আব্দুল হাকিম সাহেবের তাফসীর পড়তে থাকি। এই অধ্যয়নের ফলে বাদল আমাকে কি বলতে চেয়েছে কোনদিকে নিতে চেয়েছে স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং ওকে চিঠি লিখি। প্রতিত্তোরে আমাকে স্বাগত জানায়। এই অধ্যয়নকালেই আমি কল্পনায় আমার পরবর্তী কর্মসূচীর পরিকল্পনা করতে থাকি। যদি মেডিকেলে ভর্তি হই তবে কিভাবে করবো, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখনকার পরিবেশ কেমন হবে মেয়েদের কি বলবো, কিভাবে বলবো? ইডেনে ভর্তি হলেই বা কিভাবে করবো। বই-এর এক একটি চাপ্টার পড়তাম- আর ভাবতাম কিভাবে এই কথাগুলো অন্য মেয়েদের সামনে তুলে ধরবো? এক কথায় দাওয়াতে দীনের জন্য মানসিকভাবে প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করতে থাকি।

রেজাল্ট আউট হলো। ঢাকা চলে আসছি ভর্তির জন্য সেই ভাই-এর সাথে বলে আমার সুযোগ হয়নি। গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে চলছি লঞ্চঘাটের দিকে। কলাই ক্ষেতে সবুজের মাঝে নীলচে ফুল আর সরষে ফুলের হলুদ সমারোহের মাঝে দূরে কেউ দৌড়ে আসছে আর হাত ইশারায় আমাদের থামতে বলছে। দেখলাম আমার ঢাকা চলে আসার খবর পেয়ে সেই ভাই এসেছেন হাতে একটি ভাঁজ করা বহু পুরানো কাগজ যার সাদা রং লাল হয়ে গেছে এবং প্রতি ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে গেছে। দেখি একটি ব্যক্তিগত রিপোর্টের ছক। তাড়াহুড়ার মধ্যে উনি আমাদের ওটা বুঝালেন এবং ঢাকা গিয়ে যাতে রাখি তার জন্য সাথে দিয়ে দিলেন। ঢাকা এসে আবার দেখা মিলন বাদলের সাথে। এবার তাদের যৌথ উদ্যোগে পড়তে লাগলাম একেরপর এক বই ধারাবাহিকভাবে। তখনও তাফহীম পাইনি। এখানে পড়ছি তাফসীরে আশারাফি। দেখলাম ব্যবহারিক রিপোর্ট ফর্মটি। এবার আরও ভালভাবে জেনে নিলাম। কিভাবে রাখা যায়। ওরা আমাকে নিয়ে গেল তদানীন্তন মহিলা মজলিসের সহ-সভানেত্রী সাইয়েদা মুনীরা খালাম্মা মরহুমার কাছে। গ্রামের বাড়িতে থাকতেই আমি পেপারে ইসলামী মহিলা মজলিস নামে একটি ইসলামী মহিলা সংগঠনের খবর জানতে পেরেছিলাম। ছাত্রীদের মধ্যে কিভাবে কাজ করবো এ ব্যাপারে তিনি অনেক পরামর্শ দিলেন। ইসলামী মহিলা মজলিসের উদ্যোগে আয়োজিত একটি সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করলাম। মুনীরা খালাম্মা আমাকে বলেছিলেন পরিচিতি পেশ করার পরে যখন আহ্বান জানান হবে তখন যেন আমি উঠে দাঁড়িয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে ফর্ম পূরণ করি। স্বাভাবিক লজ্জা এবং উক্ত প্রোগ্রামে সীমাবদ্ধতার কারণে আমি আর তা করিনি। কিন্তু তাতে খালাম্মা রাগ না করে বরং মিটিং শেষে আমাদের তার বাসায় খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। বিমোহিত হলাম। ইডেন কলেজে ভর্তি উপলক্ষে যেতে হতো বলে সেখানেই টার্গেট নিয়ে কাজ শুরু করলাম এবং প্রথম টার্গেট সালেহার কাছে দাওয়াত দান ব্যর্থ হলো। পুরো দাওয়াতী ঘটনা মিলন বাদলকে বললাম। পর্যালোচনায় যে যে ত্রুটি ধরা পড়লো তা সংশোধন করে আবার কাজ শুরু করলাম। এবার টার্গেট বোন নুরুন্নিসা। ওর একটি লেখা ইডেন কলেজ ম্যাগাজিনে উঠেছিল, ঐ লেখাটি পড়ে তাকে ইসলামী লাইনের এবং তাকে গাইড করার কেউ আছে বলে মনে হলো। এবার আমি খুবই সাবধানী, কারণ প্রথমবার হোঁচট খেয়েছি। আল্লাহর রহমতে শেষ পর্যন্ত সফল হলাম এবং তাকে সাথী হিসেবে পেলাম। ভর্তি হয়েছি ইডেনে অনার্সে। Cultural week-এ কুরআন তেলাওয়াত এ First হলো অদ্ভুত সুন্দর

www.pathagar.com

এক মেয়ে সালমা মুন্নি। যেমন দেখতে সুন্দরী তেমনি সুরেলা কণ্ঠস্বর। টার্গেট নিলাম। জানতে পারলাম তার মা হাফেজা আসমা খাতুন। ঝালকাঠির ইসলামী মহিলা মজলিসের দায়িত্বশীলা। এমনিভাবে পরিচিত হলাম ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রী নাহিদ, আঞ্জুম, আলম আরার সাথে। মহিলা মজলিসে যোগ দিয়েছি। চলে এলাম হোস্টেলে। এ সময়ে আবার মিলন বাদল নিয়ে গেল সদ্য রাজশাহী ভার্সিটি থেকে পাস করা শামসুন্নাহার নিজামী আপার নিকট। তিনি তার নিজের লেখা বই Present করলেন। মেয়েদের মধ্যে কাজ করার বিশেষভাবে হোস্টেলে কাজ করার পদ্ধতির ব্যাপারে পরামর্শ দিলেন। ফিরে এসে আমার রুমে চা-চক্রের আয়োজন করলাম। আমার ক্লাসমেট আতিয়া, হাসিনা, মনোয়ারা, বোটানীর রোকেয়া আপা থার্ড ইয়ার অনার্সের মিতু আপা এবং হোস্টেল মেট্রন তাহের ইসলাম এদের দাওয়াত দিলাম। সেখানে ইসলাম সম্পর্কে জানা বুঝার গুরুত্ব এবং সে লক্ষ্যে সপ্তাহে একদিন আলোচনা করার প্রস্তাব পেশ করলাম। আতিয়া সমর্থন করলো। পলি আপা সমর্থন করে বক্তব্য রাখলেন যেন সব মেয়েদেরই ডাকা হয়। সেই প্রোগ্রামে সবার অত্যন্ত ভালো লাগলো। মেট্রন তাহেরা ইসলাম সবাইকে নিয়ে ডাইনিং রুমে করার প্রস্তাব দিলেন। তিনি নিজেই তদানীন্তন হোস্টেল সুপারেনটেনডেন্ট প্রফেসর চেমন আরাকে বললে উনি হোস্টেল ভিজিটে এসে আমার সাথে আলাপ করলেন। হোস্টেল সুপার সেলিনা'পা সবাইকে দাওয়াত দিয়ে প্রিন্সিপাল আপা ও অন্য হোস্টেল সুপারদেরও দাওয়াত দেয়া হলো। অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রফেসর চেমন আরা সেলিনা আপা মেট্রন তাহেরা ইসলামের সহযোগিতায় ও উপস্থিতিতে ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই ইডেন কলেজের নতুন হোস্টেলের ডাইনিং রুমে সাপ্তাহিক ইসলামী আলোচনা অনুষ্ঠান হতে লাগলো। পরবর্তীতে নিজামী আপাকে প্রিন্সিপাল আপার লিখিত অনুমতি নিয়ে হোস্টেলে আলোচনার জন্য আনা হয়েছিল।

পরিচিত হলাম ঢাকা ভার্সিটিতে শেষবর্ষ এম এ'র ছাত্রী বোন নাসিম হামিদা বানুর সাথে যোগাযোগ হলো সে সময় গার্লস গাইডের অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী অনার্সের ছাত্রী আনোয়ারা বেগমের সাথে। কেমিস্ট্রিতে ভর্তি হলো বোন মারজিয়া। উঠলো হোস্টেলে। এতদিন আমরা একদিকে ইসলামী মহিলা মজলিসের সাপ্তাহিক বৈঠক যোগ দিতাম সবুজবাগের হৈ চৈ-৭৬ এ সাইয়েদা মুনিরা খালাম্মার বাসায়, আর সপ্তাহে একদিন বসতাম হোস্টেলে, সাথে সাথে পরিকল্পিতভাবে দাওয়াতী কাজ করছি ছাত্রীদের মাঝে। শিক্ষিকাদের সাথে, অভিভাবিকা মহলে মহিলাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম একটু সমস্যা হচ্ছে ছাত্রী ক্ষেত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাঙ্গনে টার্গেট ছাত্রী এবং শিক্ষিকা মহলে, তাদের সময়ের সাথে আমরা সময় মেলাতে পারছি না। আবার কাজের ধরনেই কিছু অসুবিধা হচ্ছে। তাই নিজামী আপা, সাইয়েদা মুনীরা খালাম্মা এমনি ধরনের মুরব্বীদের সাথে পরামর্শ করে ছাত্রী অংগনে আলাদা নামে স্বতন্ত্রভাবে কাজের সুবিধা– এই পরামর্শ উনারা দিলেন বলে স্বতন্ত্র একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, লক্ষ্য উদ্দেশ্যতো সব একই থাকবে শুধু ক্ষেত্র বিশেষে কর্মসূচি কি হবে ইত্যাদি আলোচনা করে ১১ সদস্যা বিশিষ্ট একটি আহব্বায়িকা কমিটি গঠন করা হলো– যার নাম হলো 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা'।

তাই বলছিলাম আজ ডালপালা, ফুলে ফলে সুশোভিত যে সংগঠনটি তোমরা পেয়েছো এটার অংকুরোদগমের জন্য আল্লাহ বীজ হিসেবে আমাদের মুষ্টিমেয় কিছু মেয়েকে কবুল করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

স্মৃতিকথা বলতে যেয়ে হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে জমানো অনেক স্মরণীয় কথাই দোলা দিয়ে যাচ্ছে। সেই সংগ্রামমুখর সময়, নব আবিষ্কারের নেশায় মাতোয়ারা আর সত্যের অপূর্ব স্বাদ আস্বাদনকারী দিনগুলো এখন আর অনুভব করি না, এখনো আন্দোলনে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করছি যদিও সঠিক হক আদায় করার মত কাজ হয়ত করতে পারছি না। তথাপি যতই কাজ করি না কেন, যতই আন্দোলনে সময় কাটাই না কেন সেই ৭৬, ৭৭, ৭৮,........ এখন আর খুঁজে পাই না, সেই সময়ের পুরোটাই আমার জীবনের অনন্য স্মরণীয় সময়। বিশেষ একটি স্মরণীয় দিনের কথা খুব মনে পড়ছে। ছাত্রীসংস্থা কেবল ঘোষণা হয়েছে। আহ্বায়িকা কমিটি কাজ করছে। ফর্মাল কমিটি তখনো তৈরি হয়নি, ১৯৭৯ এ সময় বিভিন্ন দিক থেকে সাড়া দিয়ে আসা চিঠিগুলো আমাদেরকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করে। এমনি একটি চিঠি নিয়মিত পেতাম চট্টগ্রামের বাঁশখালী থেকে, বেশ সুন্দর মোটা মোটা হাতে লেখা কথাগুলো অত্যন্ত গুছিয়ে সুন্দর করে লিখতো আমাদের বোন- আজ তার নাম মনে নেই। ঠিকানায় লেখা থাকত বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল। কেমিস্ট্রি-ডিপার্টমেন্টের এক ভদ্রলোকের নাম থাকতো, সেটা কি C/o নাকি W/o বুঝা যেত না তবে আমরা কিন্তু ভেবেছি W/o হবে।

www.pathagar.com

একযোগে বিয়ে হয়ে গেল আমাদের যুগ্ম আহ্বায়িকা নাসিম হামিদা বানু ও আমার এবং আমাদের কুমিল্লায় যিনি ছাত্রীসংস্থার কাজ করতেন বোন রওশন আরার। আমরা তিন জনেই চট্টলা আছি। বোন রওশন আরা চট্টগ্রাম ভার্সিটি যাবেন ভর্তি হতে, আমরা ভাবলাম এক কাজ করা যায়। আমরাও যদি সাথে যাই তবে ভার্সিটিও দেখা হবে এবং আমাদের উক্ত বোনের সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং কিভাবে এখানে সংগঠন করা যায় এ ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা হবে।

আমরা তিন দম্পতি ভর্তির প্রয়োজনীয় কাজ করে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট খুঁজে বের করতে যদিও কষ্ট হলো না কিন্তু যে ভদ্রলোকের উনি নাম দিয়েছেন তার আর খোঁজ পাই না, প্রথম তো তিনি কি প্রফেসর নাকি অন্য কোন কর্মচারী আমাদের জানা নেই। যে বোন চিঠি লিখতেন উনি কিসে পড়েন জানতাম না।

এক রুম থেকে অন্য রুমে একতলা থেকে অন্যতলা ল্যাবরেটরী থেকে সেমিনার রুম সব খুঁজছি। না কেউ ঐ নামের কাউকে চেনে না। আর সবার প্রশ্ন কি করেন। আমাদের তিন সাথী কিন্তু একটুও বিরক্ত না হয়ে মহা উৎসাহে আমাদের সহযোগিতা করছেন। অবশেষে পাওয়া গেল আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই ভদ্রলোককে দারোয়ান বা মালী এমনি কিছু। আরো মুশকিলে পড়লাম বয়স দেখে। আমরা পড়েছি W/o অর্থাৎ উনার স্ত্রী, কিন্তু ভদ্রলোক বড় বয়সী, কি করি? বোনের নামটি ধরে জানতে চাইলাম চেনেন কিনা, বললেন চেনেন। তখন জানি না উনার কি হয়। আমাদের দেখা করার কথা শুনে খুব খুশি হলেন, বললেন চলেন আমার বাড়ি, আমরা তাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম, ভাবলাম ধারে কাছে কোথাও হবে। কিন্তু গাড়ি চলছে তো চলছেই ভার্সিটি ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে সোজা বড় রাস্তা। তারপর বায়ে ডাইনে, ডাইনে-বায়ে করে পাহাড় থেকে ঢালে নেমে বা দিক দিয়ে চলতে দেখা গেল একটি ছোট্ট দালান। প্লাস্টার ছাড়া শুধু ইটের গাঁথুনী। জানা গেল এটি ভার্সিটি স্কুল। যাক বাবা এসে তো গেছি। আমাদের দিলে খুশির ঝলক, সমমনা এক বোনের সাথে সাক্ষাতের আনন্দে। কিন্তু না আসেনি এখনো। আরো একটু বাঁক দিয়ে ডানে যেতে হবে গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। বেশ কিছু দূর গিয়ে এমন এক জায়গায় থামলো, সামনে অনাবিল মাঠ বহু দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে বাড়িঘর, হাত তুলে দেখালেন– ঐতো দেখা যায় তার বাড়ি। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ী করছি। অতঃপর জেহাদী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে নাসীম আপার সাথী ডঃ মীর নাসিম আলী, রওশন আপার সাথী ডঃ শিবলী নোমানী ও মীর কাসেম আলী সাহেবের সম্মিলিত প্রেরণায় রওয়ানা হলাম আমাদের এক দ্বীনি বোনের সাথে সাক্ষাতের জন্য। ইরি ক্ষেতের ব্লক, পানি ও কাঁদার মাঝে থোকা থোকা ধান গাছ লাগানো। পাশে সরু আইল। এক পা কোনভাবে রাখা যায়। সার্কাসের রশির ওপর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে হাঁটার মত করে আমরা দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে এঁকে বেঁকে ঝুকে চলছি। হঠাৎ করে পড়লাম কাদায়। এবার স্যান্ডেল হাতে করে হাঁটছি। প্রখর রোদ, সংকীর্ণ রাস্তা। জেহাদী উদ্দীপনা। পৌঁছলাম গিয়ে গ্রামের নিবিড় ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা পুকুর ঘেরা চট্টগ্রামের মাটির ঘরে। পাটি বিছিয়ে দেয়া হলো বসার জন্য। দু'জন বয়সী মহিলা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দু'টুকরা শাড়ি পরা কানে গলায় হাতে রুপার গয়না। একজন আমাদের সেই বোনের মা, আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন। আমি তো কিছুই বুঝি না, নাসিমা আপা কিছুটা বোঝেন। সামান্য বলতেও পারেন। তাদের প্রশ্নের উত্তরে নাসিমা আপা বললেন 'গম আছি' আমরা তো অবাক, তবে পরে জেনেছি 'গম আছি' মানে ভাল আছি। এলো সেই আকাঙ্ক্ষিত বোন। খুব ছোট মেয়ে যদিও লেখাপড়া করে কিন্তু আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। শুদ্ধ বলতে পারে না, তার গৃহ শিক্ষকই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে ছাত্রীসংস্থার ব্যাপারে। উনিই চিঠি লিখে দেন তাই সে আমাদের কাছে পাঠায়। যাহোক ছাত্রীসংস্থার কাজ সেখানকার মেয়েদের অবস্থা, কিভাবে ইউনিট হবে ইত্যাদি আলাপ করে কিছু কাগজপত্র দিয়ে এসেছিলাম। সেদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি আর আমাদের সাথীদের উৎসাহ, ধৈর্য, প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করেছিল এত দুরূহ কাজ সমাধা করতে। এমনি সম্মিলিত প্রচেষ্টাই গড়ে উঠেছে আজকের ছাত্রীসংস্থা।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিপ্লবী কর্মসূচি নিয়ে পৌঁছে যাক প্রতিটি ছাত্রীর দোরগোড়ায় যাতে ছাত্রীরা তাদের হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার অভ্যন্তরে। দেশের সামগ্রীক বিপ্লব সাধনের দায়িত্ব ছাত্রীসংস্থার নয়, তবে একটি মেয়ের অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টির দায়িত্ব অবশ্যই ছাত্রীসংস্থার। একটি মেয়ের জীবনে বিপ্লব আসলেই তৈরি হবে একটি সমাজ বিপ্লব। তাই সামগ্রিক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে অন্তরে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন দীন প্রতিষ্ঠার সুতীব্র দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রীসংস্থার বোনেরা হবেন এক একজন খাদিজা, সালমা, আয়শা, এটাই আমার কামনা, আল্লাহপাক সহযোগিতা করুন। আমীন।#

www.pathagar.com

মনের মুকুরে ছাত্রীসংস্থা

নূরুন্নিসা সিদ্দিকা

মনের জমীনে ভীড় কত কথার। আর তা যদি হয় অতীতের। আজ চল্লিশের কোটা পেরিয়ে শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের উচ্ছলতায় ভরা অতীতই তো কেবল হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই ডাকে সাড়া দেয়া যায় যদি তা থেকে সংগ্রহ করা যায় কিছু মণি-মুক্তা। হয়ত তা আরও অনেক জীবনকে করে তুলবে সমৃদ্ধ।

শৈশবের স্মৃতি

১৯৬৫ সাল। ৬ সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ছুটি। বড় ভাই বাড়ি আসলেন। আমি তখন সমবয়সীদের সাথে পুতুল খেলি আর সারা বাড়িময় হইচই করে বেড়াই। মাঝে মাঝে বড় আপার কাছে বই নিয়ে বসি। বই বলতে ছিল শিশু শ্রেণীর পাঠ 'সবুজ সাথী', 'ছড়া ও পড়া' আর ধারাপাত। বাড়ির দরজায় স্কুল। তবুও স্কুলে তো যাওয়া মানা। আব্বা ছিলেন হক্কানী আলেম। তাঁর ধারণা- মেয়েরা স্কুলে যাবে কেন? ঘরে বসে লিখতে ও পড়তে শিখলেই চলবে। বড় আপার কাছে পড়ালিখা শিখছি। ছুটিতে বাড়ি এসে বড় ভাই জানতে চাইলেন স্কুলে যাই কিনা? বললাম না। আব্বা তো যেতে দেয় না। বললেন কাল থেকে তুই স্কুলে যাবি। আব্বা জিজ্ঞেস করলে বলবি, স্কুলে পড়ে আপনার আব্বাকে পড়াব। যা হোক, আব্বার নিষেধ অমান্য করে আর স্কুলে যাবার সাহস হয়নি।

দু'দিন পর বড় ভাই নিজেই আমাকে নিয়ে যেয়ে পেশকারহাট ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। তখন স্কুলে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চলছিল। আমি যথারীতি পরীক্ষার হলে গেলাম। প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে লিখতে শুরু করলাম। এক স্যার কাছে এসে বললেন, তুমি কি করছো প্রশ্ন লিখছ কেন? বললাম স্যার কি লিখবো? বললেন উত্তর লিখ। আমি তো উত্তর কিভাবে লিখতে হয় জানি না। কাজেই কেবল প্রশ্নটা লিখে দিয়ে আসি। বুঝতেই পারছেন পরীক্ষার ফলাফল কি?

ক্লাস করা শুরু হল। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়াতে স্যারেরা অত্যন্ত খুশি হয়ে বড় ভাইকে বললেন, আপনার বোনটার যাবতীয় খরচ স্কুল দিবে। বলাবাহুল্য তখন বেতন ফ্রি ছিল। আমার বই পুস্তকের খরচও স্কুলই দিতে লাগল। প্রতিটা ক্লাসে প্রথম হওয়াতে আব্বা আর আপত্তি করলেন না। স্যারেরা চেষ্টা করলেন। তাদের ফার্স্ট গার্লকে অল-রাউণ্ডার বানাতে। তাই অন্যান্য দিকেও প্রশিক্ষণ দিতে লাগালেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম। স্কুলের সুধী সার্কেলে পরিচিত হয়ে উঠছি। এমন সময় হক স্যার একদিন মুখভার করে বললেন, নূরুন্নিসা তোর ভাই তোকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করে দিয়েছে। নিজের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বিকাশের বাধায় যতটা কষ্ট পেয়েছি, তারচেবেশি পেয়েছি স্যারের আশাহত হওয়ায়।

www.pathagar.com

স্বপ্নের পৃথিবী

বড় ভাইয়ের স্বপ্ন ছিল আমি লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হব। ঢাকা থেকে বাড়ি যাবার সময় আমার জন্য নিয়মিত বই গিফ্‌ট আনতেন। খেলনা ছাড়া কোন জিনিস চাইলে বলতেন জীবনে যারা বড় হয়েছে, বস্তুগত উপকরণ তাদের কাছে প্রধান ছিল না। আমাকে যেসব বই দিতেন তার মধ্যে ছিল 'পাক জীবন', 'মহিয়সী নারী', 'নবী সহধর্মিণী' 'বিশ্বনবীর চার দুলালী' ইত্যাদি। এসব বই আমার মনের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করতো। আমি তাদের মত বড় হবার, আদর্শ মানুষ হবার আশা করতাম। একবার বড় ভাইকে চিঠি লিখলাম- সহপাঠী বান্ধবীদের পোশাক-আশাক আমার চেয়ে অনেক উন্নত। তাদের তুলনায় নিজেকে বড় দীনহীন মনে হয়। বড় ভাই দীর্ঘ চার পৃষ্ঠার চিঠি লিখলেন। আমি অত্যন্ত লজ্জিত, অনুতপ্ত হলাম। আর কখনো বস্তুগত উপকরণ দিয়ে নিজেকে সাজাবার চেষ্টা করিনি। ঠিক করলাম চরিত্রই হবে আমার উত্তম পোশাক।

আলোর সন্ধানে

জুনিয়ার হাইস্কুলে পড়ার সময় বাবা-মায়ের আনুগত্য, কম কথা বলা, লেখাপড়ায় আত্মনিবেদন আর প্রতিবেশী, বোন, ভাবী ও খালাদেরকে হেদায়াতমূলক কথা বলা এবং বই পড়ে শোনানো আমার দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৬৯ সাল। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। বড় ভাই ঢাকা থেকে একটি পত্রিকা নিয়ে বাড়ি আসেন। পত্রিকাটির নাম মনে নেই। বিশাল আট কলামের হেডিং দিয়ে লেখা– "সারাদেশে শোকের ছায়া' নিচে শহীদ আবদুল মালেক এর শাহাদাতের ছবি। কিশোরী মনের অদম্য আগ্রহে পুরো পত্রিকার প্রতিটা লাইন মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। অঝোর ধারায় কাঁদলাম। সেই থেকে 'মালেক ভাই' হয়ে গেলেন আমার ভাই। তাছাড়া গায়ের রং, চেহারা ও শারীরিক গঠনে বড় ভাইয়ের সাথে তার মিল ছিল।

আমি যে জীবনধারায় বিশ্বাসী, যে বোধ নিয়ে গড়ে উঠেছি, শহীদ মালেক তো সে বিশ্বাসেরই বাস্তবায়ন চেয়েছেন। আর এজন্য তাকে অকালে প্রাণ দিতে হল? এ প্রশ্ন আমার মনকে ক্ষত-বিক্ষত করত। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমদ তৎকালীন ছাত্র সংগঠনের নেতা শহীদ মালেকের ঘাতকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তার প্রতি চরম ঘৃণা আর অভিশাপ আমার সেদিন থেকে। জানিনা শহীদ মালেক তোফায়েলের ঈগল চক্ষুর প্রথম শিকার কিনা। তবে তারপরে আরও বহু প্রাণের দায় নিয়ে তোফায়েল আজও বেঁচে আছে। তার মিথ্যাচারিতায় জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মহান প্রভু একদিন কড়ায় গণ্ডায় এসব অপকর্মের হিসাব নিবেন।

জীবন্ত প্রেরণা

শহীদ মালেকের শাহাদাত আমার জন্য ছিল এক জীবন্ত প্রেরণা। আজও তিনি আমার নেতা। তার জীবনের প্রতিটি ঘটনার পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করে অনুপ্রাণিত হই। পাঠ্যপুস্তকের বাইরের পড়াশোনা আরও বাড়িয়ে দেই।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় ইসলামী আন্দোলনের মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম'। বড় ভাই নিউজ সব এডিটর হিসেবে যোগ দেন। বাড়ি আসার সময় 'জাহানে নও' আর 'সংগ্রাম' নিয়ে আসতেন। আর এগুলো ছিল আমার অপরিমেয় মনের খোরাক। ১৯৭০-এর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোন এক সময়ে বড় ভাই সংগ্রামের একটি সংখ্যা নিয়ে আসেন। ভিতরের পাতায় সম্ভবত সপ্তম পাতায় এক কলামের একটা খবর চোখে পড়ে- 'ইসলামী ছাত্রীসংঘের আত্মপ্রকাশ'। আজকের বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার তারা ছিলেন পূর্বসূরি। '৭১-এ যুদ্ধ শুরু হবার পর সম্ভবত তাদের কাজ আর এগোয়নি। আজ ছাত্রীসংস্থা দীর্ঘ পঁচিশ বছর অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের সবুজ জমীনে দীন কায়েমের এই কাফেলা লক্ষ লক্ষ জনশক্তি নিয়ে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিতে দীনের পতাকাকে সমুন্নত করে চলেছে। 'সংগ্রাম' আজও বেঁচে আছে। তবে ছাত্রীদের প্রতি তার মনোভাবের কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি। এখনও ছাত্রীসংস্থার খবর একটি বাসী খবরের মত। সপ্তম পাতার অষ্টম কলামে ছাপা হয়। 'নিজস্ব' প্রচার মাধ্যমের অসহযোগিতার দৃষ্টান্ত এটি। বোনদের দীনি অগ্রযাত্রাকে পিছনমুখী করার মানসিকতা এ জন্য অনেকাংশে দায়ী। তাই আজ প্রয়োজন ছাত্রীদের একটি মুখপত্র সাপ্তাহিকী বের করা।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি

১৯৭১ এর যুদ্ধের বিভীষিকা ঢাকার পীলখানা বিডিআর গেটের নিকটে থেকেই অনুভব করেছি। আমাদের বাসা ছিল ৭৫ নং নতুন পল্টন লাইন। দেখেছি পাকিস্তানী সৈন্যদের আচরণ। আমাদের একটি মুদি দোকান ছিল বিডিআর এর কাছেই। সেখান থেকে সৈন্যরা নিয়মিত সদাইপাতি করত। কখনো কেউ কলার কাঁদিটা আস্ত নিয়ে যেত মূল্য পরিশোধ ছাড়াই। কখনো কোন বাড়িতে ঢুকে উঠান থেকে মুরগী ধরে নিয়ে যেত। আবার ব্যতিক্রমও ছিল। কাউকে দেখা যেত একটি সেভিং ব্লেড বা একটি সিগারেটের দাম অত্যন্ত বিনয়ের সাথে পরিশোধ করছে। অনেকে বাকীতে সদাই করত। বেতন পেয়ে পরিশোধ করে দিত।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তীনী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় সৈন্যরা পীলখানা প্রবেশ করে কিভাবে জিনিসপত্রের ক্ষতি সাধন করে। মুসলিম সৈন্যদের ব্যবহৃত সবকিছু অপবিত্র বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, ফ্যান, আলমিরা, রান্নাঘরের সামগ্রী কোনটাই বাদ দেয়নি। সুযোগ সন্ধানী জনগণ এর সদ্ব্যবহার করে। তারা এগুলো এনে সস্তায় বিক্রি করে দেয়। লুটের মাল বলে বড় ভাই এর একটিও কিনতে রাজী হননি। ১৯৭২ সালের বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের রাস্তাঘাটে এমনভাবে দেখা যেতো মনে হত এটা ইন্ডিয়া নাকি বাংলাদেশ?

মার্চ অথবা মে মাসে ইন্দিরা গান্ধী ঢাকায় আসেন। তাকে মাসী বলতে কিছু মানুষের উৎসাহের সীমা ছিল না। উল্লেখ্য যে, শহীদ মালেকের রক্তঝরা স্থানটিতে স্বাধীনতার পর ইন্দিরা গান্ধীর জন্য মঞ্চ তৈরি হয়েছিল।

জাতীয় মানসিকতার পরিবর্তন

ভারতের সহায়তায় স্বাধীনতা লাভ দু'দেশের দূরত্ব কমিয়ে দেয়। শুরু হয় সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান।

ভারতীয় সংস্কৃতি দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। মেয়েরা হাতাকাটা ব্লাউজ, নাভির নিচে শাড়ি পরার প্রচলন শুরু করে। নির্লজ্জতা বুঝি শেষ সীমাটুকুও ছাড়িয়ে যায়। 'পোশাকে শালীনতা' নিয়ে শুরু হয় পত্রিকায় লেখালেখি। এর পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তি অত্যন্ত উপভোগ করতাম। অশালীনতার আর অবাধ মেলামেশার কুফল অচিরেই ফলতে শুরু করে। ৭২ অথবা ৭৩-এর ৩০ নভেম্বর মুনীর চৌধুরীর ছোট বোন মুনীরা হক আজিমপুর চায়না বিল্ডিং-এ ঘাতকের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। শোনা যায় মুনীরার অবাধ মেলামেশাই তাদের দাম্পত্য কলহ ও হত্যাকান্ডের কারণ। রাজশাহী মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী অনিন্দ্য সুন্দরী নীহার বানুকে তারই ক্লাসমেট 'বাবু' বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে। লাশ গুম করে এ দুটি হত্যাকান্ড দীর্ঘদিন যাবত বহুল আলোচিত ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে নারীদের অবমূল্যায়ন এভাবেই শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কোরআনের আয়াত তুলে দেয়া হয়। সর্বত্রই শুরু হয় 'ইসলাম' ও মুসলিম' শব্দের এলার্জি। শুধু তাই নয়; 'মুক্তিযুদ্ধ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে' এই সেন্টিমেন্ট সৃষ্টির জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী কিছু মুক্তিযোদ্ধা আলেম-ওলামাদের ওপর চড়াও হয় এবং নির্বিচারে তাদের হত্যা করে স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও তার দলের অবস্থান ছিল বিপরীত। ফলে জাতির মধ্যে যে বিভক্তি সৃষ্টি হয় তা আজও অব্যাহত আছে। বলতে গেলে স্বাধীনতার তেত্রিশ বছরে আমাদের যা অর্জন তা কেবল এইটুকুই।

আওয়ামী লীগ কখনো তার ভিন্নমতকে সহ্য করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও '৭২-৭৩ সালের লুটপাট আর অরাজকতার কথা সাপ্তাহিক 'হক কথা' সহ কিছু পত্রিকা প্রকাশ করে। তরুণ কবি আসাদ-বিন হাফিজ স্বাধীনতার ছড়া লেখেন–

ধরা যাবেনা ছোঁয়া যাবেনা
বলা যাবেনা কথা
রক্ত দিয়ে পেলাম শালার
এমন স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

শুরু হল পথ চলা

১৯৭৫ সালে ইডেন মহিলা কলেজে পরিচয় হয় আয়েশা আপার সাথে। তার আগে খোঁজ পাই মুসলিম মহিলা মিশনের সেক্রেটারী জাহানারা আজহারী আপার। ১০নং মিন্টু রোডে একজন বিচারপতির বাসায় জাহানারা আপার আমন্ত্রণে হাজির হই। মুহতারামা মনোয়ারা হাদীর আলোচনা, জাকিয়া খালাম্মার ভক্তিপূর্ণ মোনাজাত ও জাহানারা আপার আন্তরিক অভ্যর্থনা মনে রাখার মতো।

ইডেনের মাঠে বসে একদিন আয়েশা আপা বললেন ইসলামী মহিলা মজলিশের কথা। সাইয়েদা মুনীরা, শামসুন্নাহার নিজামী আপার কথা। তাদের সাথে দেখা হবার আগে ভাবতে পারিনি তারা কতটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। মুনীরা খালাম্মার কথা, ব্যক্তিত্ব, আলোচনা আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করত। আজ তিনি নেই। কিন্তু তার তেজস্বীনী বক্তব্য আজও আমার কানে বাজে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। আমীন।

ছাত্রীসংস্থার যাত্রা শুরু ১৯৭৮ সালের ১৫ জুলাই, তার আগে শিক্ষানবীশ ছিলাম আমরা গুটিকয়েক ছাত্রী। ছাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক হত নাজিরা বাজার বাংলা দুয়ার নিজামী আপার বাসায়। আপা নিজেই পরিচালনা করতেন। তখন আমরা ছাত্রী মহিলা নিয়ে পনর বিশ জনের মত ছিলাম, এর বেশিরভাগই ছিল ছাত্রী। আপা পাঠচক্র পরিচালনা করতেন হাকীকত সিরিজ, সত্যের সাক্ষ্য, ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, ইসলামী বিপ্লবের পথ ইত্যাদি বইয়ের ওপর। যারা নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন ইডেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, লালমাটিয়া কলেজের ছাত্রী। কিছু স্কুল ছাত্রীও ছিল। মনে পড়ে আমাদের প্রথম T.S. (ছাত্রীমহিলা সম্মিলিত) হয় নাজিরা বাজার বাংলা দুয়ার এর একটি স্কুলে। ৫০/৬০ জনের মত অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ছাত্রীদের পৃথক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় 'আহ্বায়িকা কমিটির' মাধ্যমে সাংগঠনিক পথযাত্রা শুরু করে। এই কমিটি গঠনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল এবং ইডেন হোস্টেলে নিয়মিত বৈঠক হতো। তাফসীর ক্লাসের মাধ্যমে মনমানসিকতা গঠন ও দীনি দাওয়াত পেশ করা হয়। ধীরে ধীরে ঢাকায় বিভিন্ন এলাকা এবং ঢাকার বাইরেও কাজ শুরু হয়। বৈঠকের ব্যাপারে পূর্বসূরিদের অনুসরণ করা হতো অবশ্যই। তবে নতুন দাওয়াতী কাজ, কর্মী গঠন প্রক্রিয়া নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই চলতে থাকে। আহ্বায়িকা কমিটির সদস্যরা মাসিক বৈঠকে মিলিত হতেন। কাজের পদ্ধতির ব্যাপারে মত বিনিময় চলতো। এখানে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা হতো, সব এলাকায় কর্মপদ্ধতি একরকম হয়। এজন্য ঢাকায় বিভিন্ন ইউনিটে সফর এবং ঢাকার বাইরে আমাদেরকে প্রচুর চিঠিপত্র লিখতে হতো। এসব চিঠি ছিল প্রেরণাদায়ক ও নির্দেশনামূলক। এমনি একটি চিঠি একবার যেয়ে পড়ে গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সেক্রেটারি রওশনকে লেখা চিঠিটা ছিল চাকসু নির্বাচন সংক্রান্ত। চিঠি যথারীতি তার কাছে পৌঁছে এবং আমি জবাবও পাই। কিছুদিন পর এক ভদ্রলোক এসে একটা ঠিকানা দিয়ে বলেন আপনাকে এখানে যেতে হবে। ভাবলাম কোন সুধীর সন্ধান পাচ্ছি বুঝি। এক বোনকে সাথে নিয়ে উক্ত ঠিকানায় চলে গেলাম। কোন বাসাতো নয় ছিমছাম একটা অফিস। এক হ্যান্ডসাম ভদ্রলোক অত্যন্ত নম্রভাষায় আমাদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। তিনি সংগঠন সংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। সতর্ক হয়ে গেলাম, এ ব্যক্তিকে তো সব কথা দেয়া যাবে না। তিনি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। শেষে একটু বিরক্ত হয়ে বললাম আপনাকে তো বলেছি এর চেয়ে বেশি তথ্য আমার কাছে নেই। ভদ্রলোক মোটেও রাগ করলেন না। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় কথা বললেন। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা আলোচনার পর বের হয়ে আসতে আসতে সুধী না পাবার দুঃখে কাতর। পরে জানলাম ওটা ছিল গোয়েন্দা বিভাগ এবং আমার ঐ পত্রটির ফটোকপিও তাদের হাতে ছিল। তারা ভেবেছিল আমাদের এ কাজের পেছনে কোন বিদেশী শক্তি সক্রিয় কিনা। আয়েশা আপা ঐদিনই আমাকে ডাকলেন এবং সতর্ক করে দিলেন এ ধরনের কোথাও যাওয়ার আগে যেন অনুমতি নেই।

১৯৮৩-৮৪ সেশন, আমার দায়িত্বের প্রথম বছর। শুরু হল 'নসু'র তৎপরতা। এখন পুরোদমে চলছে ছাত্রীসংস্থায়। একান্ত আপনজনেরাও কেন জানি পর হয়ে যাচ্ছে। নাদিরা ভাবী, শিউলি, সেলিনা, নাসরিন লাকি সবাই একে একে গোলক ধাঁধায় নিমজ্জিত। প্রশ্নের জবাব দেয়ার পর তখনকার মত চুপ। পরদিন আবার একই প্রশ্ন। পরে 'নসু' থেকে ফিরে আসা শিখিয়ে দেয়া ভাইদের বক্তব্যে পড়েছি– এসব ছিল। সব বুঝার পরেও বলবে "বুঝি নাই"। শিউলি নাদিরার এলাকা শিবচরে এই সমস্যা দেখা দিল। এর সমাধানে পাঠালাম সবচেয়ে ধৈর্যশীল ধীর স্থির এবং বুদ্ধিমতি রাবেয়া আপাকে। আপা তখন

www.pathagar.com

সেক্রেটারি জেনারেল। প্রায় তিন দিন ধরে শিবচর অবস্থান করে সাধারণ সভা, কর্মী সমাবেশ আর অসংখ্য ব্যক্তিগত কন্ট্রাক্ট এ প্রচুর সময় দিয়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত রাবেয়া আপা লঞ্চে ওঠার পরই সংজ্ঞা হারান। সাথী বোনেরা বহু কষ্টে তাকে নিয়ে ঢাকায় পৌছেন। রাবেয়া আপা অসম্ভব শান্ত মনের মানুষ। শিবচরের কঠোর পরিশ্রম তাকে বিপর্যস্ত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবচরকে আর ধরে রাখা যায়নি। আজও সেই মানুষগুলো আছে। মূল আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। সারাদেশে তখন ছোটবড় মিলিয়ে ৩৭টির মত শাখা ছিল আমাদের। আল্লাহর ইচ্ছায় কেবল মাত্র শিবচর আর ঢাকার বাড্ডা ইউনিট ছাড়া আর কাউকে তারা হটাতে সক্ষম হয়নি। এসবই এখন ইতিহাস। কিন্তু এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে–

১. ইসলামী আন্দোলনের যথার্থ জ্ঞানের অভাবেই বিচ্যুতি ঘটে।
২. হঠকারিতা সত্য উপলব্ধির অন্তরায়।
৩. দায়িত্বশীলের সময়োপযোগী পদক্ষেপ দ্রুত সমস্যা নিরসনে সহায়ক।

নেতৃত্ব সৃষ্টির পরিকল্পনা

৮৩-৮৪ এর সংকট কাটানোর পর দু'বছর পার হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে নেতৃত্বের শূন্যতা। এর অন্যতম কারণ অগ্রসরমান বোনদের বিয়ে বা লেখাপড়ার কারণে স্থানান্তর, ছাত্রীদের কাজের স্বাভাবিক গতিতে এটা বরাবরই প্রধান সমস্যা, কিছু বোনের সাথে আলাপ করলাম তারপর পরামর্শ সভায় আলোচনাক্রমে নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী কর্মীদের নিয়ে এক শিক্ষাশিবির করার পরিকল্পনা হল। প্রোগ্রামটা ছিল তিনদিন ব্যাপী। এই শিক্ষা ক্যাম্পটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই বাছাই করা হলো শ'খানেক নেতৃত্ব। শুরু হলো তাদের পরিচর্যা, পরিকল্পিত যোগাযোগ, সফর, ব্যক্তিগত রিপোর্ট দেখা, এলাকায় সাথে নিয়ে কাজ এবং কর্মী ও সুধীদের সাথে ব্যাপক যোগাযোগের মাধ্যমে গণমুখী নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রয়াস চলে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

শুরু হলো সারাদেশে কর্মপ্রেরণার জোয়ার। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বোনেরা অংশ নিতে লাগল। ময়মনসিংহ, জামালপুর, রংপুর, খুলনা, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, ঢাকা প্রভৃতি এলাকায় কলেজ সংসদ নির্বাচনে ছাত্রীসংস্থা অংশ নিল। মহিলা কলেজে পূর্ণ প্যানেলে এবং সাধারণ কলেজে কমনরুম সম্পাদিকা পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একাধিক আসনে বিজয়ী হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে ছাত্রীসংস্থা পাঁচটি কলেজে একাধিক আসনে বিজয় লাভ করে।

বিচিত্রার বিচিত্র আচরণ

অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সাপ্তাহিক সংখ্যা 'বিচিত্রা' তখন সারা দেশে বহুল প্রচারিত। ছাত্রীসংস্থার তৎপরতা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কামরুন নেসা মাকসূদা আপার ভাই নোমান অথবা নয়নের বন্ধু পরিচয় দিয়ে একদিক দুটো ছেলে আমার কাছে আসে। ছাত্রীসংস্থা সম্পর্কে জানতে চায়। আমি তখন সময় না দিয়ে অন্য একটা তারিখ দেই। সে অনুযায়ী তারা আসে। কিন্তু ক্যাসেট প্লেয়ার ভিডিও ক্যামেরা সবসহ। আমি বললাম, আমি ছবি উঠাই না, এবং না মাহরুম কোন পুরুষের সামনে যাই না। তারা অনেক পীড়াপীড়ি করল। অবশেষে আমি বললাম, আপনাদের যা প্রশ্ন আছে, লিখিত দেবেন এবং আমি লিখিত জবাব দেব। কারণ, আমি জানতাম বক্তব্য বিকৃত করার বেলায় 'বিচিত্রা'র জুড়ি নেই। তারা শহীদুল্লাহ হলের প্যাডে কিছু প্রশ্ন দিল। কেন 'বিচিত্রা'র প্যাড ব্যবহার করল না তার কোন জবাব তারা দেয়নি। যাই হোক মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শ করে লিখিত জবাবের ফটোকপিটা তাদের দিলাম। দিন পনের এর মধ্যে 'বিচিত্রা' প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাপে– "স্বাধীনতা বিরোধীদের আর এক চক্রান্ত বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা" শিরোনামে। প্রতিবেদনে স্ব-নামে বেনামে কিছু সাক্ষাতকার নিয়ে সত্যকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে। বিচিত্রার এ জঘন্য রিপোর্টের প্রতিবাদ করেন প্রচার সম্পাদিকা শাহীন আকতার আঁখি। তবুও তাদের মিথ্যাচার থামেনি। বিচিত্রার অপপ্রচার আমাদের জন্য শাপে বর হয়ে দেখা দেয়।

(১) বিচিত্রার কল্প-কাহিনীর পাশাপাশি আমাদের বোনরা ছিল সাধারণ মেয়েদের অতি নিকটে। বোনদের চরিত্রের নির্মলতা, কাজে নিষ্ঠা এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণতা ছিল স্পষ্ট। তাই সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। 'বিচিত্রা'ই ছাত্রীসংস্থার নাম 'সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়।

www.pathagar.com

(২) বিচিত্রার মাধ্যমেই বিদেশে অবস্থানরত ভাইয়েরা জানতে পারেন। ছাত্রীসংস্থার বোনরা দূর-দূরান্ত হেঁটে কঠোর পরিশ্রম করে তাদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। ভাইয়েরা তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখেন, ছাত্রীসংস্থাকে গাড়ী উপহার দেয়ার। শেষ পর্যন্ত নিজস্ব উদ্যোগেই আমরা একটা গাড়ী ক্রয় করি।

মহলে ছাত্রীসংস্থার প্রভাব ছিল প্রচুর। যারাই ছাত্রীসংস্থার বোনদের সংস্পর্শে আসতেন, তাঁদের হৃদয় আস্থা ও বিশ্বাসে ভরে যেত। এ হচ্ছে আল্লাহর দেয়া এক বরকত।

কর্মীদের সাথে সম্পর্ক

কর্মীরা ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় জনশক্তি। তাদের তৎপরতাই সংগঠনে প্রাণচাঞ্চল্য আনে। সক্রিয় জনশক্তি গড়ার জন্য যোগাযোগ সর্বাধিক কার্যকর মাধ্যম। ১৯৮৫তে সন্ত্রাসের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ মাস বন্ধ ছিল। একে বলা হয় 'এরশাদ ভেকেশন'। পরিকল্পনা হল সারাদেশ সফরের। সাথী ছিলেন জনাব শেখ মহিউদ্দিন। এতে দুটি উপকার হল। এক, সফরের আশ্রয়। তবে আমার সফর সঙ্গীর ভ্রমণটাই ছিল অধিক আকর্ষণীয়। আমি যখন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কাজে বিরামহীন সময় কাটাতাম তখন তিনি ফুরফুরে মেজাজে দীনিভাইদের সাথে আকর্ষণীয় স্থানগুলো দেখতে যেতেন। আর প্রতিটি বাড়িতেই খালাম্মারা জামাই-আদর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

সারাদেশে সাংগঠনিক সফরের লক্ষ্য ছিল কর্ম প্রবাহ সৃষ্টি ও মজবুত সংগঠন তৈরি। এজন্য কর্মী ও দায়িত্বশীলাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সাংগঠনিক সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনার পাশাপাশি থাকত সুধী যোগাযোগ। অনেক শুভাকাঙ্খী বোনেরা ছিলেন সমাজের উচ্চ মর্যাদায় অভিসিক্ত। তারাও আসতেন সাক্ষাত করতে। অনেক বিষয়ে পরামর্শ করতে। বস্তুত সুধী মহলে ছাত্রীসংস্থার প্রভাব ছিল অনেক। যারাই সংস্থার বোনদের সংস্পর্শে আসতেন, তাদের হৃদয় আস্থা ও বিশ্বাসে ভরে যেত। এ হচ্ছে আল্লাহর দেয়া এক বরকত।

ত্যাগের সাধনা

ইসলামী আন্দোলন তার অনুসারীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ত্যাগ দাবি করে। দায়িত্বশীলদের ত্যাগী মনোবৃত্তি কর্মীদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করে। সংগঠনের গড়ে ওঠার মুহূর্তে ত্যাগ ও কোরবানীর প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। আলহামদুলিল্লাহ এ প্রয়োজন পূরণেই বোনেরা এগিয়ে আসে। তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা, Carreer সর্বকিছুর ওপর সংগঠন প্রাধান্য পেতে থাকে। এগিয়ে আসা বোনেরা হাসিমুখে সবকিছু করত। পিছিয়ে পড়াদের প্রতি তাদের সহানুভূতি ছিল কিন্তু কোন অভিযোগ ছিল না। পারস্পরিক এই সম্পর্কই এক সময় তাদের সক্রিয়তার আঙিনায় টেনে আনত।

কিছু ব্যক্তিগত অনুভূতি

বিকেল সোয়া তিনটায় চিঠি পেলাম রোকেয়া হল সিলেকশনে আমাকেই যেতে হবে। কিছুদিন থেকেই তাদের সাথে আমার 'এহতেসাব' হওয়া খুব বেশি feel করছি। তবুও সাংগঠনিক কাজে বাধ্য হয়ে তাদের সাথে মিশেছি– অজানা সঙ্কোচ সাথে নিয়ে। এখন তাই আর মন থেকে সাড়া পেলাম না। এ ব্যাপারে আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যে, আমি যাবো না– আয়েশা আপাকে পাঠাব। বাসায় গিয়ে তাকে বলতেই তাঁর মেজাজ খুব চড়া দেখলাম। আমিও অপরিবর্তিত। জানিয়ে দিলাম। দু'পক্ষের বেশ কড়া কথা। কিন্তু অনুভব করলাম এ মুহূর্তের আচরণেও তিনি বেশ সংযমের পরিচয় দিলেন। মার্জিত ভাষা ব্যবহার করলেন।

বেশি কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেলাম সাংগঠনিক অন্য কাজে। আমার সাংগঠনিক সত্তার কাছে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিসত্তা পরাজিত হল। হলে গিয়ে দেখি বোনেরা সব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে selection-এর জন্য। শেষ পর্যন্ত থাকতেই হল। ঠিক মাঝামাঝি সময়ে আয়েশা আপা এলেন। থমথমে মুখ। আমাকে দেখে হয়ত একটু চমকালেন। তারপর কাজ চালিয়ে যাবার ঈশারা করে বসলেন।

সভানেত্রী নির্বাচন শেষে সবাই নামায পড়তে গেছেন। আমি অযু করে এসে জায়নামাযের পাশে। আয়েশা আপা মুনাজাত সেরে একমুখ উজ্জ্বল হাসি দিয়ে এই প্রথম কথা বললেন, 'আমি জানতাম, তুমি আসবে।

www.pathagar.com

আজ শনিবার, ২রা জুন। ১১ মাস পর ইসলামী ছাত্রীসংস্থার সংবিধান প্রণীত এবং কেন্দ্রিয় কমিটি গঠিত হল। আল্লাহর হাজার শুকরিয়া সেই সাথে নির্বাচিত হয়েছে সভানেত্রী সম্পাদিকা, সদস্যাদের ও পরামর্শ সভার শপথ– সে এক প্রাণস্পর্শী দৃশ্য, অনুভব করার মত। আল্লাহর আমাদেরকে তাঁর দীনি দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। তাঁর সাহায্য ছাড়া একপাও চলা সম্ভব নয়।

পাঠচক্র : Study Circle

- মাসে তিনটি বৈঠক হবে।
- তিন মাস-সেশনকাল- মোট ৯টি বৈঠক।

হালকা কোন জ্ঞান নিয়ে ইসলামী আন্দোলনে আমরা এগিয়ে আসতে পারি না। s. c.-এর মাধ্যমে–

(১) কোন বিষয়কে গভীরভাবে জানার সুযোগ পাই।
(২) চিন্তার ঐক্য গড়ে ওঠে।
(৩) Team Spirit গড়ে ওঠে।

ফুটবল খেলোয়াড়ের উদাহরণ, s. c.-এর নিয়ম :
বাছাইকৃত বইয়ের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়াশোনা করতে হয় ও নোট করতে হয়।

নির্দিষ্ট বই

(১) ঈমানের হাকীকত, (২) ইসলামের হাকীকত, (৩) নামাজ রোজার হাকীকত, (৪) জিহাদের হাকীকত, (৫) সত্যের সাক্ষ্য, (৬) ইসলাম ও জাহেলিয়াত, (৭) ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী, (৮) চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান।

সাংগঠনিক জীবন বিস্তৃত অভিজ্ঞতার এক বেদনা মধুর ইতিহাস। তিলে তিলে গড়ে ওঠা একটি সংগ্রামী কাফেলার সবুজ শ্যামল বর্ধনের দৃশ্য যার পশ্চাতে থাকে এক প্রচন্ড জীবনীশক্তি এবং সাথে ক্ষয়কারী ধ্বংস সাধনে রত জীবাণুও।

গতকাল দীর্ঘ সময় ধরে আয়েশা আপার সাথে আলাপ হল– দুই সহকর্মী বোন মিতু আপা ও মাহমুদার বিষয় নিয়ে, তাদের সমস্যা-সাম্প্রতিক উদাসীনতা নিয়ে। কিভাবে তার সমাধান পাওয়া যায়– অনেক চিন্তা করেও পথ খুঁজে পেলাম না। সুতরাং চিন্তার গভীরতা বাড়িয়ে, নতুন চিন্তার পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। আলোচনার ইতি টেনে আয়েশা আপা হলেন ঘরমুখী। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় সেক্রেটারীয়েটের মাসিক বৈঠক। কাজ হাতে রেখে কিছু আগেই চললাম। ৯টায় মাহমুদা এসে হাজির। তার দীর্ঘদিনের সময়ানুবর্তিতায় (!) এটা একটু বিস্ময়কর বৈ কি?

৫ মিনিট দেরি করে অনুষ্ঠান শুরু হলো। 'ঢাকা শহর' প্রসঙ্গ এলো। মাহমুদাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই উষ্ণ কিছু কথাবার্তা হল। মাহমুদা তার দায়িত্ব পালনে সরাসরি অক্ষমতা প্রকাশ করে। এ ছিল তার চরিত্রের দীর্ঘদিনের সঞ্চয়েরই বহি:প্রকাশ। যাকে কেন্দ্র করে সচেতন দায়িত্বশীলদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা বিরাজ করছে। ওদিকে আয়েশা আপা তার পুঞ্জিভূত ব্যথার অন্তর থেকে সুমধুর কিছু আর ঢালতে পারলেন না। একটু কঠিন কথা-জবাবদিহির ভাষাই বেরিয়ে এল। মহান প্রভু তা লক্ষ্য করলেন, পথ করে দিলেন। নিজের ভিতরে অনুভব করলাম– ওর সাথে এত দিনকার ব্যথা, পুঞ্জীভূত তিক্ততা, বিরক্তি মুহূর্তে মায়ায় রূপান্তরিত হল। অন্তরের শীতলতা ফেলে দিয়ে তাকে আবেষ্টন করলাম– বুঝিয়ে বললাম দায়িত্বের নাজুকতার কথা। পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তন হল। সভানেত্রীও তাঁর স্বভাবসুলভ সংযত ও দরদী আত্মায় ফিরে গেলেন। অন্যরা সবাই একযোগে বাস্তব কথার সংযোগে বা নীরবে সহযোগিতা করলেন। পুরো দৃঢ়তা নিয়ে মাহমুদা আবার তার সচেতন অনুভূতিতে ফিরে গেল। একটি, বেহেশতী দৃশ্যে ভরে গেল পরিবেশ। অনুভূত হলো একটি পরম পবিত্রতম ছোঁয়া। যার পরশে সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বৈঠকের পরবর্তী দীর্ঘ সময়টি।

সদস্যা সম্মেলনের টুকরো স্মৃতি বিস্মৃতির পথে প্রায়। এতদিনে লেখার সুযোগ হল আমার। আসলে দরুণ অলস হয়েছি আমি।

২৯ অক্টোবর এক পরিবর্তনের স্মৃতি ধরে সাক্ষ্য বহন করছে। চার বছরের ছাত্রীসংস্থার জীবনের যেমন নতুন অধ্যায়, আমারও তেমনি। তিনটে বছর দায়িত্ব পালনের পর আজই প্রথম অব্যাহতি পেলাম– সেই মুহূর্তগুলোর কথাই এখন বলব– একান্ত আপন করে।

www.pathagar.com

ভোট দিয়ে এসে আমি দারুণ খুশি আমার জানামতে উপযুক্ত পাত্রে অপর্ণ করেছি। টনক নড়লো তখন- সভানেত্রী যখন ডাকলেন সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য পুরো পরামর্শ সভাকেই অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই পরামর্শ সভার প্রত্যেকের অভিমত ব্যক্ত করলেন, সাথে নিজেরও। তারপর পরামর্শ চাইলেন। সর্বপ্রথম এবং বিশেষত আমার দিকে। অকুণ্ঠা চিত্তে হাসিমুখে সায় দিলাম প্রস্তাবিত সেক্রেটারী জেনারেলের দিকে। তারপর? তারপরই শুরু হল প্রতিক্রিয়া- মিশ্র প্রতিক্রিয়া? আত্ম-সমালোচনা আর বিগত স্মৃতির সাথে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল। শরীর আগে থেকেই কিছু অসুস্থ ছিল। ক্রমে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

সবচে' কঠিন আঘাত আমার জন্য একটিই ছিল- সভানেত্রীর সাহচর্য ত্যাগ। আয়েশা আপার সঙ্গ ও আদর আমার জন্য ছিল এক সঞ্জীবনী সুধা। আজ তাই আমাকে ছাড়তে হবে। এই ভাব মনে এসে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছি বার বার। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে বিরামহীন প্রোগ্রাম, না বসলেই নয়। হৃদয়ের অবদমিত কান্না আর অশ্রুধারা রুদ্ধ করার যত কৌশল থাকতে পারে নিজের সীমিত সামর্থে তার সবই প্রয়োগ করেছি। তবু পানির ঝরণা ধারা আর মেঘলা আকাশের রং কে মেটাতে পারে?

৩০ অক্টোবর সকাল ১১টায় পরামর্শ সভার প্রথম অধিবেশন বসে। দুজন বোনের সুশ্রুষা ও সহায়তায় কিছুটা সুস্থ হয়ে বৈঠকে বসি। সেক্রেটারী জেনারেল রাবেয়া আপার প্রাণস্পর্শী তেলাওয়াত এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী সভানেত্রীর মুনাজাতের পর শুরু হল আলোচনা। দায়িত্বমুক্ত হয়ে নিজেকে বেশ হালকা অনুভব করছি। এমন সময় এলো আবার নতুন দায়িত্বের প্রস্তাব। যুক্তি ও তা খণ্ডন চলল। নিজের বেলায় পূর্ণ অস্বীকৃতি জানালাম, অতীতের অবস্থা বিবেচনা করে এক বছরের ছুটি চাইলাম। সভানেত্রী তাঁর ধারালো বুদ্ধি দিয়ে সব কথাই আমার করে শোনালেন। অথচ কিছুই মানলেন না। নতুন দায়িত্ব নিয়ে আবার কান্নায় হারিয়ে গেলাম।

রাবেয়া আপা আমাদের মধ্যে যে যোগ্যতম তার প্রমাণ বহু। তাঁর একটি অসাধারণ গুণ এই যে, আমি যখনই ব্যথা ভারাক্রান্ত অন্তর নিয়ে তার দিকে তাকিয়েছি- তখনই একটা অনাবিল শান্তি পেয়েছি। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

স্মৃতি কখনো ফুরিয়ে যায় না, পুরানো হয় না। ছাত্রীজীবনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মমুখর দিনগুলো হোক, আমাদের আখিরাতের পাথেয় মুক্তির উপায়। আর বর্তমান আর ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য হোক তা আলোক- অভিসারী।#

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ডাঃ হাবিবা চৌধুরী সুইট

বাবা মায়ের ৩য় মেয়ে হিসেবে আদরেই লালিত পালিত হয়েছি। সম্ভবত এর কারণ ছোটবেলা হতেই লেখাপড়ায় বরাবর ভাল ছাত্রী হওয়ার কারণে আমার প্রতি তাদের আলাদা খেয়াল ছিল। আমার আব্বা হাইস্কুলের শিক্ষক হওয়ার কারণে আমাদের প্রতি ভালভাবে লেখাপড়া করার জন্য প্রতিমুহূর্তেই তাগিদ দিতেন। বড় হয়ে একজন ভাল ডাক্তার হব এই চিন্তা বা Ambition আমার মাথায় ক্লাস ওয়ান থেকেই আব্বা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ভাল Result করলে বিভিন্ন পুরস্কার দিবেন এই প্রতিশ্রুতি প্রায়ই করতেন। প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পাওয়ার পর আমার আব্বা আম্মা আমার ব্যাপারে বেশি আশাবাদী হলেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ইসলামী অনুশাসন ও জীবন-যাপনের ব্যাপারেও তাগিদ পেয়েছি তাদের কাছ থেকে। আমার আব্বা ফজর নামাজের সময় হলে আমাদের কোন ভাইবোনকেই ঘুমাতে দিতেন না। আমাদেরকে জাগিয়ে দিয়ে আব্বা মসজিদে যেতেন এবং ফজর নামাজের পর কেউ ঘুমাক এটা তিনি পছন্দ করতেন না।

ক্লাস নাইনে যখন উঠি তখন থেকে আমার স্কুলের বয়েজ এবং গার্লস সেকশন আলাদা হয়ে যায়। আমি সায়েন্স নেয়ার কারণে বয়েজ সেকশনে পড়তে বাধ্য হলাম। আমার শুভাকাংখী নন এমন অনেকে আমাকে বয়েজ সেকশনে পড়ার ব্যাপারে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার আব্বা রীতিমত সংগ্রাম করে আমার পড়াশুনার ব্যাপারে অনুমতি আদায় করলেন। আমি একমাত্র ছাত্রী ছিলাম যে বয়েজ সেকশনে পড়েছি। ক্লাসে টিচারের সাথে ক্লাসে যেতাম এবং শেষ হলে আবার টিচারের সাথে অফিস বাসে চলে আসতাম। আমি তখন মাথায় কাপড় দিতাম না। একদিন আমার আব্বা আমাকে বললেন যে তুমি মুসলিম পরিবারের মেয়ে তোমাকে তো বোরখা পরতে হবে।" আব্বার এই কথায় সেদিন খুব react করেছিলাম। কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম আমি কি খারাপ হয়ে গিয়েছি যে আমাকে বোরখা পরতে হবে? এরপর আমার আব্বা এ ব্যাপারে আমাকে কখনো চাপ দেননি। যা হোক খুব ভাল result নিয়ে এস, এস, সি, পাস করলাম। ফরিদপুর জেলায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করলাম। আমার এক চাচা পেপারে আমার ছবি ছাপিয়ে খবরটা জানিয়ে ছিলেন। High ambitions এর কারণে আমি আমার আব্বাকে বললাম, ঢাকায় কোন ভাল কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পড়ব। আব্বা আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসলেন। ভাল result এর কারণে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ইডেন সরকারি মহিলা কলেজে চান্স পেয়ে গেলাম। ঢাকায় থাকার মত জায়গা না থাকায় বিশেষ করে পড়াশুনার সুবিধার্থে হোস্টেলে থাকার জন্য চেষ্টা করলাম। যাদের S.S.C তে ভাল নম্বর ছিল তাদেরকে ইডেন পুরাতন হোস্টেলের তিনতলা পিছনের ব্লকে সিট দেওয়া হল। আমি ৩২৩ নং রুমে সিট পেলাম। আমার রুমের পাশেই থাকতেন হোস্টেল সুপার কচি আপা।

www.pathagar.com

বাবা, মা, ছোট ভাই বোনকে ছেড়ে ঢাকায় এসেছি ভাল করে পড়াশুনা করার জন্য, কিন্তু যখন একাকী থাকতাম তখন খুব খারাপ লাগত। বিকালে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সাহায্য চেতাম আল্লাহ যেন আমার আশা পূরণ করেন। আমার এই একাকীত্বে হোস্টেলের সিনিয়র বোনেরা আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ না করে পারছি না তারা হলেন, মারজিয়া আপা, আয়েশা আপা, নূরুন্নিসা আপা। নূরুন্নিসা আপা থাকতেন পুরাতন বিল্ডিং এ আর খো.আয়েশা আপা থাকতেন নতুন বিল্ডিং-এ। বিকাল হলেই তারা by rotation এ বিশেষ করে মারজিয়া আপা আমার রুমে আসতেন এবং আমাকে নিয়ে নিচে ঘুরতে যেতেন এবং আলাপ করতেন। বোনদের সাহচর্জ ঐ মুহূর্তে আমার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছিল। তাদের আন্তরিকতা কথাবার্তা ব্যবহার আমাকে তাদের অনেক কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। তাদের কথাবার্তা, শালীন পোশাক, ভাল আচরণ, আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। কোন একদিন বিকেলে মারজিয়া আপা আমাকে দাওয়াত দিলেন এক বৈঠকে যাওয়ার। আমি আপার দাওয়াত পাওয়ার পরপরই সম্ভবত নতুন বিল্ডিং- এ নিচতলার একটি রুমে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সিনিয়র অনেক আপা এবং আমার ক্লাসের কয়েকজন বোনও উপস্থিত। বৈঠকটিতে অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত এবং তাফসীর শুনলাম। কোরআনকে এভাবে এর আগে শুনিনি। কোরআন অধ্যয়নে আমি আগ্রহ বোধ করলাম। এরপর প্রায় বৈঠকেই মারজিয়া আপা আমাকে নিয়ে যেতেন। সামষ্টিক পাঠ, যা নাকি একটি ইসলামী সাহিত্য পাঠ করে সুন্দর করে নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। By rotation সবাইকে পড়তে হত এবং বুঝতে হত। ছোটবেলা হতেই বলার অভ্যাস ছিল বলে সামষ্টিক পাঠেও খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতাম। বৈঠকগুলো যে ছাত্রীসংস্থার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত এবং মারজিয়া আপা যে ছাত্রীসংস্থা করেন এটা জানতে পেরেছি কিছুদিন পরই।

১৯৭৮ সালের জুলাই মাস। আজিমপুর কমিউনিটি সেন্টারে ছাত্রীসংস্থার অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেয়ে যাই। সেখানে প্রাথমিক সদস্যা হওয়ার জন্য ফরম পূরণের আহ্বান জানান হয়েছিল। আমি অজানা এক আশংকায় সেদিন ফরম পূরণ করিনি কেননা আব্বা আম্মার অনুরোধ, আদেশ ছিল ঢাকা শহরে গিয়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন কিছু না করি। যা হোক সেদিন ফরম পূরণ না করেই হোস্টেলে চলে আসলাম। তবে ছাত্রীসংস্থার ফরম পূরণ করেছি তার কয়েক মাস পরে।

মারজিয়া আপা আমাকে সুন্দরভাবে মুসলিমের পরিচয়, দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে ছিলেন এবং ছাত্রীসংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচি স্পষ্টভাবে তুলে ধরার পরই আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফরম পূরণ করলাম। আমাদের উদ্বুদ্ধ করা হল নিয়মিত নামাজ, কোরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য পড়ার ব্যাপারে। যেহেতু ছোটবেলা হতেই বাবা-মার কাছ থেকে নামাজের ব্যাপারে তাগিদ পেয়েছি সুতরাং নামাজ আমি নিয়মিত পড়তাম। অর্থসহ যখন কোরআন পড়া শুরু করলাম তখনি মনে হতে লাগল এতদিন ইসলামের অনেক কিছু সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। যাহোক পরম করুণাময়ের কাছে অসংখ্য শুকরিয়া তিনি আমাকে আলোর পথের সন্ধান দিয়েছেন। ছাত্রীসংস্থার বোনেরা কখনও পর্দার ব্যাপারে আমাকে জোর করেনি। নিজে থেকেই শালীন পোশাকের গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম। আর তাই আমরা সর্বোপরি প্রায় ১১ জন বোন ছাত্রীসংস্থার কর্মী হিসেবে মান উন্নত করলাম এবং এখানে বড় ওড়না পরা শুরু করলাম। ইডেনের শিক্ষিকাদের অনেকেই আমাদের পড়াশুনা এবং আচরণের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন।

একদিন আমার আব্বা ছুটিতে আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকায় হোস্টেলে এসেছিলেন। আমি আব্বাকে আমার জন্য আড়াই গজের সাদা কাপড় কিনে আনার জন্য বললাম। আব্বা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি করবে কাপড় দিয়ে? আমি কিছু বললাম না। শুধু বললাম কাপড় আনার জন্য। আব্বা আমার জন্য সাদা লংক্লথ কাপড় কিনে আনলেন। উনি ভেবেছেন হয়ত আমি তা দিয়ে টেবিল ক্লথ বানাবো। অথচ ঐ কাপড়টা মাথায় দিয়েই আমি আব্বার সাথে ফরিদপুরে রওয়ানা হলাম। আমার এই dress দেখে আব্বা ঐদিন খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেছিলেন। শালীনতার জন্য যে আব্বা আমাকে বলেছিলেন ২ বছর আগে সেই ড্রেসই আমি পরেছি নিজের ইচ্ছায় নিজে বুঝে। ইসলামের অনুশাসন মানার ব্যাপারে ছাত্রীসংস্থার বোনেরা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ইসলামের শিক্ষাকে অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সে ব্যাপারেও আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বোনেরা।

ছুটিতে যখন ফরিদপুরে গিয়েছিলাম আমাদের বোন ছাত্রীসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা খোন্দকার আয়েশা খাতুন চিঠিতে লিখেছিলেন "ঈমানদার যেখানেই অবস্থান করে ঈমানের ছাপ রেখে আসে।" এই কথা আমাকে দাওয়াতী কাজে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল।

www.pathagar.com

প্রাথমিক অবস্থায় আমার এই পরিবর্তন দ্বৈত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। আমার স্কুলের বান্ধবী এবং আত্মীয় স্বজনের অনেকেই এটাকে বাড়াবাড়ি হিসেবে ধরে নিল। আবার অনেকেই এটাকে পজিটিভ হিসেবে নিল। যা হোক মফস্বল থেকে ঢাকা শহরে গিয়ে আমার এক স্কুল বান্ধবী অনেক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়াতে আমার এই পরিবর্তন ভাল হিসেবেই আত্মীয়রা গ্রহণ করল।

ইন্টারমিডিয়েট থাকতেই আমি ছাত্রীসংস্থার কর্মী হলাম। কর্মীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রিপোর্ট রাখা। ব্যক্তিগত রিপোর্টের নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত কুরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্যের পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়। যার ফলশ্রুতিতে মা-বাবার কাজে সাহায্য করা। ছোটবড় ভাইবোনদের সাথে উত্তম আচরণ করা। এক কথায় সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে কাজ করার উত্তম শিক্ষা পেয়েছি ছাত্রীসংস্থা থেকে।

ছুটি শেষে ঢাকায় আসলাম, এর মধ্যে ইন্টারমিডিয়েটের result out হল। আলহামদুলিল্লাহ ১ম বিভাগে ভাল নম্বর পেয়ে পাস করলাম।

মেডিকেলের ভর্তি ফরম পূরণ করলাম। জনৈক আত্মীয় আমার বোরখা পড়া দেখে বলেই ফেললেন তুমি মেডিকেল admission দিতে পরীক্ষায় উপস্থিত হবার আগেই তোমাকে বাদ দিয়ে দিবে কেননা বোরখা পড়া মেয়ে medical এ allow করে না। যা হোক সর্বশক্তিমানের ওপর দৃঢ় আস্থা রেখেই ভর্তি পরীক্ষার জন্য কঠোর প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। আমার viva পরীক্ষা হল সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে। খুব ভাল পরীক্ষা হল। Examiner শুধু জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন বোরখা পরেছ? আমি উত্তরে বললাম এটা দ্বীন ইসলামের নির্দেশ। তাই শালীন ড্রেস পরেছি। কিছুদিন পর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় result out হল। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পেলাম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ছাত্রীসংস্থার একমাত্র আমিই ঐবার DMC তে চান্স পেলাম। ভাবলাম এর মধ্যে হয়ত আল্লাহপাক বিশেষ কারণ রেখেছেন। সিনিয়র এক বোন ডাঃ শামছুন্নাহার লাকী তখন ৩য় বর্ষে পড়েন। উনি ছাত্রীসংস্থা করেন এবং আমার সাথে পরিচিত হলেন।

আমরা দুজন মিলে আল্লাহর দ্বীনের কাজ ঢাকা মেডিকেলে কিভাবে চালু করা যায় তার পরিকল্পনা নিলাম। প্রথমে আমার রুমে বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াত প্রশিক্ষণ ক্লাস শুরু করলাম। হোস্টেলের প্রায় সকল ছাত্রীদেরকেই আমরা দাওয়াত দিলাম। অল্প অল্প করে অনেকেই এই ক্লাসে আসা শুরু করল এবং এমন দিন হয়েছে আমার রুমে জায়গা দিতে না পেরে পুরাতন হোস্টেলের দোতলায় কমনরুমে প্রোগ্রাম করেছি। কোরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত, সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ কোরআন বুঝানোর ট্রেনিং ছাত্রীসংস্থার উর্ধ্বত দায়িত্বশীল বোনেরা আগেই দিয়েছিলেন। আরবি ভাষা বুঝার জন্য প্রাক্তন সৌদি রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মিসেস খতিব টি এস সিতে আমাদের ২/৩ জন বোন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও কিছু বোনকে প্রতিদিন বিকালে উনার বাসভবন গুলশানে নিয়ে বসতেন। খুবই আন্তরিকতার সাথে আমাদের বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখিয়েছেন।

ছাত্রীসংস্থা করার কারণে ক্লাসের অনেক ছাত্রীরাই আমাকে avoid করতো, আমার সাথে প্রথম প্রথম খুব কম কথা বলত। কিন্তু আমার সাথে এই আচরণে আমি মোটেই হতাশ হইনি। বরং পূর্ণ উদ্যোম ও দৃঢ়তার সাথে ক্লাসমেটদের সাথে ও যারা হোস্টেলে থাকত এবং যারা বাইরে থাকত সবার সাথে সহজভাবে কথা বলতাম। আর একটা উপায় ছিল নিজে নিয়মিত ক্লাস করতাম। প্রত্যেক teacher এর ক্লাস lecture যত্নের সাথে উঠাতাম। ক্লাস পরীক্ষাগুলোতে ভালভাবে attend করতাম। পরবর্তীতে আমার কাছ থেকে পড়াশুনার help নেয়ার জন্য অনেকেই আমার হোস্টেলে আসত। এভাবে ওদের সাথে আরও যোগাযোগ করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। ছাত্রীসংস্থার মেয়েরা যে পড়াশুনার ব্যাপারেও নিয়মিত এবং অধ্যবসায়ী এ ধারণা ওদের মধ্যে সৃষ্টি হল। ক্লাসের সহপাঠীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথেও আমাদের যোগাযোগ ছিল। মাসিক পৃথিবী, কলম, Al Islam দেয়ার জন্য teacher দের কাছে যেতাম এবং বিভিন্ন পড়া বুঝার জন্য ম্যাডামদের কাছে যেতাম। আর আমাদের হোস্টেল সুপার ছিলেন ডাঃ তাহমিনা হোসেন। হোস্টেলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য আপার কাছে যেতাম। প্রথম যেদিন গেলাম আমরা তিনজন ছিলাম, আপা আমাদের দেখেই বললেন

www.pathagar.com

তোমরা কি মফস্বল থেকে এসেছ? হয়ত আমাদের মাথায় কাপড় পড়া দেখে উনি এই উক্তি করেছিলেন। আমি উত্তরে বললাম, আমার বাবা-মা মফস্বলেই থাকে কিন্তু ইডেন কলেজ থেকেই ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি। ঐ ম্যাডাম পরবর্তীতে আমাদের একজন আদর্শিক সুধী হয়েছিলেন।

MBBS সম্ভবত ২য় বর্ষের শেষের দিকেই ছাত্রীসংস্থার সদস্যা হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। সদস্যা সেই মান যা একজনকে যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব মানার ব্যাপারে উদ্যোগী করে এবং যিনি সদস্যা হবেন তিনি তার জান-মালকে সংগঠনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে বিক্রয় করে দিবেন। যেদিন সদস্যার শপথ করলাম সত্যিই অনেক কেঁদেছি নিজের অযোগ্যতার কথা চিন্তা করে, ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ভয়ে কেঁদেছি। উর্ধ্বতন বোনেরা এ সময় আমার পাশে এসে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একদিকে এম বি বি এস এর পড়াশুনা অন্যদিকে সদস্যা হিসেবে দায়িত্ব পালন বড় কঠিন মনে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যের ছায়ায় যারা থাকেন তাদের জন্য কঠিন দায়িত্বও সহজ হয়ে যায়। যার বাস্তব নিদর্শন পেয়েছি আমার জীবনে। আমি ব্রত নিয়েছিলাম আমাকে কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। হতে হবে নিয়মানুবর্তী। যা নাকি আমাকে বিভিন্ন সময়ে আমার ওপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করেছে। মেডিকেল জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। প্রথমে ছাত্রীসংস্থার মেডিকেল কলেজ শাখার সেক্রেটারি, পরবর্তীতে সভানেত্রী এবং পর্যায়ক্রমে ঢাকা মহানগরীর সভানেত্রী হয়েছিলাম। ৫ম বর্ষের যখন ছাত্রী আমি। আমার ওপর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারির দায়িত্ব আসে। একদিকে ডাক্তার হওয়ার জন্য পড়াশুনার কঠিন চাপ, অন্যদিকে ছাত্রীসংস্থার কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব এই উভয় দায়িত্ব আঞ্জামের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন যাকে সাহায্য করেন তার জন্য কোন কঠিন বোঝাই বোঝা হয় না। সেক্রেটারি জেনারেল হওয়ার কারণে সারা বাংলাদেশেই আমাকে সফর করতে হয়েছে। বিভিন্ন শাখা নির্বাচন, সমস্যা সমাধান, দাওয়াতী সফর করতে হয়েছে। সঞ্চয় করেছি অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। ফাইনাল পরীক্ষার পরপরই দায়িত্ব আসে কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর। কেন্দ্রীয় সভানেত্রী হিসেবে যখন দায়িত্ব আসল আমি ভেবেছি এখন বুঝি আর পারব না। সারা বাংলাদেশের অসংখ্য কর্মীদের দায়িত্বের ভার যেন বহন করতে পারছি না। আগে মাথার ওপর একজন দায়িত্বশীল ছিলেন যার নির্দেশেই কাজ করতাম কিন্তু এখন আমাকেই সে নির্দেশ দিতে হবে। আমি কি পারব কোরআন সুন্নাহ এর সঠিক নির্দেশনা দিতে? অজানা এক আশংকা ও চিন্তায় এমনও হয়েছে অনেক রাতে ঘুম আসত না। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে রাত জেগে শুধু সংগঠনের জন্য দোয়া করেছি। এক সেশন ১৯৮৯-৯০ কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করে ছাত্রীজীবন শেষ করলাম।

ছাত্রীসংস্থার বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল বোন সুমী বেশ কয়েকদিন ধরেই আমাকে তাগাদা দিচ্ছিলেন 'ছাত্রীসংস্থা সম্পর্কে আপনার অভিব্যক্তি'। এ সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য যা স্মারকে প্রকাশিত হবে। বিভিন্নমুখী ব্যস্ততা ও পেশাগত ব্যস্ততার কারণে সময় করে উঠতে পারছিলাম না, কি লিখব? এই চিন্তা করেই কয়েকদিন কাটিয়ে দিলাম। অবশেষে মনস্থির করলাম আমার জীবনের ঘটনা দিয়েই কিছু লিখব।

ইসলামী ছাত্রীসংস্থা আমার জীবনের পট পরিবর্তনে যে ভূমিকা রেখেছে সেটাই আমার অভিজ্ঞতা হিসেবে লিখলাম।

স্কুল শেষে ঢাকায় এসে যদি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার বোনদের না পেতাম তাহলে আমার জীবন ধারা হয়তো অন্য কোন পথে বেঁকে যেত। যা আমার জন্য ধ্বংস ডেকে আনতে পারত। সুতরাং প্রতিমুহূর্তেই মহান আল্লাহ পাকের কাছে শোকরিয়া আদায় করি তিনি আমাকে নেয়ামত স্বরূপ এই সংগঠনের সাথে পরিচিত করেছিলেন। যার সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছি মুসলিম কাকে বলে? মুসলমানের দায়িত্ব কর্তব্য কি? কোন পথে চললে কল্যাণ এবং কোন পথে অকল্যাণ?

একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা একটি আদর্শ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাকে একজন মুসলিম হিসেবে শিক্ষিত করেছে।

তাই সংক্ষেপে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থাকে বলতে চাই-

www.pathagar.com

ছাত্রীসংস্থা ঃ

১. হেরার রাজতোরণের উদ্ভাসিত আলো যা বিচ্ছুরিত হয়ে তরুণ যুবতীদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ দান করে।
২. ছাত্রীসংস্থা আকাশের সেই ধ্রুবতারা গভীর রাতে পথহারা পথিক যা দেখে দেখে তার গন্তব্য খুঁজে পায়।
৩. ছাত্রীসংস্থা মহাসমুদ্রে সেই সার্চ লাইটের নাম অতলান্ত মহাসমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া নাবিক যা দেখে দিক নির্দেশনাখুঁজে পায়।
৪. ইসলামী ছাত্রীসংস্থা আগ্নেয়গিরির সেই জ্বলন্ত লাভার নাম যা বিচ্ছুরিত হয়ে তাগুতের আস্তানাগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।
৫. ছাত্রীসংস্থা সেই বিপ্লবের নাম পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সামন্তবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদসহ সকল মানব রচিত মতবাদের কবর রচনা করে ইসলামের সবুজ পতাকা উড্ডীন করতে।
৬. সেই ভেলার নাম-অন্ধকারাচ্ছন্ন পথযাত্রা এবং ডুবন্ত ছাত্রী যুবসমাজ যেখানে চড়ে তার গন্তব্য পাড়ি দিতে পারে।
৭. সেই ট্রেনের নাম যার শেষ মঞ্জিল হচ্ছে জান্নাত।
৮. ইসলামী ছাত্রীসংস্থা হচ্ছে সেই ঠিকানা যেখানে উদীয়মান সংকল্পবদ্ধ মুজাহিদাদের আশ্রয় স্থল। #

www.pathagar.com

পিছনের দিনগুলো

শামিমা ইয়াসমিন লায়লা

১৯৮২ সালে, যখন ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী তখন খন্দকার আয়শা সিদ্দিকার মাধ্যমে প্রাথমিক সদস্যা ফরম পূরণ করি। মূলত বাবা মায়ের ইচ্ছাতেই। কারণ তারা খুব চাইতেন আমি এর সাথে সম্পৃক্ত হই। সত্যিকার অর্থে সংগঠন কি এবং কেন করা উচিৎ। আমার জীবনে এর প্রয়োজনীয়তাটাই বা কি এ ধরনের কোন অনুভূতিই তখন ছিল না। বলা যায় এক রকম না বুঝেই শুধুমাত্র বাবা-মায়ের অনুপ্রেরণাতেই এই ফরম ফিলাপ করি। ফ্রেন্ড সার্কেলের প্রভাবটা একটু বেশি ছিল। সামনে S.S.C পরীক্ষা থাকায় নিজেকে একটু গুটিয়ে নেই। এরপর ভেবে-চিন্তে সংগঠনে ভালভাবে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। এর মাঝে ২/৩টি কর্মী বৈঠকে ঈমানের হাকিকত ও ইসলামের হাকিকত এই বই দুটির সামষ্টিক পাঠ হয়েছিল। এই বই দু'টি পড়ার পর আমার সামগ্রিক চিন্তা-চেতনা এবং কর্মে আমূল পরিবর্তন আসে। এভাবে দিন চলছিল। '৮৩ তে আমি S.S.C দেই। যেদিন আমার S.S.C পরীক্ষা শেষ হল। সেদিন থেকেই আমি কাজ শুরু করি এবং আন্দোলনের পথে আমার নতুন করে যাত্রা শুরু হল। বলা যায় বুঝে শুনে সক্রিয়ভাবে '৮৩ তেই সংগঠনে যোগ দেই। আমার সংগঠনে আসার পিছনের দু'টি দিক ছিল। যথা ঃ

প্রথমত- বাবা-মায়ের অনুপ্রেরণা।

দ্বিতীয়ত- নিজস্ব উপলব্ধি ('৮৩ তে যেটা হয়)

পরবর্তীতে বরিশাল মহিলা কলেজে ভর্তি হই এবং আমার এক সহপাঠী মানসুরা বেগম নীলু (বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রাক্তন সদস্যা।) আমরা দু'জন পুরোদমে এখানে কাজ করি। ইন্টারমিডিয়েট এখান থেকে পাস করে পরে আমি এবং নীলু পা দু'জনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই।

ঐ সময়ে রোকেয়া, শামসুন্নাহার এবং শামসুন্নাহার এক্সটেনশান (যেটা বর্তমানে মৈত্রী হল-এর মূল বিল্ডিং ছিল বর্তমান সমাজ কল্যাণ বিভাগের প্রশাসনিক ভবন) এই হলগুলো ছিল। আমি শামসুন্নাহার এক্সটেনশনে উঠি। আয়শা আপার পরামর্শে এই হলে প্রথম হোসনে আরা বেগম মার্জনা আপা কাজ শুরু করেন। এ সময়ে ছাত্রীসংস্থার একচেটিয়া প্রভাব ছিল সবগুলো হলে, এমন কি প্রশাসনের সাথেও ভাল সম্পর্ক ছিল। দু'একজন ছাড়া বাকীরা ছাত্রীসংস্থার কাজে তেমন কোন বাঁধা সৃষ্টি করেননি। এ সময়ে ডাকসু নির্বাচনে দু' দুবার আমরা নির্বাচন করি। শামসুন্নাহার হলে একটা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন দিবসকে সামনে রেখে বই মেলা/প্রদর্শনী ইত্যাদিও আয়োজন করতাম। হল নির্বাচনগুলোতেও আমরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম। বিভিন্ন সময়ে কাজ করার সুযোগ যেমন আমরা পেয়েছি তেমনি ছোটখাটো হামলা, বিক্ষোভেরও মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। এগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ যোগাত লীগ ও ইউনিয়ন। তবে সেগুলোতে

www.pathagar.com

তেমন কোন সমস্যা হয়নি। এরই মধ্যে মৈত্রী হল নামে আলাদাভাবে হল হলো। এ সময়ে শামসুন্নাহার মেইন বিল্ডিং থেকে লীগ ও ইউনিয়ন থেকে কিছু নেত্রী মৈত্রী হলে চলে আসে। তখন মৈত্রী হলে এদের কাজ তেমন জোরালো ছিল না। এ কারণে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং ছাত্রীসংস্থার একচেটিয়া প্রভাব খর্ব করে। আমাদের মূলোৎপাটন করাই এদের প্রধান টার্গেট ছিল। এর কিছুদিন পরে কোন একটি বিশেষ ইস্যুকে সামনে রেখে আমরা একটা বই মেলার আয়োজন করি– এ সময় লীগ ও ইউনিয়ন একত্রিত হয়ে আকস্মিকভাবে আমাদের এই মেলায় হামলা করে, আমাদের স্টলগুলো তছনছ করে এবং অনেকগুলো বই আমাদের সামনেই আগুন দিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলে। এটাই আমাদের ওপর করা প্রথম কোন বড় ধরনের আক্রমণ। এ হামলার পরে আমরা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে ইনফরম করে আশ্চর্যজনকভাবে তারা নীরব থাকে। যেটা আগে কখনো দেখিনি। এর কয়েকদিন পর ওরা আমাদের বোনদের রুমে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে নানা শ্লোগান দিতে থাকে। হল সুপার ব্যাপারটির সুরাহা না করায় এটি প্রক্টর পর্যন্ত গড়ায়। এক পর্যায়ে প্রক্টর আসেন। তিনি তার কথার মাধ্যমে এক মুহূর্তেই পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করে ফেলেন। প্রক্টরের কথায় মেয়েরা রুমের তালা খুলে একেবারে মাথা নিচু করে চলে যায়। আমরা একটু অবাকই হয়েছিলাম। আমরা সবকিছুর মধ্যেও আমাদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছি এবং কোন অবস্থাতেও হল ত্যাগ করিনি। সকল কর্মী বোনেরা এ ব্যাপারে ধৈর্য, ত্যাগ এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলেও আমাদের ওপর মাঝে মাঝে আক্রমণ এসেছে। কিন্তু আমাদের বোনেরা অত্যন্ত ধৈর্য-ত্যাগের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু পিছু হটেনি। এরপর রমযানে ক্বদরের রাতে হঠাৎ করে মৈত্রী হলে আমাদের বোনদের রুমে হামলা চালানো হয়, রুমে ঢুকে বিছানাপত্র তছনছ করা হয়। লেপ-তোষক পুড়িয়ে, ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং সমস্ত জিনিস ফেলে দিয়ে বোনদেরকে রুম থেকে বের করে দিয়ে রুমে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। এরপর হল সুপার আমাদের বোনদেরকে খালি পায়ে, যে ড্রেস পরা ছিল সে অবস্থায়ই সেই রাতেই গাড়িতে করে ভিসির বাসায় নিয়ে যান। ভিসি প্রভোস্টের কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রভোস্ট তাদেরকে হলে না পাঠিয়ে ওদের সাথে সমঝোতার আগ পর্যন্ত তার নিজের বাসায় রেখে দেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের বোনদের আর হলে ওঠা হয়নি। এরই মধ্যে বাস্তবতার কারণে আমি হল ছেড়ে বাসায় উঠি এবং কেন্দ্রীয় সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করি।

আমি যখন কেন্দ্রীয় সভানেত্রী হয়েছি তখন কেন্দ্র বডিতে যারা এসেছে তারা সবাই নতুন ছিল। নতুন হওয়া সত্ত্বেও কোন সমস্যার হয়নি, সবাই অনেক বেশি চেষ্টা করেছে এবং সফলও হয়েছে।

জনশক্তির মানগত দিকটিও আশানুরূপ ছিল। যারা সদস্যা হয়েছে, তাদের আত্মিক দিকটিও মজবুত ছিল। সংগঠনের ভেতরগত অবস্থাও আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল ছিল। এবং মজবুতির দিকটিও সন্তোষজনক।#

www.pathagar.com

ছাত্রীসংস্থা এবং আমি

সাঈদা রুম্মান

ছাত্রীসংস্থা এবং আমি অভিন্ন এক সত্তা যেন। তাইতো ছাত্রীসংস্থা আর আমার জীবন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আল্লাহকে চেনা এবং জানা, নিজেকে উপলব্ধি করা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, এবং সে অনুযায়ী নিজেকে চালিত করা এ যেন ছাত্রীসংস্থারই অবদান। ছাত্রীসংস্থা যেন আমার হৃদয়-স্পন্দন প্রাণকেন্দ্র। আমার সমস্ত উপলব্ধির দ্বার খুলে দিয়েছে, আজ যেন সব জায়গায়, সবকিছুতে আমি খুঁজে ফিরছি আমার স্রষ্টাকে, শুকরিয়া জানাচ্ছি তারই দরবারে যিনি ছাত্রীসংস্থার মাধ্যমে আমার জান্নাতে যাওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছেন যে পথে এসে জীবনের উপলব্ধিকে এ পর্যায়ে এনেছি– "সেই পথে তীব্রগতিতে ছুটে চল যা তোমার খোদার ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গেছে, এবং যা খোদাভীরু লোকদের জন্যেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।"

সেই ছাত্রীসংস্থা আজ গুঁটি গুঁটি পায়ে ২৫টি বৎসর অতিক্রম করে ২৬ বছরে পদার্পণ করেছে। ১১ জন মর্দে মুজাহিদীন নিয়ে গঠিত ছাত্রীসংস্থা আজ বাংলাদেশের একপ্রান্তর থেকে আরেক প্রান্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। শহর-বন্দর পেরিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এ সংগঠন। আজ বাংলার প্রায় প্রতিটি ছাত্রী এবং মায়ের হৃদয়ের প্রতিধ্বনিই হলো ছাত্রীসংস্থা, তাদের ঠিকানা আশ্রয়স্থল হলো ছাত্রীসংস্থা।

ছাত্রীসংস্থা আজ অজস্র পথহারা ছাত্রীকে দিচ্ছে পথের দিশা, তাদেরকে চিনিয়ে দিচ্ছে তাদের পরিচয়, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে করে দিচ্ছে সচেতন। শিক্ষা অঙ্গনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কলুষিত পরিবেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে কোরআনের আলোকছটা। ফলে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এদের শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠেছে। আওয়ামী শাসন আমলে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতও তাদের সহ্য করতে হয়েছে। সাহিত্য ও অপসংস্কৃতির মোকাবেলায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে তারা। বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন শাখা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে তাদের ক্ষুরধার লিখনির মাধ্যমে সাহিত্য অঙ্গনগুলোতে এক নীরব বিপ্লব সাধন করে যাচ্ছে ছাত্রীসংস্থা। এবারের ২৯শে আগস্ট ঢাকার ওসমানী মিলনায়তনে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সারা দেশের অপসংস্কৃতিতে নাড়া পড়েছে আর ইতিবাচক সংস্কৃতিতে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। দূরে অবস্থান এবং আমার বাস্তবতার কারণে প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার দেখার সৌভাগ্য না হলেও কিন্তু পত্রিকার মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

২৫ বৎসর পূর্তিতে ছাত্রীসংস্থাকে স্মরণ করতে গিয়ে হৃদয়তন্ত্রিতে মুহুর্মুহু ঝংকৃত হচ্ছে ছাত্রীসংস্থা, ছাত্রীসংস্থা। হাহাকার করছে মনটা ছাত্রীসংস্থার ফেলে আসা দিনগুলোর জন্যে। সেদিনগুলো কত না মধুর ছিল। আনন্দের দিন। কোন ধরনের বাঁধা বন্ধন ও পিছুটানহীনভাবে জান্নাত পাওয়ার পথ খোঁজায় যেন আমি ছিলাম এক অতন্দ্রপ্রহরী। ২৫ বৎসর পূর্তি স্মারকে লিখতে বসে বারবার মনে পড়ছে আমার ছাত্রীসংস্থায় আসার দিনগুলোর কথা। যখন কিনা একাদশ শ্রেণীতে ইডেনে ভর্তি হয়েছি,

www.pathagar.com

আমি যেন একটা চঞ্চলা উড়ন্ত পাখি ছিলাম কখনও বকুল তলায় বকুল কুড়াতাম কখনও একঝাঁক বান্ধবী নিয়ে পেয়ারা বাগানে ঘুরে বেড়াতাম, কখনও বা ইডেনের বটতলায় চটপটি খাওয়ায় ব্যস্ত থাকতাম। এমনই এক দুরন্তপনার মুহূর্তে নুরুন্নিসাপার মাধ্যমে ছাত্রীসংস্থায় আসি। তখন যেন ইডেনটা ছিল ছাত্রীসংস্থার আবাসভূমি। যেদিকেই তাকাতাম ছাত্রীসংস্থার বোনদের পদচারণায় মুখরিত ছিল সে প্রাঙ্গণ। বোনদের পারস্পরিক একাত্মতা, দেখামাত্রই সালাম বিনিময়, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে পরিকল্পিত ছাত্রী ভর্তি এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব আমাকে যেন চুম্বকের মতো তাদের প্রতি আকৃষ্ট করছিল প্রতিনিয়ত। তাদের মন উজার করা ভালবাসায় আজও যেন সে ভালাবাসার অভাবে মনটা হাহাকার করে ওঠে, ডুকরে ওঠে। তাদের সেই ভালবাসার মধ্য দিয়েই যেন আল্লাহ্‌কে খুঁজে পেয়েছি। আল্লাহ্‌কে আমার মালিক, মনিব, প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, আশ্রয়দাতা হিসেবে পেয়েছি। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবেসে সৃষ্টি করেছেন, এ সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন, ভালমন্দ বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। এক মহান দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। যে দায়িত্ব যথাযথ পালনের মাধ্যমে আমার দুনিয়ার জীবনটা হবে শান্তির এবং আখেরাতটা হবে মুক্তির। আমার সবকিছু তিনিই দেখছেন এবং একমাত্র তিনিই আমার মালিক। সর্বোপরি তারই কাছে আমাকে চলে যেতে হবে আমার এ যাওয়াকে কেউই রোধ করতে পারবে না, পৃথিবীর কোন শক্তিই তার পথ রোধ করার ক্ষমতা রাখে না। এ উপলব্ধিগুলো ছাত্রীসংস্থাই আমার মনের গহিনে গেঁথে দিয়েছে।

ছাত্রীসংস্থাকে তাদের এ অবস্থান টিকিয়ে রাখতে এবং তাদের গতিকে আরো সঞ্চার করতে হলে তাদেরকে হতে হবে আরো বেশি ত্যাগী এবং পরিশ্রমী। গভীর চিন্তার অধিকারী, দক্ষ ও দূরদর্শী। জ্ঞানের অগাধ ভাণ্ডার তাদের আয়ত্তে আনতে হবে, আমল ও চরিত্র দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে যা অস্ত্র বা শক্তি দিয়ে জয় করা সম্ভব নয়। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দৃঢ় ও অটল থাকতে হবে। মানসিক বলে এতোটাই বলিয়ান হতে হবে দুনিয়ার কোন শক্তিই যেন এ মনোবল ভাঙ্গতে না পারে। মনে রাখতে হবে ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী করার জন্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সংখ্যার চেয়ে গুণকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। সর্বশেষ বলতে চাই ছাত্রীসংস্থাকে শিকারীর ন্যায় ওত পেতে থাকতে হবে প্রতিভাবান ছাত্রীদেরকে আল্লাহর দ্বীনের এ পথে আনার জন্যে। প্রতিভাবান ছাত্রীদেরকে এ পথে এনে এ পথকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যেন তারা এক একটি প্রস্ফুটিত ফুল, পরিণতিতে একটি বিকশিত বৃক্ষ।#

www.pathagar.com

অনুভবে ছাত্রীসংস্থা

নাজমুন নাহার নীলু

স্মৃতিকথা লেখা যদিও কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটি সত্যিকার অর্থেই একটি কঠিন কাজ। ছাত্রীসংস্থা আমার জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে কোনটি লিখব আর কোনটি বাদ দেব ভেবে পাচ্ছি না। ছাত্রীসংস্থার সাথে কখন কিভাবে পরিচিত হয়েছিলাম সে স্মৃতি উদ্ধার করা আমার জন্য কঠিন কাজ। কেননা অসংখ্য স্মৃতির আলোতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। যতদূর আমার মনে পড়ে ১৯৭৯/৮০ সাল হবে। সেই সময় আমি ৪র্থ বা ৫ম শ্রেণীতে পড়ি। তখন তিনজন ছাত্রীবোন আমাদের বাসায় আসেন আব্বার পরিচয় সূত্র ধরে। ছাত্রীসংস্থার পক্ষ থেকে দাওয়াতী কাজ করার জন্য জাহিমা'পা, আনিসা'পা এই দুজন বোনের কথা মনে পড়ছে আর একজন বোনের কথা স্মরণ নেই আমার। যতদূর মনে আছে আমি তাদের সাথে গিয়ে অন্য বোনদের বাসা দেখে দিয়েছিলাম তবে আসল সত্য হলো এই যে ঐ মুহূর্তে আমাকে তারা ছাত্রীসংস্থার দাওয়াত দেননি হয়তো আমি ছোট বিধায় সেই চিন্তা করে। এর মধ্যেই তিন/চার বছর অতিক্রম হয়ে গেছে আর কোন বোন আসেননি ছাত্রীসংস্থার দাওয়াত নিয়ে। হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম মোহতারিমা হাফেজা আসমা খাতুন নামে একজন ভদ্রমহিলা আসবেন খুলনা শিপইয়ার্ডে অনুষ্ঠান করার জন্য। আমাদের পাশের বাসায় এই অনুষ্ঠানটি হলো। তিনি আসলেন আলোচনা রাখলেন এবং চলে গেলেন এই স্মৃতিটুকুই আমার অন্তরে আজও অম্লান হয়ে আছে। তবে তিনি কি আলোচনা রেখেছিলেন সে কথা বলতে পারব না। মহিলাদের অনুষ্ঠান হওয়ার কারণে সেদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা শুনার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। সে সময় এই কথাটি স্পষ্ট বুঝার উপলব্ধি আমার হয়েছিল যে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলারাও কাজ করে যাচ্ছে। অতঃপর সেই শুভ মুহূর্তটি আসে যখন আমি একজন সচেতন ছাত্রী হিসেবে ছাত্রীসংস্থার সরাসরি দাওয়াত পাই। ১৯৮৪ সালের ১৫ই জুলাইয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মুহতারিমা রেজাউন্নিসা, মোহতারিমা হুমায়রা পারভীন আফু এবং মুহতারিমা আনিসা সিদ্দিকা এই তিনজন বোন আমাদের বাসায় আসেন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সাধারণ সভার দাওয়াত দিতে। সেদিন বোনদের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম প্রাথমিক সদস্যা ফরম পূরণ করেছিলাম যে ফরমটির একটি অংশ আজও আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে। এই অনুষ্ঠানের দুই তিনমাস পর মুহতারিমা রেজাউন্নিসা ভাবী (যিনি সেই সময়ে খুলনা মহানগরীর ছাত্রীসংস্থার সভানেত্রী ছিলেন) আবার আসলেন আমাদের বাসায় মুহতারিমা আফু'পাকে সঙ্গে নিয়ে। অবশ্য আফু'পার সাথে ইতিপূর্বে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি ২/৩ বছর আগে আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন। এছাড়া আমি খুলনা পাইওনিয়র উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আফু'পার সাথে কথা হতো। আফু'পাকেই দেখতাম বোরকা পরে স্কুলে আসতেন যা আমার কাছে খুবই ভাল লাগত। সেদিন রেজা ভাবী আমার হাতে একটি রিপোর্ট বই তুলে দিয়ে বললেন এখন থেকে তুমি আমাদের কর্মী হলে, এই

www.pathagar.com

বইটিতে রিপোর্ট রাখবে, সবাইকে দাওয়াত দিবে আগামী সপ্তাহে থেকে তোমাদের বাসায় প্রোগ্রাম হবে আফু আসবে, কয়েক সপ্তাহ পর পর আফু'পা এসেছিলেন তারপর থেকে আমি নিজেই ইউনিট চালাতে লাগলাম ইচ্ছা হলে বৈঠক করতাম না হলে করতাম না। আসলে দূরত্বের কারণে বোনদের পক্ষে নিয়মিত যোগাযোগ করা সম্ভব হতো না আর আমাদের যাওয়া হতো না। এভাবে প্রায় একটি বছর কেটে গেল। মাঝে মাঝে রেজা ভাবী আসতেন ছোট একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে। সর্বদা হাসি মুখ দেখলেই অন্তর ভরে উঠত। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল কখনই তিনি বাধ্য করেননি আমাদেরকে বৈঠক করতে। বৈঠক ঠিকমত করছি না বা রিপোর্ট ঠিকমত রাখছি কিনা এগুলো সম্পর্কে কখন কিভাবে যে খোঁজ-খবর নিয়ে নিতেন বুঝতেই পারতাম না। মনে হতো তিনি শুধু গল্পই করছেন আমাদের সাথে। কখনও মাঝে মাঝে আফু'পা আসতেন তবে আফু'পাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করতাম কারণ তখন সামনে ছিল আমার SSC পরীক্ষা তাই পড়ালেখার প্রস্তুতি ছাড়া অন্যকিছু চিন্তাই করতে পারতাম না। তবে পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই আফু'পা আমার সাথে যোগাযোগ করে সাধারণ কর্মী T.C তে অংশগ্রহণ করার জন্য চিঠি দিলেন। T.C টি হবে মুহতারাম মাওলানা এ,কে,এম ইউসুফ সাহেবের খুলনা টুটপাড়াস্থ বাসভবনে। তাঁর মেয়েদের সাথে আগে থেকে আমার পরিচয় ছিল তাই আমিও T.C তে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। অবশেষে T.C তে খুব আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করলাম। তবে মজার ব্যাপার এই যে T.C তে যাওয়ার পর দেখলাম আমি বিছানাপত্রসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়ে এসেছি কিন্তু! মূল জিনিস রিপোর্ট বই ও T.C তে অংশগ্রহণ করার জন্য যে নোট প্রস্তুত করেছিলাম তার কিছুই নিয়ে আসি নাই। কি আর করা! উপস্থিত বক্তৃতার মত সবকিছুতে অংশগ্রহণ করতে হলো। রাতে যখন ঘুমানোর সময় হলো তখন আমি অংশগ্রহণকারী কর্মী বোনদের সাথে না থেকে নাসরীন'পার সাথে তাঁর ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছি। এখন মনে হয় এটি ছিল T.C তে অংশগ্রহণ করা পরিপন্থি কাজ। যাক তারপর থেকেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আমি অগ্রসর হতে লাগলাম এরই মধ্যে আমি অগ্রসর কর্মী হয়ে গেলাম দায়িত্বও বেড়ে গেল তবে তখনও পর্যন্ত কেন্দ্র সম্পর্কে আমার খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তবে ১৯৮৮ সালের এক কর্মী সমাবেশের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ছাত্রীসংস্থার কেন্দ্রীয় প্রধান সম্পাদিকা মুহতারিমা ডাঃ হাবীবা চৌধুরী সুইট। সুইট'পাকে দেখে কেন্দ্র সম্পর্কে হৃদয় পটে একটি চিত্র এঁকেছিলাম মাত্র। সেই সময়ের আবেগের কোন কমতি ছিল না তাই কেন্দ্র থেকে যিনি আসতেন তারই অটোগ্রাফ নিতে কোনদিন কুণ্ঠাবোধ করিনি। সুইট'পা, শাহনূর'পা, শাহি'পা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সফরকারী বোনদের অটোগ্রাফ যেন আজও হৃদয়ের ডায়েরীতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অতঃপর আসে সেই শুভক্ষণ যখন কেন্দ্রীয় সভানেত্রীকে সরাসরি কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হল। ১৯৮৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময় কেন্দ্রীয় সভানেত্রী হিসেবে মুহতারিমা নূরুন্নিসা সিদ্দিকা খুলনা মহানগরীর একটি T.C ও সাংগঠনিক সফরকে সামনে রেখে খুলনা মহানগরীতে সফর করতে আসেন। তখন আমি একজন অগ্রসর কর্মী এবং মহানগরীর বায়তুলমাল সম্পাদিকা। দায়িত্বের কারণে মুহতারিমা কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে ঐ সফরেই নূরুন্নিসা'পা আফু'পাকে মহানগরীর দায়িত্ব থেকে জেলা সভানেত্রী ও জোনের দায়িত্ব দিলেন। ফাতেমা'পা [বর্তমানে আমেরিকায় প্রবাসী] হলেন মহানগরী সভানেত্রী এবং আমাকে দেওয়া হলো সেক্রেটারির দায়িত্বে। সফর শেষে মুহতারিমা নূরুন্নিসা'পার সাথে আমি, ফাতেমা'পা ও কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর সফরসঙ্গী সুরাইয়া'পা এই চারজন মিলে খুলনা বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ ভ্রমণ করি। ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে মাগরিবের নামাজের সময় হয়েছে নামাজ পড়ার কোন জায়গা আমরা না পেয়ে রাস্তার পাশে নামাজ পড়লাম। কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর এই আচরণটি আমার কাছে এত ভাল লেগেছিল যা সত্যিই আমাকে ইসলামী আন্দোলনের পথে টিকে থাকার এক নতুন পথের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল সেদিন। আমি শিখেছিলাম সব অবস্থায় একজন মুসলমানের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে।

নতুন দায়িত্বে আমার কারণে আমি আর ফাতেমা'পা কয়েকদিন পরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় দায়িত্বভিত্তিক T.C তে অংশগ্রহণের চিঠি পেলাম। মাত্র ৮/১০ দিনের প্রস্তুতি নিয়ে আমরা দু'জন কেন্দ্রীয় T.C তে আসলাম। এই প্রথম কেন্দ্রের সাথে আমার সরাসরি উপস্থিতি। এতদিন মনে মনে যে চিত্র হৃদয়ে এঁকেছি এ যেন তা নয় এ জগৎ আমার কল্পনার চেয়ে বিশাল স্বপ্নের চেয়েও বাস্তব। এ যেন এক অনাবিল আনন্দের স্বর্গরাজ্য আমার কাছে মনে হয়েছিল। পুকুরের ছোট মাছ সমুদ্রে পড়লে যেমনটি হয় আমার অবস্থাও তাই হয়েছিল, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা তথা সারাদেশের বোনদের সাথে পরিচিত হয়ে আমি এতোটা আবেগতাড়িত ছিলাম যে আমার মন খুলনায় ফিরে যেতে চাচ্ছিল না। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয়তো তাই ছিল তাই

www.pathagar.com

T.C থেকে ফিরে এসেই জানতে পারলাম আমার আব্বা আমাদের পুরো পরিবারকে ঢাকা নিয়ে যাবেন। ইতিপূর্বেই আব্বা ঢাকায় বদলী হয়েছিলেন। তাই আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সেদিন সত্যিই খুলনার বোনদের ছেড়ে আমার আসতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। তখন মন চেয়েছিল খুলনাতেই থেকে যাই। সেই স্মৃতিগুলো ছিল আনন্দের, সংগঠনের পথ চলার প্রথম সিঁড়ি তাই তো ভুলবার নয়।

ঢাকায় এসে বোনদের সাথে সাংগঠনিক কাজ করতে আল্লাহর রহমতে আমার তেমন কোন সমস্যা হয়নি। মনে হয়েছে এদের সবাইকে আমি আগে থেকে চিনতাম। নতুন পরিবেশ নতুন বোন তবুও কোন সমস্যা হয়নি আমার। এটা হয়তো আল্লাহপাকের বিশেষ রহমত। ঢাকায় এসে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন এবং সবশেষে কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন শেষে ছাত্রীজীবন সমাপ্তি। এ দীর্ঘ পথ চলার অসংখ্য স্মৃতি যা অনুভবে আছে কিন্তু প্রকাশ করার ভাষা এত বিস্তৃত যে অল্প পরিসরে শেষ করা সম্ভব নয়। এ কথা বলতে সংকোচ আমার নেই যে ছাত্রীসংস্থা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে ছাত্রীসংস্থা আমাকে "সিরাতুল মুস্তাকীমের" এর পথে চলার পথ দেখিয়েছে তার বিনিময়ে এই সংগঠনটিকে কিছুই দিতে পারি নাই।

ছাত্রীসংস্থাও ধীরে ধীরে দ্বীপ্ত শপথে ২৫ বছরে পর্দাপণ করেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি ছাত্রীবোনের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে না পারলেও ছাত্রীসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য সংগঠন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এই পথ চলা ছাত্রীসংস্থাকে আরও বেগবান করতে হবে এই জন্য বাংলার প্রতিটি ছাত্রীবোনের কাছে তুলে ধরতে হবে এ সংগঠনটি কি চায়? কেন চায়? ছাত্রীসংস্থাকে হতে হবে ইসলামী আদর্শ নারীর মূর্ত প্রতীক, তাকে হতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদর্শ ছাত্রী। ছাত্রীসংস্থার এক একজন বোন হবেন দুনিয়াবী যাবতীয় জ্ঞানের ন্যূনতম যোগ্যতার অধিকারী। যাতে করে তিনি ছাত্রীবোনটির বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি দিয়ে ঐ বোনের চিন্তার দরজায় নাড়া দিতে পারেন। সর্বোপরি ছাত্রীসংস্থাকে আমল ও আখলাকে এতটা তাকওয়ার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন যা আল্লাহপাক পছন্দ করেন। সবশেষে একথাটিই বলতে চাই যেখান থেকে আমার ইসলামী আন্দোলনের এই পথ চলা শুরু সেখান থেকেই ওঠে আসুক এদেশের লক্ষ কোটি ছাত্রীবোন। যাদের ইসলামী আন্দোলনের পথে চলার প্রেরণা হবে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। আমীন।

www.pathagar.com

পথের দিশা : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

সাবিকুন্নাহার মুন্নী

পৃথিবীতে শুনছি আবার,
শান্তিময় বিপ্লবের পদধ্বনি
প্রতিটি অশান্ত প্রাণ,
শান্তির স্রোতে অবগাহন করবে
খোদার রহমতের ছায়াতলে
দাঁড়াবে বাগিচার প্রতিটি বৃক্ষ,
প্রতিটি কুড়ি উজ্জীবিত হবে নতুন প্রাণরসে

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ২৫ বছর পূর্তিতে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে মহান প্রভুর কাছে বিশেষ মোনাজাত- হে আল্লাহ! বাংলাদেশের দিকভ্রান্ত ছাত্রী সমাজের কাছে সত্যের অবিনাশী পাল তুলে দিতে শান্তিময় সমাজ বিপ্লবের কান্ডারী হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থাকে কবুল করে নাও।

দাও শক্তি, দাও বুদ্ধি দাও হিম্মত
দাও ধৈর্য প্রজ্ঞা ও মজবুত ঈমান।
যে ঈমান জাহিলিয়াতের মজবুত ভিতকে ভেঙ্গে চুড়ে গুঁড়িয়ে দেবে।

যে ঈমান নিজের প্রাণকেই সজীব করবেনা জাগাবে শত কোটি প্রাণকে- যেখান থেকে জন্ম নেবে হযরত খাদিজা, ফাতিমা, সুমাইয়া, আমিনা কুতুব, হামিদা কুতুবের মত কন্যা, জায়া, জননী।

সত্য ও সুন্দরের চির উন্নত পথে আহ্বানকারী সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা বাতিলের সমস্ত বাঁধা ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দীর্ঘ ২৫টি বছর পেরিয়ে এসেছে। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আর বর্তমানের বলিষ্ঠতা সমৃদ্ধ সংগঠন আজ পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে এর দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত।

আজ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের বোনেরা ছড়িয়ে আছে। পর্দানশীন ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রীদের মধ্যে দিন দিন পর্দার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে ছাত্রীসংস্থার কারণেই। পর্দা বজায় রেখেও ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে আজ তা প্রমাণিত। এ সংগঠনের দাওয়াতেই আজ হাজার হাজার ছাত্রী, সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সেই চিরন্তন আহ্বানে আজ থেকে প্রায় ১৮টি বছর আগে ১৯৮৫ সাল, পবিত্র রমজানের এক সুন্দর ও নির্মল বিকেলে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার আয়োজিত ইফতার মাহফিলের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিলাম। সেই থেকে ছাত্রী সংস্থা আমার জীবনতরীতে Rudder এর ভূমিকা পালন করেছে।

www.pathagar.com

ছোটবেলায় একটি রচনা পড়েছিলাম Aim in life এর উপর। সেখানে প্রথম দু'টি লাইন ছিল বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লিখা- A man without an aim, like a boat without a rudder.

অর্থাৎ লক্ষ্যহীন জীবন বৈঠাহীন নৌকার মত। বৈঠাহীন তরী তার কূলের নাগাল পায়না। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নদীতেই ঘুরপাক খেতে খেতে সলিল সমাধি ঘটে। এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। এ সংগঠনের ইফতার মাহফিলে এসে আমরা তিন বোন এতই মুগ্ধ বিমোহিত হয়েছিলাম যে- এমন সুন্দর ইসলামী পরিবেশে, এককভাবে মেয়েরাও ইফতার মাহফিল করতে পারে এবং তা সুন্দর হতে পারে। সেদিনের সে ইফতার মাহফিলে ছোলা, পেয়াজু, খেজুর আর নুডুলসের স্বাদ যেন আজও মুখে লেগে আছে। আমাদের তিন বোনকে বোরখা পরিহিত পেয়ে আপুরাও খুব খুশি হয়েছিলেন। এরপর বাসার ঠিকানা নিয়ে বকুল আপা ও আঁখি আপা সোজা বাসায় চলে আসেন প্রাথমিক সদস্যা ফরম পূরণের জন্য। সেদিন থেকে শুরু হয় আমাদের বৈঠকে যাওয়া। মজার ব্যাপার হলো ছাত্রীসংস্থার কর্মী হওয়ার আগে থেকেই আমরা নিয়মিত সাপ্তাহিক দাওয়াতী কাজ করতাম? খালাম্মাদের তাফসীর মাহফিল হতো আমাদের বাসায়। রাশিদা খালাম্মা প্রতি বৃহস্পতিবার তাফসীর করতেন। আনসারী খালাম্মাতো ছিলেন প্রায় নিয়মিত বক্তা। এছাড়াও সাধারণ সভায় আসতেন আসমা খালাম্মা, শামসুন্নাহার নিজামী খালাম্মা। তাফসীরের দিন পাড়ার সব খালাম্মাদের আবার মনে করিয়ে দিয়ে আসতাম। মাহফিলে আমরা থাকতাম স্বঘোষিত ক্ষুদে ভলান্টিয়ার। খালাম্মাদের চা, পান, .. এগিয়ে দেয়ার দায়িত্ব। চার বোন মিলে মাহফিলের ক্ষুদে শিল্পী ছিলাম আমরা। ছাত্রীসংস্থার বৈঠক এত ভালো লাগতো যে "কি যে এক আকর্ষণে ছুটে যাই মুগ্ধ মনে।" আসলে শুধুমাত্র প্রাথমিক সদস্যা বৈঠকেই নয় আমরা তিন বোন মিলে প্রতিটি কর্মী বৈঠকেও হাজির হয়ে যেতাম। সেদিনের সেই বড় আপুরা বয়সে আমাদের চেয়ে ছিল অনেক বড় কিন্তু মনের দিক থেকে খুব কাছে। তাই তাদের সাথে বসে আমরা ভুলে যেতাম আমরা স্কুলের ছাত্রী আর ওনারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাদের মধ্যে খুঁজে পেতাম যেমন দায়িত্বশীলকে, খুঁজে পেতাম বড় বোনকে, খুঁজে পেতাম বন্ধুকে। সেই হৈ চৈ" ৭৬ সবুজবাগ ছাত্রী সংস্থার প্রথম অঘোষিত অফিস। সেটাই ছিল আমাদের বৈঠকের Place। শাহানা আপার বোন তাহমিনা আপাদের বাসা।

যিনি আমাদের আদর, শাসন আর সোহাগ দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন সেই তাহমিনা আপাকে অনেক স্মৃতির ভীড়ে যার কথা না বললেই নয় আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। যিনি ছিলেন আমাদের সভানেত্রী।

তার ব্যক্তিত্ব, তাঁর মেধা (যিনি আইডিয়াল স্কুল থেকে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকার করেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির ছাত্রী ছিলেন) ছিল অসাধারণ। পড়লেখা, Subject choice এর ব্যাপার, কি কোন Logic-এর জটিল বিষয়ে বোঝার জন্য তার কাছে ছুটে যেতাম। কোথাও কোন প্রতিযোগিতা হবে তার জন্য গানের রিহার্সেল, আবৃত্তির কি নাটকের রিহার্সেল, কি কোরআন তেলাওয়াতের ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনমতো না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতেন। সময় দেয়ার ব্যাপারে ছিল না সামান্য কৃপণতা। আজকে এ পর্যায়ে এসে উপলব্ধি করছি- আমরা কি পেরেছি কর্মীদের গড়ে তোলার জন্য সেরকম সময় শ্রম দিতে? কথায় কথায় সহজেই কর্মীদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেই, তারা বৈঠকে আসেনা, প্রোগ্রামগুলো কি পেরেছি কর্মীদের কাছে আকর্ষণীয় করতে? কর্মী বৈঠকের সামষ্টিক পাঠ আমাদের কাছে ছিল বৈঠকের প্রধান আকর্ষণ।

মনে পড়ে আমার মত পিছলা প্রকৃতির মানুষের পেছনে মাহবুবা আহমেদ মিমি আপার লেগে থাকার কথা। অগ্রসর কর্মী করার জন্য দায়িত্বশীলদের চেষ্টাই ছিল বেশি। S.S.C. পেরিয়ে বলতাম H.S.C শেষ করে। ঠিক ঠিক H.S.C পরীক্ষার পরের দিনই মিমি আপা গিয়ে বাসায় হানা দিয়েছেন। ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে বেঁধে ফেলেন। এদিকে ছোট বোন আগে অগ্রসর কর্মী হয়ে গেছে। পালাবার পথ কোথায়?

আসলে জীবনের যে বয়সে পদস্খলনের সুযোগ ও সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সে বয়সেই ছাত্রীসংস্থার সন্ধান পেয়েছিলাম। 'ঘুরে গিয়েছিল জীবনের মোড়। স্কুলের পাশে লাইব্রেরীর পাঠাগারের সমস্ত সেবার বই পড়তাম। সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রেও আসে Radical change. বস্তাপচা সাহিত্যের স্থান দখল করে ইসলামী সাহিত্যের শান্তিপথ, হাকীকত সিরিজ নৈতিকভিত্তি ইত্যাদি সিরিজ বইয়ের মধ্যে সাইমুম সিরিজ।

মিমি আপা হঠাৎ করে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বাঁচার আশা প্রায় নিভে গিয়েছিল- সেই মুহূর্তে উনি আমাদের ইউনিট সভানেত্রী। ওনাকে দেখতে গিয়ে জীবন-মৃত্যুর উপলব্ধি আরো গাঢ় ও তীব্র হয়। পা রাখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। একটা

www.pathagar.com

ফার্স্টক্লাস নিতে হবে এ আশায়। এরপর দ্রুত দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন শুরু হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেই পড়ে যাই এরশাদ ভ্যাকেশানে। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঢাকার রাজপথ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ছিল সোচ্চার। পতন হয় স্বৈরাচারের। কিন্তু বাতিলের সাথে ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন সংগ্রামের শেষ হয়না। ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলায় এককভাবে ব্যর্থ হয়ে সমস্ত ছাত্র সংগঠনগুলো ঐক্য গড়ে তোলে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে। তারই জের হিসেবে ছাত্রীদের উপর অর্থাৎ ছাত্রী সংস্থার বোনদের উপর আসে অত্যাচার নির্যাতন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে অবস্থানরত বোনদের হল থেকে বের করে দেয়। মৈত্রী হলে ছাত্রী সংস্থার বোনদের উপর চলে তান্ডব। রাতের অন্ধকারে তাদের হল থেকে বের করে দেয়া, রুমে তালা লাগিয়ে তাদের জিনিসপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়ার যে দৃশ্য আমি দেখেছি তা আজো অবিশ্বাস্য। ছাত্রীরাও অর্থাৎ যে নারীকে বলা হয় কুসুম কোমল সে নারীও যে হতে পারে ভয়ংকর সে দৃশ্য দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। রাতে মেয়েদের বের করে দেয়ার খবর জানতাম না সকালে ডিপার্টমেন্টে গিয়ে; দেখি থমথমে ভাব। পাশেই মৈত্রী হল ভাবলাম যাই সিনিয়র ছাত্রী সংস্থার আপাদের সাথে একটু দেখা করে আসি। হলে ঢুকতেই দেখি বিরাট জটলা, মাঝখানে ধোঁয়া। উঁকি দিয়ে দেখি হলের মাঠে ছাত্রীসংস্থার বোনদের কাপড় চোপড় আসবাবপত্র পুড়ছে। আর সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। পরিস্থিতি কিছুটা আঁচ করে ইচ্ছে করেই না জানার ভান করে সবার সামনে বললাম এখানে কি হচ্ছে? আমার এক ক্লাসমেট উত্তর দিল ছাত্রীসংস্থার মেয়েদের জিনিস পুড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম ওরা কি করেছে? এ কথা শোনার সাথে সাথে গুটিকয়েক গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ছাত্রী হায়েনার উন্মত্ততা আর হিংস্রতা নিয়ে আমার দিকে তেড়ে এসে বললো- কি করেনি? অবস্থা আঁচ করে আমি আস্তে চলে আসি ডিপার্টমেন্টে। ডিপার্টমেন্টেও থমথমে ভাব কাটেনি। সম্মিলিত এ ঐক্যের ঘোষণা-শিবির মুক্ত ক্যাম্পাস। কোন বোরখা পরা মেয়ে দাড়ি-টুপি পরা কোন ছাত্র ক্যাম্পাসে আসতে পারতো না। কিছুক্ষণ পরপর শ্লোগান- একটা দুইটা শিবির ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর।

আমরা শিবির নই, সংস্থা, আমরা একক, আলাদা ছাত্রী সংগঠন এ কথা বলার, বোঝার কোন সুযোগ নেই। তাদের বোঝাবে কে?- এত কঠিন অবস্থার মধ্যেও ক্লাসে আমার উপস্থিতি এদের গাত্র দাহ আরো বাড়িয়ে দিল। ডিপার্টমেন্টে আমাকে দেখে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো। বারান্দার সামনে মিছিল হলো কোন সাহসে আমি ক্লাসে আসি? আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অন্তরে আল্লাহ আল্লাহ জপতে লাগলাম। হঠাৎ করে একটু ভয় ভয় পেতে শুরু করলাম।

ডিপার্টমেন্টে ছাত্রী সংস্থার শুধু আমি একা। লায়লা আপা, পারভীন আপা কাছে ছিলো না। তবে বাইরে থেকে বোঝার কোন সুযোগ দিলাম না। সাহস নিয়ে আমার কয়েকজন Class mate দের সাথে ক্লাস থেকে একটু বের হয়ে আসলাম। এরই ফাঁকে তারা ক্লাসে ঢুকে বোর্ডে শিবিরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে ক্লাস থেকে বের করে দেয়া হোক- এই মন্তব্য লিখে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। আমি ক্লাসে ঢুকেই first bench এ আমার সীটে বসলাম। সামনে তাকিয়েই বোর্ডের দিকে চোখ যায়। মুহূর্তে আমার ভেতরে সাহসের সঞ্চার হলো- আমি দেখলাম ডিপার্টমেন্টে ছাত্রী হিসেবে টিকে থাকা, আদর্শ নিয়ে টিকে থাকা অর্থাৎ এটা আমার অস্তিত্বের লড়াই। আজ যদি টুটি চেপে না ধরি তাহলে ভবিষ্যতে আমাকে পরাজিতের মত ক্লাস করতে হবে। ক্লাসে ছেলেমেয়েরা সবাই একবার বোর্ডের দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার আমার দিকে। আমি আর বসে থাকতে পারলাম না- টেবিল থেকে ডাস্টারটা নিয়ে খচ্ খচ্ করে লেখাটা মুছে ফেললাম। হলে অনাবাসিক হওয়াতে আমার সাহসটা একটু বেশীই ছিল। আমার এ আচরণ বাতিলের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। তারা রাগে, দুঃখে হিংস্র মূর্তি নিয়ে আমার সামনে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়ালো, একজন প্রশ্ন করলো কেন মুছলে?

আমার উত্তর ছিল-

কেন লিখলে?

তাদের পক্ষ থেকে বলা হলো আমরা স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে লিখেছি আমার উত্তর- আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় উজ্জীবিত হয়ে মুছেছি।

এভাবে চললো কথা কাটাকাটি, জবাব পাল্টা জবাব। আল্লাহর অপার মেহেরবানী ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যাদের সাথে আমার তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা নেই তারাও সবাই আমার পক্ষ অবলম্বন করতে শুরু করলো। এভাবে ... ব্যক্তি থেকে চলে গেল পুরো ক্লাস পর্যায়ে। তারা হটে যেতে বাধ্য হলো। ক্লাস শেষে বের হওয়ার পথে কোন এক হিতাকাংখী ছাত্র আগ

www.pathagar.com

বাড়িয়ে আস্তে করে আমাকে বললো- তুমি জানোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি পরিস্থিতি। আজকে তোমার স্থানে একটি ছেলে হলে হয়তো লাশ পড়তো। তাই সাবধানে কথা বলবে। আমি অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে সে ছেলেটির সাথে দু'বছর ধরে ক্লাস করলাম ক্ষণাক্ষরেও জানলাম না যে সে কোন আদর্শবাদী আন্দোলনের ছাত্র। তার সাথে এর আগে কোনদিন কথাও হয়নি। এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ। হয়তো সেদিন এতটা বলা-করা আমার জন্য ঠিক হয়নি। মানের দিক থেকে পেছনে থাকার কারণে হয়তো আবেগকেও সংযত করতে শিখিনি। পরবর্তীতে সংগঠনের বড় আপারাও আমাকে এ ধরনের সংঘাতে যেতে বারণ করেছেন, কিন্তু সেদিনের এই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন পরিস্থিতিতে আর কোনদিন কোন বিরোধিতার মধ্যে পড়তে হয়নি। শুধু তাই নয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা যে সত্য, "তোমরা নিরাশ হয়োনা, ... কোরআনের এই আয়াতের বাস্তবায়ন ঘটেছিল দু'বছর পরই- তারা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে তাদের সেদিনের সেই কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়।

আমার মনে হয় আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের আবেগটা ছিল অনেক ক্ষেত্রে হাতুড়ে ডাক্তারদের মত। হাতুড়ে ডাক্তাররা যেমন তেমন কিছু না জেনেই বড় ধরনের অপারেশান করে বসে- তাতে অনেক সময় রোগী মরার হাত থেকে বেঁচে যায় আবার ক্ষতির কিছু হলে কখনও রোগী মারাও পড়তে পারে। এ ধরনের আবেগের সুফলটা ছিল এমন যে- ক্লাসে স্যাররা যখন ইসলাম বিরোধী কোন কথা বলতো তখন চট করে তার উত্তর দিতে দাঁড়িয়ে যেতাম। যার কারণে স্যারদের ইসলাম বিরোধী কথা বলতে হিসেব-নিকেশ করেই বলতে হতো। বিশেষ করে আহমেদ শরীফের ছেলে ডঃ নেহাল করীম সাহেবের ক্লাসে এমন অনেক হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া অবস্থায় যখন মনোসংশয়ের সাথে সাথে অধম বান্দীকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে তখন উপলব্ধি করেছি মালেক ভাইয়ের চিঠির সে অংশটি "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের চাইতে ছাত্রসংঘের অফিস আমার কাছে অধিক বেশী গুরুত্বপূর্ণ" যে অংশটি এর পূর্বে অনেকবার পড়েছি, শহীদ মালেক ভাইয়ের সে স্মরণিকাটি "আব্দুল মালেক শহীদ ঃ স্মৃতি সংকলন" পড়ে পড়ে, তার চিঠি পড়ে আমরা কর্মীরা কেঁদে বুক ভাসিয়েছি- কিন্তু এ উক্তির মর্মার্থ সেদিন বুঝতে পারিনি যে, কেন প্রাণ রসায়নের একজন সেরা ছাত্র হয়েও তিনি এ উক্তিটি করেছিলেন? আসলে এ জন্যই তিনি বলেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষা, তাতে যুব সমাজের মধ্যে কোন নৈতিক পরিবর্তন আসা সম্ভব নয়- তাই সমাজের প্রতিটি তরুণকে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান করে নৈতিক বিজয় অর্জনের জন্য সংঘের অফিসের কাজই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ঐ উক্তির পরেও তিনি ছিলেন তার ক্লাসের একজন সেরা ছাত্র। এভাবেই ভারসাম্য জীবনের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। আসলে সবাইকে জ্ঞানের অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করতে হবে। তবে হ্যাঁ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এবং তার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করলে আল্লাহ তাতে বরকত দেন। আমাদের ১ ঘণ্টা পাঠ্যপুস্তক পড়া অন্যদের ৪ ঘণ্টার সমান হবে। আমরা দেখেছি- দায়িত্ব বাড়ার সাথে পূর্বাপেক্ষা রেজাল্টও ভালো হয়েছে। এটাই আল্লাহর মদদ। সত্যের এ পতাকাবাহী সংগঠনে সামিল হওয়ার কারণেই জীবনে সাংগঠনিক কাজকে compulsory ধরে পাঠ্যপুস্তক বা লেখাপড়াকে Obtional মনে করতে অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর কাছে মনের এ পরিবর্তনের জন্য শুকরিয়া আদায় করার ভাষা নেই।

২৫ বছর আগে সময়ের প্রয়োজনে জন্ম হয়েছিল যে সংগঠনটির, অন্ধকার তিমির ভেদ করে স্বপ্নের কুলে ভীড় করেছিল যে সংগঠন- সে থেকে আজ অবধি অসংখ্য চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সম্মুখ পানে, সত্যের ডাকে প্লাবিত করছে অসংখ্য ছাত্রীকে- আজ তারই অংশ হিসেবে আমাদের এপথ চলা। আজ থেকে ১১/১২ বছর আগের কথা। সাংগঠনিক জীবনের প্রথম সফর। যে আমি বোঝার বয়স থেকে ঢাকার বাইরে কখনো পা মাড়াইনি। ঢাকায় জন্ম, ঢাকা কেন্দ্রীক যে জীবন, সফরের কথা শুনে যেমন খুশী হলাম, নতুন একটা জগৎ দেখার আনন্দ, সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্লাস মিস্ করতে হবে, মনের মধ্যে একটা দোদুল্যমানতা। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভানেত্রী পারভীন আপার সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে যাওয়াটাই অবশেষে ঠিক হলো। এ প্রসঙ্গে সংগঠনে নতুন আসার অর্থাৎ ৮৭'র প্রতিনিধি সম্মেলনের সময়কার একটি ঘটনা স্মরণ করে মনে মনে হাসি পায়, তখন নূরুন্নিসা আপা সভানেত্রী আমরা একা ভলান্টিয়ার হিসেবে থাকতে পারবো না দেখে নূরুন্নিসা আপার বিশেষ অনুমতি নিয়ে দুই বোন আমি ও আমার বড় বোন, হাসিনা আপা জীবনের প্রথম মায়ের কোল ছেড়ে আল ফালাতে। তার পরেও রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে দু'বোন ডোবার ধারের জানালার কাছে পর্দার

www.pathagar.com

নিচে গিয়ে চুপিচুপি কেঁদেছি বাসার জন্যে। সেই আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সফরে যাচ্ছি, মনের গহীনে কত কল্পনা, কতশত কৌতূহল, আহা সফর যেন কেমন? কতজনের কাছে কত গল্প শুনেছি। আজ নিজের জীবনে তা ফলতে যাচ্ছে।

থাক সে ঘটনার আর পুনরুল্লেখ করতে চাইনা। নূরুন্নিসা আপার এক স্মৃতি কথায় সেরকমই এক ঘটনা পড়েছি। কুষ্টিয়ার কষ্ট আজও ভোলার নয়। কখনো বাস, কখনো বেবী, কখনো ট্রেন- রাস্তায় নষ্ট হয়ে যাওয়া ৩ ঘণ্টা প্লাটফর্মে বসে থাকা লোকাল ট্রেনে ওঠা, ছাত্রীসংস্থার অফিস বের করতে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত শরীরে বাসায় বাসায় ধর্না দেয়া, অবশেষে খুঁজে পাওয়া, Office এর হাসিমুখে অভ্যর্থনায় ধরাতে প্রাণ ফিরে পাওয়া, দীর্ঘ সফর শেষে .... রান্নার পর অনেক রাতে খাওয়া-এরপর বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে আর কিছু মনে নেই। সকালে উঠে নতুন জীবন ফিরে পাওয়া। প্রথম এক সফরেই যেন হাজার সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম, শুকরিয়া মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে। এরপর যতবারই কুষ্টিয়াতে গিয়েছি ততবারই বোনদের কাছে প্রথম অভিজ্ঞতার কথা না বলেই পারিনি। তবে সফরের ক্ষেত্রে একটি অপূর্ণতা রয়েই গেছে জানিনা তা কখনো পূর্ণ হবে কিনা– দু'বোনের একসাথে সফর করা, দু'বোন দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে একসাথে সফরের সুযোগ পাইনি। মুখ ফুটে বলিওনি। তবে নীলু আপা মনের এ আকুতি বুঝতে পেরে একবার নিমসার কলেজে নজরুল-ফররুখ দিবসে দুজনকে একসাথে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন- অবশ্য ঢাকা থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার রাস্তা। একজন নজরুলের বক্তা আরেকজন ফররুখের। তবে যখনই যে বোনের সাথে সফরে গেছি সফর সঙ্গী হয়ে, সফর সংগীদের জন্য দায়িত্বশীলদের ব্যাকুলতা, সার্বক্ষণিক খোঁজখবর সবসময় আমাকে মুগ্ধ করেছে। বয়সে ছোট হয়েও দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে আদর ও শ্রদ্ধা যে পরিমাণ পেয়েছি সেগুলো উল্লেখ করে তাঁদের পরম পাওয়া থেকে বঞ্চিত করতে চাইনা, মহান প্রভুর কাছে দোয়া যাজাকাল্লাহু খাইরান। একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের এটাই বৈশিষ্ট্য। তাইতো আল কোরআনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন– 'তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল এসেছেন'। তোমাদের দুঃখ কষ্টে তিনি বিচলিত হন, তোমাদের কল্যাণ বিধানে তিনি অতি আগ্রহী। মুমিনদের জন্য তিনি মেহেরবান অতি দয়ালু।" (সূরা তওবা ১২৮)

১৮ বছরের কতশত স্মৃতি আজ একসাথে ভীড় করেছে মনের খাতায় মনের পাতায়, কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখি। জানিনা জীবন খাতার এ হিসাব রাব্বুল আলামীনের কাছে কেমন হবে। অযোগ্যতা আর অনভিজ্ঞতার মাঝে এসেছে কতশত দায়িত্ব তাঁর হিসেব হে মাবুদ তুমি সহজ করে দিও।

রক্তের অক্ষরে লিখা প্রিয় এ সংগঠন। কন্যা হয়ে ঢুকেছি জায়া-জননী হয়ে বের হয়েছি। কতশত বাস্তবতা, কতশত ঘটনা স্মৃতি সাগরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ব্যর্থতার গ্লানি আর সফলতার হাতছানি যেন পাশাপাশি ঘর বেঁধেছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত দিতে হয়েছে। তারপরও বোনেরা যে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তা বাস্তবে নিজের বেলাতেই কতটুকু সম্ভব হতো জানি না।

এ সংগঠন এমনই শিক্ষা দিয়েছে যেখানে রক্তের সম্পর্কের চেয়ে দ্বীনের সম্পর্কই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। সমস্যা হয়নি কখনোও আনুগত্যের, সমস্যা হয়নি সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের, সাংগঠনিক গোপনীয়তার ক্ষেত্রে। কখোনও আমি মহানগরীতে, ছোট বোন কেন্দ্রে আবার কখনো দু'জনে অত্যন্ত কাছাকাছি কিন্তু মাঝখানে ছিল সাংগঠনিক দেয়াল যা সবসময়ই সদা-সতর্ক করে দিয়েছে দায়িত্ব পালনে। সেই বোনটি নাজমুননাহার এ্যানি যার কথা আজও ভুলার নয়। যে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, আপনি কি আমার বোন, বিশ্বাস হচ্ছে না বোন হয়ে কোন বোনকে কেউ এমন সিদ্ধান্ত দিতে পারে? শুধু একটি উত্তরেই সেদিন সে তার আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছিল, তা হলো– "আমি তোমার বোন হিসেবে নয়, সংগঠনের দায়িত্বশীলা হিসেবেই এ সিদ্ধান্ত দিয়েছি। সংগঠনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই তা দিতে হয়েছে। যদিও এর কারনে আমার দুর্দিনে, শিক্ষাজীবনে, আন্দোলনে সর্বোপরি জীবনের চরম পরম সাথীটিকে নিজের কাছ থেকে হারিয়ে ছিলাম। আজও অনেক অনেক দূরে। প্রায় প্রায় হারিয়ে যাই সেই দিনগুলোতে, স্মৃতির পাতায় পাতায় সুখ দুঃখের প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায়, অনেক বৃষ্টি কান্না হয়ে ঝড়ে যায়।

তাই পেছনে ফেলে আসা ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের অনাগত সময়ের দাবিকে সামনে রেখে বর্তমান প্রজন্মকে কিছু বলা–

- দৃঢ় ঈমান আর সাহসকে সম্বল করে এগুতে হবে– শুধু সংখ্যার দিকে তাকিয়ে আত্মতৃপ্তি নয় বরং গুণগত মানের দিক থেকে সাহাবাদের মত হতে হবে। যাদের ব্যাপারে আল কোরআনের ঘোষণা তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন এরকম ধৈর্য্যশীল লোক হয় তবে তাদের দুইশত জনের উপর জয়ী হতে পারবে।

www.pathagar.com

- একদিকে ভালো ছাত্রী অপরদিকে হতে হবে ভালো সংগঠক এবং জ্ঞানের রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করে শিক্ষক ও ছাত্রীদের মধ্যে সংগঠনের ব্যাপক পরিচিতি তুলে ধরতে হবে।
- চরিত্রকে আরোও বেশী গণমুখী ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।
- ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনের ক্ষেত্রে নিজেকে আদর্শ স্থাপন করতে হবে।
- সমাজের প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান তথা বৃহৎ পরিমন্ডলে কন্যা, জায়া, জননী হিসেবে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।
- জ্ঞানের রাজ্যে মেধাবী ও যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রীদের বাছাই করে টার্গেট করে এদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে এগিয়ে আনতে হবে।

তাই ২৫ বছরের এই দিনে জাহিলিয়াতের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে হবে। যেখান আল কোরআনের শাশ্বত আহ্বান- "ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাস্‌সির কুম ফাআনজির, ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির।' সেখানে এতটুকু দাঁড়াবার সময় কোথায়? তাইতো কবির প্রশ্ন-

ঘুমায় কে আজ দরোজায় খিল দিয়ে
কে আছো অবরুদ্ধ বল প্রশ্বাস নিয়ে
ছুটে চল রুদ্ধতার আবরণ ছিঁড়ে,
ফেলো নোঙর তোমার সাহসের ভিড়ে
পায়ে পেষো তাপ দূর্বার কিষাণ
মুক্ত বিহঙ্গের মত ওড়াও নিশান।

www.pathagar.com

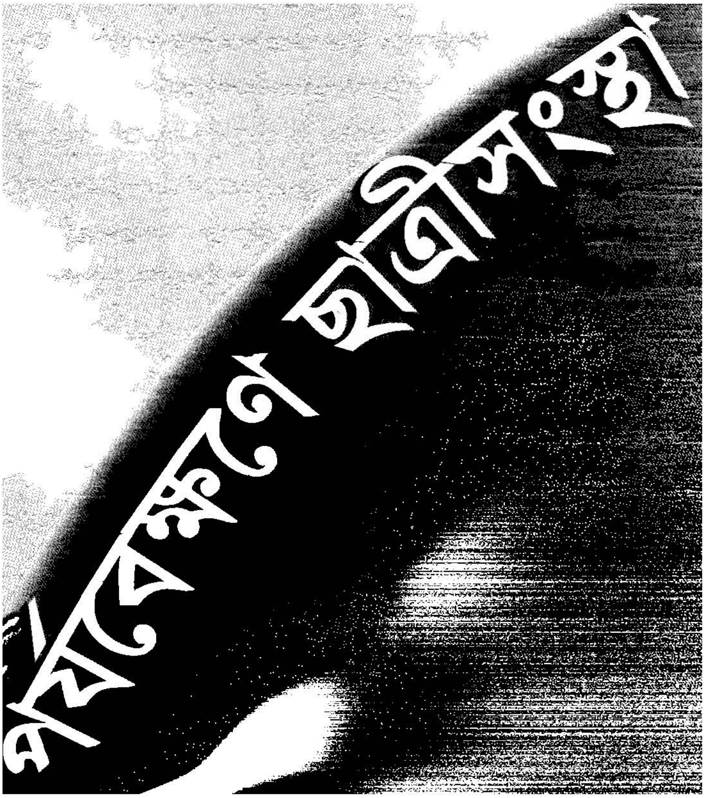

www.pathagar.com

"আদর্শ মুসলিম নারী গঠনে ছাত্রীসংস্থা"

নাজমুন নাহার নীলু

একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে সভ্যতার চরম উৎকর্ষতার যুগে অবস্থান করেও মানুষ দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটছে আদর্শের পিছনে কিন্তু হায়! পৃথিবী-অনেক আদর্শকে একদিকে স্বাগত জানিয়েছে অপরদিকে তাকে বিদায় করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। কেননা এসব আদর্শ ছিল অনাদর্শের সমাহার। সমগ্র পৃথিবী আজ আদর্শিক শূন্যতায় ভূগছে। আদর্শ খুঁজতে গিয়ে মানুষ ভোগবাদ, বস্তুবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, পশ্চিমা জীবনবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ইত্যাদি অসংখ্য মতবাদের পিছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ আজ ক্লান্ত। এভাবে কল্যানকর আদর্শ পাওয়া যায় না কারণ, মানুষ মানুষকে কখনও একটি ভারসাম্যপূর্ণ যৌক্তিক আদর্শ উপহার দিতে পারে না। মানুষ অনেক কিছু জয় করতে পারলেও আবার অনেক ক্ষেত্রে সে অপারগ, অসহায়! এখানেই মানব জীবনের সীমাবদ্ধতা। তাই সত্যিকার ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ উপহার দিতে পারেন এই বিশ্বজগতের যিনি মলিক। তিনিই দিতে পারেন মানুষকে যুগোপযোগী চিরন্তন শাশ্বত জীবন বিধান। স্বয়ং আল্লাহপাক তাই "ইসলামের" মধ্যেই সেই জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই জন্য জীবনের সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় ইসলামের মধ্যেই। আজকের পৃথিবীতে যতগুলি সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে 'নারী' সংক্রান্ত সমস্যা অন্যতম। নারী সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব উপায় উপকরণ ব্যবহার করে সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য আদর্শ নয়। এক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমেই সম্ভব নারী সংক্রান্ত ইস্যুগুলো সমাধান করার। আশার কথা হলো এই যে সত্যিকার আদর্শ মুসলিম নারী গঠনে ইসলাম তার আদর্শকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে বিশ্বনারী সমাজের কাছে। এই আদর্শকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই নারী পাবে মানুষ হিসেবে সত্যিকার অধিকার ও মর্যাদা। আর এই লক্ষ্যেই বাংলাদেশের বুকে ছাত্রীসংস্থা আদর্শ মুসলিম নারী গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আদর্শ বলতে সাধারণত আমরা বুঝি যা অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য তাই আদর্শ। আর আদর্শ সমাজ বলতে বুঝব যেখানে মানুষের ইনসানিয়াত ভিত্তিক একটা কল্যাণমুখী সামাজিক বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত এবং সুস্থ ও সুন্দর শান্তির পরিবেশ। যে সমাজের মানুষ সবার জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যেখানে নেই মানবতা বিরোধী কাজ, নেই হিংসা-বিদ্বেষ নেই মদ-জুয়া সুদের কারবার, নেই হত্যা খুন ধর্ষণের মত অন্যায়। আছে শুধু শান্তি আর শান্তি যা মানুষ প্রত্যাশা করে। সুষ্ঠু রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনেই এমন একটি আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠতে পারে। তবে সেটা মানুষের মনগড়া মতবাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা সম্ভব মহান আল্লাহপাকের পাঠানো জীবন বিধান "আল-ইসলাম" অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে। যা পাঠিয়েছেন রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন" নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ" [সূরা আহ্যাব ঃ ২১]

www.pathagar.com

আল্লাহপাক রাসূল (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে আরও বলেন, "আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া ঃ ১০]

আল্লাহপাক মহানবী (সাঃ) কে উসওয়াতুন হাসানা বা উত্তম নমুনা হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন যাতে করে মানব জাতি তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ সমগ্র জীবনে একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। মহানবী (সাঃ) এর প্রতিটি কথাকে আল্লাহতা'য়ালা তাঁর নিজের কথা বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন।

"তিনি নিজের ভাবাবেগে কোন কথা বলেন না, তাঁর কথা ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। [সূরা নাজম] এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর। সকল যুগের মানুষের জন্যে তিনিই একমাত্র আদর্শ। তাঁর আদর্শের উৎস মহান আল্লাহপাক। তাঁর আদর্শই আল্লাহপ্রদত্ত শাশ্বত জীবন বিধান আল ইসলাম। তাঁর আদর্শ হচ্ছে মহান আল্লাহপাকের বাণী মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ভাষায়, "নিশ্চয় কুরআনই ছিল আল্লাহর নবীর চরিত্র" [মুসলিম] রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ সম্পর্কে জর্জ বার্নাডশ'র উক্তি"If all the world was united muhammad would have been the best fitted man the peoples of various creeds dogmas and ideas to peace and happiness"

"পৃথিবী নানা ধর্ম-মত, ধর্ম-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার লোককে শান্তি ও সুখের পথে পরিচালিত করবার জন্য গোটা পৃথিবীটাকে একত্র করেও যদি নেতা খোঁজা হয় তাহলে সর্বোত্তম ও যোগ্যতম হবেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।" ইসলাম হার মরাল এন্ড স্পিরিচুয়্যাল ভ্যালু' গ্রন্থে মেজর আর্থার গ্লায়ন লিউনার্ড বলেছেন ঃ নবী হিসেবেই তিনি কেবল শ্রেষ্ঠ নন, বরং একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সুযোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে দুনিয়াবী ও রূহানী নির্মাতা হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনি সংস্থাপন করেছেন একটি শ্রেষ্ঠ বসতি ও সাম্রাজ্য। এই তিন মাহাত্ম্য ছাড়াও তাঁর সংস্থাপিত দীন আজও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাছাড়া তিনি যে সত্য কায়েম করেন। তার যথার্থ কারণ হচ্ছে তিনি নিজে সত্য ছিলেন, তার জনগণের নিকট বিশ্বস্ত ছিলেন, সর্বোপরি তাঁর রব এর অনুগত ছিলেন। Al-treed de lamarotine তার তুর্কী ইতিহাসের বক্তা, ধর্ম প্রচারক যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, বিমূর্তকর্ম পদ্ধতির সংস্থাপন, কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই মুহাম্মদকে দেখ, মানুষের মহত্বের যতগুলো মাপকাঠি আছে তা দিয়ে মাপলে কোন লোক তাঁর চেয়ে মহত্তর হতে পারে না। প্রফেসর রামকৃষ্ণ তার বই Muhammad the prophet of Islam' এ লিখেছেন "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বর্ণনা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমি একটা আভাস দিচ্ছি মাত্র। কত বৈচিত্র্যময় তাঁর চরিত্র। একাধারে তিনি মহাপুরুষ, নবী, পয়গম্বর অপরদিকে তিনি রাজনীতিজ্ঞ, সেনাধ্যক্ষ, সম্রাট, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক, দার্শনিক, ঋষি, সিদ্ধপুরুষ, বাগ্মী, যুগপ্রবর্তক, সংস্কারক, ক্রীতদাসের ত্রাণকর্তা, অনাথের আশ্রয়দাতা, নারীদের উদ্ধারকর্তা, সুমহান বিচারক। এই সকল মহৎ কর্ম ও মানবিক ভূমিকার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি হলেন অনন্য সাধারণ অতুলনীয়।"

প্রকৃত কথা, মহান আল্লাহপাক তাঁকেই সারা বিশ্বের সকলের জন্য আদর্শের অনুকরণীয় নমুনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রাসূল (সাঃ) যে চিরন্তন আদর্শের নমুনা মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন। সেই আদর্শের সারকথা আল্লাহপাক মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কেবল তাঁরই দাসত্ব, আনুগত্য ও হুকুম পালন করবে। এই দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। মৃত্যুর পর একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন জান্নাত ও জাহান্নামের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারিত হবে তাই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেখান পথে চলার জন্য তিনি যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানব জাতিকে আল্লাহর পথে চলার পথ দেখিয়েছেন।

সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন রাসূল (সাঃ) কে। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। তাই উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে সমগ্র মুসলিম জাতির ওপর তাঁর দেখানো পথকে অনুসরণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়েছে। এক্ষেত্রে নারীপুরুষ উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। নারীপুরুষ উভয়ই সভ্যতার নির্মাতা। নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই বিশ্বসভ্যতা গড়ে উঠেছে। সুতরাং নারী পুরুষ উভয়ই ভাল কাজে যেমন সঙ্গী আবার মন্দ কাজেও পরস্পর সঙ্গী হয়ে থাকে। পবিত্র

www.pathagar.com

কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের দোসর। তারা খারাপ কাজের আদেশ দেয়। ভাল কাজ করতে নিষেধ করে এবং (কল্যাণের কাজে) নিজের হাত গুটিয়ে রাখে তারা তো আল্লাহকেই ভুলে গেছে। তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। মুনাফিকরাই নিশ্চিতভাবে ফাসেক" [আত তওবা ঃ ৬৭]

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ এদেরকেই রহমত দান করবেন। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়"। [আত-তওবা-৭১] এ আয়াত সমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে সাধিত সংগ্রামে নারী ও পুরুষ উভয়েরই ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা সাধনার ফল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর ওহীর মাধ্যমে যে জীবন বিধান পাঠানো হয়েছে তাই আল-ইসলাম। এই বিধানকেই অনুসরণ করলেই মানুষ প্রকৃত কল্যাণ পাবে। তাই আদর্শ মানব হিসেবে রাসূলকেই অনুসরণ করা প্রত্যেক নর-নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক আদর্শ মুসলিম নারীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। 'নারী বা পুরুষ যে-ই হোক না কেন, যে ভাল কাজ করলো সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে আমি তাকে একটি পবিত্র জীবন যাপন করার সুযোগ দেব। আর যে উত্তম কাজ সে করেছিল আমি তাকে তার উত্তম পারিশ্রমিক দেব। [সূরা আল-নাহল ঃ ৯৭]

"যে সব নারী ও পুরুষ মুসলমান, মু'মিন, আনুগত্যশীল, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল আল্লাহর সামনে নতশীর, সাদকা দানকারী, রোযাদার, যৌনাঙ্গের হিফাজতকারী এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারী নিশ্চিতভাবে আল্লাহতা'য়ালা তাদের জন্য মাগফেরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। [সূরা আহযাব ঃ ৩৫] "মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যে তাদের মাথার উড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।" [সূরা নূর ঃ ৩০,৩১] "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সে ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। মূর্খ যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে যাকাত প্রদান করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ চান তোমাদের পক্ষে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত পবিত্র রাখতে।" [সূরা আহযাব-৩২,৩৩]

সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আল-কুরআনে নারীকে মানুষ হিসেবে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সমগ্র নারী সমাজকে আদর্শ মুসলিম নারী হওয়ার আহবান জানিয়েছে। এর বিনিময় নারী পাবে দুনিয়ায় মানুষ হিসেবে সার্বিক মর্যাদা আর আখেরাতে সে পাবে জান্নাত। তাই আমরা আদর্শ মুসলিম নারীর প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ দেখতে পাই বিবি মরিয়ম, বিবি আছিয়া, হযরত খাদিজা (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত সুমাইয়া (রাঃ) ইত্যাদি অসংখ্য মহিলা সাহাবীগণ এবং পরবর্তী যুগে স্ব-স্ব স্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামরত অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ মুসলিম নারীদের জীবনী থেকে যাদের মধ্যে মরিয়ম জামিলা ও জয়নব আল গাজ্জালী অন্যতম।

যুগে যুগে সংগ্রামী মুসলিম নারীরা একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্বীন ইসলাম তথা ইসলামী জীবন বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মানুষকে ইসলামের সু-শীতল ছায়াতলে আসার জন্য আহ্বান করেছে। যাতে করে আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। আর তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহপাক নারীকে মানুষ হিসেবে যে খলীফার মর্যাদা দিয়েছেন সেই দায়িত্ব পালনের জন্য এদেশে মুসলিম নারী সমাজ কাজ করে যাচ্ছে আল্লাহর দ্বীন দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে ছাত্রীসমাজও পিছিয়ে নেই একজন সচেতন মুসলিম নাগরিক হিসেবে ছাত্রী সমাজ এগিয়ে এসেছে রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশে এক অনন্য দৃষ্টান্ত রূপে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার লক্ষ্য ছাত্রী সমাজকে আল কুরআন ও রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী গঠন করে ছাত্রীদেরকে মুসলিম নারী হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে দ্বীন ইসলামের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আর পাওয়া যায় দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ। মূলত ছাত্রীসংস্থা চায় বাংলার ছাত্রীসমাজ আদর্শমুখী হয়ে গড়ে উঠুক। হয়ে উঠুক আল্লাহর নির্দেশ পালনে সদা তৎপর একজন পরিপূর্ণ আদর্শ মুসলিম নারী।

আদর্শ বিবর্জিত ছাত্রীসমাজ যখন দিকভ্রান্ত। মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়, সঠিক দায়িত্ব সম্পর্কে যখন অসচেতন ছাত্রীসমাজ ঠিক তখনই লক্ষ্যহীন তরীতে তীরের সন্ধান দিতে এগিয়ে এসেছে ছাত্রীসংস্থা ছাত্রীদের কাছে। "ইসলামী আদর্শবাহী" পতাকা হাতে আদর্শ মুসলিম নারী গঠনে ছাত্রীসংস্থা বন্ধুর মত পাশে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্যহীন তরীতে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতাশাগ্রস্ত যাত্রীদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। তাই ছাত্রীসংস্থা ছাত্রীদের আদর্শ মুসলিম নারীর জীবন গঠনের অনন্য অঙ্গন। এটি অনন্য অঙ্গন এই জন্য যে-

(১) লক্ষ্য নির্ধারণের দিক নির্দেশনা দেয় ঃ মানুষ হিসেবে একজন ছাত্রীর জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। কেন তাঁকে আল্লাহপাক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন? কি তার দায়িত্ব? এ দায়িত্ব পালন না করলে কি তার পরিণতি? ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার সহযোগিতার মাধ্যমেই সেই বোনটিকে তার সত্যিকার লক্ষ্য নির্ধারণ করার উপলব্ধিকে জাগ্রত করে। ফলে ছাত্রীবোনটির পক্ষে তার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ সহজ হয়ে উঠে এবং সে সহজেই লক্ষ্য নির্ধারণে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(২) মুসলিম নারীর দায়িত্ব কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ ইসলাম প্রিয় ছাত্রীবোনটিকে সঠিক দিক নির্দেশনা এর মাধ্যমে তাকে প্রকৃত মুসলিম নারী হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করে ছাত্রীসংস্থা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সকল আদেশ পালন করার জন্য ছাত্রীবোনটিকে উৎসাহিত করে যাতে করে আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলে উন্নত জীবন যাপন করতে পারে।

(৩) চিন্তার জগতে বিপ্লব সৃষ্টিকারী ঃ সমাজে যাবতীয় কুসংস্কার, অনাদর্শিক মতাদর্শ, সামাজিক রসম-রওয়াজ, রীতিনীতি, শিরক, বিদায়াত ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যা ছাত্রীসমাজকে দিকভ্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত করে তুলছে ঠিক তখনই ছাত্রীসংস্থা একজন ছাত্রীবোনের চিন্তার জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করতে সহযোগিতা করে। সে বোনটি অন্ধকারময় চিন্তা দূর করে মুক্ত চিন্তার অধিকারী হতে পারে এবং ইসলামের সঠিক ধারণা সে গ্রহণ করতে পারে।

(৪) সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রেরণা দেয় ঃ আজকের সমাজে যে নৈতিকতার ধ্বস নামতে শুরু করেছে ছাত্রীসমাজ পাচ্ছে না তার নিরাপত্তা, সমাজের সার্বিক দিকেই নৈতিকতার মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যুবসমাজ নানারকম অপকর্মে লিপ্ত। ছাত্রীরাও কোন কোন ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ছে অপকর্মে। সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে গঠনমূলক বুদ্ধিভিত্তিক কথা বলার প্রেরণা দেয় ছাত্রীসংস্থা ছাত্রীসমাজকে। যাতে করে সেও সমাজের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে কাজ করতে পারে।

(৫) অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নগ্নতার বিপরীতে সুন্দর ও শালীনভাবে জীবন যাপনের পথ দেখায় ঃ বর্তমান ছাত্রীসমাজ যখন নিজেকে অধিক সাজ-সজ্জা করে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে বেহায়াপনা ও নগ্নতাকে পূঁজি করে নিজেকে উত্তর আধুনিকা বানাতে ব্যস্ত। ঠিক, তখনই ছাত্রীসংস্থা তাকে আহবান করছে সুন্দর শালীন জীবন যাপনের দিকে। বন্ধুর মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ছাত্রীসমাজের কাছে মুসলিম নারীর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

(৬) অধিকার সচেতন হওয়ার দিক নির্দেশনা দেয় ঃ পৃথিবী ব্যাপী নারী সমাজ যখন অধিকারহারা, প্রগতির নামে নারী সমাজ অনাদর্শিক মতবাদে নিষ্পেষিত নিপীড়িত, সেই মুহূর্তে নারী সমাজ তথা ছাত্রীসমাজের কাছে ছাত্রীসংস্থা ইসলামী আদর্শের পতাকা হাতে ছাত্রীসমাজকে অধিকার সচেতন হতে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছে।

www.pathagar.com

(৭) শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করে একজন ছাত্রীবোনকে ঃ একটি জাতির উন্নতি তখনই সম্ভব যখন সেই জাতির সমস্ত জনগণই হবেন শিক্ষিত, সচেতন এবং নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত। আর এক্ষেত্রে ছাত্রীসংস্থা প্রেরণা দেয় ছাত্রীসমাজকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সার্বিক জ্ঞান অর্জনের। এই প্রেরণা থেকেই একজন ছাত্রীবোন গড়ে তুলতে পারেন ব্যক্তিগত, সামাজিক পাঠাগার। হয়ে উঠতে পারে নিজেই একজন সু-শিক্ষিত ব্যক্তি।

(৮) আখেরাতের সাফল্যকে প্রাধান্য দিয়েই জীবন গঠনের শিক্ষাদান ঃ ছাত্রীসংস্থা একজন ছাত্রী বোনকে এমন একজন যোগ্য আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। যাতে করে সেই বোনটি হতে পারেন একজন নিবেদিত প্রাণ খাঁটি মুসলমান। যার গোটা জিন্দেগী গড়ে উঠবে আখেরাতের সাফল্যই চূড়ান্ত সাফল্যের প্রেরণার উৎস হিসেবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হবে তার জীবনের একমাত্র কাম্য। এই মূল্যবোধ থেকেই তার জীবনকে সে গঠন করবে। সে হয়ে উঠবে রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ অনুসারী একজন আদর্শ মুসলিম নারী।

মূলত ছাত্রীসংস্থা চায় আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিতে আল্লাহর রাজ প্রতিষ্ঠিত হোক। আর এই জন্য প্রয়োজন মানুষের সহযোগিতা যেহেতু ছাত্রীসংস্থা ছাত্রীদের মাঝে কাজ করে আসছে। সেহেতু ছাত্রীসংস্থার মনের একান্ত আকুতি বাংলার প্রতিটি ছাত্রীবোন ইসলামের সু-শীতল ছায়াতলে এসে আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে গড়ে উঠুক। এটা যে শুধু ছাত্রীসংস্থারই প্রাণের আকুতি তা নয়। সাধারণ ছাত্রী সমাজও মনে করে ইসলামী মতাদর্শই গড়ে তুলতে পারে আদর্শ নারী। এ ব্যাপারে আমি একটি জরীপ কাজ চালিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল এবং বুয়েটের ছাত্রীদের মাঝে। তাদের কাছে আমার প্রশ্ন ছিল, "নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কোন মতাদর্শকে আপনি যুগোপযোগী মনে করেন?" ৯৮% ছাত্রীবোনই জবাব দিয়েছে ইসলামী মতাদর্শকেই যুগোপযোগী মনে করেন। বাকী ২% অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানুষ হিসেবে নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এই মতাদর্শকে তারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এই জরীপ থেকে এটা অনুমান করা যায় যে সাধারণ ছাত্রীসমাজেরও প্রাণের দাবি রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে নারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে, তারা ঘুনে ধরা এই সমাজে এই মতাদর্শ বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের দাবি পূরণের জন্য ছাত্রীসংস্থা বোনের মত সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

www.pathagar.com

স্মৃতিপটে

আমার ক্যাম্পাসে
আমার পদচারণা

www.pathagar.com

নাসিম হামিদা বানু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন- হেঁটে এসেছি আমি ভার্সিটির কলাভবন, রোকেয়া হলের সবুজ চত্বর, কলাভবনের দোতলা, রোকেয়া হল, টি,এস,সি, লাইব্রেরি, ভার্সিটি সংলগ্ন ভূতপূর্ব পাবলিক লাইব্রেরি। কলাভবনের দোতলায় বাংলা বিভাগের সামনে একাকী দাঁড়িয়ে আছি, অথবা অপেক্ষা করছি– ওয়াকিল আহমদ স্যার, কখনো আহ্মদ কবীর স্যার অথবা কখনো ফজলুল হক স্যার বা সাঈদ-উর রহমান স্যারের টিউটোরিয়াল ক্লাসের অপেক্ষায়। এই তো সেদিন ...

হ্যাঁ এই সেদিনগুলো ছিলো... উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে উনআশি পর্যন্ত। না, প্রায় দু'যুগ পার হয়ে গেছে সেদিনগুলো। পঁচিশ বছর আগে ছেড়ে এসেছি ভার্সিটি জীবন! কিন্তু এই স্বল্প সময় আমার জীবনে পরিবর্তন এনে দেয় অনেক অনেক বেশি।

ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েই ছাত্রলীগের কর্মী সমর্থক হিসেবে ডাকসুর নির্বাচনে ভোট দিয়েছি– ভিন্ন আদর্শে। আসলে সঠিক আদর্শ বলতে কি বুঝায় তাই বুঝতাম না। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে অর্জন– নানান রাজনৈতিক পট পরিবর্তন– আদর্শিক জ্ঞান অর্জন-- আব্বা আম্মার দেয়া সঠিক পথনির্দেশনা– ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসরণ– মুহ্তারামা সাইয়্যেদা মুনীরা খালাম্মা, মুহতারামা শামসুন্নাহার আপার আহ্বান– আয়েশার সাথে পরিচয়– ইডেন হোস্টেলে যাওয়া– নাজিরা বাজার বাসায় সবাই একত্রিত হওয়া– ছাত্রীসংস্থা গঠনের জন্য আহ্বায়িকা কমিটি গঠিত হওয়া– ছাত্রীসংস্থার নামকরণ সবার মতামতের ভিত্তিতে– যার যার ক্ষেত্রে কাজ করা– ইত্যাদি।

ভার্সিটিতে আমাকে কাজ শুরু করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? আসলে আমি নিজেকে এই কাজ শুরু করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে নিজকে মনে মনে তৈরি করতে শুরু করলাম।

শ্রদ্ধেয়া শামসুন্নাহার আপার কাছ থেকে যখন ভার্সিটিতেও এই ধরনের ইসলামী আলোচনা আমরা করতে পারি বলে সাহস পেলাম– ছাত্রীসংস্থা গঠনের পূর্বেই মহিলা মজলিশের মাধ্যমে, তখন আমার অনার্স পরীক্ষার পর আমি চিন্তা করলাম ইসলামের পথেই যদি চলতে হয়, কাজ করতে হয়, তাহলে তো নিজেকে তার উপযুক্ত করেই সবার সামনে দাঁড় করাতে হবে। আর আব্বা ও আমাকে চাপ দিচ্ছিলেন বোরখা পরার জন্য। এই সুযোগ! এখনই বোরখা পরা শুরু করার। এক লম্বা ছুটির পর অনেকদিনের অদেখার পর পরিচিতির একটু দূরত্বও বেড়ে যায়, তখন এই পরিবর্তন অনেকের মধ্যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন অঙ্কিত হলেও আমার কাছে থেকে যাবে 'হ্যাঁ' বোধক জবাব।

অনার্সের পরীক্ষার কিছুদিন পরই পোশাকে বাড়তি সৌন্দর্যের ডিজাইন (বোরখা) অঙ্গে ধারণ করি- অনেক কাছের মানুষদের (ভাই, বোন ক্লাসমেট বান্ধবী) বিরোধিতার ঝড়কে ঠেলে ফেলে। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম সুরুচিপূর্ণ পোশাকে নিজেকে আবৃত করে, সহজ কথায় বলা যায় স্মার্ট হয়ে গেলাম। কারণ আমার চলাফেরার জড়তা দূর হয়ে গেল। এবার ইসলামের কথা বলা,

www.pathagar.com

কাজ করার পথে আর কোন বাধাই রইল না। কেমন যেন একটা স্বচ্ছন্দ ও ফুরফুরে বাতাস বয়ে গেল মনের আঙিনায়।

ভার্সিটিতে মাস্টার্সের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। ইডেন থেকে অনেক মেয়েরা তখন 'বাংলায়' মাস্টার্স ক্লাস করতে ভার্সিটিতে ভর্তি হতো, কারণ তখনো সেখানে মাস্টার্সের ক্লাস শুরু হয়নি। ইডেনের মেয়ে সম্ভবত 'পলি' নাম; সে তখনো ইডেন হোস্টেলে যাতায়াত করতো। সে আমাকে দুটি চিঠি দেয়- চিঠির একটিতে শামসুন্নাহার আপার লেখা আয়েশা সম্পর্কে, ওর সাথে আমার পরিচয় করে নেয়ার আহ্বান, আরেকটি আয়েশার লেখা- আমাকে। সে শামসুন্নাহার আপার কাছে আমার কথা শুনেছে এবং আমি যে ভার্সিটিতে কাজ করতে আগ্রহী জেনে খুশি হয়েছে। পরবর্তীতে আরেকদিন আরেকটি চিঠিতে ইডেন হোস্টেলে যাওয়ার আহ্বান এবং সেখান থেকে নাজিরা বাজার শামসুন্নাহার আপার বাসায় যাবে বলে জানিয়েছে। আমিও নির্দিষ্ট দিনে, সেখানে হাজির হয়েছি সবার সাথে। এখান থেকেই যাত্রা শুরু হলো ছাত্রীদের মহিলা মজলিশ থেকে আলাদা হয়ে ছাত্রীদের একক সংগঠন গড়ে তোলার।

হ্যাঁ, এরপর ছাত্রীসংস্থার আহ্বায়িকা কমিটি গঠন করা হলো। কাজের পরিধি ইডেন হোস্টেলে আরো বৃদ্ধি পেল। ভার্সিটিতেও কাজ শুরু করতে হবে। আমিও চিন্তিত ন্যূনতম জ্ঞান নিয়ে, প্রতিকূল পরিবেশে কাকে কি বলবো? কারণ যখন কাজ শুরুই করিনি তখনও মাঝে মাঝে সকাল সাড়ে আটটার ক্লাস ধরার জন্য যখন বোরখা পরে খুব দ্রুত বিভিন্ন করিডোর পার হয়ে দুহাজার এক নম্বর ক্লাসরুমের দিকে হাঁটতাম- পেছন থেকে মন্তব্য শুনে বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতো- ধর, ধর রাজাকার। একাকী নীরব করিডোর পার হতে এক সেকেন্ডকে মনে হতো ১০ মিনিটের পথ। যাহোক আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার ওপর ভরসা করে কাজ শুরু করার চিন্তা করি।

তখন আমার সবচেয়ে নিকটতম বান্ধবী, নিকটতম প্রতিবেশী সশিওলজি বিভাগের 'বেবী'কে (আজীজুন্নেসা) আমার ক্লাসমেট ডলি ও নাজমাকে বললাম নতুন ছাত্রী সংগঠনের কথা, নতুন কাজ ইসলামী আদর্শ, আন্দোলনের সম্পর্কে। 'বেবী'তো আমার বোরখা পরা দেখে হেসেই কুটি কুটি। ওর হাসি দেখলে আমার রাগ হতো ভীষণ, কিন্তু হজম করতাম। এমন কি এই নতুন সংগঠনের বোনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, একে যেন একটু বুঝতে পারে- এরজন্য নাজিরা বাজার বাসায় আমাদের বৈঠকেও নিয়ে গিয়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি। হয়তো মনে মনে ভাবলো- এ আবার নতুন কোন্ পাগলামো। তবে ডলি ও নাজমা ভাল বললেও তারা পরীক্ষার চিন্তায় বিভোর। নাজমা বললো- "এখন ফাইনাল পরীক্ষা সামনে, পরীক্ষা শেষ করে করো।, তোমার পড়ালেখার ক্ষতি হবে। নাজমার (ওর ছোট বোন 'জলি' পরবর্তীতে রোকেয়া হল ইউনিটের কর্মী ছিলো) কথার কোন উত্তর দিলাম না। সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল।

আমার কোন সহযোগী বা সাথী পেলাম না। তবে 'ডলি'কে নিয়ে মাঝে মাঝে কাজ করতে পেরেছি। আয়েশা-আমি মিলে একটা দিন ঠিক করলাম- রোকেয়া হলে TV. রুমে তাফসীর শুরু করবো। আয়শা ইডেন থেকে এসে তাফসীর করবে। এখন দাওয়াত দিতে হবে। কাকে দাওয়াত দেব? কে আসবে কে আসবে না- ভেবে অস্থির হচ্ছি। কিভাবে দাওয়াত দিব? একা একা রীতিমতো হিম্‌শিম খাচ্ছি। ডলিকে সাথে নিয়ে (আর কে ছিল এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না) একটি মেয়ের কাছে গেলাম। মেয়েটি সব সময় মাথায় একটা স্কার্ফ পরে থাকে। তাকে টার্গেট করলাম দাওয়াতের। রোকেয়া হলে তাকে পেয়ে বললাম "আজকে T.V. রুমে একটা (ইসলামী আলোচনা অথবা) তাফসীর হবে, এসো। সে হাসতে হাসতে আশঙ্কার কথা জিজ্ঞেস করলো- রাজনীতি নাতো? রাজনীতির কোন বিষয় হলে কিন্তু যাবো না।"

আমি আশ্বাস দিলাম- না রাজনীতি না, কোরআনের তাফসীর হবে, আগে এসেই দেখো, শোনো, তারপর ভাল লাগে কি না দেখো। শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী করাতে পেরেছি- সে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী। পরে তার পরিচয় বলছি।

এর পরের টার্গেট 'বোরখা' পরা খুব স্লিম মিষ্টি ও সুন্দরী একটা মেয়ে। মেয়েটির বোরখার রং আর ডিজাইন আমার চোখে এখনও ছবির মতো ভেসে ওঠে। ক্রীম রং এর সিল্কের বোরখা, উপরের গোলাকার অংশের বর্ডারে ঝুলানো ছিল সেই কাপড়েরই বলের মতো কতগুলো গোল ঝুলুনী; কেন যেন এই বোরখাটাতে ওকে খুব স্মার্ট লাগতো এবং মানাতোও। আর আমাকে করতো আকৃষ্ট। সে রোকেয়া হলের এক্স্টেনশনেই থাকতো। ওকে বললাম- 'তোমাকে একটু TV. রুমে

www.pathagar.com

আসতে হবে, এখানে একটা তাফসীর হবে। ওরও চোখে মুখে নানা প্রশ্ন। কিন্তু সে সহজেই রাজী হলো। আরো কয়েকজনকে বললাম।

হ্যাঁ, নির্দিষ্ট দিনে রোকেয়া হলের TV. রুমে আয়েশা আসলো ওর সাদা বোরখা পরে। আমিও আরেক দফা সেই নির্দিষ্ট টার্গেটের দাওয়াত দিয়ে থাকি। ওরা কয়েকজন এলো। আয়েশা সূরা 'ফাতিহা'র দারস্ পেশ করলো। আমার মনো হলো- যেন সবাই নতুন কিছু শুনছে। আর শুনছে খুব আগ্রহ নিয়ে। ওদের চেহারা দেখে মনে হলো- এই প্রথম যেন ওরা এ ধরনের আলোচনা শুনছে।

পরবর্তীতে এই তাফসীর অনিয়মিত হলেও চলতে লাগলো আমার উপরোক্ত টার্গেটদ্বয় নিয়মিত আসতে শুরু করলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া যে, সেই ক্রীম কালারের বোরখা পরা বোন্‌টি আমার পরবর্তীতে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার নিবেদিত প্রাণকর্মী ছিলেন এবং বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরীর একজন রুকন ও মহিলা বিভাগের মহানগরী অফিস বিভাগের একজন সদস্যা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি হলেন মুহ্‌তারামা আনোয়ারা বেগম। আর স্কার্ফ পরিহিতা যিনি তিনি ইংরেজি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স পাস করেন- বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থার একজন বিজ্ঞ কর্মী ছিলেন। পরবর্তীতে বিসিএস ক্যাডার ও ম্যাজিস্ট্রেট হন, বর্তমানে ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার হিসাবে কাজ করছেন।

'ছাত্রী সংস্থা' গঠিত হওয়ার পর 'সাধারণ সভা'র সিদ্ধান্ত নেয়া হয়- ১৯৭৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অথবা আজিমপুর কমিউনিটি সেন্টারে মনে পড়ছে না। যা হোক এবারও ভার্সিটিতে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। গ্রুপ করা হলো আমি আর উম্মে সালমা মুন্নীকে (হাফেজা আসমা খাতুনের ২য় কন্যা) এক গ্রুপে দেয়া হয়। আমাদের দাওয়াতী এলাকা হলো ঢাকা ভার্সিটির রোকেয়া হল, আজীমপুর গালর্স স্কুল। বদরুন্নেসা কলেজ, আরো বেশ কয়েকটি স্কুল কলেজ।

শুরু করলাম- ভার্সিটির রোকেয়া হল থেকেই। মুন্নী এলো রোকেয়া হলে আমার কাছে। আমার সহপাঠিরা কয়েকজন দেখা হতেই বললো- 'তোর বোন তাইনা? দেখলেই বোঝা যায়। কি সুন্দর একই রকম সাদা বোরখা পরেছিস।"

আমরা শুধু মুচকি হাসতাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া তিনি আমাদের হৃদয়গুলো এমনভাবে জুড়ে দিয়েছিলেন- আমরা সহোদর বোনের চাইতেও বেশী আপন ছিলাম- আল্লাহর ভাষায়- "শীশা ঢালা প্রাচীর।" আমার সবচাইতে ভালো লাগতো এইজন্য যে, 'মুন্নীর মতো অমন সুন্দর মনের একটি বোনের উপস্থিতিই দাওয়াতের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁর মিষ্টি আহ্বানের দু'এক কথাতেই কাজ হতো। আল্লাহ পাক তাঁর এই কাজের বিনিময়ে তাঁকে হায়াতে তাইয়্যেবাহ্ দান করুন, আমীন।

যা হোক, আমরা রোকেয়া হলের মেইন বিল্ডিং, এক্সটেনশনের বিভিন্ন রুমে গিয়ে দাওয়াত দিয়েছি। আমাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছেন অনেকে। শামসুন্নাহার হলেও দাওয়াত দিয়েছি অনেককে। সেই দাওয়াতের ফলে ভার্সিটিতে জনশক্তি মোটামুটি বৃদ্ধি পাওয়ায় পরবর্তীতে কাছাকাছি সময়ে ইউনিট গঠিত হতে পেরেছিল। এমন কি আমরা ভার্সিটির ছাত্রীজীবন শেষ করে বের হবার পরই সেখানে এসেছিলেন মুহতারামা ফজিলা তাহের (মিতু)। মিতুর সময় অনেক অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে জনশক্তি, ইউনিটগুলোর মান বৃদ্ধি পেয়েছে এমন কি ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রীসংস্থার প্যানেলও ছিলো।

তবে আমার জন্য দুঃখের বিষয় পরীক্ষার পরবর্তী সময়ে আমি আর বেশি দিন ছাত্রী সংস্থায় অবস্থান করতে পারিনি। কারণ উনআশির শুরুতেই বিয়ে হয়ে যাওয়া। কয়েক মাসের মধ্যে সৌদি আরবে প্রবাসযাত্রা আমাকে আর বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থায় কাজের সুযোগ দিলো না। বলা যায়, মাত্র একটি বছর। আমার জীবনের উৎকৃষ্ট সময় এই ছাত্রীসংস্থার জন্মলগ্ন থেকে ভার্সিটির শিক্ষা সমাপ্তি শেষে এখান থেকে প্রস্থান পর্যন্ত সময়টা কেটেছে। পরবর্তী বছর ফজিলা তাহের মিতু এসেছে রোকেয়া হলে। ফলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো ছাত্রী সংস্থার বোনদের পদচারণায় রোকেয়া হলের ইউনিট। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের। আল্লাহ পাক কবুল করুন এই সংগঠন এবং এই সংগঠনের বোনদের, আমীন। #

www.pathagar.com

মারজিয়া বেগম

ইডেন কলেজ

যে শিক্ষাঙ্গন থেকে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রথম কার্যক্রম শুরু হয় তা হলো আজকের ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। পঁচিশ বছর আগের ইডেন কলেজের পরিবেশ এবং আজকের ইডেন কলেজের পরিবেশের মধ্যে রয়েছে অনেক অনেক তফাৎ। শুধু ইডেন কলেজ কেন দেশের অধিকাংশ বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর আগের পরিবেশ নেই। হত্যা, সন্ত্রাস, হল দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অস্ত্রের ঝনঝনানী আর শিক্ষকদের অপরাজনীতি পুরো ছাত্র সমাজকে করছে কলুষিত। মেধাশূন্য অস্ত্রনির্ভর মাসলম্যানদের কাছে ছাত্ররাজনীতি আজ জিম্মী। আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা অনেকাংশে এক্ষেত্রে দায়ী। যে প্রয়োজনকে সামনে রেখে ২৫ বছর আগে ছাত্রী অঙ্গনে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার জন্ম হয়েছিল– সেই প্রয়োজন পূরণের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজারো শুকরিয়া জানাই সেই কাফেলার সাথী হিসাবে আমাকে কাজ করার সুযোগ দানের জন্য। ১৯৭৭ সাল থেকে নিয়ে ১৯৮১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ছিল আমার কর্মময় জীবন। এরপর প্রয়োজনের তাকিদেই শিক্ষাজীবন শেষ করার আগেই বিদেশ পাড়ি। কিন্তু এ সময়ে ছাত্রীসংস্থা এবং শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে যা শিখেছি তার গভীরতা অনেক অনেক বেশি যা আজও অনুভব করি।

১৯৭৭ সালের শেষের দিকের ঘটনা। দুই একদিন হলো পুরাতন হোস্টেলে সিট পেয়ে উঠে এসেছি। ৩০৫ নাম্বার রুমে আমরা একই ডিপার্টমেন্টের অর্থাৎ রসায়নের চার জন রুমমেট অবস্থান করছি। আমাদের রুমের পাশেই অল্প একটু দূরেই কমনরুম। বারান্দায় দাঁড়ানো অবস্থায় দুপুর তিনটার দিকে দেখতে পেলাম নীল পাড়ের সাদা শাড়ি পরিহিতা একজনের সাথে বেশ কিছু ছাত্রী কমনরুমে জমায়েত হচ্ছে। তখনকার সময়ে আমাদের কলেজ ড্রেস ছিল নীল পাড়ের সাদা শাড়ী বা সাদা সালোয়ার কামিজ। কৌতূহলবশতঃ আমিও সেখানে এসে বসলাম। আকর্ষণীয় চেহারার আর একজনকে সেখানে বসা দেখতে পেলাম। তিনি কোরআন থেকে আলোচনা করলেন। শুনে মনে হলো এ যেন আমার মনের কথাই। এ জিনিসই আমি খুঁজে ফিরছি। আলোচনা শেষে উনাদের সাথে প্রাথমিক পরিচয় লাভ করি। এ পরিচয়ই পরবর্তীতে আরো সুদৃঢ় হয়। একই মনজিলে আমরা যাত্রা শুরু করি এবং এখনও দ্বীনি আন্দোলনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে একসাথে কাজ করে যাচ্ছি।

সাদা শাড়ী পরা বোনটি আর কেহ নয়– তিনি হলেন খন্দোকার আয়েশা খাতুন। পরবর্তীতে যিনি হলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রথম সভানেত্রী। আর তার পাশে যিনি বসেছিলেন এবং আলোচনা করেছেন তিনি হলেন মোহতারামা শামছুন্নাহার। আয়েশা আপা একদিন নূরুন্নিসা সিদ্দিকার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সে তখন মিরপুর থেকে এসে ক্লাস করতো। নতুন হোস্টেলের ১০ নাম্বার রুম ছিল আয়েশা আপার রুম। তার পাশেই থাকতো ফজিলা বেগম মিতু আপা। একই সূত্রে আরো অনেকের সাথে পরিচয় হয়। আয়েশা আপা একদিন আমাদের সাইয়েদা মুনিরা খালাম্মার বাসায় নিয়ে

www.pathagar.com

যান। সেখানে মহিলা মজলিশের প্রোগ্রাম হতো। ছাত্রী অঙ্গনে কাজ শুরুর পূর্বে সেখানে আমরা যেতাম এবং তার সদস্যাও ছিলাম। মুনিরা খালাম্মার আলোচনা এবং হৃদয় নিংড়ানো মুনাজাত মনকে ভরে দিত। পরবর্তীতে ছাত্রীদের নিয়ে আলাদাভাবে নিজামী আপা নাজিরা বাজারে তার বাসায় বসতেন। অবশেষে ১২ই জুলাই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ছাত্রীসংস্থা গঠন করার। সেই মোতাবেক ১৫ই জুলাই ১৯৭৮ সালে ঢাকা ভার্সিটির ক্যাফেটরিয়ায় বসে আলোচনা করে খন্দোকার আয়েশা খাতুনকে আহ্বায়িকা এবং নাসিম হামিদা বানুকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে এগার সদস্যা বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

আয়েশা আপার রুমটা তখন আমাদের অস্থায়ী অফিস। নূরুন্নিসাও নতুন হোস্টেলে চলে এসেছে। নতুন হোস্টেলের সুপার ছিলেন অধ্যাপিকা চেমন আরা (বাংলা বিভাগের প্রধান)। তাঁর কাছে আমরা কুরআন শিখার জন্য একজন মেহমান আনার অনুমতি আদায় করে নিলাম। প্রতি সপ্তাহে নিজামী আপা আসতে লাগলেন। নতুন হোস্টেলের ডাইনিং হলে আমাদের সাধারণ সভা হতো। প্রথম প্রথম ২/১ দিন চেমন আপা ছিলেন পরবর্তীতে আর তেমন থাকতেন না। কাজের সুবিধার জন্য হোস্টেল থেকে বের হওয়ার জন্য পারমিশনের প্রয়োজন হতো। সাংগঠনিক কাজের জন্য বের হতে হতো তাই নিজামী আপাকে আমার লোকাল গার্জিয়ান বানাই। সমস্যা মিটে যায়।

হোস্টেলে নতুন কোন মুখ দেখলে পরিচিত হতে চেষ্টা করতাম। দক্ষিণ পার্শ্বের ৩য় ব্লকের তৃতীয় তলার রুমগুলোতে সবেমাত্র নতুন বোনেরা এসেছে। এই অবস্থায় তাদের খোঁজখবর নিই। আপন হওয়ার চেষ্টা করি। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে নতুন হোস্টেলের সাধারণ সভায় নিয়ে যেতে থাকি। এদের মধ্যে হাবিবা চৌধুরী সুইট (প্রাক্তন সভানেত্রী) নাসিমা আক্তার ডলি, গুল-এ আনার (বর্তমানে ডাক্তার) নূর বেগম (বর্তমানে ডাক্তার) এবং লাভলী ছিল। এরা সবাই মেধাবী এবং বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিল। ছাত্রীসংস্থার বোনদের বিশেষ করে ইডেন কেন্দ্রিক যারা কাজ করতো তাদের বেশিরভাগ সবাই সাদা বড় চাদর জাতীয় ওড়না ব্যবহার করত। এরা যখন ডাইনিং হলে খেতে যেত একসাথে কলেজে গেলেও একসাথে। সহজেই চেনা যেত। এরা যখন কর্মী হওয়ার পথে তখন একটা সমস্যা এসে হাজির হলো। হঠাৎ করে দেখি তাবলিগের একজন মুরুব্বী (যাকে "আম্মা" বলে ডাকা হয়) পুরাতন হোস্টেলের T.V. রুমে বুধবার করে বসতে শুরু করছেন এবং তার প্রোগ্রামে সস্তা সওয়াবের আশায় এই কচি বোনগুলোও আগ্রহের সাথে বসে যায়। আমি নিজেও একদিন তাদের সাথে সেই মাহফিলে বসলাম। ওদের আলোচনা শুনার পর এদেরকে সঠিক লাইনে নিয়ে আসার জন্য সামষ্টিক পাঠ শুরু করে দিলাম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাড়িয়ে দিলাম, সামষ্টিক ভোজের ব্যবস্থা করলাম। সেই সাথে এমনসব বই তাদের পড়তে দিতাম যা তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আলহামদুলিল্লাহ। ফল পেয়েছি।

আমাদের কাজ দেখে হল কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে উঠল। সতর্ক দৃষ্টি রাখা শুরু করলেন। তাফসীর করতে নিজামী আপার আসা বন্ধ হয়ে গেল। ততদিনে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার মত লোক তৈরি হয়ে গেছে। শুধু দুই হোস্টেলে নয় কলেজেও আমাদের কাজ চালু হয়েছে। কলেজে যারা দায়িত্ব পালন করতেন তারা হলেন শিরিন, ডেইজী, নাসিমা আক্তার ডলি, রোকেয়া। পুরাতন হোস্টেলের পাঠাগার ছিল আমার রুমে। পাঠাগারের দায়িত্বে ছিল আমার রুমমেট তাসলিমার ওপর। নতুন হোস্টেলের পাঠাগারের দায়িত্ব ছিল সোহানার ওপর। সেটা আয়েশা আপার রুমেই ছিল। সোহানাও ছিল আয়েশাপার রুমমেট। দুই হোস্টেলের এবং কলেজের সার্বিক কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য হাবিবা চৌধুরী সুইট এর কথা চিন্তা করা হয়। লাভলি ছিল কোষাধ্যক্ষার দায়িত্বে। হোস্টেলে T.S. করাটা কষ্টসাধ্য ছিল তবে আয়েশা আপার রুমে নৈশ ইবাদত হত। দাওয়াতী সপ্তাহ উপলক্ষে রাত জেগে পোস্টার লিখা, দেয়ালিকা লিখা, পোস্টারিং করা এক মজার ব্যাপার। হয় আয়েশা আপার ১০ নাম্বার রুমে তা না হলে আমার রুমে বসে লেখার কাজ চলত।

বেশিদিন এ আনন্দ ধরে রাখা যায়নি। আয়েশা আপার বিয়ের পর কিছুদিনের মধ্যে নতুন ঠিকানায় চলে যান। হোস্টেলে থাকাবস্থায় প্রত্যেক দিন নূরুন্নিসা আয়েশা আপার সাথে সাক্ষাত হতই (যদি ছুটিতে বাড়িতে যেতাম)। বিরহ বেদনা বেশি দিন থাকেনি। আমাদেরও নতুন অফিস তার বিল্ডিং এ চলে আসে। নিচের তলায় অফিস। ১৭৪ নয়া পল্টন, আজিমপুর যেতে ইডেন থেকে মাত্র ১ টাকা রিক্সা ভাড়া লাগত। যখনই সুযোগ পেতাম রিক্সা বা পায়ে হেঁটে অফিসের কাজে গিয়ে হাজির হতাম। ১৭ই আগস্ট ১৯৭৯ সালে রোযার দিনে সুধীসমাবেশের মাধ্যমে আমাদের নতুন অফিসের উদ্বোধনী হয়।

www.pathagar.com

৭৮-৭৯ সেশনে আমার দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক হিসেবে। ৭৯-৮০ সেশনে অতিরিক্ত আরো একটি দায়িত্ব এসে পড়ে সাংগঠনিক সম্পাদিকা হিসাবে, কাজের চাপ সেই সাথে ব্যস্ততা। ঢাকার অধিকাংশ স্কুল-কলেজে দাওয়াত পৌঁছানো হয়ে গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আজীমপুর স্কুল, অগ্রণী স্কুল, লালমাটিয়া স্কুল ও কলেজ, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল ও কলেজ, বদরুন্নেছা, তিতুমীর কলেজ, তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল, হোমইকোনোমিক্স কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, শামছুন নাহার হল, রায়ের বাজার স্কুল, হলিক্রস। ইউনিট খোলা হয়েছে- তেজকুনীপাড়ায়, তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল স্কুলে, লালমাটিয়া, মগবাজারে, রোকেয়া হলে। ছাত্রীসংস্থার প্রথম সম্মেলনকে সামনে রেখে বাণী সংগ্রহ, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে ব্যস্ততায় কেটে যাচ্ছে। ইডেনে আগের মত সময় দিতে পারছি না। যথাসময়ে আমাদের প্রথম সম্মেলন এ্যালিফ্যান্ট রোডে 'আয়েশা একাডেমীতে' হয়ে গেল। সম্মেলন শেষ হবার অল্প কয়েক মাস পরেই ছাত্রীসংসদ নির্বাচন। কলেজে আসার পর আর কোন দলের তৎপরতা আমাদের চোখে পড়েনি। ছাত্রীসংসদও ছিল বন্ধ। যাই হোক সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইডেন কলেজে ছাত্রীসংসদ নির্বাচনের নাম ছিল মারজিয়া-রুনী পরিষদ। আমাকে ভিপি এবং হাফেজা আসমা খালাম্মার মেয়ে রুনীকে জিএস পদে দিয়ে পুরো প্যানেলের নাম ঘোষণা করা হলো। নূরুন্নিসা, আয়েশা আপা দুজনেই পরীক্ষার্থী থাকায় প্রার্থী হতে পারেন নাই। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও প্রার্থী দিয়েছে, BNP পক্ষ থেকেও (সরকারী দল) প্রার্থী দিয়েছে। স্বতন্ত্র কিছু প্রার্থীও আছে। তাদের কেউই তেমন পরিচিত নয়। নির্বাচনী কোন উচ্ছৃঙ্খলতা বা হিংস্রতা তখন ছিল না। যার যার অবস্থান থেকে কাজ করে যাচ্ছিল। একদল আরেক দলের সাথে দেখা হলে হাত মিলাচ্ছে কুশল বিনিময় হচ্ছে- দোয়া নিচ্ছে। বাইরে থেকে ফেরদৌস আরা বকুল, কামরুন্নাহার মাকসুদা, নাহার এবং ঢাকা ভার্সিটি থেকে বোনেরা এবং আমাদের ভায়েরা বিশেষভাবে আয়েশা আপার দুই দেবর জামাল, কামাল, আয়েশা আপার বোনের ছেলে মিলন, আমার ভায়ের ছেলে সাজেদ নির্বাচনী কাজে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিল। বকুল তো শ্লোগানে শ্লোগানে পরিবেশ মুখরিত করে রাখতো। আমাদের জনপ্রিয়তায় ক্ষমতাসীন দল ভয় পেয়ে গেল। সমঝোতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আমাদের কাজকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ষড়যন্ত্রের পথ ধরল। আমাদের প্যানেল পরিচিতি অনুষ্ঠানের সময় ছাত্রীদের জন্য গ্যালারীতে ফিল্ম শো'র ব্যবস্থা করে। ফলে কলেজ অডিটরিয়াম (যেখানে প্যানেল পরিচিতি সভা হচ্ছিল) ফাঁকা হয়ে যায়। আমাদের তখন কি অসহায় অবস্থা, কর্তৃপক্ষের সহায়তা পাইনি। যদিও অধিকাংশ ম্যাডাম আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সেই সময় কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন বেগম আবেদা হাফিজ (মন্ত্রী মিজা গোলাম হাফিজের স্ত্রী)। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী এসে কলেজের জন্য এবং ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধার জন্য নানা লোভনীয় টোপ দিয়ে যান। ফল যা হবার তাই হলো- বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আমাদের প্যানেল নির্বাচিত হতে পারেনি। নির্বাচনের দিনটি ছিল ১৬ই মে ১৯৮০ সাল।

বোনদের সেকি কান্না। মন খারাপ হলেও আমরা ভেঙ্গে পড়িনি। তাদের সান্ত্বনা দিতে এবং সবার সাথে হাত মিলাতেই পরদিন দুপুর হয়ে গেল। দুপুরের পরেই ভাই-ভাবী আসলেন আমাকে নিয়ে যেতে। সেই সাথে হল সুপার এবং আমাদের বোনদের বিয়ের দাওয়াত দিলেন। আগামীকাল অর্থাৎ ১৮ই মে বিয়ে।

শ্লোগান দিয়ে দিয়ে গলা বসে গেছে। কথাও বলতে পারি না। চেহারা সুরতের হাল দেখে আত্মীয় স্বজন তো পেরেশান। মুরুব্বীদের বকাঝকা, আব্বার অসুস্থতা (সেই সময় আব্বা অসুস্থ ছিলেন) সবকিছু মিলে আমার অবস্থা বলার মত নয়। যাই হোক বর আন্দোলনের এবং ডাক্তার হওয়াতে মানসম্মান বেঁচে যায়। বোনেরা টকটকে লাল রংএর ব্যালট পেপার (আমাদের ব্যালট পেপারের নাম্বার ছিল-৩) দিয়ে বরের জন্য মুকুট এবং মালা বানিয়ে নিয়ে এসেছিল। নাহার ছিল খুব দুষ্ট। সে তো বলেই বসলো তোমার-আমার পরিষদ "মারজিয়া-ফয়েজ পরিষদ"-। আর যায় কোথায় বোনেরা সবাই এই শ্লোগান দিয়ে নির্বাচনে পরাজয়ের দুঃখ ভুলার চেষ্টা করল।

সংগঠনের বোনেরা বুঝতে পারছে আমি আর বেশি দিন তাদের মাঝে থাকছি না। ইডেনে নেতৃত্ব দেবার মত তখনও কেউ তৈরি হয়নি। আয়েশা আপার প্রশ্ন কাকে রেখে যাচ্ছ? এর জবাব আমার জানা ছিল না। তবে আশা ছিল আল্লাহ কাউকে না কাউকে তার কাজের জন্য বাছাই করে নেবেন। আমার এ আশা ব্যর্থ হয়নি। আজো ইডেনে ছাত্রীসংস্থার দীপ্ত পদচারণা তার প্রমাণ বহন করে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের মধ্যে ছাত্রীসংস্থার প্রথম তিন সভানেত্রী তো ইডেন কলেজ থেকেই এসেছে। #

www.pathagar.com

ডা: শামসুন্নাহার লাকী

ঢাকা মেডিকেল কলেজ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। বাংলাদেশের ছোট্ট শ্যামল বুকে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, স্বকীয়তায় দেদীপ্যমান। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে যার যাত্রা হয়েছিল শুরু, আজ তার বিস্তৃতি বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তরে। আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি প্রথম সেই এগারজনকে যারা তারুণ্যের অদম্য সাহসিকতায় এবং অবিচল ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে বাংলাদেশের বুকে আদর্শিক চেতনার আলোর মশালটিকে জ্বালিয়ে দেন, বাতিলের ফুৎকারে মশালটি নিভে যাবার ভয় যাদেরকে শংকিত করেনি। একে একে যোগ দিয়ে চলেছে সে আলোর মিছিলে, বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে সেইসব ছাত্রী বোনেরা-জান্নাতই যাদের একমাত্র কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা। এক সময়ে আমিও এ মিছিলে শামিল হই। বহু বছর আগের কথা। ১৯৭৯ সাল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম। ফেব্রুয়ারিতে ক্লাস শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়ের বাসা থেকে হোস্টেলে উঠলাম। হোস্টেলে আসবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমার আঠার বছর পূর্ণ হয়।

আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আমার আগে ও পরে অনেকেই হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র আমিই ডাক্তারী পড়তে আসি। আমার মা ও আব্বার অসংখ্য ব্যাপারে অমিল থাকলেও এই ব্যাপারটাতে দুজনেরই একটাই কথা- আমাকে ডাক্তার হতে হবে। তাদের দু'জনের মিলিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে যাচ্ছি। এ এক অনাবিল প্রশান্তি। ১৮তম জন্মদিনটা পার করছি মানে, আমি এখন আর ছোটটি নই। রীতিমত একজন প্রাপ্তবয়স্ক বাংলাদেশী নাগরিক। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি, যার সাথে যোগ হলো নিজের ওপর গভীর আস্থা ও প্রচণ্ড সাহস। এরই মাঝে একদিন সকালে আমি আমার রুমে একা বসে আছি।

হঠাৎ আমার রুমে এক মহিলা এলেন, আমি তাকে চিনি না- অথচ তিনি আমার নাম জানেন, ঠিকানাটাও জানেন। বিস্মিত হলাম। তার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটা। জিজ্ঞেস করলাম, কার কাছ থেকে আমার নাম ঠিকানা জানলেন, বল্লেন- সাইফুল আলম খান মিলনের কাছ থেকে। আমি তো এ নামে কাউকে চিনি না। মনে মনে হিসাব মেলানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে, আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মানুষ এত সুন্দর! বোরখাতে কোন মানুষকে এত সুন্দর দেখাতে পারে!

বোরখা আবার সাদা রঙেরও হয়! (আমাদের ফ্যামিলিতে বোরখার কোন চল ছিল না।) মনে হচ্ছিল আমি যেন স্বর্গের কোন অপ্সরীকে দেখছি। অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম, চোখে আমার একরাশ মুগ্ধতা। উনিও আমার সাথে বেশি কথা বলেননি। শুধু স্থান-কাল বলে একটা অনুষ্ঠানের দাওয়াত দিয়ে চলে গেলেন। পিছনে মুগ্ধতার যে আবেশটুকু রেখে গেলেন তাকে অস্বীকার করার মত কোন অবস্থা আমার ছিল না। অতএব, যথাসময়ে আমি আমার এক বান্ধবী মাহমুদা বেগম শেলীসহ হাজির হলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মত বাইছাসের (তৎকালীন ইসলামী ছাত্রীসংস্থা) ফর্ম পূরণ করলাম। শেলীকেও উৎসাহিত করলাম- এভাবে দুজনে ছাত্রীসংস্থার প্রাথমিক সদস্যা হয়ে হোস্টেলে ফিরে

www.pathagar.com

এলাম। এভাবেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ অঙ্গনে ছাত্রীসংস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। আমার দেখা সেই তিনি, স্বর্গ থেকে নেমে আসা ফেরেশ্‌তার মত মনে হচ্ছিল যাকে, তিনি হচ্ছেন আমার ভীষণ ভীষণ প্রিয় আয়েশা আপা, খন্দোকার আয়েশা খাতুন। ঐ সময়ে আরেকজন অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী এক মহিলা আমাকে রীতিমত সম্মোহিত করে ফেলেন তার অসাধারণ বাগ্মীতা, চমৎকার ভরাট কণ্ঠস্বর এবং অত্যন্ত উঁচুমানের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আচরণের দ্বারা– তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নিজামী আপা, (শামসুন্নাহার নিজামী)।

এখানে আরেকজনের কথা না বল্লেই নয়। তিনি হলেন আমার খালু রহুল কুদ্দুস খাঁন। HSC পরীক্ষার পর, ঢাকায় আসবার আগে উনি আমাকে মওদূদী সাহেবের হাকীকত সিরিজের (সম্ভবত) কয়েকটি বই পড়তে দেন। গল্পের বই পড়াটা ছিল আমার নেশার মত। বিভিন্ন আদর্শ সম্বন্ধে জানতে, ইসলাম সম্পর্কে জানতে প্রচুর আগ্রহ ছিল। তদুপরি আমার প্রতি খালুর স্নেহশীল, মার্জিত ব্যবহারের কারণে তার প্রতি আমি বিশেষ প্রীত ছিলাম। বইগুলি খুব আগ্রহসহকারে তাই পড়তে শুরু করি, যদিও বইগুলির গেট-আপ আমার কাছে খুবই অনাকার্ষণীয় মনে হয়েছিল। ধৈর্য ধরে পাতা উল্টিয়ে দেখি– ভিতরটা যেন মনি-মুক্তায় ভরা। ঈমান, ইসলাম, কালেমা-এ জাতীয় শব্দগুলির প্রয়োজনীয়তা প্রত্যহিক জীবনে কতটুকু তা আমার জানা ছিল না। অথচ এগুলি জীবনের পরতে পরতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তা এত সহজ কথায়, এত সুন্দর সুন্দর সহজ, বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে এ বইগুলিতে লেখা-মোহিত হয়ে গেলাম। রীতিমত বৈপ্লবিক কথাবার্তা! খালুর কাছে আরও বই চাইলাম, উনি বল্লেন– তুমি তো ঢাকায় যাচ্ছ সেখানে দেখবে শিবিরের ছেলেরা আছে, আর যেখানেই শিবির সেখানেই একটা করে লাইব্রেরি আছে।

DMC তে ভর্তির পর বিভিন্ন পার্টির তরফ থেকে দেয়া নবীন বরণ উপভোগ করতে লাগলাম। এক সময় শিবিরের তরফ থেকে নবীন বরণ অনুষ্ঠানের দাওয়াত পেলাম, আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম, অনুষ্ঠানের দিন আমি ও শেলী একসাথে গেলাম। বেশির ভাগ মেয়েই ঐ অনুষ্ঠানে যায়নি। বিষয়টা আমার কাছে দৃষ্টিকটু লাগে এবং খুব খারাপ লাগে। আয়োজক ভাইয়েরা এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছেন–এর মধ্যে এক ভাইকে কয়েকবারই চোখে পড়ল, সম্ভবত সবার থেকে বেশ খানিকটা লম্বা হবার কারণেই। সিনিয়র এ ভাইটির মুখে সর্বক্ষণই লেগেছিল এক মিষ্টি হাসি। ফলে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে এক ফাঁকে তাকে বল্লাম– আপনাদের এখানে কি লাইব্রেরি আছে? জবাব দিলেন আছে। আবার বল্লাম– আমি আপনাদের লাইব্রেরির সদস্য হতে চাই। উনি বল্লেন– আচ্ছা। জেলা শহরের পাবলিক লাইব্রেরিতে আমি গেছি একাধিকবার। বইয়ের লাইব্রেরি বলতে ও রকমই একটা ধারণা আমার মধ্যে কাজ করছিল। ভেবেছিলাম– কয়েকদিন পর হয়তো উনি আমাকে কিছু বই পৌঁছে দেবেন অথবা ফর্ম পূরণ ও নির্দিষ্ট চাঁদার মাধ্যমে আমাকে লাইব্রেরির নিয়মিত সদস্য করে নেবেন। কিন্তু ঘটনা সেভাবে ঘটল না। বেশ কিছুদিন পর ঐ আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটে আমার রুমে যার কথা আগেই বলেছি। ঐ সিনিয়র ভাইটি হলেন আজকের প্রখ্যাত স্পাইনাল সার্জন ডাঃ ইদ্রিস আলী, আমাদের প্রিয় ইদ্রিস ভাই। পরে যা বুঝেছি– ইদ্রিস ভাই সাইফুল আলম খান মিলন ভাইয়ের মাধ্যমে সংস্থার সভানেত্রী আয়েশা আপার কাছে আমার সংবাদটি পৌঁছে দিয়েছিলেন। আয়েশা আপা নিজে এসে আমাকে দাওয়াত দিয়ে গেলেন। আর আমি পেলাম পথের সন্ধান।

পথে নেমে দেখি– এ পথ শুধুই চলার, শুধুই সামনে এগিয়ে যাবার। বসে থাকবার কোন স্থান এখানে নেই। নিতান্ত নিরীহ, শান্ত-শিষ্ট আমি মেয়েটি শুধু বই পড়ে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছিলাম তাই লাইব্রেরির সদস্য হতে চেয়েছিলাম। সেই আমাকে সংগঠন এমন কাজের মধ্যে ছেড়ে দিল, কাজের পর কাজ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল যে-শেষে কাজের চাপে বই পড়ার মাসিক টার্গেটটা পূর্ণ করাই এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠল।

ফর্ম পূরণ করে এলাম তো মাত্র দুজন। তিনজন না হলে ইউনিট হয় না। অতএব আরেকজন খোঁজার পালা। এই একজনকে পেতে আমাদেরকে বেশ অনেকদিন অপেক্ষা করতে হলো। সে ছিল সাঈদা-আমাদের পরের ইয়ারের। তবে ঐ এক বছর (প্রায়) আমরা বসে থাকিনি। কর্মী বৈঠকের ধাঁচে রেগুলার বৈঠক করে গেছি; সাধারণ সভা, শব-বেদারী ইত্যাদির আয়োজন করেছি হোস্টেলে। আমাদেরই ক্লাস-মেট রেহানা, তাহমিনা, রাজিয়া, বন্যা-এরা অংশ নিয়েছে; হোস্টেলের বাইরে থাকত এমন অনেকে মাঝে মাঝে এয়ানত দিয়েছে, এমন কি রেহানা ছাত্রীসংস্থার (শুধু মেডিক্যাল শাখা নয়) পক্ষ থেকে বন্যাদুর্গতদের সাহায্য করতে পর্যন্ত গিয়েছে কিন্তু ফরম পূরণ করে সংগঠনে যোগ দেয়নি। আমাকে

www.pathagar.com

মেডিক্যাল বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ একখানা বিরান ভূমি-যেখানে চারা গজাতে হবে। বিভিন্ন মেডিক্যালের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল হাতে লেখা চিঠি। স্টুডেন্ট লাইফে চিঠি লেখাটা ছিল আমার হবি। পাতার পর পাতা চিঠি লিখে লিখে দাওয়াত দানের কাজটা তাই খুব আনন্দের সাথে করতাম। এভাবে পেয়েছিলাম বরিশাল মেডিক্যালের বোন মোমেনাকে, ময়মনসিং মেডিক্যালের ইয়াসমীন জাহান শাহীন আপাকে (শাহীন আপা অবশ্য ফর্ম পূরণ করেননি, সুধী রয়ে গেলেন সারা জীবন), চিটাগাং মেডিক্যালের বোন খালেদা নাসরিন মনিকে। সলিমুল্লাহ মেডিকেলে মাঝে মাঝে সাধারণ সভার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করতাম আমরা। সেখানে পাই বোন নূরকে। এভাবে খুবই ধীর গতিতে মেডিকেল অঙ্গনে কাজ হতে থাকে। পরের বছর ভর্তি হলো হাবীবা চৌধুরী সুইট-তৈরি কর্মী। ফলে ঢাকা মেডিক্যালের কাজ বেগবান হয়। সুইটের মাধ্যমে শাহ্নূর এল। ওরা দুজনই চমৎকার দাওয়াতী কাজ করতে পারে। ফলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জনবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডি,এম, সি ইউনিটের পরিচালনায় আসে সুইট, আর আমি এসে পড়ি ঢাকা মহানগরীতে।

সেই প্রথম দিককার কথা- যখন প্রকৃতপক্ষে ২ জন কর্মী ছিলাম- আমি ও শেলী। একবার ডি এম সিতে পোস্টারিং করলাম। জীবনে প্রথম লিখছি। মেঝেতে কাগজ বিছিয়ে মনে হলো- এত বড় কাগজ, কত কথা লিখব? অক্ষরগুলো কত বড়ই বা লেখা সম্ভব? দুজন মিলে অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম কাগজটা দুভাগ করে লিখতে। পরদিন খুব সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে ওগুলো লাগিয়ে রুমে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন ক্লাস করতে গেলাম-খুব আগ্রহ নিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চুপসে গেলাম। বিস্তৃত দেয়ালে, বেশ উঁচুতে অতটুকু কাগজ চোখেই পড়ছে না, লেখা তো আরও পড়া যায় না। কী যে হাস্যকর- মনে মনে খুব হেসেছি। পরবর্তীতে আরও অনেকবার পোস্টারিং করেছি। খাতায় হাতের লেখা খারাপ হলেও পোস্টারে লেখা ভালই হতো, বেশ প্রশংসাও পেয়েছি। কিছুদিন আগেও ডাক্তারদের এক কনফারেন্স শেষে প্রস্তাবনা লেখার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। পোস্টারের কাগজে পোস্টার আকারে লিখতে হবে, পোস্টারের ভাষায়। লিখছি- আমার এক কলিগ ভাই বল্লেন- আপার লেখা দেখি খুবই সুন্দর, মনে হচ্ছে লিখে অভ্যস্ত; পার্টি করতেন নাকি? মন চলে গেল ছাত্রীসংস্থার দিনগুলোতে। চোখের সামনে তখন ডিএমসি হোস্টেল আর সংস্থার অফিসে। পোস্টার লেখার দিনগুলো ভিড় করেছে।

এমনি আরও অনেক স্মৃতি আছে। স্মৃতির ভান্ডারে যত রত্ন জমা তার মূল্য তো সে-ই বুঝবে যার স্মৃতি এগুলো। অন্যের কাছে তা একটা ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। তাইতো স্মৃতি কথায় কিছুই লিখতে চাইনি প্রথমে। শেষ পর্যন্ত উত্তরসূরি বোনদের চাপাচাপিতে দু'কথা লিখতে গিয়ে দেখছি, কথা আর ফুরায় না। সম্ভবত ইতিমধ্যে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে শুরু করেছে। তাই, আর থাক স্মৃতির প্রসঙ্গ।

আসলে, এমনি করেই দিন বয়ে যাবে। ছাত্রী বোনেরা ছাত্রীজীবন শেষ করে বৃহত্তর কর্ম জীবনে ছড়িয়ে পড়বে, ফেলে আসা স্থানটা পূর্ণ হয়ে যাবে নতুন বোনদের দ্বারা। এভাবেই এগিয়ে চলবে ছাত্রীসংস্থার কাফেলা বিজয়ের পানে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব। ক্রমশঃ যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠছে। একেকটি মুসলিম দেশকে টার্গেট করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে, চলছে রক্তের হোলিখেলা। বাংলাদেশও এই ষড়যন্ত্রের বাইরে নয়। তবে, মেঘের আঁধার কখনই স্থায়ী নয়, সূর্যের আলো হাসি ছড়াবেই। মিথ্যা অপসৃত হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হবেই। ইসলামের এই মহান বিজয়ের সংগ্রামে ইসলামী ছাত্রীসংস্থা যতটুকু অবদান রাখতে পারবে ততটুকুই ইসলামী ছাত্রীসংস্থার সাফল্য।#

www.pathagar.com

শাহানারা বেগম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও দেশ পুনর্গঠনের পরিবর্তে সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং শিক্ষাঙ্গনগুলি নকলের দৌরাত্ম্যে ভেসে যায়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নৈতিক অবক্ষয়ের ধস নামে। এ হেন পরিস্থিতিতে "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা জাতি, ভবিষ্যৎ বংশধর যাদের হাতে গঠিত হবে তাদের সঠিক দিক নির্দেশাবলী তুলে ধরার সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৪০০ বছর আগে মানবতার শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের যথার্থ অনুসরণ করে অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন এবং সেই জ্ঞানের আলোকে তার সঙ্গী-সাথীদের (মুমিন নারী-পুরুষ) গড়ে তুলেছিলেন তাদের দ্বারাই মানব ইতিহাসের স্বীকৃত "আইয়ামে জাহিলিয়াতের" কদর্যতা দূর করে সেখানে সৃষ্টি করেছিলেন কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সোনালী যুগ। যার জন্য মানুষে হন্যে হয়ে ঘুরছে মানবতা। যখনই মানুষ স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞানের প্রতি উদাসীনতা ও অবজ্ঞা দেখিয়েছে এবং চলেছে বিভিন্ন মতবাদের পিছনে আর করেছে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষের গোলামী তখনই নেমে এসেছে চরম জিল্লতী ও অশান্তি। মানব জাতির উল্লেখযোগ্য নারীরাও তাদের সম্মান ও মর্যাদা হারিয়ে পণ্যের মান বাড়াবার সামগ্রী ও ভোগবাদী সমাজের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঠিক এমন সময় যখন সত্য পথের সন্ধানী কিছু বোনদের অক্লান্ত চেষ্টায় "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা" নামে সংগঠনের আবির্ভাব হয় তখন মহান আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আমি আল্লাহর প্রিয় পথের যাত্রী হিসেবে নিজেকে শামিল করার প্রয়াস পাই।

পাবনা আমার স্থায়ী নিবাস হবার কারণে পাবনায় কাজ চালিয়ে যাই। ইতিমধ্যে আমার দ্বীনি বোনেরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে তাদের আগ্রহের কারণে তাদের সাথে চিঠিতে যোগাযোগ চালিয়ে যাই সংগঠন কায়েমের উদ্দেশ্যে।

বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করায় আমি রাজশাহীতে চলে আসি। সাংগঠনিক জীবনে এর পরবর্তী অধ্যায়ে অনেক স্মৃতিমধুর অভিজ্ঞতা আজও আমার মনের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে। সেদিনের কথা কিভাবে ভুলতে পারি যেদিন মন্নুজান হলের ২০৩ নম্বর রুমে নুরুন্নিসা সিদ্দিকা আপার সফরে ১ম কাজ শুরু হয়। অবশ্য এর পূর্বে এখানকার আগ্রহী বোনদের সাথে (পাবনায় অবস্থানকালীন সময়ে) চিঠিতে যোগাযোগ করে পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করি।

এরপরই শুরু হয় অন্যান্য হলগুলোতে ছাত্রী বোনদের মধ্যে সঠিক ইসলামী আদর্শ তুলে ধরার প্রচণ্ড প্রয়াস। ছাত্রীসংস্থার বোনেরা ২/৩ জন ছাড়া সবাই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হওয়ায় ক্লাস ও প্রাকটিকাল ক্লাসের চাপ থাকা সত্ত্বেও তাদের আবেগ উদ্দীপনা ইসলামের জন্য সবটুকুই ছিল নিবেদিত। তা সত্ত্বেও তাদের ফলাফল ছিল যথেষ্ট ভালো।

www.pathagar.com

এ সময়ের একটি ঘটনা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না তা হলো এ সময় ক্যাম্পাসে বামপন্থীদের দাপট ছিল সর্বত্র বিশেষ করে ছাত্রমৈত্রীর। বামপন্থী এই ছাত্র সংগঠন একজোট হয়ে পরিকল্পনা নেয় তারা ইসলামপন্থী ছাত্রীদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিবে এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তাদের ওপর চড়াও হয়। তাদের তিরস্কারসহ কুরআন হাদিস নিজ নিজ ঘরে পড়ার অনুমতি দেয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করে এবং চরম হুমকি দেয়। এমন কি তাদেরকে তিনতলা থেকে ফেলে দেয়ার বাস্তব পরিকল্পনা করে। আল্লাহর সাহায্যে প্রশাসনের উছিলায় আমরা এ থেকে রক্ষা পাই।

এ সময় রাকসুর ভিপি ও জিএস ছিল যথাক্রমে ডেজি ও পারভীন (মৈত্রি)। জাসদের সেলিনা পারভীন সে সময় ইসলামের বিরোধিতায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল। এ সময়ের আর একটি বিষয় আমার খুব মনে পড়ে। আমরা সালমান রুশদির বিরুদ্ধে ছাত্রীসংস্থার প্রতিবাদ লিপি পোষ্টার আকারে দেয়ালে দিচ্ছিলাম, তখন এ ব্যাপারে চরম প্রতিবাদ করে এবং বলে কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কোন ব্যক্তির উচিত নয়। তখন আমি বললাম ধরো তোমার পিতাকে আমি গালি দিলাম। এতে তোমার খুব কষ্ট হবে কারণ সে তোমার প্রিয় ব্যক্তি। ঠিক এমন আমাদের প্রিয় ব্যক্তিকে গালি দেয়া কেন অন্যায় হবেনা। আসলে আল্লাহ এবং রাসূল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা আজ এ অবস্থার শিকার। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিন এবং হেদায়াত দান করেন।

এ সময় আমরা রাকসুর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। ৫টি প্যানেলে আমরা নির্বাচন করি। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আমরা তৃতীয় অবস্থান অর্জন করি।

এমনই অনেক ঘটনা মনের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে যা আজও আমাকে কাজে অনুপ্রেরণা যোগায়। স্বল্প পরিসরে অনেক স্মৃতির কথা এখানে লিখলাম। এই স্মৃতি কথাগুলো লিখতে পেরে সবাইকে জানাতে পেরে আমি নিজেকে খুব হালকা মনে করছি এবং আমাকে এ সুযোগ দেয়ার জন্য ছাত্রীসংস্থাকে শুকরিয়া জানাচ্ছি। তবে সবার আগে শুকরিয়া জানাচ্ছি মহান আল্লাহর দরবারে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করে নিন। আমীন। #

www.pathagar.com

ডাঃ খালেদা নাসরীন

চট্টগ্রাম মেডিকেল

পিছন ফিরে তাকানোই হলো স্মৃতিচারণ। আর স্মৃতি মানে বেদনায় ভারাক্রান্ত সুখের বৃষ্টি। সুখ এ জন্য যে অতীতের স্মৃতিগুলো আমাদের দিবে ভালো কাজের প্রেরণা। শেখাবে ত্যাগ, তিতিক্ষা। ইসলামী ছাত্রীসংস্থার মূল কর্মকাণ্ডে যে আপারা ছিলেন তাদের কাছ থেকে আমরা যে বৈপ্লবিক আহ্বান পেয়েছিলাম সেটার ফলশ্রুতি স্বরূপ হয়তো আজ আমরা ইসলামপ্রিয় ও সংগঠন প্রিয় বাংলাদেশের শত সহস্র মহিলাদেরকে একই প্লাটফরমে আনার তৌফিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেছেন। আজকের মহিলাদের ইসলাম প্রিয়তা সেটাই প্রমাণ করে।

আর দুঃখ এ জন্য যে ফেলে আসা দিনগুলোতে আমাদের হয়তো আরো সুগঠিত হওয়া দরকার ছিল। অনেক স্মৃতি বিস্মৃতির তলে হারিয়ে গেছে। আমি সর্বপ্রথম ইসলামী ছাত্রীসংস্থার দাওয়াত পাই ১৯৮২ সালে- ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামের আহ্বান জানানোর জন্য এক প্রাণবন্ত নিবেদন হিসাবে।

এই নিবেদনের একজন নগণ্য কর্মী হিসাবে চায়না বিল্ডিং-এ প্রাক্তন সভানেত্রী ও প্রথম সভানেত্রী খন্দোকার আয়েশা খাতুন এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শুরু হয় আমার নতুন ভুবনে পদচারণা।

চট্টগ্রাম মেডিকেলে ১ম বর্ষের ছাত্রী হিসাবে কাজ শুরু করি এবং বিপুল সাড়া পাই। হোস্টেল জীবনে ছাত্রীসংস্থায় সিনিয়র আপু হিসাবে নাজমা আপা (বর্তমান বায়োকেমেস্ট্রিতে M phil করে কানাডায়) ও বেবী আপাকে পাই অত্যন্ত আন্তরিক আত্মার আত্মীয় হিসাবে।

ফজিলা তাহের আপা ছিলেন আমাদের তত্ত্বাবধায়ক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ চট্টগ্রাম শাখার উৎসর্গী কর্মী। ফারজানা ও ফারুক দুই শিশুকে কোলে নিয়ে আমাদের বড় শিশুদেরকে! ট্রেনিং, T.S, কোরআন ক্লাস এবং বিভিন্নভাবে সর্বতোভাবে সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে হাত ধরে টেনে উঠানোর পরম প্রচেষ্টা ছিল তার। রিজিয়া খালাম্মা ছিলেন- যার আন্তরিক সাহচর্য ও উপদেশ দিয়েছিল আমাদের গতিময়তা।

ছাত্রীসংস্থায় থাকাকালিন জীবনে শুধু কর্মী হিসাবেই ছিলাম। সেই অল্প কয়েক বৎসরের বৈপ্লবিক স্মৃতিগুলো এখনো আমার ভাল লাগার উৎস, সুখের বৃষ্টিতে স্নাত হওয়ার ঘন মেঘ। ভালোভাবে হয়তো অনেক কাজই করতে পারিনি সে জন্য অনুতপ্ত। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সারা বিশ্বের কোটি কোটি নারী জাতীর এসিড দগ্ধ বিকৃত মুখ দেখে এবং বিভিন্ন দেশে দেশে Direct/ Indirect ভাবে নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক করুণ সচিত্র প্রতিবেদন পাঠ করে। ইসলামকে যদি সারা বিশ্বের মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল পরিচালিকা শক্তি হিসাবে গ্রহণ করতো তাহলো হয়তো এমনটি হতো না।

স্মৃতিচারণ করতে বললে- স্মৃতির শেষ নেই জীবনেরও শেষ নেই। এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়, এক স্তর থেকে আরেক স্তর, কখনো দেহসহ জীবন কখনো দেহহীন জীবন। আমাদের জীবন শুরু হয়েছে, চলছে, চলবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে জান্নাতের বাগানে দেখা করার এবং বিরাট get together করার তৌফিক দান করুন।

Time and tide wait for none. বরফ বিক্রেতার বরফের মতো আমাদের জীবনও শেষ হয়ে আসছে। শেষ হয়ে আসছে সময়। ১৯৮২-২০০৩ সালের মধ্যে বহু বৎসর পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ইসলামী ছাত্রীসংস্থা আগের চেয়ে আরো বেগবান হয়েছে আশা করি। আমার জীবন থেকেও অনেক বৎসর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছি। বর্তমানে আল মাগরেবী চক্ষু হাসপাতালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিমিটেড এর সঙ্গে যুক্ত আছি। কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও ছাত্রীসংস্থার বোনদের জন্য রইল আমার আন্তরিকতা তাদের কষ্ট ও পরিশ্রম সার্থক হোক- দোয়া রইল। আল্লাহ পাক আমাদের জীবন কবুল করে নিন। আমিন। #

www.pathagar.com

হাসিনা ইয়াসমীন রিনা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অহর্নিশ ঘুরছে সময়ের ঘড়ি। চির অনিঃশেষ তার চলার গতি। দিন দিনান্তে কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের মাহেন্দ্র মুহূর্তগুলো। ক্ষয়িষ্ণু বরফের মত আমাদের পার্থিব সময় সমষ্টিও ফুরিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি মৃত্যু যবনিকার ওপারের সীমানায়। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

"দুনিয়ার এ জীবন খেলা ও মন ভুলানোর সামগ্রী মাত্র। আসলে জীবনের ঘর তো পরকাল।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত ঃ ৬৪)

'তোমরা ভালভাবে জেনে রাখো, দুনিয়ার এ জীবন একটি খেলা, হাসি-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং সন্তান-সন্ততি ও অর্থ সম্পদে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়...। আসলে দুনিয়ার এ জীবন ধোঁকা ও প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা আল হাদীদ, আয়াত ঃ ২০)

৩১ অক্টোবর ২০০০ তারিখে বিদায় নিয়েছি প্রাণপ্রিয় সংগঠন "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা" থেকে। দেখতে দেখতে তিন বছর হতে চলল। সময় কি দ্রুত যায়! কোথায় হারিয়ে গেল সেই স্বর্ণালী-বর্ণালী দিনগুলো। ফেলে আসা দিনগুলো আজ শুধুই সোনালি অতীত। অন্য দশজনের মত আমিও মাঝে মাঝে অতীত বিধুর হয়ে পড়ি। সত্যিই, সবকিছুই ক্ষণভঙ্গুরতায় আক্রান্ত, কেবল সময়ই প্রবল পরাক্রান্ত।

কোন কিছু গুছিয়ে লিখার যোগ্যতা আমার কখনোই ছিল না। আজও নেই। তবুও প্রাণপ্রিয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে নিজের শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও কলম ধরতে ব্রত হলাম। দীর্ঘ ১২টি বছর আল্লাহপাক তাঁর একান্ত অনুগ্রহে এই অধমকে ইসলামী সংগঠনে থাকার সুযোগ দিয়েছেন। বিনয়াবনত চিত্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি তাঁরই শিখিয়ে দেয়া ভাষায় ঃ সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই যিনি আমাদেরকে পথের দিশা দিয়েছেন। তিনি না দিলে কখনই আমরা এ পথের সন্ধান পেতাম না।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ঃ ৪৩)

স্মৃতিকথা লিখতে বসে অনেক বিষয়ই মনের জানালায় উঁকি দিচ্ছে। আর অপরাধী মন অসংকোচে এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে– নিজের অযুত অযোগ্যতা, সীমাবদ্ধতা আর শৈথিল্যের কারণে দায়িত্বে থাকাকালীন দিনগুলোতে অমিত সম্ভাবনার অসীম অর্ণবে প্রত্যাশিতভাবে তরী ভাসাতে পারিনি। ক্রন্দসী মনের সরল স্বীকারোক্তি– 'সংগঠন অনেক কিছুই দিয়েছে, আমি দিতে পারিনি কিছুই।'

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুপম লীলাভূমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। নাগরিক ব্যস্ততা ও হৈ হল্লোড় থেকে পুরোপুরি মুক্ত এই ক্যাম্পাস চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ১৮ কি.মি. দূরে। Shuttle train এর সুবিধা থাকলেও সংখ্যায় বেশি হওয়ায় অনেক ছাত্রছাত্রীকে লোকাল বাসে ক্যাম্পাসে পৌঁছতে হয়। পথের কষ্টটা লাঘব হয়ে যায় নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ঘেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি

www.pathagar.com

পৌঁছলেই। উঁচু-নিচু পাহাড়, দু' পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া দুই পাশে বৃক্ষরাজি শোভিত দৃষ্টিনন্দন ছায়া ঢাকা প্রশস্ত রাস্তা, পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে ওঠা বিচিত্র কাব্যিক নাম উৎকীর্ণ কলোনী সারি, প্রাণ প্রাচুর্যে সরগরম Hall সমূহ, সেন্ট্রাল মসজিদসহ একাধিক মসজিদের সুউচ্চ মৌন মিনার ইত্যাদি যে কাউকে দারুণভাবে মোহিত করবেই। নামাজের সময়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভেসে আসা মন আকুল করা আজানের ধ্বনি, দিগন্ত প্রসারিত সবুজের সমারোহ, পাখিদের কলরব, পাহাড়ী প্রান্তরের সুনশান নীরবতা- সবকিছু মিলিয়ে পার্থিব-অপার্থিব সৃষ্টির এক অনন্য সাধারণ সৌন্দর্য সবারই মন ভরে দেয়। বাস্তবে দেখার সুযোগ না হলে এই মনোলোভা সৌন্দর্য শুধু বর্ণনা দিয়ে উপলব্ধি করানো সত্যিই সুকঠিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই যেন ব্যতিক্রমী স্মৃতিতে ভরা। অসংখ্য স্মৃতির মধ্য থেকে শুধু দু'একটি এখানে বলবার চেষ্টা করব যা আমাকে খুবই আন্দোলিত করেছে এবং ভাবীকালেও করবে। এখন বৃহত্তর আন্দোলনে কাজ করতে এসে যখন সবদিক সামলাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন সেই অমলিন স্মৃতিগুলোই আমাকে পৌনঃপুনিকভাবে প্রাণিত করে এবং মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর সেই উক্তিটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়- "এ পৃথিবী রণক্ষেত্র। এখানে টিকে থাকার জন্যই সংগ্রামের ধারা চালু রয়েছে। বাস্তবতাকে মোকাবিলা করার শক্তি যাদের নেই, সংগ্রামে তাদের সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই নেই"।

১৯৯৬ সালে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক কাঠামোতেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে ব্যাপক রদবদল ঘটে। ফলশ্রুতিতে দেশের সকল পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বিস্ফোরনুখ অবস্থার উন্মেষ ঘটে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মহানগরী বা অন্যান্য শাখার মত সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন সম্ভব ছিল না। সবদিক মূল্যায়ন করে কৌশলে কাজ করতে হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সুসংহত সাংগঠনিক ভিত থাকলেও ছাত্রী সংস্থার কাজ সমান্তরালভাবে এগিয়ে নেয়া যায়নি। ছাত্রী মহলে বিরোধী স্রোতই ছিল প্রবল। ছাত্র হল কিংবা কোথাও গণ্ডগোলের আভাস পেলে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শুরু হত ছাত্রী হলগুলোতে। অধিকন্তু অধিকাংশ গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘটতো শামসুন্নাহার হলে। ফলে হলে অবস্থানরত বোনদের মধ্যে যারা ছাত্রী সংস্থার প্রতি সহানুভূতিশীল তাঁদের সব সময় টেনশনে থাকতে হত। অবশ্য ছাত্রী সংস্থার কাজ তখন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। ফ্যাকাল্টি, হল, ক্যাম্পাস, কলোনীসহ সব স্থানেই আমাদের কাজ চলছে, ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আদর্শ এবং সদস্যা শাখা মানে উন্নীত হয়েছে। বিরোধীদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম হলেও সর্বত্রই ছাত্রী সংস্থার কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি সবার নজরে পড়ত। শামসুন্নাহার হলের ৪/৫টা রুমে আমরা প্রোগ্রামাদি করতে পারতাম। বছরে বহুবার কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত বা আশ্বস্ত থাকবার সুযোগ কর্মী বোনেরা পাননি। সামনে কী হয়? সম্ভাব্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী করতে হবে? এসব নিয়ে আগাম প্রস্তুতিসহ সব সময় সর্বাত্মক সতর্কতায় থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন। কত যে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে। রাত জেগে পাহারা দেয়া, চলমান ঘটনাবলী সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা, বিরোধীরা কী পদক্ষেপ নিচ্ছে জানার চেষ্টা করা, ডাইনিং রুম, T.V রুম, টেনিস কোর্ট-কেন্টিন-টেলিফোন ইত্যাদি জায়গায় উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ, সব মিলিয়ে এমন এক কঠিন পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি হয়েছিল যে, মাঝে মাঝে মনে হত এই অনিঃশেষ অনিশ্চয়তার বুঝি কোন ইতি নেই। আমার সাথী বোন যারা ছিলেন কিংবা যারা পূর্ব থেকে ঐ অঙ্গনে কাজ করেছেন তারা ভিন্ন অন্য বোনদের পক্ষে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা সত্যিই সহজ নয়। আজ লিখতে বসে আমার সেই ত্যাগী বোনদের কথা বড় বেশি মনে পড়ছে। বাস্তব কারণে আজ অনেকেই কত দূরে! অনেকের সাথে হয়তো আর দেখা হবে না প্রলয়ের আগে। অথচ একটা সময় এমন ছিল আমরা ছিলাম একই পরিবারের সদস্যের মত কিংবা তার চাইতেও বেশি। কোরআনে বর্ণিত 'বুনীআ'নুম মারসুস' এর সম্পর্কের কারণেই এত টেনশন, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, সংশয় আর কষ্টের মাঝেও অন্য রকম আনন্দ পেতাম-সাহস পেতাম। দায়িত্ব পালনে যে জিনিসটি বেশি পাওয়া প্রয়োজন তা হল সহকর্মীদের শ্রদ্ধাশ্রিত ভালবাসা। অভিজ্ঞতায় জেনেছি, এটি থাকলে সহযোগিতা পাওয়া যায় অনেক বেশি। এই অর্থে আমি সত্যিই Lucky। সাথী বোনেরা তাদের গাঢ় ভালবাসায় আমাকে চির ঋণী করেছেন। তাঁদের সেই গভীর মমতার কোন প্রতিদান আমি দিতে পারিনি, অনিবার্যভাবে পারবও না। এ প্রসঙ্গে সূরা আনফালের ৬২ ও ৬৩ নং আয়াতটি মনে পড়ছে-

www.pathagar.com

"তিনিই তো নিজের সহায়তায় ও মুমিনদের মাধ্যমে তোমাকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং মুমিনদের অন্তর পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি সারা দুনিয়ার সমস্ত দৌলত ব্যয় করলেও এদের অন্তর জোড়া দিতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তর জুড়ে দিয়েছেন।" [আল আনফাল- ৬২ ও ৬৩ নং আয়াত]

অগ্রজদের কাছ থেকেও অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উপযুক্ত বিনিময় দান করুন। দু'জন প্রিয় মানুষের কথা না বললেই নয়। তাঁরা হচ্ছেন আমাদের প্রিয় বড় বোন সোনিয়া ফেরদৌস ছন্দা এবং তাঁর Husband শ্রদ্ধেয় বদিউল আলম ভাই। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-রাত যখনই কোন সমস্যায় পড়েছি ছন্দাপা'র সহযোগিতা চেয়ে পেয়েছি। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলতেন- দেখ, আমরা আমাদের সামর্থ্যের আলোকে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাব, মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটি তো থাকবেই- বাকীটুকু সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহর। বেশি টেনশন করে কী হবে?" ভাইয়াও নিরবধি আমাদেরকে সান্ত্বনা ও প্রেরণা দিতেন। জরুরি প্রয়োজনে রাত ২টা-৩টায়ও আমরা ফোন করতাম ছন্দাপা'র বাসায়। এমনও হয়েছে জরুরি পরিস্থিতিতে রাতে শ্রদ্ধেয় বদিউল আলম ভাই খালি পায়ে টর্চ হাতে হলে চলে এসেছেন আমাদের দেখার জন্য। কখনো কখনো আপাকেও সাথে নিয়ে আসতেন। সেই দরদী ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই। 'Whom the Allah love die young- খোদা যাদের ভালবাসেন তারা অকালে ঝরে যায়। আল্লাহ পাক আমাদের এই প্রিয়জন-প্রিয় মানুষটিকে জান্নাতুল ফিরদৌস নসীব করুন, কায়মনো বাক্যে সতত এ প্রার্থনাই করি।

প্রতি বছর Hall গুলোতে Intra Hall Room Change এর পালা আসলে শামসুন্নাহার হলে কয়েকটি রুম (১০৬, ১২১, ২১২) নিয়ে বড় রকমের ঝামেলা পোহাতে হত। উল্লেখিত রুমগুলো ছাত্রী সংস্থার চিহ্নিত রুম ছিল। বিরোধী মেয়েরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মী সমর্থকদের Intra Hall Room Change চাইত উপরিউক্ত রুমগুলোতে। প্রভোস্ট, হাউজ টিউটর সবাই যেহেতু অভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অতএব ছাত্রী সংস্থা কর্মীদের কোণঠাসা করার এটিই সুবর্ণ সুযোগ। Intra Change এর সময় আমাদের বোনদের ভাবনার অন্ত নেই- কারণ রুমগুলো যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে হলে প্রোগ্রাম করার ন্যূনতম সুযোগও থাকবে না। ক্যাম্পাস জুড়ে সাংগঠনিক ভিতও দুর্বল হয়ে যাবে। প্রকৃত ব্যাপার হল, শাখা কমিটির বেশিরভাগ কর্মীই শামসুন্নাহার হলের আবাসিক ছাত্রী ছিলেন।

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বরের শেষভাগে এক রাতে হঠাৎ করে ছাত্রলীগ এর ক'জন মেয়ে কর্মী দলীয় নেত্রীদের নিয়ে তল্পিতল্পাসহ ২১২ নং রুমের সামনে হাজির। আমি, উম্মে জয়নব আপা, বীনু আপা, নাহিদ আপা রুমে বসে সীট নিয়ে আলাপ করছিলাম। রাত ৯টায় ছিল সেক্রেটারিয়েট বৈঠক। মেয়েটি রুমে ঢুকেই বলল- 'আমি এই রুমে সীট পেয়েছি। জিনিসপত্র নিয়ে আসলাম, কাল থেকে এ রুমেই থাকব। মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। আমাদের বোনরা বলছে- "এ রুমে অন্যদের নামে সীট বরাদ্দ থাকা অবস্থায় অন্য কেউ কী করে সীট পেতে পারে?" আমরা আগে প্রভোস্টের সাথে কথা বলব। তারপরে অন্য কারো রুমে আসার ব্যাপার দেখা যাবে।" ওদের চেঁচামেচিতে পাশের রুমগুলো থেকে অনেকে বেরিয়ে আসল। কিছুক্ষণ খিস্তিখেউড় করে মেয়েটি এ রুমে উঠবেই বলে জিনিসপত্র ফেলে চলে গেল। মহাচিন্তায় পড়লাম। সেক্রেটারিয়েট বৈঠক হলো না। কমিটিসহ আরো ক'জন বোন মিলে অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল যে রুমে তালা দিয়ে সুবেহ সাদিকের আগেই আমাদের দু'জনকে (আমি ও উম্মে জয়নব) হল থেকে চলে যেতে হবে, পাছে সকালেই ওরা রুমে ঢুকে পড়ে। এ কথাটি আমাদের ভালো বোঝা ছিল যে, একবার রুমে এসে গেলে ওদেরকে ঠেকানোর আর কোন উপায় থাকবে না। ভদ্রভাবে তাদেরকে ফেরানোর কোন অবকাশ নেই। আর যাচ্ছে তাই আশোভন আচরণ করাতো শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব। অনেক রাত, আমাদের বোনেরা নিজ নিজ রুমে ফিরে গিয়েছেন। আমি এবং জয়নব ২১২ নং রুমেই আছি। অস্থিরতায় কাটল নির্ঘুম রাত। দু'জনে তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর সাহায্য চাইলাম। সব খাতা, ফাইলপত্র, সাংগঠনিক বই গুছিয়ে কয়েকটা ব্যাগে ভর্তি করলাম। গুরুত্বপূর্ণ কোন কাগজ যেন থেকে না যায় বার বার চেক করে নিলাম। ততক্ষণে ফজরের আজান হয়েছে। আমাদের হাতে সময় খুব কম। নামাজ পড়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। নামাজ শেষে সন্তর্পণে নিচ তলায় নেমে ১২১ নং রুমের খোলা জানালা দিয়ে অতি সাবধানে নাহিদ আপাকে ডেকে তুললাম। ব্যাগগুলো সে রুমে রেখে শুধু বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাগটা সাথে নিয়ে অজানা গন্তব্যে পা বাড়ালাম। স্থির করলাম, ছন্দা আপার বাসায় উঠব। কারণ, শহরে ফিরে কী লাভ? বরং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, সবার টেনশন বাড়বে। দায়িত্বশীলরা ময়দানে অনুপস্থিত থাকলে যা হয়। হল থেকে ছন্দাপা'র বাসা দেড় কি.মি. দূরে। এত প্রত্যুষে কোন রিক্সাও

www.pathagar.com

নেই। অনিশ্চয়তায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বন্ধুর পাহাড়ী পথ বেয়ে শ্রান্ত পদক্ষেপে ছন্দাপা'র বাসার দিকে এগুচ্ছিলাম। সূর্যোদয়ের আগেই সেখানে পৌঁছলাম। সেদিনের মত সেখানেই থাকলাম। দুপুরে ছন্দাপা হলে গিয়ে দায়িত্বশীল বোনদের আমাদের অবস্থান অবহিত করলেন। আপা ও ভাইয়ার আন্তরিকতার কোন কমতি ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা ছিল এই যে, ছন্দাপার বাসার সদস্য সংখ্যা বেশি এবং রাতে শোবার মত অতিরিক্ত রুমও নেই। বিকালে বোনদের সাথে পরামর্শক্রমে ঠিক হল যে আমরা দক্ষিণ ক্যাম্পাসে আমাদের এক সুধী ডাঃ তকী সাহেবের বাসায় থাকব। ডাঃ তকী সাহেবের মেয়ে রাশেদা বানু ছিলেন দক্ষিণ ক্যাম্পাস ইউনিটের দায়িত্বশীলা। টানা ১৪ দিন সে বাসায় ছিলাম। হলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। একটাই ভয়, রুম খুললেই তারা সেখানে অবস্থান নিয়ে নেবে। আমাদের ওপর তারা কড়া নজরদারি রাখছিল। ফ্যাকাল্টিতেও যেতে পারিনি। ক্লাস, পড়াশোনা, প্রকাশ্য সাংগঠনিক কাজ সবকিছু স্থগিত হয়ে মোটামুটি এক অবরুদ্ধ অবস্থা। কোরআন-হাদীস অধ্যয়ন, ইসলামী সাহিত্য-পত্রিকা পাঠ- এভাবেই কাটছিল দিনগুলো। বোনেরা সকাল-সন্ধ্যায় এসে হল ও ক্যাম্পাসের খবরদারি জানাত। গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামগুলো রাশেদা আপাদের বাসাতেই হয়েছে।

দু' সপ্তাহ ধরে ডাঃ তকী সাহেবের বাসায় যে সৌহার্দপূর্ণ আতিথেয়তা আমরা পেয়েছি আমার স্মৃতির পাতায় তা চির অমলিন– চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। খালা-খালুজান, রাশেদা আপার ছোট বোন নাছেরা ও ছোট দু'ভাই সবাই দিনমান আমাদেরকে প্রাণিত রাখার চেষ্টা করতেন যেন কোনভাবেই আমাদের মন ছোট না হয়। পরবর্তী সময়ে আমরা সে বাসার নাম দিয়েছিলাম 'পাহাড়ী ঝর্ণা'। আমরাই শুধু নই, সমর্থক থেকে শুরু করে আমাদের যে কোন বোনেরই সেখানে ছিল অসংকোচ যাতায়াত। রাশেদা আপাদের আতিথেয়তার খ্যাতি রীতিমত প্রবাদের পর্যায়ে পড়ে। এই পরিবারের প্রাণখোলা ঔদার্য কোরআনের সেই আয়াতটিই স্মরণ করিয়ে দেয়–

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে রবের কাছে এবং তাদের কোন দুঃখ মর্মবেদনা ও ভয় নেই। একটুখানি মিষ্টি কথা, কোন অপ্রীতিকর ব্যাপারে ক্ষমা ও উদারতার নীতি অবলম্বন করা সেই দানের চেয়ে ভালো, যার পেছনে আসে দুঃখ ও মর্মজ্বালা।" [আল বাকারাহ ঃ ২৬২-২৬৩ নং আয়াত]

সুপ্রিয় পাঠক, এখানে উল্লেখ্য যে ২১২ নং রুমে আমার বা উম্মে জয়নব কারোরই সীট ছিল না। আমাদের সীট ছিল অন্য দু'রুমে। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তক্রমেই আমরা সে রুমে থাকছিলাম। ২১২ নং রুমই ছিল হলে আমাদের অফিস রুম। এই রুমের ১টা সীট ছিল বীনু আপার অন্যটি ইংরেজি বিভাগের আমাদের এক সমর্থক বোন খালেদা বেগমের। তিনি শহরে থাকতেন, কদাচিৎ হলে যেতেন। পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে খালেদা আপাকে ১ দিনের জন্য হলেও হলে নিয়ে আসতে হবে এবং প্রভোস্টের সাথে কথা বলে এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে ২১২ নং বীনু ও খালেদা এই দু'জনের নামে বরাদ্দ। কোন ছাত্রলীগ কর্মীর নয়।

রায়হান জামিলা (তৎকালীন চট্টগ্রাম মহানগরী সভানেত্রী) আপা শহর থেকে খালেদা আপাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন এবং আমরা সবাই হলে গেলাম। রায়হান আপা সবাইকে ৪১ বার সূরা ফাতহ্ সামষ্টিকভাবে পড়তে বললেন। এটি বিজয়ের সূরা। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে এই সূরা পড়েই রাসূল (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তেলাওয়াত শেষে হল নামাজ এবং সবশেষে সম্মানজনকভাবে সীটটা বহাল থাকতে সম্মিলিত মোনজাত। সন্ধ্যায় প্রভোস্ট আসার অপেক্ষায় থাকলাম কিন্তু কোন কারণে তিনি সেদিন এলেন না। পরদিন সন্ধ্যায় প্রভোস্টের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা সসম্মানে আমাদের রুমটা ফিরে পেলাম। রুমে ফিরে সবাই আরো একবার সিজদায় অবনত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

১০ মার্চ ১৯৯৮, মঙ্গলবার আমার স্মৃতির পাতার চির অমলিন একটি দিন। মাস্টার্স পরীক্ষার Theory পর্ব শেষ হয়েছে Pratcical পরীক্ষাগুলো বাকী। Theory পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে শেষ হলেও আমি ১ দিনের জন্যও বাসায় যাইনি যদিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা মাত্র ১ ঘণ্টার পথ। পরীক্ষা শেষে আমার সার্বক্ষণিক ভাবনা ছিল চলে আসার আগে প্রিয় ক্যাম্পাসকে কীভাবে আরো সাংগঠনিক দৃঢ়তা দেয়া যায়, কীভাবে অনুজদের মধ্যে আরো ভালো নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যায়। তখন কেন্দ্রীয় উদ্যোগে দেশব্যাপী চলছে স্কুল দাওয়াতী সপ্তাহ। উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ঠিক সে মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়াতী সপ্তাহ পালন কঠিন ছিল। সিদ্ধান্ত হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি যেহেতু শীঘ্রই ভালো হবার সম্ভাবনা নেই সেহেতু ব্যাপকভাবে না পারলেও সাধ্যানুসারে কার্যক্রম চালাতে হবে। সেই মতে ৯ মার্চ সোমবার থেকে

www.pathagar.com

সপ্তাহ পালন শুরু করেছি। চ.বি ক্যাম্পাসে স্কুল ছিল মাত্র ১টি তবুও আশপাশের ৩টি স্কুলে প্রতিবার কাজ করতাম। এবার আরো বাইরের কয়েকটি স্কুলেও যাবার সিদ্ধান্ত নেই। ৯ মার্চ আমি উম্মে জয়নবকে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ কিলোমিটার দূরে ফতেপুর এলাকায় গেলাম। ফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয়- একটি বড় প্রতিষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীও অনেক। স্কুল সংলগ্ন বাড়িটি হল আমাদের কর্মী বোন শাহনাজ বেগমদের। সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মদনহাট-ফতেপুর এলাকায় স্থানীয় বাড়িগুলোতে দাওয়াতী কাজ করলাম। কয়েকজন সুধী বৃদ্ধি পেল, অনেক ছাত্রী বোনকেও পেলাম। ফেরার আগে স্কুলের পাশের বাড়ীর কর্মী বোন শাহনাজসহ সিদ্ধান্ত নেই যে আগামীকাল Tiffin Hour-এ ফতেপুর স্কুলে যাব, ছাত্রীদের সাথে পরিচিত হব। মদনহাট এলাকা বরাবরই আওয়ামী লীগ প্রভাবিত এলাকা এবং সেখানে কখনোই প্রকাশ্যে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করা সম্ভব হয়নি।

যাই হোক, পরদিন ১০ মার্চ সকাল ১১টার দিকে আমি এবং ফাতেমা বেগম দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে স্কুলের দিকে রওয়ানা হলাম। ফাতিমা তখন নবীন অগ্রসর কর্মী এবং প্রত্যেকটি কাজে অংশগ্রহণে অতি আগ্রহী। আমার সাথে দাওয়াতী কাজে বের হওয়া তার খুব ইচ্ছে। আমরা প্রথমে ফতেপুর স্কুল সংলগ্ন শাহনাজদের বাড়ি গেলাম। স্কুলের টিফিন আওয়ার হয়ে এল। কোন ভয় লাগেনি তবুও এক অজানা আশংকায় মনটা ভারী ছিল। কারণ ৯ মার্চ রাতে দেখা একটি স্বপ্ন আমাকে ভাবিত রেখেছে। সকালে স্বপ্নের কথাটা জয়নব আপাকে না বলে পারিনি। [স্বপ্নটা ছিল এই- 'আমি সংগঠনিক কাজে হল থেকে বেরিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নং গেটে আসার আগেই হঠাৎ পুরো আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। প্রবল ঝড় তুফান বইতে শুরু করেছে। দিশেহারা অবস্থায় আমি পথ হারিয়ে ফেললাম। অনেকক্ষণ পর ঝড় শেষে আমি হলে ফিরে গেলাম'।]

আমি ও ফাতিমা স্কুলে ছাত্রীদের কমনরুমে গেলাম। প্রায় ১৫ মিনিট তাদের সাথে পরিচিত হলাম। কথা বলার এক পর্যায়ে অনেকগুলো পরিচিতি বিলি করলাম। কথা বলা শেষ হয়নি, ইতোমধ্যে একজন খালা (স্কুলের আয়া) এসে বললেন- আপনাদের দু'জনকে প্রধান শিক্ষক তাঁর রুমে এক্ষুনি যেতে বলেছেন। আয়ার কথা ভালোভাবে বুঝে ওঠার আগেই আমাদের পিঠ, মাথা ও মুখের ওপর বেধড়ক বেতের ঘা পড়তে লাগল সাথে অকথ্য ভাষায় (চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়) গালিগালাজ, তর্জন গর্জন আর খিস্তিখেউড়। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। প্রহার করতে করতেই আমাদেরকে হেড মাস্টারের রুমে নেয়া হল। প্রায় সাত আটটা বেত একত্রে বেঁধে আমাদেরকে পিটানো হচ্ছিল। দু'জনের ওড়না ছিঁড়ে গেছে। পিন দিয়ে ভালোভাবে বাঁধা ছিল বলে ওড়না পড়ে যায়নি। এত মারধর করার পরও আমরা এতক্ষণ স্তব্ধ ছিলাম। এক পর্যায়ে আমি বলে উঠলাম- "আল্লাহ! এই আবু জেহেলের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।" সাথে সাথেই লোকটির হাত থেকে বেত খসে পড়ল। কাঁচা-পাকা চুল দাড়ি, পাঞ্জাবী টুপি পরা ষাটোর্ধ মাজারি সাইজের এই লোকটিই প্রধান শিক্ষক। কী বীভৎস তার চাহনি আর ভীষণ তার রুদ্র রূপ।

শিক্ষকদের প্রতি শৈশব থেকেই আমার অনেক দুর্বলতা। 'কী হতে চাও' জিজ্ঞাসিত হলেই বলতাম Teaching করব। কিন্তু আজ শিক্ষকের এই কি রূপ, আমি দেখলাম। সব শিক্ষক এসে জড়ো হল সাথে কমিটির দু'একজন লোক। আমাদেরকে শাসিয়ে দিল যেন আর এ স্কুলে না আসি। শিক্ষকদের কেউ কোন কথা বললেন না, তারা সবাই যেন হেড মাস্টারের কাণ্ড দেখে হতভম্ব। বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ ক্যাম্পাসের একজন চাচী (মিসেস মতিউর রহমান) ছিলেন সে স্কুলের শিক্ষিকা। আমাদের অবস্থা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন।

শিক্ষকবৃন্দ কিছুক্ষণ পর নিজ নিজ ক্লাসে চলে গেলেন। কমিটির একজন লোক শুধু বসে ছিলেন। তিনি হচ্ছেন আমাদের স্থানীয় কর্মী শাহনাজ আপার বড় ভাই। আমাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি সেক্রেটারিকে ফোনে ডেকে আনা হল। পুলিশ এসে জেলে দেবে, ভার্সিটি থেকে নাম কেটে দেয়া হবে ইত্যাদি বলাবলি আর হুমকি ধমকি দিল। সংগঠন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানার চেষ্টা করল। ডিপার্টমেন্ট, ইয়ার, Hall এসব জানার চেষ্টা করল। আল্লাহর অসীম রহমতে আমরা এতটুকুও ঘাড়বে যাইনি। আমরা তাদের কথার কোন উত্তর দেইনি, স্ট্যাম্পে সইও করতে হয়নি। কঠিন মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর সাহায্য বুঝি এভাবেই আসে!

প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। পরে জানলাম ও বুঝলাম শাহনাজের বড় ভাই যিনি স্কুল কমিটির সদস্য তিনি তার প্রভাব খাটিয়ে পরিস্থিতি সামলেছেন। উনি অত্যন্ত সসম্মানে আমাদেরকে একটা রিক্সা ঠিক করে দিলেন এবং আমাদের

www.pathagar.com

নিরাপত্তার জন্য আরেকটি রিক্সা নিয়ে তিনি আমাদেরকে Hall পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। রিকসায় ফিরতে ফিরতে ফাতেমাকে বোঝালাম Hall এ ফিরে সে যেন এ বিষয়ে কাউকে কিছু না বলে। ভাবছিলাম, এই দুর্ঘটনা ফাতিমাকে নিরুৎসাহিত করে দেয় কিনা। সে সবেমাত্র নবোদ্যমে কাজ শুরু করেছে। এই অবস্থায় সে যদি ভেঙ্গে পড়ে, কিংবা এটি অন্য কাউকে বলে তাহলে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহর শুকরিয়া, ফাতেমা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিল, এতবড় ঘটনায় সে বিচলিত হয়নি।

হলে পৌঁছে নিজ নিজ রুমে চলে গেলাম। ততক্ষণে ডাইনিং এ খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লাম। দেহ-মন উভয় পর্যায়েই ছিলাম বিধ্বস্ত। ইতোমধ্যেই রুমে অনেকে এসেছে, কেউ কিছু বুঝতে পারেনি।

মাথার একদিকে অনেকটুকু ফেটে গিয়েছে। স্নায়ুচাপে এতক্ষণ অনুভূতিতে ভোঁতা হয়েছিল বলে টের পাইনি। শোয়ার পরপরই প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করলাম সারা শরীর জুড়ে। প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। কোন উহ্ পর্যন্ত করছিলাম না পাছে অন্য বোনেরা বিষয়টি জেনে যান। ফাতিমারও খুব জ্বর এসেছে। শহীদ হওয়ার চেয়ে গাজী হওয়াটাই যে কষ্টের!

আসরের নামাজ শেষে ফাতিমার রুমে গিয়ে দেখলাম সেও নামায পড়ছে। রুমে অন্যদের ভীড় দেখে কিছু না বলে চলে এলাম। মাগরিবের পূর্ব মুহূর্তে শামসুন্নাহার মিতুল আপা (শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী সংস্থার প্রাক্তন সভানেত্রী বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা) অশ্রুসিক্ত চোখে হন্তদন্ত হয়ে ২১২ নং রুমে ছুটে আসলেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। এতক্ষণ চুপচাপ থাকলেও আমি আর আবেগ সামলে রাখতে পারলাম না। তারপর ফাতেমার খোঁজে তার রুমে ছুটে গেলেন। ততক্ষণে উম্মে জয়নব, নাহিদ আপা, বীনু আপাসহ আমাদের অনেক বোন উপস্থিত হয়েছেন। সবাই হতবাক। কী হয়েছে কেউ বুঝতে পারছে না। মাগরিব নামাজ শেষে মিতুল আপা যতটুকু শুনেছেন বলতে লাগলেন। আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলাম যে মিতুল আপা কীভাবে খবরটা জানলেন। সেদিন বিকেলে ক্লাবে তাঁদের প্রোগ্রাম ছিল। পরে জানলাম, মিসেস মতিউর রহমান চাচী স্কুল থেকে ফিরে এসে ক্লাবে গিয়ে অন্য চাচীদেরকে ঘটনাটা বলেছেন। মিতুল আপা আমাকে ও ফাতিমাকে ওনার বাসায় নিয়ে যাবেনই। আমরা রাজী হলাম। ততক্ষণে মোজাম্মেল ভাই অপেক্ষা করছেন (মিতুল আপার Husband. শিবিরের নিবেদিত প্রাণ সদস্য ছিলেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক) আমাদেরকে দেখার জন্য দক্ষিণ ক্যাম্পাসের চাচীরা মিতুল আপার বাসায় এলেন। খবর পেয়ে সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম আবু বকর সিদ্দিকুল্লাহ চাচা ও চাচী, রাশেদা আপাসহ অনেকেই এলেন। ছন্দা আপা তখনও জানেন না কারণ সেদিন উনি ক্লাবের প্রোগ্রামে আসেননি। ফলে উত্তর ক্যাম্পাসে খবরটি পৌঁছেনি। মোজাম্মেল ভাই এ্যাম্বুলেন্স Call করে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে ছন্দাপার বাসায় গেলাম। অনেক কঠিন মুহূর্তে যাকে হাসতে দেখি সেই ছন্দাপাও কেঁদে ফেললেন। একটু পরেই বদিউল আলম ভাই এলেন। আলম ভাই ও মোজাম্মেল ভাই ঠিক করলেন এত বড় ঘটনা এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে না। এর কঠিন প্রতিউত্তর দিতে হবে। কিন্তু আমি বাধ সাধলাম। কারণ বিষয়টি জানাজানি হলে পত্রিকায় লেখালেখি হলে কর্মী সমর্থক ঘাবড়ে গিয়ে নিরুৎসাহিত হতে পারেন। আমরা এর বিচার আল্লাহর কাছেই চাইলাম।

রাতে মিতুল আপার বাসায় ফিরে এলাম। সেখানে তিনদিন ছিলাম। মোজাম্মেল-মিতুল দম্পতির সেই স্নেহ ভালোবাসা তো কখনই ভুলবার নয়। ইতিমধ্যেই শহরে রায়হান আপা, মেরিনা আপা, ফজিলা আপাসহ সবাই খবরটি জেনেছেন। মহানগরী সভানেত্রী রায়হান জামিলা আপা ফোনে কেন্দ্রে খবরটি পাঠিয়েছেন। খবর শুনেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভানেত্রী নাজমুন্নাহার নীলু ও কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদিকা সাবিকুন্নাহার মুন্নী চট্টগ্রামে ছুটে এসেছেন। সেদিন দুপুরে রায়হান আপা আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরে নিয়ে এসেছেন। "মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি দেহতুল্য- শরীরের এক অঙ্গ ব্যথা পেলে অন্য অঙ্গগুলোতেও তা সঞ্চারিত হয়"- হাদীসটি হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছি এ ঘটনার পর। সীসাঢালা প্রাচীরের" এই সম্পর্ক যেন সব কষ্ট মুছে দিল।

জীবন বহতা নদী। এর বাঁকে বাঁকে এমন কিছু ঘটনা এমন কিছু স্মৃতির অভ্যুদয় ঘটে যেগুলো উত্তরকালে আমাদেরকে Nostalgic করে তোলে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আজ এখানে উল্লেখ করার প্রয়াস পেলাম। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আরো প্রাণোচ্ছল তা নিয়ে ইসলামী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার তৌফিক দিন, ইচ্ছার কেন্দ্রবিন্দুতে সেটাই একমাত্র বাসনা। #

www.pathagar.com

উম্মে সালমা মুন্নী

[১৯৭৮ সালের বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রথম ১১ জনের ১ জন। তিনি তখনকার আহ্বায়িকা কমিটির সদস্যা ছিলেন। যাদের প্রাণান্তকর সাধনায় এ আন্দোলন প্রাণ পেয়েছে, সেই সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের একজন উম্মে সালমা মুন্নী। পরবর্তীতে তিনি প্রবাস জীবন যাপন করেছেন এবং সেখানেও ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দা ইসলামীক আন্দোলনের উপদেষ্টা।

আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে সৌভাগ্যক্রমে আমরা এই আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্বকে আমাদের কাছে পেয়েছি (আলহামদুলিল্লাহ)। তাই নিকটবর্তী একান্ত সান্নিধ্যে না যেয়ে আমরা পারলাম না। সেই সংগ্রামমুখর অতীতের দিনগুলো তিনি আবেগতাড়িত ভাষায় আমাদের কাছে ব্যক্ত করলেন।

স্মৃতিকথাগুলো সবার জন্য তুলে দেয়া হল–]

আন্দোলনে আমার অংশগ্রহণ পারিবারিকভাবেই মূলত হয়েছে। পারিবারিকভাবে প্রথম থেকেই আমাদের Family টা ইসলামী আন্দোলনের ভাবধারায় ছিল। আমার আম্মা সব সময়ই আমাদেরকে ইসলামী দিক নিদের্শনা দিয়ে গড়ে তুলছেন। ছোটবেলা থেকেই আমি আমার বাড়ির আশ পাশের সবাইকে নিয়ে বিভিন্ন মিছিল মিটিংও করেছি। ৯-১০ বছর বয়সে আমি মহিলাদের নিয়ে মিছিল করেছি এবং ইসলামী বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করতাম। আমি যখন ইডেন কলেজে ভর্তি হই, তখন আমার আম্মা এই নিয়ে চিন্তায় ছিলেন কি করে আমাকে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করানো যায়। যেহেতু আমার ছোটকাল থেকেই আন্দোলনী মনোভাব ছিল, তাই আমার আম্মা শামসুন্নাহার আপা এবং আয়েশা আপাকে বললেন আমাকে যেন সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর আয়েশা 'পা আমাকে টার্গেট নিলেন। প্রথমে ১৯৭৬/৭৭ সালের দিকে আমরা ইডেনে কাজ শুরু করি। আমি ইডেনের নতুন হলে Programme শুরু করলাম । এরপর আমাদের চেষ্টা ছিল কি করে আমাদের হলগুলোতে সংগঠনের কাজ চালু করা যায়। এভাবেই আস্তে আস্তে সংগঠনের কাজে এগিয়ে যাই। তবে আমি এরপরে বেশিদিন কাজ করতে পারিনি। ১৯৭৮ শেষের দিকে আমি বাংলাদেশের বাইরে চলে যাই। তবে ৭৬, ৭৭, ৭৮ সালের সেই সংগ্রামী দিনগুলো এখনো আমাকে দোলা দেয়, অনুপ্রেরণা দেয়।

বর্তমান ছাত্রীসংস্থা দেখে আমার খুবই ভাল লেগেছে। ছাত্রীসংস্থা এতবড় কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ করছে দেখে খুবই আনন্দিত হলাম, তবে আমার মনে হয় ছাত্রীসংস্থাকে আরো সামনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সবদিক থেকে অর্থাৎ জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরো বেশি চিন্তাশীল ও উন্নতি সাধন করতে হবে ছাত্রীসংস্থাকে। কারণ বর্তমান বিজ্ঞানের যুগের চাহিদার আলোকে বলা যায়, সময়ের দাবি ছাত্রীসংস্থাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলাকৌশল এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা প্রয়োজন। এছাড়াও

www.pathagar.com

ছাত্রীসংস্থাকে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় আরো চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান সমাজে ছাত্রীদের নৈতিক অবক্ষয় রোধকল্পে ছাত্রীসংস্থাকে সমাজের ছাত্রীদের সাথে মিশে যেয়ে এ উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের সাথে মিশে যেয়ে আমাদের আদর্শগুলো তাদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামের মৌলিক দিকগুলো খুব কৌশলের সাথে বুঝাতে হবে। তার সাথে সাথে তাদেরকে সমাজের অবস্থা তুলে ধরে ইসলামের দাওয়াতের দিকে আকর্ষণ করাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা এটাই–ছাত্রীদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে নৈতিক শিক্ষা বিস্তার করে, তাদেরকে নৈতিক অবক্ষয় রোধে এগিয়ে আনতে হবে।

ছাত্রীসংস্থাকে এ চিন্তা করতে হবে, টেকনোলোজীর মাধ্যমে কি করে সংগঠনের কাজকে আরো বিস্তার ঘটানো যায়, সে চেষ্টা করতে হবে। তাই অনেক বেশি বেশি বই পড়া দরকার। বিশেষ করে তোমাদেরকে বাংলাদেশের ইতিহাস ভালো করে জানা দরকার। আসল ইতিহাস তোমাদের জানা থাকলে ইনশাল্লাহ্ তোমাদেরকে কেউ ছোট করতে পারবে না। তোমরা উপযুক্ত ও যৌক্তিক জবাবের মাধ্যমে তা সবাইকে জানাতে পারবে এবং সার্বিক দিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কলাকৌশলে আরো সুকৌশলী হতে হবে তোমাদেরকে। তো দোয়া করি আল্লাহ তোমাদেরকে আরো বেগবান করার জন্য পথকে সহজ করে দিন।#

www.pathagar.com

পঁচিশ বছর পেরিয়ে

মাহমুদা সুলতানা ডেইজী

ধরিত্রীর বুকে অনবদ্য জীবনের তরে শুভ্র শশী হাসে
সততই সাবলীল চিত্তে
এই বাংলার বুকে
সে যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।
তিমির রজনী ভেদিয়া পূর্বাশার দ্বারে হেসেছে ঐ প্রভাকর
খোদার শমশের হাতে
তৌহিদের বারতা বয়ে
আজি পঁচিশ বছরের এই সৌষ্ঠব।
আল-কোরআনের আলোয় অস্ফুট হৃদয় করেছে জ্যোতির্ময়।
গর্তের কিনারায় দাঁড়ানো সেই বোনটি
আজ স্বপ্ন দেখে
জলদ ভেদিয়া পাবে জান্নাতী মলয়।
চীর ভাস্বর হয়ে তামাম জগৎ কোলে পেরেসানহীন নবীন প্রসূন
আশাহীন বুকে কোরআনের আলোতে
জেগেছে ছাত্রী সমাজে
নবীজীর উত্তরসূরি হয়ে।
আঁকাবাকা পথ বেয়ে সুন্নাহ্‌র পরাগ মেখে জীবনের অবসাদ ভুলে
চলেছে পঁচিশটি বছর ধরে
যুগের মুয়াজ্জিন হয়ে
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।
সত্যের সংলাপ বয়ে অশোভন উৎখাত করে-ঘটেছে স্ফুরণ
ক্ষুদ্র বাংলার বুকে
জীবন সায়াহ্নে তব খোদার দুয়ারে
হাত তুলে, মোরা মুসলিম!
পঁচিশ বছর পেরিয়ে, নব সঙ্গীত ক্ষণে ডাকি তোমারে, হে বোন!
ছিঁড়ে ফেল পার্থিব ইন্দ্রজাল
শাশ্বত শ্লোগানের তরে।
বসতি গড়ো জান্নাতী মঞ্জিলে।

www.pathagar.com

মহানগরী সমূহের যাত্রা পথে

www.pathagar.com

শুরু থেকে সেই এই অবধি
কোরআনের পথে পথচলা
আঁধারের ভাঁজ কেটে আসবেই ভোর
দৃপ্ত শপথে এই কাফেলা।

তিমির রাত্রি পেরিয়ে একটি আলোকোজ্জ্বল ভোরের প্রত্যাশার মতই জাহেলিয়াতের অন্যায় ও যুলুম মাড়িয়ে মানুষের কাঙ্ক্ষিত একটি সুনির্মল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হয়েছিলো এ কাফেলার। সংখ্যায় তারা অল্প ছিলেন। শুরুটাও ছিল নিতান্তই সাদামাটা। কিন্তু আল কুরআনের আলোকে সমাজে একটি পবিত্র ধারা সৃষ্টির প্রত্যয়ে তাঁরা কতটা সিক্ত ছিলেন, তা খুব সহজেই অনুমেয়। গভীর অন্ধকারের বুকে একখন্ড আলোর সন্ধান করার মত শূন্য থেকেই শুরু হয়েছিলো এবং সবরকম সংকটময় অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে, হতাশার আবর্জনাকে দূরে ঠেলে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা এগিয়ে এসেছে দৃপ্ত শপথে সময়ের শ্রেষ্ঠ দাবি পূরণে। সাময়িক কোন উত্তেজনা সৃষ্টি নয় বরং যথার্থ প্রতিনিধিত্বে ছাত্রীসংস্থা তৎপর। আজকের সময়ের প্রেক্ষাপট তার শ্রান্তিহীন নিরলস পথ চলার সেই অনন্য স্বাক্ষরই বহন করছে। যাই হোক যেহেতু বাংলার সবুজ জমীন ছাত্রীসংস্থার কাজের একমাত্র অঙ্গন তাই স্বাভাবিকভাবেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ চারটি মহানগরীতে কাজের মজবুত অবস্থান তৈরির টার্গেট শুরু থেকেই ছিলো। এ দৃঢ় নিয়তে প্রতিটি মহানগরীতেই শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন কেউ কেউ। যোগ্য সিপাহসালারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিলো তাঁদেরকে। এভাবেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহানগরীতে যাত্রা শুরু হয়েছিলো আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে। চলতে চলতে আজ যে পথে এসেছে ছন্দময় গতিশীলতা। যে পথ আরো অনেক দিগন্তে পথ চলায় আহ্বান করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু এ পথ চলার শুরুটা কেমন ছিলো? কতটাই একাগ্র সাধনায় কেটেছে সে সময়? অতীত হয়ে যাওয়া সেই শুরুকে যদি জানতে পারি আমরা তবে তাই হবে অনাগত ভবিষ্যতের পথে পথচলার সর্বোত্তম পাথেয়। অতীতের সেই অনন্য সময়ের অনুসন্ধানেই- আজকের এ প্রতিবেদন।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাকালের সেই শাখা

ঢাকা মহানগরী

১৯৮১ সাল।

তৎকালীন স্বৈরতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নীতিগতভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে। সেই সাথে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও জীবন যাপনের উত্তম কৌশল অবলম্বনে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় নীতিমালা প্রণয়ন ছিল প্রহসনমূলক। এমতাবস্থায় আদর্শ জীবনব্যবস্থা প্রণয়নে, একটি কাঙ্ক্ষিত সুন্দর সমাজ গঠনের উদ্যোগ নেয়া ছিল সময়েরই দাবি। এহেন পরিস্থিতিতে রাজধানীর বুকে গুটিকতক ছাত্রীর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক চেষ্টাই ছিল আধারের বুকে আলোর মত।

তেমনই সময়ের একটি দিন, ৩০ অক্টোবর।

পিনপতন নীরবতা আর ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ। সবার আবেগ আর উৎকণ্ঠা একীভূত হয়ে কি এক অদ্ভুত অপার্থিব অনুভূতি নিয়ে সমবেত নতুন পরামর্শ সভার সদস্যাগণ। শুরু হলো ছাত্রীসংস্থার ১ম অধিবেশন। একে একে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম শেষে সিদ্ধান্ত হয় "ঢাকা শহর শাখা" আলাদাভাবে বন্টনের। অধিবেশনে "ঢাকা শহর শাখা"র সভানেত্রী হিসাবে প্রথম সেক্রেটারী মুহতারামা নুরুন্নিসা সিদ্দীকার নাম প্রস্তাবিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। কেন্দ্রের ১ম শাখা ঢাকা শহর শাখার ১৯৮১-৮২ সেশনের প্রথম কমিটি গঠিত হয় ৫ জন বোনকে নিয়ে। এরা হলেন :

১৯৮১-১৯৮২ সেশন

সভানেত্রী	-	নুরুন্নিসা সিদ্দিকা
সেক্রেটারী	-	শামসুন নাহার লাকী
বায়তুলমাল ও অফিস	-	বেগম মাসহুদা
সাংগঠনিক সম্পাদিকা	-	পার্সা বেগম
প্রচার বিভাগ	-	নূরুন নাহার

মোরা ছুটেছি দূর্বার গতিতে আলোর মশাল লয়ে

"ঢাকা শহর শাখা" ১৯৮১-১৯৮২ সালে কাজ শুরু করে ১২টি ইউনিট নিয়ে–

১. কলেজ ইডেন ইউনিট
২. ওয়ারী ইউনিট
৩. সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ ইউনিট

www.pathagar.com

৪. মগবাজার ইউনিট
৫. রায়েরবাজার ইউনিট
৬. তেজগাঁও ইউনিট
৭. রোকেয়া হল ইউনিট
৮. মালিবাগ ইউনিট
৯. ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিট
১০. আজিমপুর ইউনিট
১১. শামসুন নাহার হল ইউনিট
১২. সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ইউনিট।

সময়ের গতিধারায় সংগঠন সম্প্রসারণের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ মজবুতি অর্জনের মাধ্যমে আন্দোলনের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ফলশ্রুতিতে শুরু হয় থানাভিত্তিক কার্যক্রমের পরিক্রমা, "ঢাকা শহর শাখা"র নাম হয় ঢাকা মহানগরী। যা ক্রমেই বিকশিত হয় নব্বই-এর দশকে। এ সময় তৃণমূল পর্যায়ে কাজকে ছড়িয়ে দিতে এবং আন্দোলনের গতিকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে ব্যাপক দাওয়াতী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শুরু হয় জোনভিত্তিক কার্যক্রম....।
নতুন শতকের আগমনী ধ্বনি এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটু একটু করে যেন প্রস্তুত করে দেয় ছাত্রীসংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন ঢাকা মহানগরীকে। সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ আর তার যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন ছিল সে সময়ের আন্দোলনের একমাত্র গতিময় সত্ত্বা। আর তাই নতুন শতাব্দীতে ওয়ার্ডভিত্তিক কার্যক্রমের প্রারম্ভিক ঢাকা মহানগরীর কাজের গতিশীলতার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে।

"এ ছিল চাহিদার আলোকে যুগের একমাত্র দাবি।
আন্দোলনের গতিতে বলিষ্ঠ সংযোজন।
চেতনার জগতে এ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।"

যুগের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তারপরও ঢাকা মহানগরী থমকে যায়নি কখনও, পিছপা হয়নি একদম। আন্দোলনের এ নির্ভীক সেনানী, সত্যের পথে দুর্জয়-দুর্দম-অকুতোভয় এ কাফেলার সামনে বারবারই বাধার প্রাচীর এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু রুখতে পারেনি এর অগ্রযাত্রাকে।
চিরকল্যাণের পথে আল্লাহকে পাবার নেশায় ব্যাকুল হয়ে চুটে চলা এ কাফেলার অগ্রযাত্রাই বুঝিয়ে দেয়–

"আমাদের প্রত্যয় একটাই
আল্লাহর পথে মোরা চলবই
নিকশ কালিমাভরা আকাশে
ধ্রুবজ্যোতি তারা হয়ে জ্বলবোই।"

২০০১-২০০২ সেশন থেকে শুরু হয় ওয়ার্ড ভিত্তিক কার্যক্রমের প্রস্তুতি। তখন ঢাকা মহানগরীর ইউনিট সংখ্যা ছিল ১৬৬টি এবং থানা সংখ্যা ৪৫টি। ২০০২-২০০৩ সেশনে ঢাকা মহানগরী ভৌগলিকভাবে ঢাকা সিটি করপোরেশন এর বিভক্তি অনুযায়ী ২১টি থানা এবং ইডেন কলেজ থানা, মেডিকেল থানাসহ ২৩টি থানা ও ওয়ার্ড নিয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক কাজ চালু করে। ২০০৩-২০০৪ ঢাকা মহানগরীর সাংগঠনিক অবকাঠামো নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

সাংগঠনিক অবকাঠামো		অবস্থান
১.	জোন	৯
২.	থানা	২৩
৩.	ইউনিয়ন	১১
৪.	ওয়ার্ড	৯০
	(ক) ইউনিট আছে এমন ওয়ার্ড	৭১
	(খ) ইউনিট নাই এমন ওয়ার্ড	১৯

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা "ঢাকা মহানগরী" শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কাজ শুরু করে সূচনালগ্ন থেকেই। ছাত্রী সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকার সব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঈমানী আলোকবর্তিকা নিয়ে স্বীয় অবস্থান ঘোষণা করে ঢাকা মহানগরীর আলোক সেনানীরা।

দেশের প্রধান ও অন্যতম মহিলা কলেজ 'ইডেন' থেকেই এই অঙ্গনের যাত্রা শুরু। বর্তমানে 'ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' তার ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী অবস্থান আরো দৃঢ় করেছে। ঢাকা মহানগরীর অন্যতম থানা হিসাবে 'ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' কাজ করছে। বর্তমানে এই থানার ইউনিট সংখ্যা ৭টি।

১৯৭৮-১৯৭৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিট ভিত্তিক কাজ শুরু করে। বর্তমানে মেডিকেল থানার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২টি ইউনিট আছে।

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী পুরানো ঢাকায় অবস্থিত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ইউনিট কায়েম হয় ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে। বর্তমানে এটি মেডিকেল থানার অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়া রোকেয়া হল ইউনিট ও শামসুন্নাহার হল ইউনিট বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা অন্তর্ভুক্ত হয়ে কেন্দ্রের একটি শাখা হয়ে কাজ করছে।

ঢাকা মহানগরীর ২৪টি বছর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত স্থানে অস্থায়ী কার্যালয় ছিল। নিউপল্টন, আজিমপুরে ১ম অফিস, ৫০৮, এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজারে ২য় অফিস এবং সবশেষে ঐ একই স্থানের গ্রীনভ্যালী এপার্টমেন্টে ২৫০০ বর্গফুট নিয়ে বর্তমানে সর্বশেষে যে অফিসটি অবস্থান করছে, সেটাই হল ঢাকা মহানগরীর স্থায়ী কার্যালয়। মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে এবং ঢাকা মহানগরীর কর্মী, সুধী ও শুভাকাঙ্ক্ষিদের সহায়তায় ঢাকা মহানগরী তার নিজস্ব কার্যালয় ক্রয়ে সমর্থ হয়।

পাল তুলে দাও ঝাণ্ডা ওড়াও সিন্দবাদ

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ঢাকা মহানগরীর আলোর মশালবাহী দলের কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন যে বোনেরা, ঢাকা মহানগরীর কর্মী বোনেরা তাদেরকে কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করে, তাদের অশেষ পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও ক্লান্তিহীন কর্মনীতি-ই আজকের এই অবস্থানে আসতে সহযোগিতা করেছে–

সেশন	সভানেত্রী	সেক্রেটারী
১৯৮১-১৯৮২	নুরুন্নিসা সিদ্দিকা	শামসুন নাহার লাকী
১৯৮২-১৯৮৩	শামসুন নাহার লাকী	নুরুন নাহার
১৯৮৩-১৯৮৪	শামসুন নাহার লাকী	কামরুন নেছা মাকসুদা
১৯৮৪-১৯৮৫	কামরুন নেছা মাকসুদা	হাবীবা চৌধুরী সুইট
১৯৮৫-১৯৮৬	হাবীবা চৌধুরী সুইট	হোসনে আরা বেগম
১৯৮৬-১৯৮৭	তাসনিম আহমেদ নাজনীন	হোসনে আরা বেগম

www.pathagar.com

সেশন	সভানেত্রী	সেক্রেটারী
১৯৮৭-১৯৮৮	তাসনিম আহমেদ নাজনীন	ফেরদৌস আরা বকুল
১৯৮৮-১৯৮৯	ডাঃ শাহনূর বেগম	শাহীনা পারভীন
১৯৮৯-১৯৯০	শামীমা ইয়াসমীন লায়লা	ফাতেমা খাতুন
১৯৯০-১৯৯১	ফাতেমা খাতুন	নাজমুন নাহার নীলু
১৯৯১-১৯৯২	সাইদা রুম্মান	নাজমুন নাহার নীলু
১৯৯২-১৯৯৩	নাজমুন নাহার নীলু	রোকেয়া বেগম লীনা
১৯৯৩-১৯৯৪	পারভীন আক্তার	আমেনা বেগম
১৯৯৪-১৯৯৫	পারভীন আক্তার	আমেনা বেগম
১৯৯৫-১৯৯৬	আমেনা বেগম	সাবিকুন নাহার মুন্নী
১৯৯৬-১৯৯৭	সাবিকুন নাহার মুন্নী	নাজমুন নাহার নাজমা
১৯৯৭-১৯৯৮	সাবিহা পারভীন	উম্মে খালেদা জাহান
১৯৯৮-১৯৯৯	উম্মে খালেদা জাহান	আলেয়া বেগম সুমী
১৯৯৯-২০০০	আলেয়া বেগম সুমী	নাজমুন নাহার নাজু
২০০০-২০০১	হামিদা আক্তার কাজলী	নাজমুন নাহার নাজু
২০০১-২০০২	নাজমুন নাহার নাজু	শাহনাজ পারভীন
২০০২-২০০৩	নাজমুন নাহার নাজু	খাদিজা আখতার

যাত্রা পথে ছায়াবীথি–

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ঢাকা মহানগরীর চলার পথে যাদের সুপরামর্শ সহযোগিতা, আর্থিক সহায়তা ও স্নেহশীতল ছায়া পেয়েছে তাদের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে।

১. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (তৎকালীন সিটি আমির)
২. সর্দার আব্দুস সালাম (স্থানীয় সংগঠন কায়েমে যার অবদান অগ্রগামী)
৩. প্রিন্সিপাল হাসনা হেনা
৪. সাইয়েদা মুনিরা
৫. শামসুন নাহার নিজামী
৬. অধ্যাপিকা চেমন আরা
৭. মোঃ হেমায়েত হোসেন (ডা. ই. শি. ক পরিচালক)
৮. মীর কাশেম আলী
৯. জনাব কামরুজ্জামান
১০. মো: আবু তাহের
১১. সাইফুল ইসলাম খান মিলন
১২. খোন্দকার আয়েশা খাতুন
১৩. ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের 'নতুন হল" এর মেট্রোন খালাম্মা,
যিনি ইসলামী ছাত্রীসংস্থার জন্মলগ্নে 'মা' এর মত সহযোগিতা করেছেন।

সুর ছন্দ ও কলম সেনানীরা–

ঢাকা মহানগরী সাহিত্য সাংস্কৃতিক কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে ১৯৮৫-১৯৮৬ সেশন থেকে। এ সময় ঢাকা মহানগরীর রাইয়্যান শিল্পীগোষ্ঠী নামে সাহিত্য সাংস্কৃতিক কাজ শুরু করে, পরবর্তীতে কেন্দ্রীয়ভাবে সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কাজকে বাংলাদেশের সর্বত্র একই নামে পরিচিত করার পর্যায়ে এ বিভাগের নাম দেয়া হয় 'সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী।"

ঢাকা মহানগরী সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন করে। ১৯৯৮ সালে ১৯ মে ঢাকা মহানগরী মনোমুগ্ধকর গীতি আলেখ্য, কৌতুক এবং আকর্ষণীয় নাটক পরিবেশন করে। ১৯৯৯ সালে ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে থানা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে থানাগুলো মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ঢাকা মহানগরীর 'সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠী" বিভিন্ন সময় সাধারণ সভা ও কর্মী সমাবেশে গীতি আলেখ্য পরিবেশন করে। ২০০৩ সালে সমন্বয়ের ক্ষুদে শিল্পীরা "আলোর পাখি" শিশু সমাবেশে তাদের সাংস্কৃতিক আয়োজন দিয়ে শিশু ও অভিভাবকদের হৃদয়ে স্থান করে নেয়।

আমাদের প্রকাশনাসমূহ

১৯৮১-১৯৮২ সেশনে ঢাকা শহর শাখা হিসাবে 'উন্মেষ" নামে প্রকাশনা প্রকাশ করে। এর সম্পাদিকা ছিলেন শামসুন্নাহার লাকী। এই সেশনে-ই ভাষা দিবস উপলক্ষে 'বাঙময় বৈভব" নামে প্রকাশনা প্রকাশ করে। এছাড়াও ঢাকা মহানগরী অন্যান্য থানার উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে যেসব প্রকাশনা বের করে তন্মধ্যে–

১৯৯০ ও ২০০৩ সালে মেডিকেল থানার উদ্যোগে 'বিপরীত শব্দাবলী"।

১৯৯১ সালে ইডেন কলেজ থানার উদ্যোগে 'প্রত্যয়", যা পরবর্তীতে ১৯৯৪ সাল থেকে ঢাকা মহানগরীর প্রকাশনা বিভাগ থেকে বার্ষিক প্রকাশনা সীরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে নিয়মিতভাবে প্রকাশ হতে থাকে।

একইভাবে স্কুল বিভাগের পক্ষ থেকে বার্ষিক শিশু কিশোর পত্রিকা 'উন্মেষ" প্রকাশ করতে থাকে নিয়মিত। এছাড়া অতি সম্প্রতি ঢাকা মহানগরীর ডেমরা ও শ্যামপুর থানা অনুক্ষন ও অনুভূতি নামে ২টি হ্যান্ড ম্যাগাজিন প্রকাশ করে।

স্বর্ণালী দিনের প্রত্যাশায় : ঢাকা মহানগরীর যাত্রা শুরুর পর থেকে আজ পর্যন্ত এই গতিময় পথচলায় নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এগিয়ে চলছে আলোকোজ্জ্বল স্বর্ণালী দিনের প্রত্যাশায়। ঢাকা মহানগরীর প্রতিটি ছাত্রীর কাছে ইসলামী আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিটি ঘরে পৌছানোই আমাদের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা।

এছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটকে ঢাকা মহানগরীর সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অংশ নেয় এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক কর্মশালায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ১ম স্থান অধিকার করে।

ঢাকা মহানগরী সাহিত্যিকদের জন্য ত্রৈমাসিক সাহিত্য আসরের আয়োজন করে এবং উন্মুক্ত পরিবেশে স্বরচিত লেখা পাঠানোর মাধ্যমে কচি হাতের লেখিকাদের উৎসাহিত করা হয়। এ বিভাগের উদ্যোগে ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ সেশনে "পরিবর্তন" নামে হ্যাণ্ড ম্যাগাজিন প্রকাশ করে যা সাহিত্যপ্রেমীদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। #

লেখিকা ঃ খাদিজা আক্তার, রাহাত তাসনিয়া সুবর্ণা

www.pathagar.com

ভোরের প্রত্যাশায়

চট্টগ্রাম মহানগরী

চট্টগ্রাম, মহান রবের এক অপরূপ সৃষ্টি। এর আকাশ, বাতাস, পাহাড়, পর্বত, সাগর যেন একটির সাথে আর একটির কি এক নিবিড় বন্ধন। পাহাড়ী সৌন্দর্যে ঘেরা চট্টগ্রামকে বলা হয় প্রাচ্যের রাণী। বিভিন্ন দেশ থেকে ওলী আউলিয়া ও ইসলামী ব্যক্তিগণ প্রথমে এ অঞ্চলে ছুটে এসেছেন, এখান থেকেই বাংলাদেশে ইসলামের সুশীতল পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন। এজন্য এ অঞ্চলকে বলা হয় বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশ দ্বার। সাগরের বিশাল জলরাশির মত উদার চট্টগ্রামবাসীর হৃদয়, পাহাড়ের মত অটল তাদের ঈমান। আসলে সাগর, পাহাড় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মন-মেজাজের ওপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৭১ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ইসলাম বিমুখতার স্রোতধারা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিচ্ছিল; তার সবচেয়ে সহজ শিকার ছিল দেশের নারী সমাজ। এ স্রোতধারা প্রতিরোধে ১৯৭৮ সালে ছাত্রীসংস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে কাজ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখানে ইসলামী আন্দোলনে কাজের বিস্তৃতিতে অনুকূল ছিল না।

১৯৮২ সালে সামরিক বাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ মাত্র ৬ মাস আগের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার এর নিকট হতে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। এরপর ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি পর্যায়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি বরং তা ছিল ভোটকেন্দ্র দখল ও ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের নির্বাচন। অবৈধ পন্থায় এরশাদ নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে নেন। সে সময়ে এরশাদ সরকার ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। বিশেষ করে বড়বড় জনসভা, সেমিনারের ওপর ১৪৪ ধারা নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং পুলিশ বাহিনী দ্বারা হামলা চালায়। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে। বিরোধীদল যখন কোন কর্মসূচি হাতে নিত তখন এরশাদ সরকার জাতীয় পর্যায় হতে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের নেতাদের গ্রেফতার ও হয়রানীর শিকার করেন। সে সময়ে এখনকার মত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এত বিস্তৃত ছিল না এবং জনশক্তির সংখ্যাধিক্য এরূপ ছিল না। প্রতিটি মহল্লায় দু'একটি পরিবার জামায়াতপন্থী ছিল। সরকারের বিরোধিতার কারণে ইসলামী আন্দোলন তার আভ্যন্তরীণ কাজ গোপনে করত এবং দাওয়াতী কাজও অত্যন্ত হেকমতের সাথে সম্পন্ন করতে হতো। এহেন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ১৯৭৮ সালে গঠিত হলেও চট্টগ্রামে এর কাজ শুরু হতে আরও কিছু সময় লেগে যায়। তখন জামায়াত এবং শিবিরের সুদৃঢ় অবস্থানের কারণে তারা নিজেরাই মহিলা ও ছাত্রী অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলনের কাজের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তারা নিজেদের উদ্যোগে আত্মীয় ও পরিচিত মহলে দাওয়াতী তৎপরতা শুরু করেন।

www.pathagar.com

এরই প্রেক্ষিতে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও কেন্দ্রীয় সভানেত্রী খন্দকার আয়েশা খাতুনের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রামে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রথম কমিটি মনোনয়ন হয়। প্রথম কমিটিতে ১৯৮৩-৮৪ সেশনের জন্য চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রথম সভানেত্রী ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রী খালেদা নাসরিন মনি। ঐ সময় চট্টগ্রাম মহানগরীতে ছিল মাত্র একটি ইউনিট এবং তা ছিল আগ্রাবাদ ইউনিট। পরবর্তী একবছর শেষে আরও দু'টি ইউনিট গঠিত হয়। ইউনিটগুলো হলো- পাহাড়তলী ও মাদারবাড়ী ইউনিট। তখন এখনকার মত আলাদাভাবে নয় বরং উত্তর ও দক্ষিণ জেলা একসাথেই কাজ হতো। চট্টগ্রামের প্রথম আঞ্চলিক দায়িত্বশীলা ছিলেন জাহানারা শাহীন নাসিম। এর বিস্তৃতি ছিল সিলেট থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত। পরবর্তীতে ১৯৯০ সাল থেকে সিলেট, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আলাদাভাবে কাজ হতে থাকে। জাহানারা শাহীন নাসিম আপার পরে পর্যায়ক্রমে আঞ্চলিক দায়িত্বশীলার দায়িত্ব পালন করেন- ফাতেমা নার্গিস পাপড়ি, ফরিদা খানম এবং নাহিদ আক্তার। এরপর কাজের বিস্তৃতি হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য একে উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। চট্টগ্রাম মহানগরীতে ধীরে ধীরে কাজের অগ্রগতি বাড়তে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে থানা ও জেলাভিত্তিক কাজ শুরু হয়। ১৯৮৩ সালের পর থেকে চট্টগ্রামে ছাত্রীসংস্থার অগ্রযাত্রাকে আরও বেশি বেগবান করার জন্য যারা কাজ করেছেন তাদের অর্থাৎ দায়িত্বশীলাদের নামের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

সেশন	সভানেত্রী	সেক্রেটারি
১৯৮৩-৮৪	খালদা নাসরিন মনি	আমেনা বেগম
১৯৮৪-৮৫	ফাতেমা নার্গিস পাপড়ি	সেলিনা নার্গিস ডেইজী
১৯৮৫-৮৬	ফাতেমা নার্গিস পাপড়ি	জাহানারা শাহীন নাসিম
১৯৮৬-৮৭	জাহানারা শাহীন নাসিম	ফরিদা খানম
১৯৮৭-৮৮	জাহানারা শাহীন নাসিম	ফরিদা খানম
১৯৮৮-৮৯	জাহানারা শাহীন নাসিম	মেরিনা সুলতানা
১৯৮৯-৯০	মেরিনা সুলতানা	রাবেয়া সুলতানা
১৯৯০-৯১	মেরিনা সুলতানা	হাসিনা ইয়াসমিন রীনা
১৯৯১-৯২	মেরিনা সুলতানা	হাসিনা ইয়াসমিন রীনা
১৯৯২-৯৩	মেরিনা সুলতানা	রায়হান জামিলা
১৯৯৩-৯৪	মেরিনা সুলতানা	রায়হান জামিলা
১৯৯৪-৯৫	মেরিনা সুলতানা	রায়হান জামিলা
১৯৯৫-৯৬	মেরিনা সুলতানা	রায়হান জামিলা
১৯৯৬-৯৭	রায়হান জামিলা	আলবিদা বেগম আরজু
১৯৯৭-৯৮	রায়হান জামিলা	আলবিদা বেগম আরজু
১৯৯৮-৯৯	হাসিনা ইয়াসমিন রীনা	নাহিদ আক্তার
১৯৯৯-২০০০	হাসিনা ইয়াসমিন রীনা	আলবিদা বেগম আরজু।
২০০০- ২০০১	ফয়জুন্নিসা সালমা	উম্মে সালমা
২০০১-২০০২	নাসরিন সুলতানা	শিরিন জাহান
২০০২-২০০৩	নাসরিন সুলতানা	শিরিন জাহান

তবে চট্টগ্রামে ছাত্রীসংস্থার কাজকে যারা বিস্তৃত করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ ফাতেমা নার্গিস পাপড়ি, তাহেরা আক্তার, জাহানারা শাহীন নাসিম, ফরিদা বেগম, মেরিনা সুলতানা এবং রায়হান জামিলা।

তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রামে আজ ইসলামী আন্দোলন অনেক বেশি বিস্তৃত ও মজবুত অবস্থান নিয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরীর ১২টি থানাতেই ছাত্রীসংস্থার কাজ আছে। আর এ ১২টি থানাতে সর্বমোট ইউনিট সংখ্যা ৬১টি।

এভাবেই ছাত্রীসংস্থা কোরআনের আলো হাতে নিয়ে হৃদয় গহীনের অমানিশা ঘুচিয়ে দিকভ্রান্ত ছাত্রীসমাজকে আলোর দিশা দিয়ে যাচ্ছে। #

লেখিকা ঃ রুমানা আক্তার, সহায়ক ঃ নুরুন্নাহার খানম মিশু।

www.pathagar.com

স্মৃতির সাগরে উদ্দাম কলরব

রাজশাহী মহানগরী

বাংলাদেশের ছাত্রীসমাজকে শিক্ষায়-আদর্শে মেধা-মননে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে যোগ্যতম করে গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। এই ছোট্ট কাফেলা ছাত্রীসমাজের মাঝে ইসলামী আন্দোলনের কাজে আঞ্জাম দেবার অঙ্গীকার নিয়ে পদ্মা বিধৌত রাজশাহী মহানগরীতে পদচারণা শুরু করে ১৯৮১ সালে।

স্মৃতিময় মহানগরী রাজশাহী : বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিভাগীয় শহর রাজশাহী। বরেন্দ্র অঞ্চলে শক্ত মাটির ছোঁয়াতে গড়া রাজশাহীর মানুষ যে কোন কাজে দৃঢ় প্রত্যয়ী। সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা এই রাজশাহী শহর। চারিদিক জুড়ে আছে শহিদী রক্তের গন্ধ। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ছোট্ট কাফেলায় রাজশাহী মহানগরীর ছাত্রীসমাজ প্রথম থেকে জড়িত হয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব নিয়ে। রাজশাহী মহানগরীর দক্ষিণ কোণ বেয়ে আল্লাহর প্রশংসা বাণী প্রচার করতে করতে বয়ে চলেছে পদ্মা নদী, পদ্মা নদীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বড় কুঠি যা এখনো জানিয়ে দেয় রাজশাহীবাসী অত্যাচার-নির্যাতনের কাছে মাথানত করে না। রাজশাহী মহানগরীর দরগা পাড়া অবস্থিত শাহমাখদুম ও শাহ তুবকানের সমাধি ভূমি যা এখনো প্রমাণ করে রাজশাহী মহানগরী ইসলামী আন্দোলনের উর্বর ভূমি।

রাজশাহীতে প্রথম কাজের সূচনা : রাজশাহী মহানগরীতে প্রথম কাজের সূচনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রথম সভানেত্রী বোন শাহানারা বেগম। তারই পরিচর্যায় রাজশাহী মহানগরীতে তৈরি হয় দূরদৃষ্টি সম্পন্না এক নেতৃত্ব শামীমা বেগম চুনী। রাজশাহী মহানগরীতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কাজ শুরু করার এক বাস্তব চিন্তা গ্রহণ করা হয় ১৯৮০ সালে নভেম্বর মাসে রানীনগর অঞ্চলে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন শামীমা বেগম চুনী, আরজিনা আক্তার, শামীমা ফেরদৌস, তাসলীমা বেগম।

রাজশাহী মহানগরীতে প্রথম সাংগঠনিক সফর : ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রথম সভানেত্রী খন্দকার আয়েশা আপার প্রথম সাংগঠনিক সফর অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী মহানগরীতে। সফর উপলক্ষে রাজশাহী মহানগরীর পাঠান পাড়ায় মুহতারিমা আনোয়ারা আপার বাসায় এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে শামীমা বেগম চুনীকে সভানেত্রী ও তাসলীমা বেগমকে সেক্রেটারি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। আয়েশা আপা এই কমিটিকে বার্ষিক পরিকল্পনা, ১ সেট বই ও বিভিন্নমুখী দিকনির্দেশনা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের উদ্বোধন করেন।

সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাংগঠনিক অবকাঠামো : সর্বপ্রথম ৩টি ইউনিটের মাধ্যমে রাজশাহী শহর শাখা গঠন করা হয়। ইউনিটগুলি হচ্ছে রানীনগর পাঠানপাড়া ও লফিপুর। এর পর শীতলাইয়ে একটি ইউনিট গঠন করা হয়। এইভাবে ১৯৮৩-১৯৮৬ এর মধ্যে কদমতলা, হেতেম খাঁ, সিপাই পাড়ায় ইউনিট গঠন করা হয়।

www.pathagar.com

১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ এর মধ্যে ৯টি ইউনিট গঠন করা হয়।

১৯৯১-১৯৯৪ সালে ইউনিট সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি।

১৯৯৩-৯৪ সেশনে ১২টি ইউনিটকে ৫টি থানায় ভাগ করা হয়।

১৯৯৬-১৯৯৭ সেশনে ইউনিট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭টি ও থানা ৬টি।

১৯৯৭-৯৮ সেশনে থানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭টি।

১৯৯৮-৯৯ সেশনে ইউনিটের সংখ্যা ছিল ২০টি।

১৯৯৯-২০০৩ সাল পর্যন্ত ইউনিট সংখ্যা ২৪টিতে পৌছিয়েছে।

রাজশাহী মহানগরীর স্মৃতিময় অফিসগুলি : ইসলামী আন্দোলনের চেতনায় বিভোর-মনগুলিকে বিভিন্ন সময়ে একত্রিত করার স্থান হিসাবে প্রথম যে ভাই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থাকে তাঁর বাড়িতে স্থান দিয়েছিলেন তিনি হলেন মুহতারিম মুজিবর রহমান ভাই। তার বাড়ি তখন ছিল হেতেম খাঁ মহল্লায়। এরপর মহানগরী অফিস স্থানান্তরিত হয় কদমতলার শ্রদ্ধেয় সপুরা আপার বাসায়। এই বাড়িটি এখনো সেই কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন সময়ে এই বাড়িটি কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠতো বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কর্মী বোনদের দ্বারা। এরপর মহানগরী অফিস স্থানান্তরিত হয় হেতেম খাঁ আবু মোঃ সেলিম ভাইয়ের বাসায়। দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থানের পর অফিস স্থানান্তরিত হয় হেতেম খাঁ নুরুল ইসলামী মিকরানী স্যারের বাসায়। বর্তমানে ছাত্রীসংস্থার রাজশাহী মহানগরী অফিস সিবোইল বাস টার্মিনালের পেছনে অবস্থান করছে। প্রত্যেকটি অফিসের আনাচে-কানাচে লেগে আছে স্মৃতির ছোঁয়া যে স্মৃতিগুলি এই কাফেলার সামনে এগিয়ে যাবার পাথেয়।

সূচনালগ্নে রাজশাহী মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কাজের শুরু : রাজশাহী মহানগরীকে শিক্ষা নগরী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শান্ত সুনিবিড় পরিবেশে অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সাক্ষী বহন করছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা তার দাওয়াতের পসরা নিয়ে এগিয়ে গেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ : এই কলেজটি রাজশাহীর অন্যতম বিদ্যাপীঠ। রাজশাহী কলেজের মহিলা হোস্টেলে কাজ শুরু হয় ১৯৮৯ সাল থেকে। বিভিন্ন সময় দূরদৃষ্টিসম্পন্না নেতৃত্বের পরিচালানায় মুখরিত হয়ে ওঠে রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গণ।

রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় : রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে কাজের সূচনা হয় ১৯৮৯ সাল থেকে। DMC থেকে দুজন ছাত্রীসংস্থার বোন আসে রামেকসু নির্বাচন উপলক্ষে। দাওয়াতী কাজের পরে বোন হালিমা খাতুন শাহীনকে দায়িত্ব দিয়ে একটি দাওয়াতী ইউনিট গঠন করা হয়। এরপর থেকেই সাবিহা ইয়াসমীন মনি, ফাতেমা সিদ্দিকা, ফেরদৌসী বেগম ও শাহ্নাজ পারভীন এর নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে কাজ চলতে থাকে। রাজশাহী মহিলা কলেজ, N T C ও পোস্টাল একাডেমীতে কাজ শুরু হয় ৯০ এর দশক থেকে।

বিভিন্ন সময়ে কলেজ সংসদ নির্বাচনে ছাত্রীসংস্থার অংশগ্রহণ : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ছাত্রীসমাজের অধিকার আদায় ও সমস্যা সমাধানে তার জন্মলগ্ন থেকেই সোচ্চার। ৩ দফা কর্মসূচির ৩য় দফা হচ্ছে ছাত্রীসমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ। এই ৩য় দফা বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা বিভিন্ন সময়ে কলেজ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৮ সালে রাকসু নির্বাচনে সেন্ট্রাল প্যানেলে ছাত্রী সহসম্পাদিকা পদে রাজশাহী মহানগরী থেকে অংশগ্রহণ করে সাবরীনা শারমিন (বনি)।

রাজশাহী কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার রাজশাহী মহানগরীর কর্মী বোনেরা দুইবার বিজয়ী হয়। প্রথম রাজশাহী কলেজ কমনরুম সম্পাদিকা ছিলেন ছাত্রীসংস্থার কর্মী বোন ফেরদৌসী বেগম বেলী। ২য় বার নির্বাচিত হন মোবাশ্বেরা মেরিনা।

রাজশাহী পলিটেকনিকে ছাত্রীসংস্থার কর্মী বোনেরা ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রামেকসু নির্বাচনেও আমাদের বোনেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কলেজ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ছাত্রীসংস্থার বোনেরা বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী মহানগরীতে দাওয়াতের কাজে অগ্রসর ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা : অপসংস্কৃতির সয়লাবে সমাজ যখন ছেয়ে গেছে। ছাত্রীসমাজ যখন নগ্নতায় মেতে উঠেছে। সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার পিপাসায় যখন ছাত্রীসমাজ কাতর হয়ে উঠেছে তখন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা সাবরীনা শারমিন বনিকে পরিচালিকা করে সর্বপ্রথম ব্যতিক্রম সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কাজের উন্মেষ ঘটায়।

এই সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এখনো কাজ করে যাচ্ছে ছাত্রীসমাজকে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক অঙ্গন উপহার দেবার প্রয়াসে।

প্রথম প্রকাশনা : সাহিত্য মানুষের জীবনের আয়না। সাহিত্যের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজে মেধামননের সমন্বয় ঘটে। ইসলামের দাওয়াতকে সকল ছাত্রীর মনের মনিকোঠায় পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯-৯০ সেশনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা রাজশাহী মহানগরী শাখা 'উসওয়াতুন হাসানা' নামে সর্বপ্রথম একটি সিরাত স্মারক প্রকাশ করে যার সম্পাদিকা ছিলেন সাবরীনা শারমিন বনি। এই প্রসংগে যাদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তারা হলেন ভূতত্ত্ব ও মৃত্তিকা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল মান্নান ভাই ও ওয়াহীদা আপা যাঁরা এখন ফিনল্যান্ড প্রবাসী। তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় রাজশাহী মহানগরী তার স্বপ্নের 'উসওয়াতুন হাসানা' এর প্রথম প্রকাশকে সফল করতে পেরেছিল।

প্রতিরোধের মুকাবেলায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা রাজশাহী মহানগরী : 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কুফরি শক্তির প্রতি বজ্রকঠিন এবং পরস্পরের প্রতি দয়াশীল' বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা রাজশাহী মহানগরীর কর্মী বোনদের সম্পর্ক সীসাঢালা প্রাচীরের মত কিন্তু প্রতিরোধের মুকাবেলায় বজ্রকঠিন। বিভিন্ন সময়ে কর্মী বোনেরা প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সাথে তারা সেই প্রতিরোধের মুকাবেলা করেছে। রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ তৎকালীন ছাত্র মৈত্রির ঘাঁটি ছিল। তাদের ঘোষণা "এখানে ইসলামী আন্দোলনের কথা বলার অধিকার কারও নাই।" ১৯৮৮-৮৯ সেশনে শামীমা বেগম চুনীর নেতৃত্বে একটি দাওয়াতী গ্রুপ যায় নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজে ছাত্রীদের মাঝে দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে, ছাত্রী বোনদের সাথে কথা শুরু করতেই– সন্ত্রাসী গ্রুপ কমন রুমের গেট অবরোধ করে। ছাত্রীসংস্থার বোনেরা যুক্তির ভিত্তিতে তাদের সাথে কথা বলে। তবে তাঁরা আল্লাহর সেই বাণীর কথা স্মরণ করে "আর জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে তারা বলে তোমাদেরকে সালাম"। পরে অবশ্য ছাত্রমৈত্রীর অবরোধকারীদের লীডার এসে ছাত্রীসংস্থার বোনদের কাছে ক্ষমা চেয়ে যায়। এখন নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজে ছাত্রীসংস্থার কাজ কিছুটা শুরু হয়েছে। রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত আমবাগান অঞ্চল। এই অঞ্চলে ছাত্রীসংস্থার বোনেরা রাকসু নির্বাচনের কাজ করার জন্য প্রবেশ করলে আওয়ামী-বাকশালীদের প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। ছাত্রী বোনেরা এই প্রতিরোধও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাটিয়ে ওঠে। এখানেও ছাত্রীসংস্থার দাওয়াত পৌঁছেছে এবং এখান থেকেও কিছু কর্মী বোন বের হয়ে এসেছে। রাজশাহী পলিটেকনিকে বোনেরা কাজ করতে যেয়ে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার রাজশাহী মহানগরীর বোনদের গতি তারা রুখতে পারেনি। এই মহানগরীর ছাত্রী অংগনে এক স্মরণযোগ্য নাম বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।

যাঁদের অবদান ভোলার নয় : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থায় যারা অবদান রেখেছিলেন তারা অনেকেই আজ দুনিয়াতে নেই, তবে যার কথা আজ বেশি মনে পড়ে যিনি রাজশাহীতে মহিলা অংগনে হেদায়েতের আলো জ্বালাবার জন্য বেশি অবদান রেখেছিলেন, যাঁর বাড়িতে প্রথম ছাত্রীসংস্থার মহানগরী কমিটি গঠন করা হয় সেই আনোয়ারা খালাম্মা– আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতবাসী করেন। এরপর যাঁদের নাম আসে তাহেরা সাইদ খালাম্মা যিনি এখন খুলনায় অবস্থান করছেন। জামায়াত ইসলামীর রাজশাহী মহানগরীর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি- মাহমুদা আকন্দ। মহানগরী আমীর ভাই আতাউর রহমান, আব্দুল মান্নান ভাই।

যাঁদেরকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে আজকের এই ইমারত : যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা মেধা-মননে গড়ে উঠেছে আজকের এই ইমারত, যাঁদের গতিময় পায়ের ছাপ আজও স্মৃতিময় হয়ে আছে এই মহানগরীর আনাচে-কানাচে তাদের নাম উল্লেখ না করলে প্রেক্ষাপট বর্ণনা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। প্রথমেই যাঁর নাম আসে সেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব শাহানারা আপা সপুরা আপা, শামীমা বেগম চুনী, তাসলীমা আপা, শাহীন আরা, রাফিয়া খাতুন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এই শাখা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার সর্বোচ্চ মান সদস্যা শাখার মর্যাদা লাভ করে ২০০২-২০০৩ সেশনে।

১৯৮১-২০০৩ পর্যন্ত যেসব বোনেরা রাজশাহী মহানগরীতে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে তাদের নাম :

www.pathagar.com

সেশন	সভানেত্রী	সেক্রেটারি
১৯৮২-৮৩	শামীমা বেগম চুনী	তাসলীমা খাতুন
১৯৮৩-১৯৮৪	শামীমা বেগম চুনী	আরজিনা-আক্তার
১৯৮৪-১৯৮৫	শামীমা বেগম চুনী	সপুরা খাতুন
১৯৮৫-১৯৮৬	শামীমা বেগম চুনী	সপুরা খাতুন
১৯৮৭-১৯৮৮	সপুরা খাতুন	শাহীন আরা
১৯৮৭-১৯৮৮	শামীমা বেগম চুনী	ওয়াহীদা আক্তার
১৯৮৮-১৯৮৯	ওয়াহীদা আক্তার	আরজিনা আক্তার
১৯৮৯-১৯৯০	সালেহা খাতুন	ওয়াহীদা আক্তার
১৯৯০-১৯৯১	আরজিনা আক্তার	হাসিনা তৈয়বা
১৯৯১-১৯৯২	আরজিনা আক্তার	মুর্শিদা খাতুন
১৯৯২-১৯৯৩	সখিনা খাতুন	সাবরীনা শারমিন বনি
১৯৯৩-১৯৯৪	সাবরীনা শারমিন	তাহ্‌সিনা খাতুন
১৯৯৪-১৯৯৫	তাহ্‌সিনা খাতুন	শামসাদ জাহান
১৯৯৫-১৯৯৬	তাহ্‌সিনা খাতুন	সামশাদ জাহান
১৯৯৬-১৯৯৭	তাহ্‌সিনা খাতুন	হাসিবা ওবাইদা
১৯৯৭-১৯৯৮	তাহ্‌সিনা খাতুন	হাসিবা ওবাইদা
১৯৯৮-১৯৯৯	তাহ্‌সিনা খাতুন	তসলিমা খাতুন সালমা
১৯৯৯-২০০০	শামীমা আক্তার সীমা	তসলীমা খাতুন সালমা
২০০০-২০০১	শামীমা আক্তার সীমা	ফাহ্‌মিদা সুলতানা
২০০১-২০০২	মোমেনা খাতুন জলি	শাহনাজ পারভীন
২০০২-২০০৩	মোমেনা খাতুন জলি	খন্দকার সাজেদা বেগম

বর্তমান সম্ভাবনা : সমৃদ্ধ অতীত বর্তমানের জন্য আলোকবর্তিকা যা সামনে চলার পথকে করে আলোকিত। যদিও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা রাজশাহী মহানগরী তার সূচনা লগ্নকে খুব জমজমাট করতে পারেনি তবুও সেই সময়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কণ্ঠস্বর আজও দিকনির্দেশনা দেয় মহানগরীর বোনদের। এরই ফলশ্রুতিতে আজ রাজশাহী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। #

লেখিকা ঃ সাবরীনা শারমিন (বনি)

www.pathagar.com

অতীতের স্রোতধারা

খুলনা মহানগরী

তার কথার চেয়ে উত্তম কথা কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা দেয় নিশ্চয় আমি মুসলিম। - আল কুরআন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির রহমতস্বরূপ পাঠালেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী, মানবতার মুক্তির মহান দূত প্রিয় নবী রাসূল (সঃ)কে। দীনের কাজে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বিদুষীনি মহিলা রাসূল (সঃ) এর সহধর্মিণী হযরত খাদিজা (রাঃ)।

নবী রাসূলের যুগ শেষ, শেষ হয়েছে তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনদের যুগও। তাই বলে শেষ হয়ে যায়নি আল্লাহর কুরআনের ঐ হেরার রশ্মির আহ্বান। দ্বীনের কাজে মহিলারাও পিছিয়ে থাকেনি। ইসলামের পথে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন সম্মানিতা সাহাবা হযরত সুমাইয়া (রাঃ)।

সেই আদর্শের পথ বেয়ে ১৯৭৮ সালের ১৫ই জুলাই ১১ জনের এক কাফেলা নিয়ে যাত্রা শুরু করে আমাদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। পরদিন পত্রিকার মাধ্যমে সারাদেশে এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় শহরে বন্দরে, আনাচে-কানাচে, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ায় আল্লাহর রঙে রঙিন ও তার রহমতের সাগরে সিক্ত হবার আশায় পথহারা তরুণীরা এ সংস্থার ছায়াতলে প্রশান্তির আশ্রয় খুঁজতে শুরু করে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত খুলনায় ভৈরব ও রূপসা নদীর মিলনস্থলে ইসলামী ছাত্রীসংস্থা যাত্রা শুরু করে ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকে। এর পিছনে যাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ ছিল তারা হলেন বর্তমান দৈনিক সংগ্রামের খুলনা প্রতিনিধি শেখ বেলালুদ্দিন এবং গাউছুল আযম হাদী ভাই।

খুলনা নূরনগর জামায়াতের প্রবীণ রুকন মুহাম্মদ কাজেম আলী সাহেবের বাসায় সর্বপ্রথম ছাত্রীসংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। হুমায়রা পারভীন আপুর সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রোগ্রাম শুরু হয়। সেই প্রোগ্রামে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন-

- হাসিনা খাতুন, বর্তমানে সৌদী আরবে আছেন।
- তাহেরা খাতুন, বর্তমানে ঢাকায় মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষিকা।
- শামসুন্নাহার জাহিমা, বর্তমানে ঢাকার মতিঝিলে আছেন।
- দোররশ সাহার লাকী, বর্তমানে রাজশাহী আছেন।
- নাজমুন্নাহার, বর্তমানে খুলনায় আছেন।
- হুমায়রা পারভীন আফু, বর্তমানে ঢাকায় আছেন।
- খুকু, প্রবাসী
- মাহমুদা হক আলফা, ঢাকায় আছেন।

www.pathagar.com

উপরোক্ত বোনদের উপস্থিতিতে খুলনা মহানগরীর প্রথম সভানেত্রী হিসেবে মনোনীত হলেন খুলনা তথা সারা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলেমে দীন মাওলানা এ.কে.এম ইউসুফ সাহেবের মেয়ে হাসিনা খাতুন। সেই ১৯৭৯ সালের মে মাসের কথা। তিনি দায়িত্ব পালন করেন প্রায় পাঁচ মাসের মত। ইতিমধ্যে বিয়ে হবার সুবাদে পাড়ি জমালেন সৌদী আরবে।

ক্রমবিকাশ

প্রথম নির্বাচিত সভানেত্রী শামসুন্নাহার জাহিমা ঃ

১৯৮০-৮১ এবং ৮১-৮২ সেশনে সংগঠনের বপনকৃত বীজকে মহীরূহে পরিণত করার দায়িত্বে এগিয়ে আসেন দ্বিতীয় সভানেত্রী বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আমাদের প্রিয় বোন শামসুন্নাহার জাহিমা। তিনি এ সংগঠন গড়ে তোলার জন্য রাতদিন প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এমন ছিল যে অনেক ছাত্রী লুকিয়ে থেকেও তার চোখ এড়াতে পারেনি। এই সময় খুলনা মহানগরীতে তিনটি ইউনিট গঠিত হয় এবং কর্মী সংখ্যা ১০ জন। দিনরাত পরিশ্রম করে সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ছাত্রীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন সংগঠনের জনশক্তি বৃদ্ধির আশায়। তখনকার সময়ে ছাত্রীসংস্থার কাজ ছিল কলেজ কেন্দ্রীক। খুলনা সরকারী মহিলা কলেজকে কেন্দ্র করে এই সংগঠনের কাজের সম্প্রসারণ ঘটে। এ সময়ে প্রথম ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় বয়রা হাজী ফয়েজউদ্দিন স্কুলে। এখানকার কাজের অবস্থা কেন্দ্রের অজানা থাকার কারণে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। এজন্য সাংগঠনিক সিস্টেমে এ অনেক ঘাটতি ছিল। ফলে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানের সভানেত্রী হিসেবে একজন সাধারণ মহিলাকে রাখা হয়। শামসুন্নাহার জাহিমা আপা কলেজে নতুন ভর্তি ছাত্রীদের তালিকা কলেজ অফিস থেকে সংগ্রহ করে সেইসব ছাত্রীদের বাড়িতে ঈদকার্ড পাঠিয়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন নতুন ছাত্রীদের মাঝে। তার এই হিকমতপূর্ণ কর্মতৎপরতার কারণে ছাত্রীসংস্থার নামের সাথে অনেক ছাত্রী পরিচিত হলো এবং অনেক ছাত্রীকে সমর্থক হিসেবে পাওয়া গেল। এ সময়ে কলেজে ছাত্রীসংসদ নির্বাচনে ছাত্রীসংস্থা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। শামসুন্নাহার জাহিমা আপার নেতৃত্বে প্রথম শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয় সুন্দরবনে এবং প্রথম পিকনিক হয় মনুশেখের দিঘির পাড়ে। ছাত্রীসংস্থার কাজের এই অগ্রগতি দেখে মহিলাদের মাঝে দ্বীনি আন্দোলনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং ১৯৮১ সালে মহিলাদের মাঝে কাজ শুরু হয়।

কিছুটা প্রতিকূলতার সম্মুখীন ঃ মিসেস রেজাউন্নেছার পরিচালনায় খুলনা পাবলিক লাইব্রেরি অডিটরিয়ামে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় কিন্তু প্রোগ্রামের পূর্ব মুহূর্তে অনুমতি নাকচ করে দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় মেহমানদের উপস্থিতিতে এই সাধারণ সভা তাৎক্ষণিকভাবে P.M.G এর T.T.C. তে অনুষ্ঠিত হয়। তখনকার সময়ের আরেকটি ঘটনা। মহানগরীতে প্রথম শিক্ষা শিবির এর আয়োজন করা হয়। নিউজপ্রিন্ট মিলের এক অফিসারের মিল কলোনীস্থ বাসায় শিক্ষা শিবির হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রোগ্রামের পূর্ব মুহূর্তে মিল কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে স্যাটেলাইট স্কুলের পাশে একটি বাড়িতে শিক্ষা শিবির সম্পন্ন করা হয়। শিক্ষা শিবির তে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন আঞ্জুমান আরা এবং নূরুন্নেছা আপা। শিক্ষা শিবির শেষে রাতে স্যাটেলাইট স্কুলে সাধারণদের নিয়ে একটি উন্মুক্ত অনুষ্ঠান হয় এবং ব্যাপক উপস্থিতি হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হাফেজা আসমা খালাম্মা।

১৯৮৫-৮৬ সেশনে দায়িত্ব পালন করেন আইনুন নাহার আঞ্জু। হঠাৎ যশোর থেকে খুলনা মহানগরীতে এসে দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়ে। দুই সন্তানের জননী সভানেত্রীর পক্ষে কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কর্মীদের সহযোগিতায় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়। খুলনা থেকে তিনি প্রথম কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সদস্যা হন। ফলে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং মহানগরীর কাজ আরো গতিশীল হয়।

হুমায়রা পারভীন আফুর দুইটি সেশন ঃ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্জ শামসুর রহমান সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা হুমায়রা পারভীন আফুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজও কর্মীদের অনুপ্রেরণা যোগায়। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর উপস্থিতিতে ফররুখ একাডেমীতে শিক্ষা শিবির হয়। খুলনার বোনেরা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং ইউনিট বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজে গতিশীলতা আসে।

www.pathagar.com

এক সংগ্রামী নেতৃত্ব ঃ ১৯৮৯-৯১ সেশন দুইটি বছর দায়িত্ব পালন করেন ফাতেমা খাতুন। এই সময়ে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করার কারণে প্রথম সন্তান হিসাবে পরিবারের অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মহানগরীর মত বিশাল এলাকার দায়িত্ব পালন করা তাঁর জন্য কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করেন এবং সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি গ্রুপ প্রশিক্ষণগুলো কার্যকরী করার ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব দেন এবং মহানগরীর সর্বত্র সহীহ কোরআন প্রশিক্ষণ চালু করেন। সুধীদের মধ্যে তাঁর বেশ গ্রহণযোগ্যতা ছিল এবং সুধী ও কর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতার কারণে মহানগরীর দায়িত্ব পালন করা তার সহজ হয়।

পরবর্তী সেশনে পরামর্শ সভার সদস্যা এবং খুলনা জেলার দায়িত্বশীলা হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর এবং খুলনা জেলা নিয়ে খুলনা সাংগঠনিক জেলা গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিয়ে হয়ে যাবার কারণে তিনি সুদূর আমেরিকা পাড়ি জমান। চলে যাবার আগে মহানগরীর পক্ষ থেকে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং কর্মীদের মাঝে এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

১৯৯১-১৯৯৩ সেশন ঃ ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী কাফেলার দায়িত্ব বহন করেন তানজিলা খাতুন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং দৃঢ়তার সাথে তিনি এ জিহাদী কাফেলাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে থাকেন। কল্যাণ ফান্ড এবং বায়তুলমাল সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে অনেকটা সফল হয়েছিলেন।

আদর্শের ব্যাপারে আপোষহীন নেতৃত্ব ঃ ১৯৯৩-৯৪ সেশনে মহানগরীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শামসুন্নাহার। এই সময়ে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংগঠন প্রসারের কাজ চলতে থাকে। এই সময়ে ইউনিট সংখ্যা ছিল ১২টি এবং কর্মীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০ জন। টি.সি, টি.এস. কর্মী সমাবেশ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয় এবং ব্যাপক দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে সংগঠন সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হয়। জনশক্তির মানউন্নয়ন ও আত্মিক মজবুতীর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়।

পরবর্তী চারটি সেশনের কথা ঃ ১৯৯৩-৯৪ সেশন থেকে ১৯৯৭-৯৮ সেশন পর্যন্ত দীর্ঘ চারটি বছর মহানগরীর সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন কোহিনূর ইয়াসমিন লিপি। পূর্বে মহানগরীতে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেক হোঁচট খেতে হয়। তবে কর্মীদের সহযোগিতায় এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের অকৃত্রিম ভালবাসায় সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হন।

প্রাক্তন বোনদের সাংগঠনিক মান বৃদ্ধি, ছাত্রীসংস্থার কাজে ময়দানে সহযোগিতা ও আর্থিক সাহায্য এ তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৫-৯৬ সেশনে আয়োজন করা হয় মহানগরীর অফিস কক্ষে প্রাক্তন ছাত্রী পুনর্মিলনী। অধিকাংশ প্রাক্তন বোনেরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

আল্লাহর মেহেরবানীতে ১৯৯৭ সালের ৭ই অক্টোবর চারজন সদস্যা নিয়ে সদস্যা শাখা ঘোষণা দেয়া হয়। এবং ৯৮ সালে ১২ জন সদস্যা হয়। এ সময়ে বদর দিবস উপলক্ষে কর্মী সমাবেশে কর্মীদের বাধ্যতামূলক হাজির করার মাধ্যমে কর্মীদের একটি সঠিক তালিকা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সমাবেশে ৮ জন কর্মী শরিয়ী কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকায় তাদেরকে কর্মী মান থেকে বাদ দেয়া হয়। নিরলস পরিশ্রম করে সুধী বৃদ্ধি এবং বায়তুলমাল সমৃদ্ধ করা হয়। সংগঠন সম্প্রসারণের কাজের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়। ফলে ১২টি ইউনিট ৩৬টি ইউনিটে উন্নীত হয়।

১৯৯৭-৯৮ সেশনে খুলনায় প্রথম শিশু সংগঠন চালু হয়। ১৯৯৮ সালে ১০০ জন আলোর পাখির উপস্থিতি আলোর পাখিদের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সুধীমহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে।

ফয়জুন নাহার পাঠান আপার তিনটি সেশন

শহীদ কাশেম পাঠান এর ছোট বোন ফয়জুন নাহার পাঠান স্বীয় মেধা ও যোগ্যতার সমন্বয় ঘটিয়ে এবং সদস্যা বোনদের আন্তরিক সহযোগিতায় সংগঠনের কাজকে মজবুতীর দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হন। এ সময়ে সেক্রেটারি নূরুন্নাহার পলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। উপযুক্ত জায়গার অভাবে এক সুধীর বাসায় টি.সি. করা হয় এতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে আর টি.সি. করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রশিক্ষণের ঘাটতি পূরণের জন্য বিভিন্ন টি.এস. এর আয়োজন করা হয়। একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রাক্তন সভানেত্রী ফাতেমা আপা আমেরিকা থেকে আসেন এবং অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে প্রাক্তন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান হয়।

www.pathagar.com

অফিস ঃ

"বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোর চেয়ে ছাত্রসংঘের অফিসই আমার নিকট প্রিয়।"

- শহীদ আবদুল মালেক

কিন্তু প্রিয় এই অফিস আমাদের না থাকায় বিভিন্ন বাসায় আমাদের কার্যক্রম চালাতে হয়। যেসব বাসায় আমরা অফিসের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি তাদের অবদান আমরা কখনো ভুলতে পারব না। যেসব বাসায় বাসায় অফিসের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়- ১. শামসুন্নাহার জাহিমা'র বাসা, ২. মিসেস রেজাউন্নেছা'র বাসা, ৩. গুলশানদের বাসা।

উল্লেখ্য যে, মরহুম মুজিবুল হক সাহেবের মেয়ে গুলশান একজন সাধারণ ছাত্রী হয়েও আমাদের অফিসের সমস্যার কথা শুনে স্বেচ্ছায় তাদের বাড়ির একটি রুম আমাদের দিতে রাজি হলেন এবং ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সেখানেই আমাদের অফিস থাকে এবং প্রায় ১২ বছর তাদের পুরো পরিবারের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা আমাদের কাজকে গতিশীল করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে অফিস ভাড়া করতে সক্ষম হই।

বর্তমানে আমাদের অফিস সোনাডাঙ্গা থানার পিছনে এম.পি মুফতী আবদুস সাত্তার সাহেবের জামাতা ইসলামী ব্যাংকের ম্যানেজার মোশাররফ সাহেবের বাড়ি।

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

সংগঠনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু থাকলেও নফীসা সিদ্দিকাহর নেতৃত্বে রেনেসাঁ' নামে প্রথম শিল্পীগোষ্ঠী এবং পরবর্তীতে 'প্রত্যয়' নামে সাহিত্য গোষ্ঠী গঠিত হয়।

- রেনেসাঁ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রথম শিল্পী ছিলেন কামরুন্নাহার সালমা।
- নফীসা সিদ্দীকার পরিচালনায় প্রথম গীতি আলেখ্য 'নবীর দেশে আয়' অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৯০ সাল থেকে 'প্রত্যাশা' নামক পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু হয় এবং এ পর্যন্ত ৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

'প্রত্যয়' এবং 'প্রত্যাবর্তন' নামে ২টি হ্যান্ড ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

- ১৯৯৭-৯৮ সেশনে থানা ভিত্তিক দেয়ালিকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এবং প্রায় সবগুলো থানা থেকে দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়।
- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সাহিত্য আসরের আয়োজন করা হয়।

কলেজ বিভাগের কার্যক্রম ঃ ১৯৭৯ সাল থেকে খুলনা সরকারী মহিলা কলেজ এবং বি.এল কলেজে কাজ শুরু হয় এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হয়।

- বি.এল কলেজে প্রথম সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন রেজাউন্নেছা।
- 'প্রত্যয়' নামে মহানগরীর প্রথম দেয়ালিকা বি.এল. কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়।
- বিএল কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রথম কমনরুম সম্পাদিকা হিসাবে নির্বাচিত হন মরিয়ম এবং সহ সম্পাদিকা তাহমিনা। পরবর্তীতে কমনরুম সম্পাদিকা নির্বাচিতা হন তানজিলা খাতুন।

এরপর কমনরুম সম্পাদিকা নির্বাচিত হন লিজা এবং সহ-সম্পাদিকা সায়েরা।

খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হয়, ছাত্রীসংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত পরিষদ দেয়া হয়।

- লুৎফা-রীনা-জাহিমা পরিষদ,
- আনিছা-জেসমিন-লাকী পরিষদ
- আয়শা-মেঘনা-পাপিয়া পরিষদ
- নাজমা-ফরিদা-সায়রা পরিষদ
- পারভীন-শিমুল-মেরী পরিষদ
- রেহেনা-নিগার-আশা পরিষদ।

এছাড়াও খুলনা সরকারি পাইওনিয়ার কলেজসহ অন্যান্য কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

চলমান কার্যক্রম ঃ পূর্বের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এবং সংগঠনকে আরও গতিশীল করতে বর্তমান সদস্যা ও কর্মীরা তাদের মেধা ও চিন্তা দিয়ে সার্বক্ষণিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

- গত দুই বছর যাবৎ মেধাবী ছাত্রীদের নিয়ে মহানগরী বিশেষ ছাত্রী সমাবেশ করে এবং ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে।
- স্কুল কর্মীদের নিয়ে খুলনায় বিভাগীয় যাদুঘরে শিক্ষাসফর অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান এর উপস্থিতিতে ছাত্রী ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং সমাবেশ শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। এতে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।
- বড় হল রুমের অভাবে শিক্ষা শিবির করা সম্ভব হচ্ছে না এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

বর্তমানে মহানগরীতে ৩৬টি ইউনিট রয়েছে। ইউনিটগুলোর যথাযথ তদারকীর জন্য ১২টি থানা ও ৫টি জোন রয়েছে। স্কুল, কলেজ, সাহিত্য-সাংস্কৃতিকসহ বেশ কয়েকটি বিভাগে বর্তমানে কার্যক্রম চালু রয়েছে।

নিম্নোক্ত বিভাগগুলোতে বর্তমান কার্যক্রম চালু রয়েছে।

১. বায়তুলমাল বিভাগ, ২. অফিস বিভাগ, ৩. কলেজ বিভাগ, ৪. স্কুল বিভাগ, ৫. দাওয়াতী এলাকা বিভাগ, ৬. সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিভাগ, ৭. প্রচার প্রকাশনা বিভাগ, ৮. কল্যাণ ফান্ড বিভাগ, ৯. মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ।

২৫ বছরের সভানেত্রী সেক্রেটারিদের তালিকা ঃ

সেশন	সভানেত্রী	সেক্রেটারি
১৯৭৯-৮০	হাছিনা পারভীন	মরিয়ম বেগম
১৯৮০-৮১	সামসুন্নাহার জাহিমা	সাঈদা পারভীন শিউলী
১৯৮১-৮২	সামসুন্নাহার জাহিমা	সাঈদা পারভীন শিউলী
১৯৮২-৮৩	রেজাউন্নেছা	আনিছা সিদ্দিকা
১৯৮৩-৮৪	রেজাউন্নেছা	আনিছা সিদ্দিকা
১৯৮৪-৮৫	রেজাউন্নেছা	আনিছা সিদ্দিকা
১৯৮৫-৮৬	আইনুন্নাহার আঞ্জু	রেজাউন্নেছা
১৯৮৬-৮৭	রেজাউন্নেছা	ইসমাত জাহান শামসী
১৯৮৭-৮৮	হুমায়রা পারভীন আফু	ইসমাত জাহান শামসী
১৯৮৮-৮৯	হুমায়রা পারভীন আফু	ফাতেমা খাতুন
১৯৮৯-৯০	ফাতেমা খাতুন	তানজিলা খাতুন
১৯৯০-৯১	ফাতেমা খাতুন	তানজিলা খাতুন
১৯৯১-৯২	তানজিলা খাতুন	সামসুন্নাহার
১৯৯২-৯৩	তানজিলা খাতুন	সামসুন্নাহার
১৯৯৩-৯৪	সামসুন্নাহার	তাসলিমা খাতুন রুবী
১৯৯৪-৯৫	কোহিনূর ইয়াসমিন লিপি	তাসলিমা খাতুন রুবী
১৯৯৫-৯৬	কোহিনূর ইয়াসমিন লিপি	ইসরাত জাহান
১৯৯৬-৯৭	কোহিনূর ইয়াসমিন লিপি	ফয়জুন নাহার পাঠান
১৯৯৭-৯৮	কোহিনূর ইয়াসমিন লিপি	ফয়জুন নাহার পাঠান
১৯৯৮-৯৯	ফয়জুন নাহার পাঠান	কামরুন্নেছা খুশী
১৯৯৯-২০০০	ফয়জুন নাহার পাঠান	নূরুন্নাহার পলি
২০০০-২০০১	ফয়জুন নাহার পাঠান	নূরুন্নাহার পলি
২০০১-২০০২	আয়শা আক্তার রানু	ইমরানা জাহান
২০০২-২০০৩	আয়শা আক্তার রানু	ইমরানা জাহান

www.pathagar.com

শেষ কথা ঃ

বিশ্ববরেণ্য ও একমাত্র উসওয়াতুন হাসানা প্রিয় নবীজী (সাঃ) তার গোটা জীবনে "ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার" মাধ্যমে মক্কা-মদীনার সর্বস্তরে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করতে সক্ষম হন। আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে তার বিভিন্ন কাজে রহমত ঢেলে দিয়েছেন। আমরাও যদি এ দুটো গুণ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করি তবে অবশ্যই আল্লাহ রহমত করবেন এবং বদরের বিজয়ের মত অকল্পনীয় বিজয় দান করবেন। আল্লামা ইকবালের একটি কথা বার বার মনে পড়ছে। "তোমরা বদরের পরিবেশ তৈরি কর আজও ফেরেশতারা কাতারে কাতারে তোমাদের সাহায্যে আসমান থেকে নেমে আসবে।

স্মৃতিকথাগুলো যেন স্মৃতিতেই অম্লান না থাকে। স্মৃতিকে ধরে রেখে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ কাফেলাকে মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়-এ প্রত্যাশাই আমাদের।

"তোমরা দ্রুত গতিতে সেই পথে ছুটে চল যে পথ আসমান ও জমিনের সমান প্রশস্ত এবং যা চলে গেছে জান্নাতের দিকে।"- আল কুরআন #

লেখিকা ঃ কোহিনূর ইয়াসমিন লিপি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

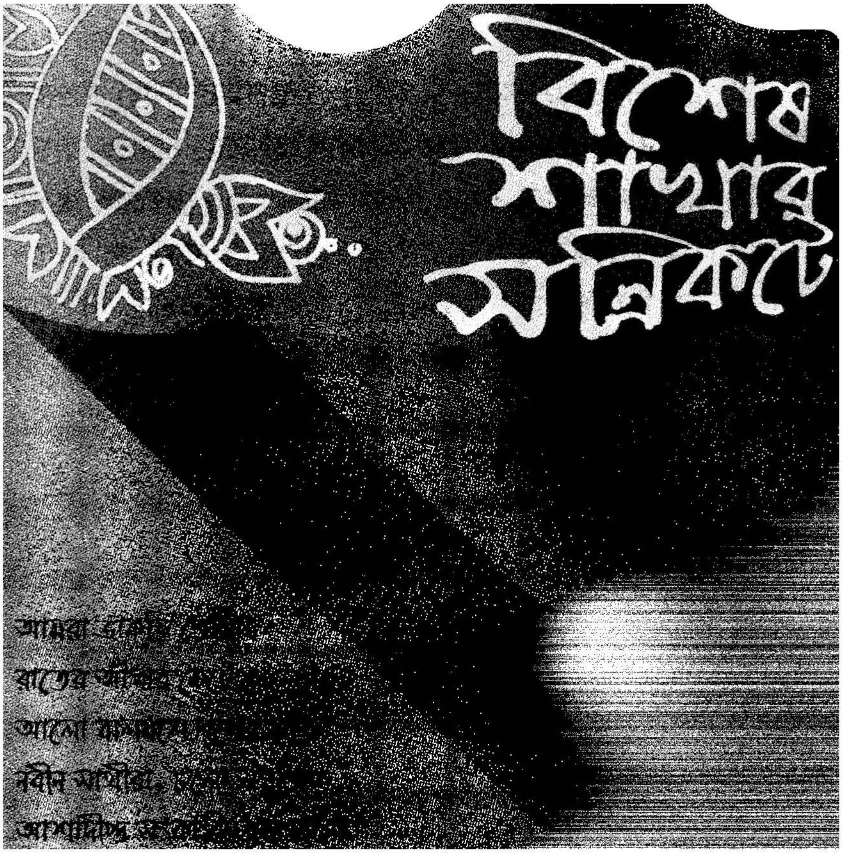

www.pathagar.com

যেখানে জাগেনি ঘুমের পাড়ারা
হয়নি সূর্যোদয়,
ভাঙবো আঁধার আলোর বানে
আমাদের এ প্রত্যয়।

প্রত্যয়দীপ্ত একটি সংগঠনের নাম ছাত্রীসংস্থা- সেই প্রত্যয় সূর্যোদয়ের, সেই প্রত্যয় একটি সুন্দর সমাজ গড়ার; বাংলার তরুণতাজা প্রাণে আদর্শের আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ ঘটাবার। হযরত খাদিজা (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), ফাতেমার (রাঃ) উত্তরসূরী তৈরির অনন্য এ রাহবার তার আহ্বান ছড়িয়ে দিয়েছে বাংলার প্রতিটি আনাচে-কানাচে-শহর থেকে গ্রামে। ২৫ বছরের এ দীর্ঘ সফরে এই প্রাপ্তিই যে ছিলো প্রত্যাশিত। তাই পরিসরের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় বিশেষ কিছু শাখার ইতিহাস-ঐতিহ্যের সামান্য আয়োজন আপনাদের জন্য-

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদল্যায়

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গন হিসাবে সবচেয়ে ফোকাস পজিশনে অবস্থান প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সত্য-মিথ্যার চিরন্তন সংঘাতের অর্বাচীন সাক্ষী এই ক্যাম্পাস। সারাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে জীবন গড়ার রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আসে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী। সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীর উজ্জ্বল সমাবেশ এখানে। ভবিষ্যতের এই কারিগরদের চিরউন্নত শাশ্বত পথ নিশানা দেখিয়ে দিতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর হতেই এ অঙ্গনে দ্বীনের দাওয়াতকে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়িকা নাসিম হামিদা বানু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রোকেয়া হল অন্তর্ভুক্ত অনাবাসিক ছাত্রী ছিলেন। তিনি রোকেয়া হলের কমনরুমে তাফসীর ক্লাস শুরু করেন এবং তাফসীরে মেয়েদের বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করেন। ১৯৭৮ সালেরই ডিসেম্বর মাসে আহ্বায়িকা কমিটির আর একজন সদস্যা ফজিলা তাহের মিতু ইডেন কলেজ থেকে অনার্স কমপ্লিট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স এ ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে দ্বীন ইসলামের শাশ্বত বার্তা পৌঁছিয়ে দিতে অবিরাম প্রচেষ্টা চালান। তার মাধ্যমেই আল্লাহর রহমতে রোকেয়া হলে ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। শামসুন্নাহার হলের এক্সটেনশন সমাজ কল্যাণ ছাত্রীনিবাস যা পরবর্তীতে মৈত্রী হল নামকরণ করা হয়। এখানে ছাত্রীসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী মুহতারামা খোন্দকার আয়েশা খাতুন তাফসীর শুরু করেন। পরবর্তীতে এ হলেরই অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্রী হোসনে আরা মার্জনা এর নিরলস তৎপরতায় সমাজকল্যাণ ছাত্রীনিবাস ছাত্রীসংস্থার এক উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৯ সালে সমাজকল্যাণ ছাত্রীনিবাসে ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। শামসুন্নাহার হলে রোকেয়া হল এবং সমাজকল্যাণ ছাত্রীনিবাসের পরে ছাত্রীসংস্থার তৎপরতা শুরু হয়। সমাজকল্যাণ ছাত্রীনিবাসের মার্জনা'পা এখানে প্রথম তাফসীর শুরু করেন। পরবর্তীতে ৮৫-৮৬ সেশনে এখানে ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রথম সভানেত্রী ছিলেন বেগম মাসুদা। ১৯৮৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মহানগরীর একটি থানা হিসেবে কাজ করে। কাজের অব্যাহত গতিধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৮ সালে সাংগঠনিকভাবে শাখার মর্যাদা লাভ করে। প্রথম শাখা সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শামীমা ইয়াসমিন লায়লা।

ইসলামের সঠিক ধারণার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে অনৈতিক ও উচ্ছৃংখল পরিবেশে পবিত্রতার সুশীতল বার্তা প্রবাহিত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীসংস্থা সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পার হয়ে রচনা করেছে এক দুর্লভ স্মৃতি উপাখ্যান। সচেতন ছাত্রীদের হৃদয়তন্ত্রীতে ইসলামের চির উন্নত রূপকে নির্মাণ করেছে এ সংগঠন। দাওয়াতী কর্মকান্ডকে সম্প্রসারিত করতে প্রকাশিত হয়েছে একাধিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা ছিল 'প্রতীতী'। এছাড়া প্রকাশিত হয় পত্রিকা অনন্য এবং এরপর সৃজন নামে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। প্রশাসনের অনুমতিতে হলগুলোতে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিবস, নববর্ষ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আয়োজিত মেলায় ছাত্রীসংস্থার সমৃদ্ধ স্টল থাকত। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় বইমেলা, কৃতিছাত্রী সংবর্ধনা, ইসলামে নারীর অধিকার শীর্ষক সিম্পোজিয়াম। ছাত্রীসমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে ডাকসু নির্বাচনে বলিষ্ঠতার সাথে অংশগ্রহণ করে।

www.pathagar.com

ডাকসু নির্বাচনে ফেরদৌস আরা বকুল ও শামীমা ইয়াসমীন লায়লা ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা পদে বিজয়ী হন এবং এ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ডাকসু নির্বাচনে শামসুন্নাহার হল ছাত্রী সংসদে সালমা-ফাতেমা-লিপি পরিষদ, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল পারভীন-মানছুরা-নাজনীন পরিষদ, রোকেয়া হলে ফাতেমা-আসমা-জলি পরিষদ অংশগ্রহণ করেছিল। এভাবে এ সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে ইসলামকে যুগোপযোগী একটি মিশন বলে তুলে ধরতে সমর্থ হয়।

'৮০-র দশক সম্পূর্ণটা এবং '৯০ এর অর্ধদশক পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীসংস্থা আদর্শের ধারক বাহক হিসাবে ছাত্রী ও শিক্ষক মহলের মধ্যে একক প্রভাবশালী সংগঠন হিসাবে ভূমিকা পালন করে। শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীসংস্থার অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। ছাত্রী সংগঠন হিসাবে ছাত্রীসংস্থাকে ছাত্রীরা অনেক বেশি আস্থাভাজন মনে করতো। এছাড়া সমাজকল্যাণ ছাত্রীনিবাসে অত্যন্ত গঠনমূলকভাবে ছাত্রীসংস্থার কাজ শুরু হয়। এ সময় সমাজকল্যাণ হোস্টেলের ৪০ জন ছাত্রীর মধ্যে ১৩-১৫ জনই ছিলেন ছাত্রীসংস্থার কর্মী এবং বাকীরা প্রায় সবাই সমর্থক ছিল। এ পর্যায়ে ছাত্রীসংস্থার বোনদের যেমন গঠনমূলক স্বর্ণালী পথচলা অব্যাহত থাকে, একই সাথে ইউনিয়ন, লীগ, বামপন্থী সংগঠনগুলোও সত্যের এই কাফেলার অগ্রযাত্রাকে নস্যাৎ করতে মেতে উঠে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে। যদি ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস এ কথার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে যে, এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। যখনই দাওয়াতী দ্বীনের কাজ বেগবান হয় তখনই বাতিল শক্তিও এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। আমাদের বোনদেরকেও সহ্য করতে হয়েছে অনেক অত্যাচার ও নির্যাতন।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ছাত্রীসংস্থার উদ্যোগে মৈত্রী হলে অনুষ্ঠিত হয় বই মেলা। বামপন্থী সংগঠন এই বই মেলা পুড়িয়ে নস্যাৎ করে দেয়। ছাত্রীসংস্থার মেয়েদের বিভিন্ন রকম ভর্ৎসনা করে মিছিল করে। আমাদের বোনেরা দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে।

এর কিছুদিন পর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে শ্লোগান তুলে মৈত্রী হলের বাম সংগঠনের ছাত্রীরা আমাদের বোনদের ওপর চালায় এক কুটিল ষড়যন্ত্র ও অমানবিক আচরণ। মধ্যরাত আনুমানিক রাত ২টার দিকে ছাত্রীসংস্থার বোনদের রুমে তালা আটকানো হয়। পরের দিন পর্যন্ত এ অবস্থায় অন্তরীণ রাখা হয়। প্রক্টরসহ কর্তৃপক্ষের অন্যান্যদের উপস্থিতিতে আলোচনায় আমাদের বোনেরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে প্রমাণিত হলে বাম সংগঠন তালা খুলে দিতে বাধ্য হয়।

১৯৯০ এর ১৭ই রমজান। মিথ্যার প্রচারক বাতিলপন্থীরা নিরপরাধ পবিত্র ছাত্রীদের উপরে আর এক জঘন্য ষড়যন্ত্র চালায়। মিথ্যা অপবাদের ধুয়া তুলে বাম সংগঠনের ছাত্রীরা ছাত্রীসংস্থার বোনদের রুমে আক্রমণ চালায়। ধরপাকড় করে। কোরআন হাদীস বইপত্র ব্যবহার্য জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় ট্রাঙ্ক সবকিছুই তছনছ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিজেদের কাছে রেখে দেয়। এই কুটিল ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের মেয়েদের হল ছেড়ে চলে যেতে বলে। সূচিত হয় আর এক বদর প্রান্তর। ঈমানী পরীক্ষায় ত্যাগের আর এক নজরানা। হল কর্তৃপক্ষ তা অপারগতার কথা বলেন। অনেক রাতে এই উপায়ান্তরহীন মেয়েদেরকে V.C-এর কাছে পাঠানো হয়। V.C স্বয়ং এটি হলের ব্যাপার বলে এড়িয়ে যায়। আশ্রয়হীন এ জিহাদী কাফেলার সৈনিকেরা কিছুদিন প্রভোস্ট এর বাসায় অবস্থানের পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে অনেক বোনেরই পরীক্ষা চলছিল অনেক আবেদন ও অনেক চেষ্টার পরও এই বোনদের আর হলে উঠতে দেয়া হয়নি। এদের অধিকাংশেরই ঢাকায় কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। আশ্রয়হীন এ বোনদের এই ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যে দিয়ে কোনরকমে ছাত্রীত্ব চালিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সত্যের সৈনিক এই সংগ্রামী বোনেরা যে সীমাহীন ত্যাগ, ধৈর্য, আন্দোলনের পথে অচিলতা ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিল তা সত্যিই সাহাবীদের জিহাদী জিন্দেগীর ঈমানী পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৯৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। রাত ৮.৩০টার দিকে আমাদের বোনদের রুমে হামলা চালানো হয়। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তছনছ করে কোরআন হাদীস ইসলামী সাহিত্য ছুঁড়ে ফেলে। ছাত্রীসংস্থার পরিচয়বাহী বিভিন্ন স্থানে ইসলামী সংগঠনের ওপর অকথ্য হামলা চালানো হয়। তারই এজেন্ডা হিসাবে লীগসহ অন্যান্য বাম দল ছাত্রীসংস্থার মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর জেনারেল মিটিং ডাকা হয় এবং কর্তৃপক্ষ ছাত্রীসংস্থাকে একটি ভীতিকর অরাজকতা সৃষ্টিকারী প্রগতিবিরোধী সংগঠন বলে উপস্থাপন করে। এ সংগঠন নিষিদ্ধ হোক বলে বাম সমর্থিত ছাত্রীদের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করে এবং একে সাধারণ ছাত্রীদের মতামত বলে চালিয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

২৪ সেপ্টেম্বর। এক সুদূর প্রসারি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এ রাতেই আক্রমণ চালানো হয় রোকেয়া হলে। শাখা সভানেত্রীর রুম বর্ধিত ভবন-২০ এ হামলা চালিয়ে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তছনছ করা হয়। হল মাঠে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় তালিমুল কোরআনের জন্য সংগৃহীত ব্লাকবোর্ড প্লেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। সম্মান ভবন-৫ এ হানা দিয়ে আমাদের এক দ্বীনিবোনের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ মার্কসীট, সার্টিফিকেট কেড়ে নেয়া হয় যা পরবর্তীতে শত অনুরোধ আর তদ্বির করেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। হলের প্রভোস্ট হাউজ টিউটর, এমনকি স্বয়ং ভিসিও এ অশুভ শক্তির হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছিল। আমাদের হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ আমাদের ন্যূনতম আশ্রয়টুকু দিতে চায়নি। যার কারণে হল ছেড়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে দীর্ঘদিন বোনদের এক মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়েছে।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রীসংস্থা নামের এ প্রগতিশীল সংগঠনের অস্তিত্ব বিলোপ করা। যার অপপ্রচেষ্টা হিসাবে শামসুন্নাহার হলের তৎকালীন প্রভোস্ট সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ঐ হলের তিনজন আবাসিক ছাত্রীকে বহিষ্কার করে। কিন্তু আল্লাহর অপার মেহেরবানী তিনি ওদের অপপ্রচারণা চিরতরে ভঙ্গ করে দিয়েছেন। উচ্চ আদালতে মামলার ফলে এ সংগঠন পূর্ণ বৈধতা লাভ করে, কুৎসা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাদের মহান বিজয় দান করেন।

কিন্তু একথাও সত্য যে আল্লাহ দ্বীনি আন্দোলনের কাজকে থামিয়ে রাখেননি। প্রশাসনের রোষ এড়াতে এবং অন্যান্য বিরোধী শক্তিদের অযথা হট্টগোল এড়াতে যদিও প্রকাশ্য তৎপরতা বন্ধ আছে তথাপি আল্লাহর অপরিসীম রহমতে বর্তমানের সাংগঠনিক অবস্থা ভাল। জনশক্তি আল্লাহর রহমতে সন্তোষজনক। ছাত্রীসংস্থার মেয়েরাই ছাত্রীদেরকে ইসলামী আকিদা অনুসারী জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করনে এবং আল্লাহর দেয়া প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আনতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা সাহসী সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রতিটি ছাত্রী হলেই আমাদের সংগঠিত কাজ চলছে। বর্তমানে ৪টি ছাত্রী হলে ইউনিট এবং আবাসিক এলাকাতে ১টি হল ইউনিটসহ মোট ৫টি ইউনিট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা তার তৎপরতা অব্যহত রেখেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এই তৎপরতাকে কবুল করে নিন। আমিন॥

নিম্নে শাখা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন–

সেশন	সভানেত্রী	সেক্রেটারী
১৯৮৮-৮৯	শামীমা ইয়াসমিন লায়লা	উম্মে ছালমা
১৯৮৯-৯০	উম্মে ছালমা	হোসনে আক্তার
১৯৯০-৯১	উম্মে ছালমা	উম্মুল খায়ের সূফী
১৯৯১-৯২	উম্মুল খায়ের সূফী	পারভীন আক্তার
১৯৯২-৯৩	ফেরদৌসি খানম (অক্টোবর'৯২-এপ্রিল'৯৩)	পারভীন আক্তার
	পারভীন আক্তার (এপ্রিল'৯৩- অক্টোবর'৯৩)	সাজেদা আক্তার
১৯৯৩-৯৪	সাজেদা আক্তার	দিলরুবা পূরবী
১৯৯৪-৯৫	সৈয়দা আসমা আক্তার	রোকেয়া বেগম রীনা
১৯৯৫-৯৬	রোকেয়া বেগম রীনা	সাবিহা পারভীন
১৯৯৬-৯৭	রোকেয়া বেগম রীনা (অক্টোবর'৯৬-এপ্রিল'৯৭)	সাবিহা পারভীন
	সাবিহা পারভীন (এপ্রিল'৯৭-অক্টোবর'৯৭)	রাহিমা আক্তার
১৯৯৭-৯৮	রাহিমা আক্তার	নিলুফা ইয়াসমিন নিপু
১৯৯৮-৯৯	নিলুফা ইয়াসমিন নিপু	হাসিনা আক্তার শিপন
১৯৯৯-২০০০	রাহিমা আক্তার	উম্মে লীনা আফরিন
২০০০-০১	উম্মে লীনা আফরিন	ফাতেমা শিরীন
২০০১-০২	ফাতিমা আক্তার হ্যাপি	রওশন আরা স্বপ্না
২০০২-০৩	ফাতিমা আক্তার হ্যাপি	রওশন আরা স্বপ্ন

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রামের মূল শহর থেকে ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে পাহাড় ঘেরা সবুজ শ্যামলিমার মনোরম পরিবেশে এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষকদের আবাসিক কোয়ার্টার এবং কর্মচারীদের কলোনীগুলো রয়েছে। আবাসিক ক্যাম্পাস উত্তর ও দক্ষিণ দু'ভাগে বিভক্ত। এছাড়া এলাকায় ৪টি স্কুল ও ১টি কলেজও রয়েছে। বর্তমানে ছাত্রী হল তিনটি। তার মধ্যে পুরাতন শামসুন্নাহর জরাজীর্ণ এবং ফ্যাকাল্টি থেকে দূরে হবার কারণে ছাত্রীরা থাকতে অনাগ্রহী। দূর থেকে সবুজের হাতছানি মানুষকে আকৃষ্ট করলেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশির ভাগ সময়ই অস্থিতিশীল।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে নতুন সংযোজন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার গতিশীল পদচারণা বিভিন্ন শহর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পার হয়ে সবুজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পা রাখে ১৯৭৯ সালে। ইসলামী আদর্শবাহী একক ছাত্রী সংগঠন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়ে নিজেদের অবস্থান গড়ে নেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর দু'জন টিচার প্রফেসর ডঃ মোঃ লোকমান ও প্রফেসর মোঃ নূরুল করিম এর সহযোগিতায় প্রথম বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা এর কাজ শুরু হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় ১৯৭৯-৮০ সেশনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রতিষ্ঠার ২য় বছরে কোন এক সুন্দর দিনে প্রফেসর নূরুল করিমের বাসায় কয়েকজন ইসলামপ্রিয় ছাত্রীদের নিয়ে প্রথম কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে সভানেত্রী ছিলেন সরাবান তাহুরা, প্রচার প্রকাশনা ও পাঠাগার সম্পাদিকা ছিলেন শামীমা আক্তার (অর্থনীতি) পরবর্তীতে সভানেত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন রওশন (ব্যবস্থাপনা)। ১৯৮৩-৮৪ সালে মোটামুটি হল ভিত্তিক কিছু কাজ চলছিলো। পরবর্তীতে এ সকল বোনদের ছাত্রীজীবন শেষ হওয়াতে এবং শহর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্বের কারণে কাজ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৮৬-৮৭ সালে সভানেত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তাহেরা আক্তার বিউটি। এছাড়াও ছিলেন পাপড়ি, রুবি। ১৯৮৭-৮৮ তে সভানেত্রী ছিলেন শামসী। এ পর্যন্ত হল ভিত্তিক প্রোগ্রাম এবং কিছু দাওয়াতী কাজ হতো।

"তোমরা আল্লাহর জন্যে শ্রম স্বীকার করো যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত" আল কুরআনের এ বিপ্লবী আহ্বানে সাড়া দিয়ে এইচএসসি ফলপ্রার্থী ফরিদা খানম সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এসে ৮৮-৮৯ এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে এলাকাভিত্তিক কুরআন তাফসীর ক্লাস শুরু হয়।

সরকারের প্রভাবে প্রভাবিত এ চ.বি ক্যাম্পাস। স্বৈরাচারী আমলের ক্ষমতাধর বিভৎস ছাত্ররাজনীতির মুখে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এ সময়ের কমিটি মেম্বাররা ছিলেন সভানেত্রী ফরিদা খানম, সেক্রেটারী নাসরিন জাহান চৌধুরী, বায়তুলমাল সম্পাদিকা রেহেনা বেগম, পাঠাগার ও অফিস সম্পাদিকা শামসুন্নাহার মিতুল, প্রচার সম্পাদিকা জিনাত আরা হক ও স্কুল বিভাগীয় সম্পাদিকা ছিলেন সোহেল ইয়াসমীন ইতি। ১৯৮৮-৮৯ এর এই কমিটিকে অনেক ধৈর্য হিকমত ও সাহসের সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ইসলামপ্রিয় সাহসী এই মুজাহিদা বোনদের নিয়ে সবুজ ক্যাম্পাসে চির সবুজ, চির

www.pathagar.com

শুভ্রতা ছড়ানোর প্রত্যয়ে সংগঠন মজবুত করতে প্রাণান্ত চেষ্টা চালাতে হয়। ১৯৮৯-৯০ সেশনে একই কমিটি সংগঠনকে আরো প্রসারিত করে। এলাকায় ও হলে স্বল্প সংখ্যক কর্মী নিয়ে ২টি ইউনিট গঠিত হয়। এরপরও হলের বোনদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়। তখন মেয়েদের হলে ছাত্র ইউনিয়ন ছিল খুবই সক্রিয়। '৯০ এর ৮ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রীসংস্থা ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯০-৯১ এ সভানেত্রী ছিলেন জাহানারা শাহীন নাসিম এবং এ সময় চাকসু ক্যাফেটেরিয়াতে নিয়মিত দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে কাজের সম্প্রসারণ হয়। আগের কমিটি নিয়ে তিনি কাজ করে যান।

'৯১ এ স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর ইসলামী আন্দোলন চ.বি ক্যাম্পাসে সচল পদচারণায় মুখর হয়।

১৯৯১-৯২ সেশনে সোনিয়া ফেরদৌস ছন্দা সভানেত্রী এবং সেক্রেটারী রেহেনা বেগম মিলন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় ছাত্রীসংস্থার কাজ এ ক্যাম্পাসে বেশ জোরদার হয়। এইভাবে চলতে থাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীসংস্থার কাজ।

শহর থেকে দূরে ছায়াঢাকা আঁধার গলিতে যে ছাত্রীসংস্থা পরম মমতায় কাজ শুরু করেছিলো তা আজ বিশালতায় ভরপুর হয়েছে। আমাদের আশা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের প্রতিটি ছাত্রীপ্রাণে আমরা কোরআনের আলো জ্বালবোই। আল্লাহ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখাকে কবুল করুন।

বিভিন্ন সেশনে সভানেত্রী সেক্রেটারী হিসাবে যারা ছিলেন–

সেশন	সভানেত্রীর নাম	সেক্রেটারীর নাম
১৯৭৯-১৯৮০	শারাবান তাহুরা	–
১৯৮০-১৯৮১	রওশন	–
১৯৮৬-১৯৮৭	তাহেরা আক্তার বিউটি	–
১৯৮৭-১৯৮৮	শাম্‌সী	–
১৯৮৮-১৯৮৯	ফরিদা খানম	নাসরিন জাহান চৌধুরী
১৯৮৯-১৯৯০	ফরিদা খানম	নাসরিন জাহান চৌধুরী
১৯৯০-১৯৯১	জাহানারা শাহীন নাসিম	–
১৯৯১-১৯৯২	সোনিয়া ফেরদৌস (ছন্দা)	রেহেনা বেগম (মিলন)
১৯৯২-১৯৯৩	সোনিয়া ফেরদৌস (ছন্দা)	ফরিদা খানম
১৯৯৩-১৯৯৪	রোকেয়া বেগম চৌধুরী	নার্গিস সুলতানা মনি
১৯৯৪-১৯৯৫	রোকেয়া বেগম চৌধুরী	জয়নব বেগম নাহিদ
১৯৯৫-১৯৯৬	হাসিনা ইয়াসমীন রীনা	জয়নব বেগম নাহিদ
১৯৯৬-১৯৯৭	হাসিনা ইয়াসমীন রীনা	জয়নব বেগম নাহিদ
১৯৯৭-১৯৯৮	হাসিনা ইয়াসমীন রীনা	জয়নব বেগম নাহিদ
১৯৯৮-১৯৯৯	আলবিদা বেগম আরজু	মাকসুদা বেগম বিনু
১৯৯৯-২০০০	আলবিদা বেগম আরজু	মাকসুদা বেগম বিনু
২০০০-২০০১	নারগিস বেগম	ফেরদৌস ফাহিমা
২০০১-২০০২	নারগিস বেগম	ফেরদৌস ফাহিমা
২০০২-২০০৩ (মে-সেপ্টেম্বর)	ফেরদৌস ফাহিমা	সীমাউল ফেরদৌসী
২০০২-২০০৩	ফেরদৌস ফাহিমা	সীমাউল ফেরদৌসী

www.pathagar.com

সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও মজবুতির পরিসংখ্যানমূলক তথ্য

এর পর '৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯ তে বিভিন্ন দায়িত্বশীলার তত্ত্বাবধানে কাজ সচল হলে দু'টি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। বাড়তে থাকে সত্য সন্ধানী মানুষের দল। হলের যে সব সাধারণ ছাত্রী বাতিল শক্তির মুখে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না তাদের সমর্থন নিয়ে ছাত্রীসংস্থা এগিয়ে চলে নিজ লক্ষ্যপানে। ১৯৯০ এর চাকসু নির্বাচনে আবারো প্রতিনিধিত্বশীল ছাত্রীসংগঠন হিসেবে ছাত্রীসংস্থার ছাত্রীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। দক্ষিণ ক্যাম্পাসে তাফসীর এলাকা, ইউনিট মানে উন্নীত হয়। ৯১-৯৩ সালে সভানেত্রী সোনিয়া ফেরদৌস ছন্দার সময় সাংগঠনিক মজবুতি বৃদ্ধি পায়। সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় তাফসীর চালু হয়। উত্তর ক্যাম্পাসে একটি ইউনিট কায়েম হয়। হল ও এলাকার চারটি ইউনিট নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা দীনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যায়। ১৯৯৩-৯৫ সাল পর্যন্ত সভানেত্রী রোকেয়া বেগম চৌধুরীর পরিচালনায় সংগঠন সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সাথে বাড়তে থাকে জনসমর্থন। বিভিন্নমুখী প্রোগ্রামের মাধ্যমে সাধারণদের মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো হয়। কর্মীদের জন্য বিভিন্ন গঠনমূলক প্রোগ্রাম কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মিক ও সাংগঠনিক মানোন্নয়নের প্রক্রিয়া চলে। এ সময় সাংগঠনিক কাঠামো বেশ মজবুত হয়। ২টি ইউনিট বৃদ্ধি পায়। জনশক্তির সাংগঠনিক মানোন্নয়নের ধারাবাহিকতা সচল থাকে।

ফ্যাকাল্টিতে ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চা-চক্র, নবীনবরণ, গ্রুপ দাওয়াত, ব্যক্তিগত দাওয়াতের মাধ্যমে ফ্যাকাল্টিতে জনশক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলে। প্রত্যেক বিভাগ ভিত্তিক কমিটি গঠন করে সংগঠন সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেয়। ফ্যাকাল্টিতে ব্যাপক সমর্থক বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করে সুধী বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলে। এ সময়ে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সুধী বৃদ্ধি পায়। কাঠামোগত মান অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এ সময়ে সদস্যা ও আদর্শ শাখায় উন্নীত হয়। সময়ের পরিক্রমা আওয়ামী দুঃশাসনে আচ্ছন্ন। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ছাত্রী হলগুলোতে ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রীসংস্থার কর্মীদের বিভিন্ন হয়রানী করে দাওয়াতী কাজে বাধা দেয়। প্রতিকূল এ পরিবেশে ছাত্রীসংস্থার কাজ হল থেকে শুরু করে এলাকার প্রতিটা জায়গায় বেশ হিকমত ও কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হত।

চরম রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিবেশে গোপনে, হেকমত ও কৌশলে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হত। এ সময়ে সাংগঠনিক মজবুতির দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় বেশি। '৯৮ মেয়েদের জন্য নতুন হল 'প্রীতিলতা হল' নির্মিত হলে নতুন শামসুন্নাহার থেকে অনেক কর্মীবোন প্রীতিলতা হলে চলে আসলে শামসুন্নাহার হলের একটি ইউনিট, নতুন হলে স্থানান্তরিত হয়। এর পরবর্তী সেশনেই প্রীতিলতা হলে আরো একটি ইউনিট কায়েম হয়। এলাকায়ও দু'টি ইউনিট বৃদ্ধি পায়। নতুন শামসুন্নাহার হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের দাপট বেড়ে যাওয়ায় ছাত্রীসংস্থার কাজ খুবই গোপনে চালাতে হয়, কিন্তু প্রীতিলতা হলে ছাত্রলীগ গঠিত না হওয়ায় মোটামুটি খোলামেলাভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম ও দাওয়াতী কাজ চলে। আভ্যন্তরীণ মজবুতির মধ্য দিয়ে এ সময়ে কাজ পরিচালিত হয়। এ বছরগুলোতে প্রথম দিকে ফ্যাকাল্টি ভিত্তিক কিছুটা কাজ হলেও শেষে স্থবির হয়ে পড়ে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ থাকার কারণে।

প্রতিকূল পরিবেশে কাজের বেশি বিস্তৃতি না ঘটলেও সৃষ্ট কাজকে গতিশীল করার চেষ্টা চলে। সমর্থক বৃদ্ধির মাধ্যমে সংগঠনের মজবুতি ধরে রাখা হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার অনুকূলে থাকায় হল ইউনিটগুলোতে ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চলে। প্রকাশ্য দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিটি পথহারা ছাত্রীকে সত্য পথের যাত্রী হওয়ার আহ্বান জানায়। হলের ইউনিটের আলোচনা সভাগুলো কমনরুমে প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি এলাকায় দাওয়াত পৌঁছানো হয়। এবং দাওয়াত প্রাপ্ত এলাকায় সংগঠন কয়েমের উদ্দেশ্যে কুরআন তাফসীর ক্লাস শুরু হয়। পুরাতন শামসুন্নাহার হলে অনেকদিন থেকে কুরআন তাফসীর ক্লাস শুরু হলেও সংগঠনের কারো আবাস সেখানে না হওয়ায় ইউনিট কায়েমে বিলম্ব দেখা দিচ্ছে। এরপরও ব্যাপক সমর্থন নিয়ে প্রকাশ্যে সেখানে দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। নতুন শামসুন্নাহারে আরো একটি ইউনিট বৃদ্ধি পায়। হলগুলোতে ছাত্রীসংস্থা প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত পদ্মা বিধৌত রাজশাহী মহানগরীর সবুজ চত্বরে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৩ সালে ২৯৮২ হেক্টর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছিল দর্শন ও আইন বিভাগ নিয়ে। কালের পরিক্রমায় বর্তমানে ৮টি অনুষদ, ৪৩টি বিভাগ, ৫টি গবেষণা ইনস্টিটিউটে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এখানে প্রায় আটশতাধিক শিক্ষক, প্রায় পাঁচশ' কর্মকর্তা ও দেড় হাজার কর্মচারী রয়েছেন। ছাত্রদের জন্য ১১টি ও ছাত্রীদের জন্য ৪টি আবাসিক হল, একটি স্টেডিয়াম, একটি অডিটোরিয়াম, একটি সুইমিংপুল, দু'টি প্রশাসনিক ভবন, একটি অতিথি ভবন, আটটি ক্লাস ভবন রয়েছে।

সংগঠনপূর্ব সামাজিক অবস্থা

বৃটিশ শিক্ষাবিদ লর্ড মেকেল প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে বাতিলের অনুচর তৈরির কারখানায় পরিণত করে রেখেছিলো দীর্ঘদিন। এ শিক্ষাব্যবস্থার কালিমা থেকে রেহাই পায়নি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও। বিজাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে কোন রদবদল না করেই হুবহু গ্রহণ করে চলেছিল শিক্ষার্থীরা। ফলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ, একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরা সম্পূর্ণ অচেতন ছিলো। সহশিক্ষার অভিশাপ জড়িয়ে ছিলো অঙ্গাঅঙ্গি।

নৈতিক অবক্ষয়

সাধারণ চেতনায় ছাত্রীরা শালীন থাকলেও হিযাবের প্রচলন ছিলো না। আবাসিক হলগুলোতে মিডিয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ থাকলেও পাশ্চাত্যের করালগ্রাসী স্রোতে অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু শিক্ষক ক্লাসের দু'একজন হিযাব পরিহিতাকে অপমান করতে ও ছাড়তেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ছাত্রীহলগুলোতে ছাত্রমৈত্রীর প্রচণ্ড দাপট ছিলো। জাসদ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলগুলো তাদের পরিক্রমা অব্যাহত রেখেছিলো। বাইরে থেকে আমদানিকৃত ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মতবাদে রাজনৈতিক অঙ্গন নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত ও দূষিত ছিলো। এ দূষণ প্রক্রিয়া ক্রমাগত সাধারণ ছাত্রীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছিলো। ফাঁকা বুলিকে মুক্তির আশায় ও দাপটে সমর্থন করত ছাত্রীরা।

যখন ১৯৭৮ সালের ১৫ই জুলাই ঢাকায় খোন্দকার আয়েশা খাতুনের নেতৃত্বে "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা" গঠিত হয়। তখনকার ব্যাপক কর্মসূচি ও প্রচেষ্টার অন্যতম সংযোজন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার মূল কাজ শুরুর প্রায় দু'বছর পর ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরের শেষে কেন্দ্রীয় সফরকারী মুহতারিমা নূরুন্নিসা সিদ্দিকা ও হাফিজা আসমা খাতুনের উপস্থিতিতে মুন্নুজান হলের ২০২ নং রুমে ১১ জন বোন নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কাজ শুরু হয়। ছাত্রীসমাজকে মেধানির্ভর সুস্থ রাজনীতির সন্ধান

www.pathagar.com

দিতে, ধর্মহীন জীবনধারা থেকে ফিরিয়ে আনতে, অপসংস্কৃতির অশ্লীলতা থেকে মুক্তি দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের যোগ্যতা নিয়ে বেড়ে ওঠার শপথে অনন্য, একক, ব্যতিক্রমধর্মী ছাত্রীসংগঠনটির পরিশীলিত, পরিকল্পিত ও গঠনমূলক কাজ শুরু হয় এভাবেই।

মোট ৪ জন কর্মী ও ৭ জন প্রাথমিক সদস্যার সমন্বয়ে ১৯৮০ সালের শেষের দিকে রাকসু নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিপ্লবী চেতনায় (নেতৃত্বের পরিবর্তন চাই) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উত্থান।

প্রথম কমিটি ঃ

সভানেত্রী	ঃ শাহানারা বেগম,
সেক্রেটারী	ঃ সফুরা খাতুন,
বায়তুলমাল	ঃ আসমা মেহজাবিন তুহীন,
পাঠাগার ও প্রচার	ঃ হাসিনা আখতার।

বিভিন্ন সেশনে সভানেত্রী সেক্রেটারী হিসেবে যারা ছিলেন–

সেশন	সভানেত্রীর নাম	সেক্রেটারীর নাম
১৯৮১-১৯৮২	শাহানারা বেগম	সফুরা খাতুন
১৯৮২-১৯৮৩	শাহানারা বেগম	সফুরা খাতুন
১৯৮৩-১৯৮৪	শাহানারা বেগম	সফুরা খাতুন
১৯৮৪-১৯৮৫	শাহানারা বেগম	সখিনা খাতুন
১৯৮৫-১৯৮৬	আইনুন্নাহার আনজু	শাহানারা বেগম
১৯৮৬-১৯৮৭	শাহানারা বেগম	সখিনা খাতুন
১৯৮৭-১৯৮৮	শাহানারা বেগম	সখিনা খাতুন
১৯৮৮-১৯৮৯	সখিনা খাতুন	গুলশান আরা হক সন্ধ্যা
১৯৮৯-১৯৯০	সখিনা খাতুন	গুলশান আরা হক সন্ধ্যা
১৯৯০-১৯৯১	সখিনা খাতুন	গুলশান আরা হক সন্ধ্যা
১৯৯১-১৯৯২	জান্নাতুস সালিমা শিউলী	তৌহিদা ইয়াসমীন রুকু
১৯৯২-১৯৯৩	জান্নাতুস সালিমা শিউলী	তৌহিদা ইয়াসমীন রুকু
১৯৯৩-১৯৯৪	জান্নাতুস সালিমা শিউলী	ফজিলাতুন্নেসা হাসি
১৯৯৪-১৯৯৫	জান্নাতুস সালিমা শিউলী	ফজিলাতুন্নেসা হাসি
১৯৯৫-১৯৯৬	ফজিলাতুন্নেসা হাসি	হালিমা খাতুন
১৯৯৬-১৯৯৭	সুলতানা রাজিয়া	শামীমা আখতার সীমা
১৯৯৭-১৯৯৮	সুলতানা রাজিয়া	শামীমা আখতার সীমা
১৯৯৮-১৯৯৯	শামীমা আখতার সীমা	হাসিবা ওবায়দা
১৯৯৯-২০০০	হাসিবা ওবায়দা	শিরিন আখতার
২০০০-২০০১	হাসিবা ওবায়দা	শিরিন আখতার
২০০১-২০০২	শিরিন আখতার	উম্মে হাবিবা
২০০২-২০০৩	শিরিন আখতার	উম্মে হাবিবা

www.pathagar.com

প্রথম অফিস ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্নুজান হলের ২০২ নং রুম। পরে ব্যাপক কাজের সুবিধার্থে সভানেত্রীর বাসায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব ক্যাম্পাসে T.S, রিপোর্টিং ও অন্যান্য অফিসিয়াল কাজ চলত।

প্রথম ইউনিট ঃ মন্নুজান হলে প্রথম ইউনিট খোলা হয়। ১৯৮১ সালে রোকেয়া হলে দাওয়াতী কাজের ফলশ্রুতিতে সম্ভবত ১৯৮২ সালে রোকেয়া হলে ইউনিট গঠন করা হয়। ১৯৮৫-৮৬ সেশনে তাপসী রাবেয়া হলে কাজ শুরু হয়।

প্রথম সুধী ঃ তখন শিক্ষকদের সাথে এ শিশু সংগঠনের তেমন একটা সম্পর্ক না থাকলেও অনেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন।

১. আব্দুল মান্নান- ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ। ২. মোয়াজ্জেম হোসেন- গণিত বিভাগ।

প্রথম পাঠাগার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রথম পাঠাগারটির উদ্বোধন হয় মন্নুজান হলে। সাধারণ ছাত্রীদের আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে বইগুলো সংগ্রহ করা হয়।

প্রথম নির্বাচন ঃ ১৯৮০ সালের শেষের দিকে রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করা হয়। বিভিন্ন পোস্টার ও ব্যানারে সত্যের বাণী তুলে ধরা হতে থাকে। এ নির্বাচনে পাঁচজন ছাত্রীকে ছাত্রীসংস্থার ব্যানারে মনোনয়ন দেয়া হয়।

সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও মজবুতি ঃ রাজশাহী শহর থেকে ৩ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত মনোরম পরিবেশ বিশিষ্ট এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর পদচারণা এই ক্যাম্পাসে। অশ্লীল ও বিদেশী সংস্কৃতির অবাধ অনুপ্রবেশ সামাজিক মূল্যবোধে যে ধ্বস নেমেছে তার ক্ষতির পরিমাণ উপলব্ধি করেই শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার যাত্রা। একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ৬-৭ জন ছাত্রী নিয়ে শুরু হয় পথ চলা। গত ২৩ বছর পরিবেশ পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় পূর্ব অপেক্ষা বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি অনেকাংশে অনুকূল।

বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি হল ছাড়াও পার্শ্ববর্তী ৮টি এলাকা নিয়ে কাজ চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শাখায় বর্তমানে ১৩টি ইউনিট ও ৫টি দাওয়াতী এলাকা রয়েছে। #

www.pathagar.com

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

"তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে। এটা আল্লাহর কৃপা তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।" (হাদীদ-২১)

মহান রবের এ আহ্বানকে সামনে রেখে আনসারুল্লাহর দায়িত্ব পালনের মহতী লক্ষ্যে সাড়া দেবার জন্য নিজেকে সত্যিকার অর্থে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরি করার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আল্লাহর রজ্জুর সাথে নিজেকে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহী বোনদের নিয়ে ধীরে চলা নদীর মত গতিপথ সৃষ্টি করে আল্লাহর দীনের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা এগিয়ে চলে মোহনা লক্ষ্যে সন্তর্পণে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে শুধু ছাত্র ভর্তির সুযোগ ছিল। পরবর্তীতে মেয়েদের জোরালো আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯০-৯১ সেশনে ছাত্রী ভর্তির অনুমতি পায়। এদিকে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ১৯৭৮ সালে ঢাকাতে কাজ শুরু করার পর ক্রমান্বয়ে তা দেশের বিভিন্ন জেলাতে ছড়িয়ে পড়ে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্রীবোনরা ভর্তি হতে থাকে, তাই যশোর জেলা থেকে মাহফুজা আক্তার আলো আপা ও মুয়াজ্জেমা আক্তার আশা আপা ছাত্রীসংস্থার অগ্রসর কর্মী হয়ে ভর্তি হতে আসেন এবং সিরাজগঞ্জ থেকে সোমা তুকান আপাও ছাত্রীসংস্থা সম্পর্কে পরিচিত হয়ে আসেন।

আর এদের মাধ্যমেই ছাত্রীসংস্থার আলো ছড়িয়ে পড়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। কিভাবে পর্যায়ক্রমে তা গোলাপ রূপে সুশোভিত হল তা নিম্নে আলোচিত হলো :

১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩ সদস্যা বিশিষ্ট কমিটির সমন্বয়ে ৫ জন জনশক্তির এই সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিনায় গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রথমে এটি ছিল ইউনিট।

সেশন	সভানেত্রীর নাম	সেক্রেটারীর নাম
১৯৯১-৯২ (ছয় মাসের জন্য)	মাহফুজা আক্তার আলো	হোসনে আরা
১৯৯১-৯২	মোয়াজ্জেমা আক্তার	হোসনে আরা
১৯৯২-৯৩	আরজুমান আরা নাসিমা	সেলিনা রোজিন পিয়া
১৯৯৩-৯৪	সেলিনা রোজিন পিয়া	কবিতা সুলতানা
১৯৯৪-৯৫	সেলিনা রোজিন পিয়া	নাজমা সুলতানা

www.pathagar.com

সেশন	সভানেত্রীর নাম	সেক্রেটারীর নাম
১৯৯৫-৯৬	সেলিনা রোজিন পিয়া	শেখ নার্গিস সুলতানা উর্মি
১৯৯৬-৯৭	শেখ নার্গিস সুলতানা উর্মি	লুৎফুন্নাহার দিলারা
১৯৯৭-৯৮	নুসরাত জাহান দীপা	লুমা ফারহানা
১৯৯৮-৯৯	নুসরাত জাহান দীপা	লুমা ফারহানা
১৯৯৯-২০০০	নুসরাত জাহান দীপা	রওশন আরা
২০০০-০১	নুসরাত জাহান দীপা	উম্মে উমাইয়া পপি
২০০১-০২	নুসরাত জাহান দীপা	উম্মে উমাইয়া পপি
২০০২-০৩	শাহানা পারভীন	পলি আফরোজ

"জেহাদের এই ঝাণ্ডা আমরা চিরদিন উঁচু রাখবো,
চির মুজাহিদ সৈনিক মোরা অতন্দ্র নিশি জাগবো।"

জিহাদী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত এ ছাত্রী কাফেলা তাদের যাত্রাপথে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তা ছাত্রীসমাজের নিকট একটি প্রতিনিধিত্বশীল ছাত্রী সংগঠন বলে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে নতশিরে দু'হাত তুলে দোয়া করি তিনি যেন অচিরেই আদর্শ শাখায় পরিণত হওয়ার তৌফিক দিন এবং এ সংগঠনের বোনদের একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপন করার তৌফিক দিন এবং নির্ধারিত লক্ষ্যপানে পৌঁছার তৌফিক দান করেন রহমতের বৃষ্টি ধারার মত।

"আমি পাড়ি দিয়ে এসেছি পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের উল্টো দিক থেকে সময়ের উল্টো দিক থেকে আমার যাত্রা।
আমি পৌঁছুবো তোমার নির্ধারিত কিনারে তোমার নির্ধারিত উপত্যকায়।"

আল্লাহ যেন আমাদের সবার এ নির্ধারিত উপত্যকায় পৌঁছার তৌফিক দিন। আমীন।

www.pathagar.com

সিলেট শহর

সবুজ শ্যামল চা-বাগানের হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য আর ঐতিহ্যবাহী সুরমা নদী বিধৌত সিলেট নগরী। এককালের শ্রীহট্ট। কত না ইতিহাস আর কেচ্ছা-কাহিনী জড়িয়ে আছে এ শহরকে কেন্দ্র করে। হযরত শাহজালাল (রহঃ), ইয়েমেন থেকে আগত যে প্রাণপুরুষের পবিত্র স্পর্শে কুফর আর শিরকের সয়লাবে ভেসে যাওয়া গৌড়গোবিন্দ শাসিত সিলেট মুক্ত হয়েছিল সমস্ত অন্যায়-জুলুম থেকে। প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ইসলামী আন্দোলন, হৃদয়ের মণিকোঠায় আজো সেই প্রাণপুরুষ শাহজালালের (রহঃ) পদচারণা। সেই সমৃদ্ধ অতীতের ধারাবাহিকতায় সিলেটে ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে ছাত্রী বোনদের মাঝে বিকাশ লাভ করে অনন্য ছাত্রী সংগঠন, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।

একসময়ের শিশু যেমন পৃথিবীর আলো হাওয়া আর মায়ের স্নেহস্পর্শে লালিত হয়ে এক পর্যায়ে বড় হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আমাদের এ প্রিয় সংগঠনটিও একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুরআন সুন্নাহর স্নেহরসে সিক্ত হয়ে পা দিয়েছে তারুণ্যে।

সিলেট শহরের কাজ শুরু হয় কবি ও লেখিকা মরহুমা লায়লা রাগিবের মাধ্যমে। প্রথমে তাঁকে আহ্বায়িকা করে সিলেটে ছাত্রীসংস্থার প্রথম পথচলা। ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে সংগঠন। ছাত্রীসংস্থার সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হতে থাকে ইসলামপ্রিয় বোনেরা। আঞ্জুমানে খেদমতে কোরানের প্রতিনিধি হাফেজা আসমা খাতুনের মাধ্যমে প্রথমে আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম শুরু। ছাত্রীসংস্থার কাজ মূলত দাওয়াতী ও আত্মগঠনমূলক। কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াতই এর দাওয়াত। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক তাফসীরের মাধ্যমে শত শত বোনেরা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের প্রয়াস পায়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলেও এ সংস্থার আদর্শিক ডাকের সাড়া মেলে। মেধাবী ছাত্রীরা ইসলামের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করে নৈতিক জীবনকে শাণিত করতে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

বর্তমানে সিলেট শহর ১০টি থানায় কাজ চালু করেছে। ২৪টি ইউনিট ও একাধিক দাওয়াতী এলাকায় কাজ করছে। সিলেটে ছাত্রীসংস্থার কাজ শুরুর পর থেকেই সীরাত (সা) মাহফিল, ছাত্রী-সুধী সমাবেশ চালু আছে। তবে ৯০ সালের পর হতে মোটামুটি বড় আকারে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে ইফতার মাহফিলসহ সিলেট মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য এলাকায় প্রত্যেক বছর ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এ পর্যন্ত ১০ জন সভানেত্রী বিভিন্ন সেশনে দায়িত্ব পালন করেছেন। সিলেট শহর শাখা ৭-৮ সেশন ধরে প্রায় নিয়মিত সীরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে বার্ষিক প্রকাশনা "সীরাজাম মুনীরা" বের করে আসছে। যা ইসলামী চেতনাবোধক পত্রিকা হিসাবে সুধীমহলে সমাদৃত। ২০০২-২০০৩ সেশনে এই প্রথমবারের মত ছাত্রীসংস্থার দেয়ালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে বের হয়।

ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনাকে ধরে রাখার ঐতিহ্য সিলেট অঞ্চলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আরও সব অঞ্চলের মত এখানেও ইসলামের ব্যাপক ভুল ধারণা ও অপসংস্কৃতির সয়লাব লক্ষ্যণীয়। তাই মুসলিম ছাত্রীসমাজকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও করণীয় সম্পর্কে জানিয়ে আদর্শ মুসলিম ছাত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে ছাত্রীসংস্থা সিলেটকে হতে হবে আরও মজবুত, বেগবান। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন ॥

www.pathagar.com

বরিশাল শহর

"সাহসের সাথে কিছু স্বপ্ন জড়াও
তারপর পথ চল নির্ভয়
আঁধারের ভাঁজ কেটে
আসবে বিজয়
সূর্যের লগ্ন সে নিশ্চয়।"

ইসলামী আন্দোলনের কাজকে সম্প্রসারিত করবার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রাচ্যের ভেনিস, ধান, নদী, খাল- এই তিনে বরিশাল নামে খ্যাত এই দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরে ১৯৭৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর কিছুসংখ্যক ছাত্রীবোনদের উপস্থিতিতে বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে যাত্রা শুরু হয়। প্রথম সভানেত্রী হলেন সাদিয়া মাহমুদা ও মাফরুজা বেগমকে সেক্রেটারী করে বার সদস্যা বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

প্রতিষ্ঠার পর পরই খুব জোরালোভাবে কার্যক্রম চলে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দাওয়াত পৌছানো হলে সাধারণ ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। সাদিয়া মাহমুদা আপা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন- "আমাদের বোনদের প্রচেষ্টায় যে জনশক্তি এ পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল তাদের সম্পর্ক ছিল সীসাঢালা প্রাচীরের মত।"

অফিস ঃ ছাত্রীসংস্থার ১ম অফিস ছিল ফকিরবাড়ী রোডস্থ খন্দকার মঞ্জিলে। বেশ কয়েক বছর থাকার পর অফিস স্থানান্তর হয় গোড়াচাঁদ দাস রোডে অধ্যাপক হাই খানের বাসায়। ওখান থেকে জর্ডন রোডস্থ রাহীম মঞ্জিলে কিছুদিন ছিল এবং ১৯৮১ সালে কাজের সুবিধার্থে তখনকার সভানেত্রী জামালুন্নেসা হাসি আপার বটতলাস্থ মেহরাজ মঞ্জিলে স্থানান্তর করা হয়। ৮৩-৮৭ সাল পর্যন্ত দ্বীন বন্ধু সেন রোডে অবস্থিত শাখা সভানেত্রী হালিমা বেগমের বাসায় অফিসের কার্যক্রম চলে। ৮৮ সালে অফিস স্থানান্তর করা হয় নবগ্রাম রোড কুলসুম মঞ্জিলে মুন্সি আশরাফুল হকের ভাড়া বাসায়। বছর কয়েক পর অফিস চলে আসে বন্দে রোডস্থ পান্থনীড়ে।

২০০১ সালে বাস্তবতার কারণে অফিস ছেড়ে দিতে হয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন, সর্বত্র অশান্ত পরিবেশ, আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হুমকি, কোথাও অফিসের জন্য নিরাপদ স্থান না পাওয়ায় বর্তমান সভানেত্রীর বটতলাস্থ 'আকন মঞ্জিলের' বাসায় অস্থায়ীভাবে অফিসের কার্যক্রম চলে ৯ মাস। ওখান থেকে ব্রাউন কম্পাউন্ড কুসুমালয়ে ২ মাস অফিসের কার্যক্রম চলার পর নিউ সার্কুলার রোডে এক ভাড়া বাসায় স্থানান্তর করা হয়। কাজের বিস্তৃতির সাথে অফিস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মে-২০০৩ এ জর্ডন রোডস্থ হদুয়া লজ'- এ বর্তমানে অফিসের কার্যক্রম চলছে।

১৯৭৯-৮৬ সাল ঃ ছাত্রীসংস্থার তৃতীয় দফা কর্মসূচি- সমস্যা সমাধানের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ছাত্রীদের সামাজিক সমস্যার সমাধান, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দক্ষিণ বাংলার প্রাণকেন্দ্রে ছাত্রীরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন তার পর্যায়ক্রমিক সমাধান কল্পে বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজে বিভিন্ন বিভাগে অনার্স কোর্স প্রবর্তন ও মাস্টার্স ডিগ্রি

www.pathagar.com

চালু করার দাবিতে ছাত্রীসংস্থা সর্বপ্রথম আন্দোলন করে। এবং ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষালাভের পথ উন্মুক্ত, সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন ও সরকারকে এ যুক্তিপূর্ণ দাবি মেনে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বরিশাল শহর শাখার কর্মীবৃন্দ ১টি লিফলেটও বের করে। উল্লেখ্য বর্তমানে সরকারী মহিলা কলেজে অনার্স কোর্স চালু আছে। এদিকে দাওয়াত সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। দায়ীত্বশীলা ও কর্মীদের মধ্যে শুধু কাজ আর কাজ করার চিন্তা ছাড়া অন্য কোন ভাবনা নেই যেন। তাই সাংগঠনিক ব্যস্ততা, ব্যক্তিগত পড়াশুনা আর পরিবারের হক আদায় করে ক্লান্ত বোনদের জন্য একটু বিনোদন ব্যবস্থা- বনভোজন। বছরটি ছিল ১৯৮৫। সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। অনেক বোনের কলকাকলীতে মুখরিত। শরয়ী সীমার মধ্যে থেকেও এত সুন্দর একটি আনন্দঘন পরিবেশ উপস্থিত নতুনদের মধ্যে পুরনো ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন ঘটিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কাজে আরও উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করল।

১৯৮৮ সাল ঃ ছাত্রীসংস্থা দাওয়াত সম্প্রসারণ ও অভ্যন্তরীণ মজবুতির দিকে লক্ষ্য দেয়। বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজে শাখা সভানেত্রী সাঈদা আরজুমান্দ বানুর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয় নবীনবরণ অনুষ্ঠান। বিপুল সংখ্যক নবীন ছাত্রীরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

১৯৮৯-৯১ সাল ঃ এ সময়ে ক্যাম্পাস ভিত্তিক কাজের জোয়ার আসতে শুরু করে। বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলার অক্সফোর্ড নামে খ্যাত বি.এম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও সরকারী মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীসংস্থা ১টি প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং এরই ফলশ্রুতিতে ছাত্রীসংস্থা ১৯৯১ সালে বিএম কলেজ বাকসু নির্বাচনে ব্যাপক পোস্টারিং ও ছাত্রী নিবাসে প্যানেল পরিচিতি অনুষ্ঠান করা হয় এবং ছাত্রী হোস্টেলের সার্বিক সমস্যা সমাধান কল্পে সহছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা পদে শাহনাজ পারভীন সম্পা বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। এ সময়টিতে এশিয়ার বৃহত্তম শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ছাত্রী হোস্টেল এর কাজের অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্রীসংস্থা মেডিকেল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ২টি পদে অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষে ছাত্রী নিবাসে প্যানেল পরিচিতি অনুষ্ঠান করা হয়।

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ১৯৯২-২০০৩ সাল ঃ অপসংস্কৃতির উত্তাল সাগরে বিপরীত স্রোত আনার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯২ সালে "সত্যের সন্ধানী শিল্পীগোষ্ঠী"র আত্মপ্রকাশ ঘটে। নাজমুন নাহার নাজু আপার পরিচালনায় কার্যক্রম অব্যাহত থাকে ২টি বছর। পরবর্তীতে একাধিক পরিচালিকার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৯৮ সাল থেকে সাহিত্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় তদারকীতে চলে আসে এবং আভ্যন্তরীণ মজবুতী অর্জনে সক্ষম হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা কর্মী বোনেরা ইতিমধ্যে ইসলামীক ফাউন্ডেশন, শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত, ইসলামী গান, উপস্থিত বক্তৃতা, সাধারণ জ্ঞান, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদের প্রতিভা বিকাশে সক্ষম হয় এবং অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে একাধিক পুরস্কার।

২০০২ সালে বরিশাল শহর শাখা ২৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করে ছাত্রী ও সুধী সমাবেশ। সত্যের সন্ধানী শিল্পীগোষ্ঠী অনুষ্ঠানে গীতি নক্শা ও নাটক (তওবা) পরিবেশনের মাধ্যমে সকলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়।

১৯৯২ সাল থেকে এ পর্যন্ত সত্যের সন্ধানী শিল্পীগোষ্ঠীর নামে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চলে আসছিল। ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বরিশাল শহর সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশ করলো হ্যান্ড ম্যাগাজিন "জাগরণ"। প্রথম প্রকাশিত পত্রিকায় সত্যের সন্ধানী সাহিত্য গোষ্ঠীর নাম কেন্দ্রের পরামর্শের আলোকে পরিবর্তন হয়ে কেন্দ্রের সাহিত্য সাংস্কৃতিক বিভাগের নামে নতুন নামকরণ হলো- "সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী"। বর্তমানে সাহিত্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে উত্তরোত্তর সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছানোর ব্যাপারে আফসানা তানজিন ও দিলরুবা ইয়াসমিন নাহিদ এর যৌথ প্রচেষ্টা উল্লেখ করার মত।

১৯৯২-১৯৯৮ সেশন ঃ এ সময়ে ছাত্রীসংস্থার সার্বিক কার্যক্রম আদর্শমানে চলে আসলে কেন্দ্রীয়ভাবে বরিশাল শহর শাখাকে 'আদর্শ শাখা' ঘোষণা করা হয়। তখনকার সভানেত্রী ছিলেন শওকত আরা বিউটি। এ সময়টিতে বি.এম কলেজ ছাত্রীনিবাস ছিল ছাত্রীসংস্থার মজবুত ঘাঁটি। এক কথায় বলা যায় নেতৃত্ব তৈরির কারখানা।

প্রতিবছর নবীন ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজন করা হতো নবীনবরণ অনুষ্ঠান ও কৃতি ছাত্রী সম্বর্ধনা। এ ছাড়া মেডিকেলেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা হত। ছাত্রীসংস্থার বোনদের ছাড়া একটি অনুষ্ঠান সুন্দর সুশৃংখল, সুচারুরূপে বাস্তবায়নের কথা অন্যকোন সংগঠনের বোনেরা চিন্তাই করতে পারত না। অর্থাৎ যে কোন অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য ছাত্রীসংস্থার বোন ছাড়া সম্ভব হবে না এ রকম অনুভূতি পয়দা হয়েছিল ছাত্রীনিবাসের প্রতিটি ছাত্রী বোনদের মধ্যে।

www.pathagar.com

ছাত্রী নিবাসের শত শত ছাত্রীদের জন্য কোন নামায ঘরের ব্যবস্থা ছিল না, ছাত্রীসংস্থা আন্দোলনের মাধ্যমে নামাজ ঘর প্রতিষ্ঠায় সফল হয়।

ছাত্রীসংস্থার ঈর্ষণীয় সাফল্য বিরোধী শক্তির গাত্রদাহের কারণ হলো- ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ছাত্রীনিবাসে ছাত্রলীগ নেত্রীদের ছাত্রীসংস্থার ওপর বারবার খবরদারী করতে চাইলেও সফল হয়নি।

১৯৯৯ সেশন ঃ বি.এম কলেজ ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীসংস্থার নেতৃত্ব পর্যায়ের কয়েকজন বোনের ছাত্রীজীবন শেষ হওয়ায় তাদের স্থানান্তরের সুযোগ গ্রহণ করে ছাত্রলীগ ছাত্রীসংস্থাকে হল থেকে উচ্ছেদের পাঁয়তারা শুরু করে। তারা ১০৩, ২০২, ২০৩, ৩০৭, ৪০৬, ৪০৭, ৩০০৪ উক্ত রুমগুলো বিশেষভাবে টার্গেট করে। এ ছাড়া হলের প্রতিটি রুমে তল্লাসী অভিযান চালায়। কর্মীদের বিনা কারণে অসহ্য গালমন্দ, বই ও অন্যান্য আসবাবপত্র বাহিরে ছুঁড়ে ফেলা ও মূল্যবান সরঞ্জামাদী লুট করা হয়। ছাত্রীসংস্থার বোনদের অনেক ত্যাগের ফসল দুটি লেন্ডিং লাইব্রেরির সমস্ত বই, নোটপত্র নষ্ট করে দেয়া হয়। হলে যে কয়জন ছাত্রীসংস্থার বোন ছিলেন তাদের মূলত ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও কিছু কৌশল অবলম্বনের কারণে থাকা সম্ভব হয়েছিল। তবে তাদের ওপর সর্বক্ষণ নজরদারী ছিল।

২০০০ সেশন ঃ বি.এম. কলেজ (বাকসু) নির্বাচনে ছাত্রীসংস্থা ৪টি পদে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রীনিবাসের অধিকাংশ ছাত্রীদের সমর্থন এবং তাদের বিজয়ী হবার সম্ভাবনা উপলব্ধি করে ছাত্রলীগ নির্বাচনের রাতে হলে অস্ত্র উঠিয়ে প্রতিটি ছাত্রীকে হুমকি প্রদান করে ছাত্রীসংস্থার প্রার্থীদের ভোট না দেয়ার জন্য। এও বলা হয় ছাত্রীসংস্থার প্রার্থীদের ভোট দিলে হল থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে।

ছাত্রলীগের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে সাধারণ ছাত্রীরা ভোট প্রদান করতে শুরু করে। কিন্তু ভোট দানের ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ছাত্রলীগ বুথগুলো দখল করে নেয়। ভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ছাত্রীসংস্থার। বাকসু নির্বাচনের পরের রাত্রে ছাত্রীনিবাসে ছাত্রলীগের হামলা হওয়ার সম্ভাবনা উপলব্ধি করে ছাত্রীসংস্থার বোনদের ঐ দিন ফজর নামায বাদ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়। রাতে হলে হামলা করে সাধারণ ছাত্রীদের ভয়ভীতি দেখানো হয়। এ ঘটনা স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য বাকসু নির্বাচন ফলাফল পরবর্তীতে ছাত্রঐক্যের আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ অবৈধ ঘোষণা ও বাতিল করতে বাধ্য হয়। একই বছর ছাত্রীসংস্থা কর্মীদের নিয়ে আয়োজন করে বনভোজন। বনভোজন অনুষ্ঠানের পুরোদিনটাই ছিল অনেক আনন্দের। উপস্থিত প্রতিটি বোনের স্মৃতিতে তা অম্লান হয়ে থাকবে।

২০০১ সেশন ঃ ছাত্রীসংস্থা আভ্যন্তরীণ মজবুতীর দিকে লক্ষ্য দেয়। এই সময়টিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল আশংকাজনক। বড় কোন অনুষ্ঠান করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ।

বি.এম কলেজ ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীসংস্থাকে সমূলে উৎখাতের জন্য ছাত্রলীগ চালায় চিরুনী অভিযান। অগত্যা কর্মী বোনেরা হোস্টেলের কাছাকাছি বাসা ভাড়া নেয় এবং সেখানেই ইউনিটের কার্যক্রম চলে আসছিল।

সরকার পরিবর্তনের পর ছাত্রীনিবাসে বর্তমান ছাত্রীসংস্থার কার্যক্রম চলেছে।

২০০২ সেশন ঃ বাছাইকৃত স্কুল কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। ৪টি গ্রুপে বন্টন করে কর্মীদের নিয়ে যাওয়া হয়। শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের জন্মস্থান খাচারে অবস্থিত শের-ই-বাংলা যাদুঘরে। সফর শেষে তাদের জন্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান করা হয়। এ শিক্ষা সফরের ফলে স্কুল কর্মীদের মধ্যে কাজের স্পৃহা ও মানোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ২৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সরকারী মহিলা কলেজে আয়োজন করা হয় সুধী ও ছাত্রী সমাবেশ। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ধারণাতীত। হল ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছাত্রী ও সুধীদের মধ্যে এ অনুষ্ঠান ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য ২০০২-২০০৩ সেশনে বরিশাল শহর শাখা সদস্যা সংখ্যার উন্নীত হয়।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অবধি বরিশাল শহর শাখার দায়িত্বে যারা ছিলেন।

www.pathagar.com

সেশন	সভানেত্রী	সেক্রেটারি
১৯৭৮-৭৯	সাদিয়া মাহমুদা	মাফরুজা বেগম
১৯৭৯-৮০	সাদিয়া মাহমুদা	খন্দকার আয়শা
১৯৮০-৮১	জামালুন্নেসা হাসি	খন্দকার আয়শা
১৯৮১-৮২	জামালুন্নেসা হাসি	মাফরুজা বেগম
১৯৮২-৮৩	মাফরুজা বেগম	হালিমা বেগম
১৯৮৩-৮৪	হালিমা বেগম	শামীমা ইয়াসমিন লায়লা
১৯৮৪-৮৫	হালিমা বেগম	শামীমা ইয়াসমিন লায়লা
১৯৮৫-৮৬	হালিমা বেগম	হাফিজা শওকত
১৯৮৬-৮৭	হালিমা বেগম	হাফিজা শওকত
১৯৮৭-৮৮	হালিমা বেগম	সাঈদা আরজুমান্দ বানু
১৯৮৮-৮৯	সাঈদা আরজুমান্দ বানু	হামিদা বেগম
১৯৮৯-৯০	সাঈদা আরজুমান্দ বানু	হাফিজা শওক
১৯৯০-৯১	সাঈদা আরজুমান্দ বানু	নাঈমা তাহেরা খান নীনা
১৯৯১-৯২	নাঈমা তাহেরা খান নীনা	নাজমুন নাহার নাজু
১৯৯২-৯৩	শওকত আরা বিউটি	নাসিমা ইয়াসমিন শায়লা
১৯৯৩-৯৪	শওকত আরা বিউটি	নাসিমা ইয়াসমিন শায়লা
১৯৯৪-৯৫	শওকত আরা বিউটি	আফরোজা সুলতানা মুক্তা
১৯৯৫-৯৬	শওকত আরা বিউটি	আফরোজা সুলতানা মুক্তা
১৯৯৬-৯৭	লাইলুন নাহার লুনা	কামরুন নাহার বেবী
১৯৯৭-৯৮	লাইলুন নাহার লুনা	কামরুন নাহার বেবী
১৯৯৮-৯৯	লাইলুন নাহার লুনা	নাজমুন নাহার সুমী
১৯৯৯-২০০০	দিল আফরোজ ইয়াসমিন	শামীমা ইয়াসমিন মায়া
২০০০-০১	দিল আফরোজ ইয়াসমিন	রাবেয়া আকতার
২০০১-০২	দিল আফরোজ ইয়াসমিন	রাবেয়া আকতার
২০০২-০৩	দিল আফরোজ ইয়াসমিন	রাবেয়া আকতার

www.pathagar.com

পাবনা শহর

প্রকৃতির অনুপম সৃজনী সবুজ ব-দ্বীপ এই বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের এক ছোট সীমানা জুড়ে রয়েছে পাবনা অঞ্চল। অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রদেশ ছিল বঙ্গদেশ। যার জেলা ছিল মোট ২৮টি তারই একটি জেলা হল উত্তরাঞ্চলের প্রবেশদ্বার পাবনা জেলা। যেকোন প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস চিরকালই সময় ও ভূগোলের সীমানাকে অতিক্রম করে চলে কালান্তরের পথে। এই প্রেক্ষিতেই পাবনার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯৭৮ সালে।

সত্যিই আনন্দের বিষয় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা যে, বছর ঢাকাতে প্রতিষ্ঠা হয় ঠিক সেই বছরে পাবনাতেও এর কার্যক্রম শুরু হয়। এবং এ সময় পাবনা নারী সমাজের এক অনন্য প্রতিভা মিসেস নাজমা রহমানকে আহ্বায়িকা করে ৫ সদস্যা বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়।

৫ সদস্যা বিশিষ্ট এই কমিটির সদস্যারা হলেন :

১. শাহানারা বেগম
২. মনোয়ারা বেগম
৩. শামীমা আক্তার (বিউটি)
৪. হাসিনা মমতাজ (শেফালী)
৫. সুলতানা আরা বেগম।

সর্বপ্রথম পাবনা শহরের ছোট এলাকা গোপালপুরে এর ভিত স্থাপিত হয়। খোদাভীরু ও মেধাবী ছাত্রীদের নিয়ে এ-সংস্থা শুরু থেকেই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে থাকে। দীর্ঘদিনে পাবনায় এ সংস্থার পরিধি হয়েছে বিস্তৃত। এর জনশক্তি আজ উন্নীত হয়েছে প্রায় নয় হাজারে। আনন্দের বিষয় যে, পাবনা প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে পর্যাক্রমে এলাকা- ইউনিট- শাখা- আদর্শ শাখা- সদস্যা শাখার মানে উন্নীত হয়েছে। পাবনায় ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী মুহ্তারিমা শাহানারা বেগম। তিনি ১৯৭৮-১৯৮৩ পর্যন্ত নিরলস নেতৃত্ব প্রদান করেন। এবং তার সহযোগিতায় যারা ছিলেন তারা হলেন :

১. সেক্রেটারী – সুলতানা আরা বেগম
২. বায়তুলমাল- হাসিনা মমতাজ শেফালী
৩. অফিস ও দাওয়াতী এলাকা- মনোয়ারা বেগম
৪. পাঠাগার সম্পাদিকা : শামীমা আক্তার (বিউটি)

www.pathagar.com

১৯৮২ থেকে নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় যারা রয়েছেন :

সেশন	সভানেত্রীর নাম	সেক্রেটারীর নাম
১৯৮২-১৯৮৩	শামীমা বেগম ঝিনু	মনোয়ারা বেগম
১৯৮৩-১৯৮৪	মনোয়ারা বেগম	আসমা মেহেজাবীন তুহিন
১৯৮৪-১৯৮৫	আসমা মেহেজাবীন তুহিন	আনোয়ারা খানম
১৯৮৬-১৯৮৭	হাসিনা খাতুন	জীবননেছা
১৯৮৭-১৯৮৮	হাসিনা খাতুন	জীবননেছা
১৯৮৮-১৯৮৯	জীবননেছা	মুর্শিদা খাতুন
১৯৮৯-১৯৯০	মুর্শিদা খাতুন	আসিফা বেগম
১৯৯০-১৯৯১	মুর্শিদা খাতুন	গুলশানা আরা লুনা
১৯৯১-১৯৯২	শামীমা সুলতানা মুকুল	গুলশান আরা লুনা
১৯৯২-১৯৯৩	সুরাইয়া সুলতানা পাপড়ী	শামীমা সুলতানা মুকুল
১৯৯৩-১৯৯৪	সুরাইয়া সুলতানা পাপড়ী	শামীমা সুলতানা
১৯৯৪-১৯৯৫	সুরাইয়া সুলতানা পাপড়ী	রেহানা বেগম
১৯৯৫-১৯৯৬	রেহানা বেগম	এশরাত আরা উর্মি
১৯৯৬-১৯৯৭	রেহানা বেগম	আমিনা বেগম
১৯৯৭-১৯৯৮	আমিনা বেগম	রোকসানা আনোয়ার
১৯৯৮-১৯৯৯	আমিনা বেগম	রোকসানা আনোয়ার
১৯৯৯-২০০০	মারুফা বেগম	রোকসানা আনোয়ার
২০০০-২০০১	রোকসানা আনোয়ার	মার্জানুন্নাহার
২০০১-২০০২	মার্জানুন্নাহার	ফাতেমা খাতুন
২০০২-২০০৩	মার্জানুন্নাহার	সুবর্ণা জামান

১৯৮৪ সাল থেকে পাবনায় নির্বাচনী ধারা শুরু হয়। ১৯৯৩-৯৪ সেশনে আদর্শ শাখার মানে উন্নীত হয় এবং ১৯৯৯-২০০০ সেশনে ৩ জন বোনের সদস্যা মানে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে সদস্যা শাখার মানে উন্নীত হয়। ২০০১-২০০২ সেশনে এটা ভেঙ্গে গেলেও ২০০২-২০০৩ সেশনে পাবনা শহর শাখা পুনরায় সদস্যা শাখায় উন্নীত হয়। #

www.pathagar.com

বগুড়া শহর

বাবা আদম শহীদ, তুফান শাহ শহীদ, বন্দিগী শাহ শহীদ, মীর সাইয়েদ সুলতান মাহমুদ মাহী সাওয়ার (রঃ), সরদার মজনু শাহ, মস্তানা বুরহানা, শহীদ আব্দুল মালেক, শহীদ সাইফুল ইসলাম মামুন, শহীদ আনিছুর রহমান পাশা'র স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি বগুড়া ইতিহাসের পাতায় যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের এক তীর্থভূমি হিসাবেই স্বীকৃত। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলন, সাইয়েদ আহমদ বেরীলভী রহঃ এর জিহাদী আন্দোলন, ফকির মজনু শাহের ফকির আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন প্রভৃতির অন্যতম দুর্গ ছিল বগুড়া। অতীত ইসলামী আন্দোলনের ধারা বেয়ে আধুনিক কালেও বগুড়ায় ইসলামী আন্দোলন রচনা করেছে এক মজবুত ভিত্তি। সৃষ্টি হয়েছে শাহাদাতের ঐতিহ্য। রচিত হয়েছে ত্যাগ ও কুরবানীর অনন্য সব দৃষ্টান্ত। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলেমে দীন, সফল ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহঃ এর ইসলামী আন্দোলনের সূচনালগ্নেই এর জোয়ার এসে আছড়ে পড়ে বগুড়ার জন মানুষের প্রান্তরে। গড়ে ওঠে সর্বস্তরে সংগঠন। যেমন বৃহত্তর অংগনে ঠিক তেমনি ছাত্রী অংগনে। আমরা চলমান প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কাল অবধি বগুড়ায় ছাত্রী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের স্মৃতিময় ঘটনাগুলিকে উল্লেখ করার প্রয়াস পাব।

বিংশ শতাব্দির বিদায় ঘণ্টা বাজছে। কিন্তু বিদায় নেয়নি নব্য জাহেলিয়াত। পরিবেশটা খুবই প্রতিকূল। ছাত্রীদের নামায পড়া মাথায় ওড়না পড়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। মনে করা হত এসব কেবল বুড়োদের কাজ। ইসলামী আন্দোনের কোন ধারণাই তাদের ছিল না। ইসলামী রাজনীতিকে ইসলাম বিকৃতিকরণ মনে করত। ইসলাম বলতে ঘরে বসে নামায, রোজা, তছবিহ তাহলীল ও জিকির করাকে বুঝতো। এমনি সমাজে এমনি এক পরিবেশে আল্লাহর এক পছন্দনীয় এক বান্দী, বয়স তার খুবই অল্প। এখনও ম্যাট্রিক পাস করেনি। ভাবছে সমাজের এই ভ্রান্ত চেহারা কিভাবে পাল্টানো যায়। ভাবছে, এই ভ্রান্ত অবস্থা থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায় কিভাবে। কচি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মুসলমানদের কাছে আজ তাদের আসল পরিচয় তুলে ধরা দরকার। এবং সেই আলোকে তাদের জীবন গড়ে তোলা দরকার।

কিভাবে এত বড় কাজ সম্ভব। এ কাজতো একার ইচ্ছা দিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন কিছু লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। কিন্তু কোথায় পাবে সে কিছু লোক। তার মতো চিন্তা কি সবাই করে? অন্যদের সাথে তার চিন্তাকে শেয়ার করতেও পারে না। হয়ত হেসেই উড়িয়ে দেবে তার কথাকে। তাই সে একা একা ভাবতো কি করা যায়? কিভাবে এ সমাজের অবস্থা পরিবর্তন করা যায়।

ইতিমধ্যে তার দুলাভাইকে দেখেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন করতে। বাবাও একজন পরহেযগার মানুষ। ইকামাতে দীনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার কাজে ব্যস্ত। এসব দেখে তার অনুভূতি হয়ে ওঠে আরও ধারালো আরও তীক্ষ্ণ হৃদয়ের সমস্ত বিশ্বাস দিয়ে উপলব্ধি করে ছাত্রী অঙ্গনে ইকামাতে দীনের কাজের গুরত্বের কথা। কারণ সে মনে করে আজকে যে ছাত্রী সেই তো আগামী দিনের মা। আর একটি জাতির উন্নতি অবনতি নির্ভর করে একটি মায়ের ওপর। এসব ভেবে সেই

www.pathagar.com

পেরেশানী আত্মা আরও অস্থির হতে থাকে। এমনি অস্থিরতার মাঝে একদিন পরিকল্পনা নিয়ে ফেলে ছাত্রীদের একটি সংস্থা করার। এমনকি নিজেই তার নাম দেয়। বাংলাদেশ ইসলামী সাংস্কৃতিক ছাত্রীসংস্থা।- নামতো দেওয়া হল কিন্তু কোন পদ্ধতিতে এ সংস্থা চলবে তার কোন নির্দেশনা পাচ্ছেন না তিনি। বয়সও অল্প বলে নিজেও কোন উপায় বের করতে পারছেন না। এমনি এক পেরেশানি মুহূর্তে তার বাবা আব্দুর রহমান ফকির সাহেব একটি কাগজ এনে বললেন- "মা তোমাদের জন্য সুখবর। ঢাকা থেকে চিঠি এসেছে। ছাত্রীদের মাঝে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রত্যেক জেলায় একাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলছে। এ লক্ষ্যে সম্ভাবনাময়ী জেলাগুলি থেকে ছাত্রীদের ঢাকায় ডেকেছে। তাদের নিয়ে T.C হবে। (যেটি ছিল কেন্দ্রের প্রথম T.C.) তুমিও মহান কাজে নিয়োজিত হতে পার।"

ইতিমধ্যে সেই পেরেশানী আত্মা ম্যাট্রিক পেরিয়ে ইন্টামিডিয়েটের ছাত্রী। বগুড়া মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজে ভর্তি হয়েছে। বাবার মুখের কথাগুলি শুনে তার মনে হচ্ছিল যে, তার অন্তরের কথাগুলি কে যেন জানতে পেরেছে। আর সেই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্য কোন এক কর্তা তার বাণী বাহককে পাঠিয়েছেন সেই কাঙ্ক্ষিত আত্মার ইচ্ছা পূরণের জন্য। এতদিন ধরে যে জিনিসকে কল্পনায় লালন পালন করেছে আজ সে কল্পনা বাস্তবে রূপ পেয়েছে। তার হাতেই পেয়ে গেছে সেই কল্পনার লালিত বিষয়। আনন্দে আত্মহারায় সে যে বাকরুদ্ধ। সেই কচি আত্মার মুখে কোন ভাষা ছিল না তার রবের কাছে শুকরিয়া আদায় করার। T.C. থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্মেলন স্মারক ১টি পরিচিতি ১টি এবং প্রাথমিক সদস্যা ফরম ১টি পাঠায়।

এখন দায়িত্ব অনেক। অনেক পথ এগুতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন সঙ্গী। এক এক করে সাগরের মাঝে নুড়ি কুড়ানোর মত হাজারো ছাত্রীর মাঝে খুঁজতে থাকে তার মনের মত ছাত্রী। সে ভাবতে থাকে, কাকে বলা যাবে তার মনের কথা। তার প্রিয় সংগঠনের কথা। লক্ষ্য করতে থাকে কোন মেয়েটি একটু শালিন! কোন মেয়েটি বড় ওড়না পড়ে! (সে ছাড়া বোরখা পড়া মেয়ে একটিও ছিলনা পুরো কলেজে) ইতিমধ্যে তার কলেজেরে দোতলায় লক্ষ্য করল একটি মেয়ে বড় ওড়না পড়া। ছুটে যায় তার কাছে। পরিচয় জেনে নিয়ে সম্পর্কটা গভীর করে তার কাছে উপস্থাপন করে তার প্রিয় সংগঠনের কথা। প্রথম প্রস্তাবেই মেনে নেয় সমস্ত কথাগুলি এবং তার সাথে সংগঠনের সকল কাজে সাথে থাকবে বলেও শপথ করে। সৌভাগ্যবান ২য় ব্যক্তিটি হল মোছাঃ ফেরদৌসী। আর যার মাধ্যমে সে সৌভাগ্যবানদের মধ্যে সামিল হতে পেরেছিল এবং আজ বগুড়ায় হাজার হাজার মেয়ে ইসলামী আন্দোলনের সাথে, ইকামাতে দীনের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে তিনিই হলেন সেই ভাগ্যবান পিতার সার্থক সন্তান মোছাঃ মোস্তাজিয়া বানু।

এইভাবে দুইজন এবং খুঁজতে খুঁজতে আরও ২ জনকে পাওয়া যায়। পরেরও দুজন ছিল জমজ বোন ফাতিমা ও নাসিমা। তারা ছিল তাবলীগ পন্থী। এই চারজন মিলে কলেজের নামাযঘরে বসত। কুরআনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। এভাবেই চলত প্রাথমিক কাজ।

মজার ব্যাপার ছিল যে, কেন্দ্র থেকে প্রাথমিকভাবে যে কাগজপত্র এসেছিল তা ছিল ১ কপি করে। কোন ফটোকপির দোকান না থাকায় হাতে লিখে তা চারকপি করা হয়েছিল। এমনকি সম্মেলন স্মারকও হাতে লিখে কপি করা হয়েছিল। এরূপ অনেক কাজই করা হত কষ্টের পরিবর্তে আনন্দের অনুভূতি নিয়ে।

এই চারজন সদস্যা নিয়ে বগুড়া মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজের নামাযঘরে অনাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পবিত্র সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ছিলেন সেই প্রশস্ত আত্মার অধিকারী মুহতারিমা মুস্তাজিয়া বানু। সেক্রেটারী ছিলেন তাঁর প্রথম সঙ্গী মুহতারিমা ফেরদৌসী। ফাতিমা ও নার্গিস বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করত।

বগুড়াকে শাখা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিলেন মুহতারিমা নুরুন্নিসা ছিদ্দিকা। এবং তার সাথেই সব বিষয়ে যোগাযোগ হত। এভাবেই বগুড়ার উর্বর মাটিতে ছাত্রী অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলনের বীজ বপন হয় যার সবুজ ডালপালা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।#

www.pathagar.com

ফরিদপুর শহর

"তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়।"

পল্লী কবি জসীমউদ্দিনের ছায়া ঘেরা, সুনিবিড় অঞ্চল এই ফরিদপুর। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে আরো বিভিন্ন ঘটনা উপঘটনার সাক্ষী এ অঞ্চল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এ অঞ্চলটি বিশেষ ঘটনার সাক্ষী হয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে।

শুরুর কথা ঃ বাংলাদেশের সবুজ জমীনে যখন বিরাজ করছিল ঘোর অন্ধকার, ইসলামকে মুছে দেয়ার জন্য চলছিল নানামুখী ষড়যন্ত্র। আর নারীমুক্তির শ্লোগান দিয়ে নারী সমাজ যখন তাদের অধিকার হারাতে বসেছিল ঠিক সেই সময় ১৯৭৮ সালের ১৫ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের T.S.C তে বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।"

সময়ের হাত ধরে ছাত্রী সমাজের এ প্রিয় সংগঠনটি ছড়িয়ে যেতে থাকে সবুজ এ দেশটির বিভিন্ন প্রান্তরে। আলহামদুলিল্লাহ। সংগঠনটির সূচনালগ্নেই ফরিদপুরে এর কাজ শুরু হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রীসংস্থার কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে মহিলা ও ছাত্রীরা একই সাথে কোরআন ও হাদিসের আলোচনা নিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতেন। ১৯৭৮ সালে ছাত্রীসংস্থা পরামর্শে প্রতিষ্ঠার পর ফরিদপুরে এই সংগঠনের কার্যক্রম এককভাবে শুরু হয়। তখন ফরিদপুরের এই ক্ষুদ্র সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন রোকেয়া আক্তার (মনি)। সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন চির সাদা হৃদয়ের অধিকারিণী আফরোজা খানম পুষি এবং বায়তুলমাল সম্পাদিকা ছিলেন মারুফা বেগম। খুব অল্প কয়েকজন বোনকে নিয়ে সংগঠনটি তার কার্যক্রম শুরু করে। তখন সংগঠনের বিস্তৃতি ১টি ইউনিট (আলীপুর) এবং ১টি দাওয়াতী এলাকার (পশ্চিম খাবাশপুরে) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রীসংস্থার কোন অফিস না থাকায় ফিরোজা বেগমের বাসায় প্রথম কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৮ সালে গঠিত কমিটির মাধ্যমেই ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত কাজ চলতে থাকে।

১৯৮৩-১৯৮৪ ঃ মনি আপা, আফরোজা আপাদের বিদায়ের পর সংগঠনের হাল ধরেন বোন সাবিনা ইয়াসমিন আইরিন যাকে বর্তমানে সবাই লেখিকা সাবিনা মল্লিক হিসাবে চিনেন। তখন কমিটিতে ছিলেন লুৎফুন নাহার, রেহানা বেগম, রাফেজা বেগম, সালমা সুলতানা প্রমুখ। জনশক্তি কম থাকা সত্ত্বেও আইরিন আপার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংগঠনের কার্যক্রম সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় সংগঠনের কার্যক্রম তেমন বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৪-১৯৮৫ ঃ সালে দায়িত্ব পালন করেন গুহ লক্ষিপুরের বোন মাসরুরা খাতুন (স্বরুফা)।

১৯৮৫-১৯৮৭ ঃ এই সেশনে সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন সালমা সুলতানা। তিনি ফরিদপুরের সাংগঠনিক জেলা এবং কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সদস্যা হিসাবে কাজ করেন। তার নেতৃত্বে সংগঠনের কার্যক্রম বেশ বৃদ্ধি পায় এবং দাওয়াত শহরের প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছাসহ জনসমর্থন বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

১৯৮৭-১৯৮৮ ঃ এ সেশনে দায়িত্ব পালন করেন রাফেজা বেগম।

১৯৮৮-১৯৯১ ঃ এ সময়ে দায়িত্ব পালন করেন মাহফুজা বেগম। তার সময়ে বৃহত্তর ফরিদপুরের প্রথম T.C অনুষ্ঠিত হয়। এই T.C উপলক্ষেই আলীপুরে ৩ রুমের একটি অফিস ভাড়া নেয়া হয়। এ বছর হতে প্রতিবছর শহর শাখার উদ্যোগে T.C কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া এ সময় বিভিন্ন দিবস উদযাপন, ইফতার মাহফিল, খাদিজা (রা) দিবস, বনভোজন প্রভৃতি কার্যক্রমও হয়।

১৯৯১-১৯৯২ ঃ এ সময়ে সভানেত্রী ছিলেন নাসিমা বেগম সংগঠনের মজবুতি এবং বিস্তৃতি মূলত এ সময় থেকেই শুরু হয়। বদর দিবস, ইফতার মাহফিল, বনভোজন ও বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সভার মাধ্যমে সংগঠনের জনশক্তি ও জনসমর্থন বাড়তে থাকে। এ সময় গোয়ালচামট, খোদাবক্স রোড, আলীপুর, লক্ষিপুর, পশ্চিম খাবাশপুর, হাবেলী গোপালপুর, টেপাখোলা, পূর্ব খাবাশপুর, ঝিলটুলী ও রাজেন্দ্র কলেজ এরিয়ায় ইউনিট ও দাওয়াতী ইউনিটের মাধ্যমে সংগঠনের কাজ চালু ছিল।

১৯৯২-১৯৯৪ ঃ জনশক্তির মানউন্নয়ন ও জনসমর্থন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে বিশেষভাবে এগিয়ে নেন বোন হেলেনা বেগম। স্কুল বিভাগের কাজ মূলত এ সময় হতেই শুরু হয়।

১৯৯৪-১৯৯৬ সাল ঃ হেলেনা আপার বিদায়ের পর সংগঠনের হাল ধরেন নাজমুন নিসা আপা। এ বোনটির নিবিড় পরিচর্যায় সংগঠনের ভিত আরো মজবুত হয়। মূলত এ কয়েক বছরে স্কুল অঙ্গনে, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, সংগঠনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। নাজমুন নিসা আপার সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তখন ছাত্রীসংস্থা ফরিদপুর শহরে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৯৯৬-২০০৩ সাল ঃ এরপর সংগঠনটি এগিয়ে নিয়ে যান বোন সুলতানা বেগম। সংগঠনের সম্প্রসারণ ও মজবুতি জনশক্তির মানউন্নয়ন, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি, স্কুল ও কলেজ বিভাগের কাজ সম্প্রসারণসহ উল্লেখযোগ্য কাজগুলো মূলত এ সময়ই হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে সুধী ও ছাত্রী সমাবেশ, বদর দিবস, ইফতার মাহফিল, বনভোজন, চা-চক্র, ঈদ পুনর্মিলনী, সীরাতুন্নবী (সঃ), মহররম, শবে মিরাজ, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, কর্মী সমাবেশ, ভাষা দিবস, T.C, T.S প্রভৃতি। ১৯৯৮ সালে ফরিদপুর শহর শাখার উদ্যোগে বায়তুল আমান চামেলী খালার বাসায় প্রথম T.C অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের ৫ আগস্ট ফরিদপুর শহর শাখাকে আদর্শ শাখা হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং একই বছরে ৫ ডিসেম্বরে এটিকে সদস্যা শাখা হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। যে তিনজন বোনকে নিয়ে সদস্যা শাখা ঘোষণা দেয়া হয় তারা হলেন সুলতানা বেগম, মোহসিনা বেগম, নাজুফা বেগম। কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ইউনিট থেকে থানা ভিত্তিক কাজ চালু হয়। ৩টি থানা ও ১২টি ইউনিটের অধীনে কাজ চলতে থাকে।

১৯৯৯ সালে ফরিদপুর শহর শাখার উদ্যোগে প্রথম প্রকাশনা 'প্রশান্ত' প্রকাশিত হয় যা সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাছাড়া সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে (সম্পাদিকা এলিজা মমতাজ) ও সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ (সম্পাদিকা- দিলরুবা আক্তার কণা) ২টি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। শিশু বিভাগের কাজকে জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে 'আলোর পাখি' নামে শাখা সংগঠনের কাজ শুরু হয়।

২০০৩ সালে ফরিদপুর শহরে ওয়ার্ড ভিত্তিক কাজ শুরু হয়। ৩ বছরেই ফরিদপুর শহরে কেন্দ্রের উদ্যোগে বৃহত্তর ফরিদপুরের অংশগ্রহণে আঞ্চলিক T.C অনুষ্ঠিত হয় ফরিদপুর আদর্শ একাডেমীতে। বর্তমানে ফরিদপুর শহরে ৯টি ওয়ার্ড, ২৪টি এলাকা রয়েছে। এরমধ্যে ছাত্রীসংস্থার কার্যক্রম ১২টি এলাকায় ১১টি ইউনিট ও ৮টি তাফসীর ক্লাসের মাধ্যমে চলছে। তবে সব ওয়ার্ডেই দাওয়াতী কার্যক্রম জনসমর্থন ভাল। মোট ১৭৭১ জন জনশক্তির মাধ্যমে এই সংস্থার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ছাত্রীসংস্থা আজ ফরিদপুরে একটি পরিচিত নাম। আগামীতে এ সংগঠন সবার হৃদয়ে সুন্দর স্থান তৈরি করতে পারবে এ প্রত্যাশা আমাদের সবার। #

www.pathagar.com

রংপুর শহর

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর
খোলো দ্বার, ওঠ বীর।
নিদাঘের রৌদ্র ঘর-কণ্ঠে শোনো প্রদীপ্ত আহ্বান...

বিশ্ব মানবতাকে সত্য, সুন্দর, সুবিচার ও প্রগতির পথপ্রদর্শনের গুরুদায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ওপর অর্পণ করেছেন। এক্ষেত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের দায়িত্ব সমান। আর এ দায়িত্ব পালনের উপরেই নির্ভর করে প্রত্যেকের জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের সুউচ্চ সম্মান অথবা ব্যর্থতার মর্মান্তিক পরিণতিতে সীমাহীন দুঃখভোগ। এ দায়িত্ব পালন তাই অপরিহার্য কর্তব্য প্রতিটি মুসলিমের সুষ্ঠু সুন্দরভাবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা তথা সংগঠন। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

এ উপলব্ধি থেকে ১৯৭৮ সালের ১৫ই জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের ছাত্রীদের মুক্তির বার্তাবহনকারী সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। প্রতিষ্ঠার পর পরই পত্রিকান্তরে এ সংস্থার আহ্বান ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত। সারাদেশ থেকে এ আহ্বানে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দানকারী জেলাগুলোর মধ্যে 'রংপুর' একটি অন্যতম জেলা।

কাজের প্রাথমিক তৎপরতা শুরু হয় তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী রংপুর জিলার মুহ্তারাম জিলা আমীর এর বাসায়। রংপুরের ছাত্রীদের ইসলামী আন্দোলনের এই জান্নাতী কাফেলায় সাথী হয়ে এগিয়ে যেতে প্রেরণা সৃষ্টিকারী প্রথম বোনদের মধ্যে মুহ্তারিমা জাহানারা বেগম মাজেদা ও সৈয়দা মোকাররমা-এর নাম উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের স্বর্ণালী পাতায়। রংপুর শহর ছাত্রীসংস্থার ইতিহাসে জিলা আমীর, মুহ্তারাম চাচার 'শালবন'স্থ বাসাই প্রথম অফিস। বোন জাহানারা বেগম মাজেদার পরিচালনায় গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলছিলো এ জান্নাতী কাফেলা সুসংঘবদ্ধতার দিকে। কিন্তু তখনও সংগঠনকে সুশৃংখলতার দিকে পরিপূর্ণভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে বৃহত্তর জীবনের অমিত সম্ভাবনার হাতছানিতে তাকে চলে যেতে হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়াবী অঙ্গনে। এ সময় এ কাফেলার কান্ডারী হন বোন সুমাইয়া নাফিস। ছাত্রীসংস্থার কার্যালয়ও পরিবর্তিত হয়ে আসে 'চকবাজার'স্থ (বর্তমান আশরতপুর) শাহজাদা ভাইয়ের বাসায়। এ সময়ই অর্থাৎ ১৯৮১-৮২ ইং সেশনে গঠিত হয় রংপুর শহর শাখা। শাখা সভানেত্রী হন বোন সুমাইয়া নাফিস এবং সেক্রেটারী সৈয়দা মোশাররফা ময়না।

শহরের প্রতিটি প্রান্তে কুরআনের আহ্বান পৌছে দেয়ার সুমহান শপথে দীপ্ত এই কাফেলার প্রতিটি সাথীই যখন সাংগঠনিক মজবুতী আনার প্রচেষ্টা-তৎপর ঠিক তখনই জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে পা রাখলেন সুমাইয়া নাফিস আপা। তার যোগ্য উত্তরসূরি সৈয়দা তৌহিদা হোসেন এর হাতে এ কাফেলা

www.pathagar.com

পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করে। এর মধ্যেই ৮৫ সালে ছাত্রীসংস্থার অফিস স্থানান্তরিত করা হয় মুলাটোল-এ মুহ্‌তারিমা আনজুরা তালুকদার খালাম্মার বাসায়।

সময় এগিয়ে চলে তার আপন প্রবাহে। সময়ের পরিক্রমার সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলনের এ সুশীতল জান্নাতী কাফেলার প্রসারিত শাখা পরিণত হয় আদর্শ শাখায় ১৯৯১-৯২ ইং সেশনে। শাখা সভানেত্রী সৈয়দা তৌহিদা হোসেন এ সেশনে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সদস্যা মনোনীত হন। শাখা সভানেত্রীর যোগ্য পরিচালনা ও কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় উত্তরোত্তর শক্ত ও মজবুত অবস্থান তৈরি হয় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা রংপুর শহর শাখার। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে অফিস ভাড়া'র কথা চিন্তা করতে হয়। প্রথম ছাত্রীসংস্থার ভাড়াকৃত অফিস স্থানান্তর করা হয় কামাড়পাড়া রোড নং-৩ বাসা নং-১৬৫ তে।

১৯৯৩-৯৪ ইং সেশনে আল্লাহর রাহে নিজের নামায, কুরবানী, ইবাদত, জীবন ও মৃত্যুর দায়িত্ব সমর্পিতা বোনদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সদস্যা শাখা। এ সেশনে সৈয়দা তৌহিদা হোসেন আপাকে বৃহত্তর ও দিনাজপুর অঞ্চলের তদারককারী হিসেবে রংপুর জিলায় স্থানান্তর করা হয় এবং এ কাফেলার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় মুহ্‌তারিমা বোন শাহানা পারভীন লাভলীর ওপর। রংপুর শহর শাখাকে এ সময়টা একটা কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। কারণ সভানেত্রী ও সেক্রেটারী উভয়ই মেডিকেলে অধ্যয়নরতা। তারপরও বরাবরই বোনদের ত্যাগ ও আন্তরিকতার উপরই রচিত হয়েছে আন্দোলনের মজবুত ভিত্তি। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। ১৯৯৫-৯৬ ইং সেশনে শাহানা পারভীন লাভলী আপার ছাত্রীজীবন শেষ হলে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় শাহীনা আক্তার রিফাত আপার ওপর। এ সময়ে রংপুরের বৃহত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন কারমাইকেল কলেজ, সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজে কাজ ভাল হয়।

দিন বদলের চক্রে শাহীনা আক্তার রিফাত আপারও ছাত্রীজীবন শেষ হয়। আন্দোলনের দায়িত্ব এসে পড়ল মমতা আলেয়া মৌসুমী আপার ওপর ১৯৯৭-৯৮ ইং সেশনে। এ পর্যায়ে এসে কেমন যেন এক স্থবিরতার সম্মুখীন হয়। বোনদের ছাত্রীজীবন সবারই প্রায় শেষের দিকে। এখনই প্রয়োজন নতুন নেতৃত্ব তৈরি হওয়ার। কেন্দ্রসহ সচেতন মহলে উদ্বিগ্নতার কারণ হয় রংপুর শহর শাখা।

১৯৯৮-৯৯ ইং সেশনে কামারপাড়া বাসাস্থ ২১৫ রোড নং-১ এ অফিস স্থানান্তর হয়। অদ্যাবধি এ অফিসেই শাখার সমস্ত কার্যক্রম চলছে। শাখা সভানেত্রী মৌসুমী আপা ২০০০-২০০১ সেশনে জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে পাড়ি জমালে আন্দোলনের দায়িত্ব বোন ফাতেমা বেগম এর হাতে সমর্পণ করা হয়।

২০০০-২০০১ সেশনে রংপুর শহর শাখার ইতিহাসে বড় রকম বিপর্যয় নেমে আসে একে একে সকল সদস্যা বোনের জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে ঠাঁই হয়ে যাওয়ায়। ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর অঙ্গনের হাতছানিকে কখনো কখনো আনন্দের চেয়ে বেদনার বোঝা বাড়ায় তা প্রমাণিত হল এই ৩ জন বোনের জীবনের স্বপ্নীল বাস্তবতায়।

২০০১-২০০২ সেশনে এই ৩ সদস্যা বোনের ছাত্রীজীবন শেষ হওয়ার মাধ্যমে ভেঙ্গে যায় দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ এই সদস্যা শাখা। রংপুর শহর শাখার এই বিপর্যয় কেন্দ্রকেও বিচলিত করে কিছুটা। এ সেশনেই কুড়িগ্রাম শহর ও সাংগঠনিক জিলার সদস্যা মনোনীত হন বোন হোসনে আরা বানু মুন্নী। শেষে তাকেই রংপুর শহর শাখার সভানেত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয় কুড়িগ্রাম থেকে স্থানান্তর করে। বর্তমানেও তিনিই দায়িত্বে রয়েছেন রংপুর শহর শাখার।

এভাবেই অদ্যাবধি নানা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সংঘাতমুখর পরিবেশের মোকাবেলা করেও এই ঐতিহ্যবাহী শাখাটি তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে রংপুর শহর শাখায় ১২টি ওয়ার্ডে ১৮টি ইউনিট রয়েছে। আল্লাহর রাহে ছুটে চলা পথিকদের এই-ই তো দৃপ্ত শপথ যেন-

আমাদের রুখতে চাবে ঝঞ্ঝা বাধার পাহাড় এসে
বাধার ঐ পাহাড় দলে চলতে হবে দুঃসাহসে
জীবনের স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে সাজাতে হবে।
হোকনা বন্ধুর পথ তবুও তো চলতে হবে।

আল্লাহ আমাদের এই নিরন্তর প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

www.pathagar.com

রংপুর শহর শাখার এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যারা বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের অগ্রভাগে থেকে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় ছিলেন তাদের পরিচয় ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল নিচে–

সেশন	সভানেত্রীর নাম	সেক্রেটারীর নাম
১৯৭৯-১৯৮০	জাহানারা বেগম মাজেদা	সৈয়দা মোকাররমা
১৯৮০-১৯৮১	জাহানারা বেগম মাজেদা	সৈয়দা মোকাররমা
১৯৮১-১৯৮২	সুমাইয়া নাফিস	সৈয়দা মোশাররফা ময়না
১৯৮২-১৯৮৩	সুমাইয়া নাফিস	সৈয়দা মোশাররফা ময়না
১৯৮৩-১৯৮৪	সুমাইয়া নাফিস	সৈয়দা মোশাররফা ময়না
১৯৮৪-১৯৮৫	সুমাইয়া নাফিস	সৈয়দা মোশাররফা ময়না
১৯৮৫-১৯৮৬	সুমাইয়া নাফিস	সৈয়দা তৌহিদা হোসেন
১৯৮৬-১৯৮৭	সৈয়দা তৌহিদা হোসেন	সৈয়দা মোশাররফা ময়না
১৯৮৭-১৯৮৮	সৈয়দা তৌহিদা হোসেন	সাদিকা সাইফুন লিয়েন
১৯৮৮-১৯৮৯	সৈয়দা তৌহিদা হোসেন	সাদিকা সাইফুন লিয়েন
১৯৮৯-১৯৯০	সৈয়দা তৌহিদা হোসেন	সাদিকা সাইফুন লিয়েন
১৯৯০-১৯৯১	সৈয়দা তৌহিদা হোসেন	সাদিকা সাইফুন লিয়েন
১৯৯১-১৯৯২	সৈয়দা তৌহিদা হোসেন	শাহানা পারভীন লাভলী
১৯৯২-১৯৯৩	সৈয়দা তৌহিদা হোসেন	শাহানা পারভীন লাভলী
১৯৯৩-১৯৯৪	শাহানা পারভীন লাভলী	শাহীনা আক্তার রিফাত
১৯৯৪-১৯৯৫	শাহানা পারভীন লাভলী	শাহীনা আক্তার রিফাত
১৯৯৫-১৯৯৬	শাহীনা আক্তার রিফাত	মমতা আলেয়া মৌসুমী
১৯৯৬-১৯৯৭	শাহীনা আক্তার রিফাত	মমতা আলেয়া মৌসুমী
১৯৯৭-১৯৯৮	মমতা আলেয়া মৌসুমী	মমতাজ বেগম
১৯৯৮-১৯৯৯	মমতা আলেয়া মৌসুমী	খাদিজা বেগম রীতি
১৯৯৯-২০০০	মমতা আলেয়া মৌসুমী	খাদিজা বেগম রীতি
২০০০-২০০১	ফাতেমা বেগম	ওজিফা খাতুন
২০০১-২০০২	হোসনে আরা বানু মুন্নী	রোকাইয়া জাহান রুকু
২০০২-২০০৩	হোসনে আরা বানু মুন্নী	রোকাইয়া জাহান রুকু

www.pathagar.com

নাটোর শহর

বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ বিল চলনবিল, উত্তরবঙ্গের এককালের রাজধানী এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গের বাসভবন কাঁচাগোল্লা, কৈ মাছ এবং রাণীভবানীর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক নাটোর হিন্দু প্রধান এলাকা হলেও মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশ, ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতির বিকাশে এ নাটোর কখনও পিছিয়ে ছিল না। ১৯৭৮ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা বাংলার জমিনে দীন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যে দীপ্ত পদযাত্রা শুরু করে, সময়ের কিছু ব্যবধানে তার মনলোভা দাওয়াতী সুরলহরী নাটোরেও আছড়ে পড়ে। ১৯৮২ সাল, তৎকালীন কেন্দ্রীয় মেহমান রাবেয়া আপা নাটোর সফর করেন এবং তখনই প্রথম নাটোরে দাওয়াতী বৈঠক শুরু হয়। এরপর থেকে অনিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে তাফসীর ক্লাস চলতে থাকে। ১৯৮৪ সাল এলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। রাজশাহী সাংগঠনিক জেলা সভানেত্রী মোহতারামা শামীমা বেগম চুনী আপা নাটোরে প্রথম ইউনিট গঠন করেন। মোহতারামা নাঈমা খাতুন চায়না আপা সভানেত্রী ও ইসমত আরাকে সেক্রেটারী মনোনীত করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সেই থেকে শুরু হলো নাটোরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দীনি কাফেলা ছাত্রীসংস্থার পথ চলা। নানা প্রতিকূলতা, কেন্দ্র থেকে দূরত্ব, বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও প্রসার হতে থাকে এর কার্যক্রম। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮-৮৯ সেশনে কেন্দ্র নাটোর শহরকে শাখা হিসেবে ঘোষণা করে। শহর শাখার সভানেত্রী মনোনীত হন মোহতারামা ইসমত আরা এবং সেক্রেটারী হন ইসরাত জাহান।

শহর শাখার কাজ চলতে থাকে বিরামহীন। আদর্শ শাখার বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য কমিটি বোনদের পরিশ্রম ছিল অবিরত। আর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পাওয়া চিঠি, সফর বোনদের আরো বেশি অনুপ্রাণিত করে। অবশেষে নাটোর শহর আদর্শ শাখার মানে উন্নীত হলে ১৯৯৯ সালে ১৮ মার্চ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সফর করেন মোহতারামা কোহিনূর আখতার সীমা আপা। দীর্ঘ প্রত্যাশার পর ১৯৯৯ সালে জুন মাসে আদর্শ শাখা ঘোষণা সংক্রান্ত চিঠি আসে।

শাখা সভানেত্রী মোহতারামা শামীমা আফরোজ মলি আপা জরুরি ভিত্তিতে কমিটিকে একত্রিত করে এ সুসংবাদ জানান।

নাটোর শহর শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

ইউনিট গঠনের পর থেকেই সাংগঠনিক জেলার মাধ্যমে কেন্দ্র ঘোষিত প্রায় সকল কর্মসূচিই পালিত হয়। তারমধ্যে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রামের ধারাবিবরণী নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১৯৮৮, ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে মহিলাকমনরুম সম্পাদিকা পদে ছাত্রীসংস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয় সীরাতুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে দেয়ালিকা 'মরুঝরণা'।

১৯৯২, ৯৩ সালেও "মরুঝরণা" প্রকাশিত হয়।

১৯৯১-৯৩ সালে সিরাতুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেহমান ছিলেন রাজশাহী সাংগঠনিক জেলা সভানেত্রী মুহতারামা শাহানারা আপা এবং পরে মুহতারিমা জান্নাতুস সালিমা আপা।

১৯৯৩ সালেও অনুরূপ প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্যা, মুহতারিমা রাশেদা খাতুন।

www.pathagar.com

মহান ভাষা দিবস উপলক্ষে নাটোর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রকাশিত হয় দেয়ালিকা "আলোকিত বর্ণমালা"।
১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় নাটোরের সর্বপ্রথম শিক্ষাশিবির। এতে মেহমান ছিলেন কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদিকা মুহতারামা মাহবুবা খাতুন শরিফা।
১৯৯৯ সালে ইসলামী শিক্ষাদিবস উপলক্ষে শহর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সিম্পোজিয়াম। এতে মেহমান ছিলেন প্রাক্তন সদস্যা ও রাজশাহী মহানগরী সভানেত্রী মোহতারিমা শাহানারা বেগম ও সখিনা খাতুন।
১৯৯৯-২০০০ সালে সীরাত (সঃ) উপলক্ষে সিম্পোজিয়াম ও কৃতি ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেহমান ছিলেন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারামা উম্মে খালেদা জাহান।
২০০০ সালে কর্মী ও সুধী সমাবেশে মেহমান ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারামা সাবিহা পারভীন।
২০০১ সালের শিক্ষা শিবিরে মেহমান ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারামা আলেয়া বেগম সুমী।
২০০২ সালের শিক্ষা শিবিরে মেহমান ছিলেন স্কুল বিভাগীয় সম্পাদিকা মুহতারামা হামিদা রুম্মান।
২০০২ সালের ছাত্রী ও সুধী সমাবেশে মেহমান ছিলেন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারামা কোহিনূর আকতার সীমা।
২০০৩ সালের বিশেষ ছাত্রী সমাবেশে মেহমান ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারামা আলেয়া বেগম সুমী।
২০০৩ সালের কর্মী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনালের মুহতারামা আলেয়া বেগম সুমী।
২০০৩ সালের শিক্ষা শিবিরে মেহমান ছিলেন ঢাকা মহানগরী সভানেত্রী বোন মুহতারামা নাজমুন নাহার নাজু।
এছাড়াও কেন্দ্রের উপস্থিতিতে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

নাটোর শহর শাখা বিভিন্ন সময়ে সভানেত্রী ও সেক্রেটারীর নাম–

সন	সভানেত্রী	সেক্রেটারী
১৯৮৪-৮৫	নাঈমা খাতুন	ইসমত আরা
১৯৮৫-৮৬	নাঈমা খাতুন	ইসমত আরা
১৯৮৬-৮৭	নাঈমা খাতুন	ইসমত আরা
১৯৮৭-৮৮	ইসমত আরা	ইসরাত জাহান
১৯৮৮-৮৯	ইসমত আরা	ইসরাত জাহান
১৯৮৯-৯০	ইসমত আরা	ইসরাত জাহান
১৯৯০-৯১	ইসমত আরা	মাহ্মুদা সিদ্দিকা
১৯৯১-৯২	মাহ্মুদা সিদ্দিকা	উম্মে আসমা
১৯৯২-৯৩	মাহ্মুদা সিদ্দিকা	উম্মে আসমা
১৯৯৩-৯৪	মাহ্মুদা সিদ্দিকা	উম্মে আসমা
১৯৯৪-৯৫	মাহ্মুদা সিদ্দিকা	দ্বীনা আকবরী শিউলী
১৯৯৫-৯৬	দ্বীনা আকবরী শিউলী	জুবাইদা কাঁকন লিপি
১৯৯৬-৯৭	দ্বীনা আকবরী শিউলী	জুবাইদা কাঁকন লিপি
১৯৯৭-৯৮	দ্বীনা আকবরী শিউলী	শামীমা আফরোজ
১৯৯৮-৯৯	শামিমা আফরোজ	মাছুমা নাসরীন
১৯৯৯-২০০০	শামিমা আফরোজ	মাছুমা নাসরীন
২০০০-০১	শামিমা আফরোজ	মাছুমা নাসরীন
২০০১-০২	মাছুমা নাসরীন	সোহেলী আজগারী
২০০২-০৩	সোহেলী আজগারী	হাসিনা খানম

নাটোর শহর শাখার সাংগঠনিক বিস্তৃতি

মোট ওয়ার্ড সংখ্যা -৯টি, এলাকা সংখ্যা-৩২টি দাওয়াত প্রাপ্ত এলাকা-২৮টি, সংগঠন কায়েমকৃত এলাকা-৮টি। #

www.pathagar.com

সম্মেলনের গান

যেখানে জাগেনি ঘুমের পাড়ারা
হয়নি সূর্যোদয়,
ভাঙবো আঁধার আলোর বানে
আমাদের এই প্রত্যয়
মোবারক হোক সম্মেলন
মোবারক হোক এই আয়োজন॥
কোরআনের আলোয় আলোকিত হব
ছড়াবো আলো বিশ্বময়, বিশ্বময়
বাতিলের উচ্ছেদ করবো মোরা
আনবো দ্বীনের বিজয়, বিজয়॥
আমাদের পথ যদিও কণ্টকাকীর্ণ
আমরা করিনা ভয়
আল্লাহর রঙে রাঙাবো জগত
তাইতো মোরা দুর্জয়॥
মোবারক হোক সম্মেলন
মোবারক হোক এই আয়োজন।

www.pathagar.com

বার্ষিক সম্মেলন

চল চল চল
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরনি তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল রে চল চল

জীবন জাগার এই শ্লোগানে মুখর বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার তরুণ ছাত্রীদের সংগ্রামী কাফেলা। '৭৮-এ দামামা বাজিয়ে এ কাফেলা পৌঁছাতে চায় জান্নাতের মঞ্জিলে। তাই প্রয়োজন হিসেব মেলানোর, আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রতি বছরে আয়োজিত হয় "কেন্দ্রীয় বার্ষিক সম্মেলন।" সারা দেশের থানা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিনিধিরা এসে মিলিত হয় আল ফালাহ মিলনায়তনে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এ সম্মেলনগুলোর প্রতিবেদন তুলে ধরা হল–

১ম সম্মেলন-১৯৭৯

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে
ভোর হলো জানি না তা
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা
দুয়ারে তোমার জোয়ার এনেছে
সাত সাগরের ফেনা
তবু জাগলে না?
তবু তুমি জাগলে না?

মুসলিম নারীকে আড়মোড়া ভেঙ্গে জাগিয়ে তোলার আহ্বান নিয়ে ১৯৭৯ সালের ৬ ও ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় বার্ষিক ১ম সম্মেলন। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা-এর দুর্জয় কাফেলার প্রথম সভানেত্রী খোন্দকার আয়েশা খাতুন। এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন ডা: সাইয়েদা ফিরোজা বেগম। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন হাফেজা আসমা খাতুন।

বক্তারা ছাত্রীদেরকে মুসলিম নারী হিসেবে গড়ে তোলার দৃপ্ত শপথের জন্য ছাত্রীসংস্থার এ অগ্রযাত্রাকে স্বাগত জানিয়ে সামনে অগ্রসর হবার জন্য উৎসাহিত করেন।

বিশেষ কার্যক্রম

'৭৮-এর ১৫ই জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে এ সংস্থার গঠিত হবার ঘোষণা দেওয়া হয়।

২৬শে জুলাই প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ শুরু হয়। মাত্র ৪ মাসে নিবেদিত প্রাণ এ জনশক্তি ১৬০টি সাধারণ সভাসহ চা-চক্র, ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১২টি প্রাতিষ্ঠানিক ও আবাসিক ইউনিটে মোট ১০৭টি কর্মী বৈঠক। ৭টি T.S এবং প্রায় ২০০টি সামষ্টিক পাঠ হয়। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রভাবও এই প্রথম থেকেই হয়। ইউনিট ভিত্তিক সাহিত্য সভা, দেয়ালিকা পত্রিকাসহ নিজ হাতে ঈদ কার্ড তৈরি করে কর্মীদের মধ্যে তা বিলি করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এছাড়া ঢাকার বাইরে মোট ৯টি জেলায় ইউনিট গঠন করা হয়। বরিশাল, পাবনা, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, যশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ।

৯ম সম্মেলন-১৯৮৭

ইসলামী ছাত্রীসংস্থার যাত্রা পথ আজ কিশোর বয়সে উপনীত। তৎকালীন অগ্রযাত্রার কান্ডারী (কেন্দ্রীয় সভানেত্রী) নুরুন্নিসা সিদ্দিকা। ২রা ও ৩রা এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় ৯ম সম্মেলন। কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর স্বাগত বক্তব্যের পরই উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি হাফেজা আসমা খাতুন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিভিন্ন জেলাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে দাওয়াত পৌঁছে যেতে থাকে। শাখাগুলো ইউনিট পর্যায় পর্যন্ত দিবস উদযাপন করে। পোস্টারিং হয় প্রায় ৩০,০০০, তাফসীর হয় ১০০০টি এবং সাধারণ সভা ৯৫৪টি।

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেরও প্রসার ঘটতে থাকে। 'আবহ"- পত্রিকা ২টি প্রকাশিত হয়। ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল জোরালো করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে ৩টি শিল্পী গোষ্ঠী, ঢাকাতে 'রাইয়্যান শিল্পী," রাজশাহীতে "হেরার রশ্মি এবং খুলনায় রেনেসাঁ" শিল্প গোষ্ঠী।

২য় দফার কার্যক্রমে সংগঠনের বিস্তৃতি লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটসহ শাখাগুলোর ইউনিট সফরের সংখ্যা ছিল ৫০টি। থেমে থাকেনি প্রশিক্ষণ। শিক্ষা শিবির হয়- ১০টি, শিক্ষা বৈঠক-৫৫টি।

৩য় দফার কার্যক্রম হিসেবে ঢাকার উদ্যোগে ১টি বিশেষ পরিকল্পনা হিসেবে মেডিকেল কোচিং সেন্টার "মুন লাইট" খোলা হয়। ছাত্রীসংস্থার মেডিকেল বিভাগের ছাত্রীরাই-এ কোচিং পরিচালনা করে। ২৭ জন ছাত্রী এখানে ভর্তি হয় এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এরমধ্যে আল্লাহর মেহেরবানীতে ১৭ জন ছাত্রী বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ লাভ করে।

১৪তম সম্মেলন-১৯৯২

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা এগিয়ে চলছে দিকবিদিক। রাজনৈতিক অঙ্গন কিছুটা হলেও শান্তি। সময় পরিক্রমায় আজ ইসলামী দলের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ঠিক এমনই পরিস্থিতির মাঝেই অনুষ্ঠিত হল এ সংস্থার ১৪তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক সম্মেলন। ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর ১৯৯২।

ঢাকা ভার্সিটির ছাত্রী শামীমা ইয়াসসিন লায়লা সে সময়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন তৎকালীন জাতীয় সংসদ সদস্যা হাফেজা আসমা খাতুন। এরপরেই কেন্দ্রীয় সভানেত্রী হিসেবে শামীমা ইয়াসমিন লায়লা রাখেন তাঁর স্বাগত বক্তব্য। সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন সংসদ সদস্য রাশেদা খাতুন, প্রাক্তন সভানেত্রীবৃন্দা যথাক্রমে খোন্দকার আয়েশা খাতুন, নুরুন্নিসা সিদ্দিকা, ডা: হাবিবা চৌধুরী সুইট। এছাড়াও রোকেয়া আনসার, জাকিয়া খাতুন এবং প্রাক্তন প্রধান সম্পাদিকা ডা: শাহনূর বেগম।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

শাখাগুলো বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেন্দ্র কর্তৃক নির্দেশিত প্রতিটি দিবস উদযাপন বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করে প্রতিটি শাখা ইউনিট পর্যায় পর্যন্ত। এছাড়া কৃতিছাত্রী সংবর্ধনা, বনভোজন, চা-চক্র, বিভিন্ন প্রতিযোগিতাসহ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় অসংখ্য।

অপসংস্কৃতির আগ্রাসন রোধে সুস্থ-সংস্কৃতির চর্চা চলতে থাকে। বাড়তে থাকে জেলা ভিত্তিক শিল্পী গোষ্ঠীর সংখ্যা। বরিশালের সত্যের সন্ধানী, রাজশাহীর ব্যতিক্রম, প্রভা সাহিত্য গোষ্ঠীসহ ঢাকার সমন্বয়ের যেন জুড়ি নেই। এদিকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়মিত প্রকাশনা সম্মেলন স্মারক, সিয়াম, ক্যালেণ্ডার সত্যিই যেন প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে ছাত্রীসংস্থার পথকে সুগম করে তোলে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের উদ্যোগে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে শাখাগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসনীয়।

২য় দফার কাজের ফলাফলই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। কেন্দ্রীয় সফর, শাখা বৃদ্ধি তারই উদাহরণ।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই শাখাগুলো কেন্দ্রীয় অনুমোদন সাপেক্ষে নিতে থাকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা বৈঠক। থানা পর্যায় পর্যন্ত এ T.S. অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কেন্দ্র ভিত্তিকের সাথে সাথে প্রায় ১২টি শাখা নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করে।

www.pathagar.com

৩য় দফার কার্যক্রমে কলেজ সংসদ নির্বাচন একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। খুলনা সরকারি বি-এল কলেজ এবং দিবানৈশ কলেজে ২ জন করে সম্পাদিকা নির্বাচিত হয়। বরিশালের বাকসু নির্বাচনে ১টি পদে বিজয়ী হয়। এছাড়া ঢাকা শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ মহিলা হোস্টেলে নির্বাচন উপলক্ষে প্যানেল পরিচিতি অনুষ্ঠান হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের নামাজ কক্ষে ইংরেজি ১ম বর্ষের ছাত্রী মনিরা মুসফিকার শাহাদত উপলক্ষে কোরআনখানির আয়োজন করা হয়।

১৫তম সম্মেলন-১৯৯৩

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ১৬তম বর্ষের ১৫তম এ সম্মেলন। কেন্দ্রীয় সভানেত্রী শামীমা ইয়াসমিন লায়লার ২য়তম নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের স্বাগত বক্তব্য প্রতিনিধি বোনদেরকে করে উজ্জীবিত।

১লা ও ২রা নভেম্বরের অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন তৎকালীন জাতীয় সংসদ সদস্য রাশেদা খাতুন।

এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সভানেত্রীবৃন্দা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুলতানা রাজিয়া, প্রাক্তন প্রধান সম্পাদিকা ডা: শাহনূর বেগম।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

প্রতিবারের ন্যায় এবারেও শাখাগুলো দিবস উদযাপনে থাকে অনেক ব্যস্ত। কেন্দ্র ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা ছাড়াও শাখাগুলো বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেয়। জমে ওঠে বিভিন্ন জেলা শহরে নবীন বরণ এবং কৃতিছাত্রী সংবর্ধনা। ঢাকা মহানগরী আই সি এম এ মিলনায়তনে আয়োজিত সংখ্যায় সে সময়ের এইচ এস সিতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকারী সারা আহমেদ এবং বিজ্ঞানের ১৪তম স্থান অধিকারী তাহমিনা ইসলাম এ্যানি উপস্থিত হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আবার ঢাকা ও সিলেট শহরের আয়োজনে শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজন, চা-চক্রের মাধ্যমেও দাওয়াতী কার্যক্রম চলতে থাকে।

সাহিত্য অঙ্গনও দিনে দিনে হতে থাকে জমজমাট। কেন্দ্রের নিয়মিত ম্যাগাজিন ছাড়াও ঢাকা মহানগরীর প্রত্যয়, খুলনার প্রত্যাশা, সিলেটের সিরাজুম মুনিরা, পাবনার স্পন্দন এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জের মরু ঝর্ণা সত্যিই অতুলনীয়।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সংগঠনের বিস্তৃতির সাথে সাথেই বাড়ছে। কেন্দ্র কর্তৃক দায়িত্ব ভিত্তিক ও মান ভিত্তিক T.S. ছাড়াও মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয় T.C. হয় ২টি (ঢাকা ও রাজশাহীতে)। জেলা ভিত্তিক T.S. ও অনুষ্ঠিত হয়।

সফর- কেন্দ্রীয় সফর বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হয় ৫৯টি।

৩য় দফার কার্যক্রম হিসেবে কলেজ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ঢাকা মহানগরী-খিলগাঁও কলেজ, কুমিল্লা শহর ভিক্টোরিয়া ও মহিলা কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, খুলনা মহানগরী- বয়রা ও মহিলা এবং বি. এল কলেজে অংশগ্রহণ করে। এতে খুলনা বি. এল কলেজে ছাত্রীদের ২টি পদে বিজয় অর্জিত হয়।

১৬তম সম্মেলন-১৯৯৪

তেজোদীপ্ত সংগ্রামী কাফেলার যাত্রা থেমে নেই। সময়ের গতির সাথেই পাল্লা দিয়ে চলছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। আল ফালাহর ৪র্থ তলার স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গন। ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর, অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ১৬তম সম্মেলন।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে ছাত্রীসংস্থার নেতৃত্বেরও পরিবর্তন। স্বাগত বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সভানেত্রী সাঈদা রুম্মান। আর সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন হাফেজা আসমা খাতুন।

বিশেষ অতিথি থাকেন নারী অধিকার আন্দোলনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা চেমন আরা, অধ্যাপিকা জাকিয়া খানম, সুলতানা রাজিয়া, ছাত্রীসংস্থার প্রাক্তন আহ্বায়িকা কমিটির সদস্যা নাসিম হামিদা বানু, উম্মে সালমা মুন্নী এবং প্রাক্তন সভানেত্রীত্রয়।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা উচিত যারা লোকদেরকে কল্যাণের দিকে ডাকবে।" – আল কুরআন

আল কুরআনের এমন আহ্বানে উৎসাহী প্রায় প্রতিটি শাখাই প্রতিবারের ন্যায় এবারেও দিবস উদযাপনে অত্যন্ত আগ্রহী।

www.pathagar.com

দিবসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিরাতুন্নবী (সাঃ)। শাখার ব্যাপক আয়োজন দেশব্যাপী সাড়া না জাগিয়ে পারে না। সাহিত্যরসেও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সাহিত্য অঙ্গন।

সাংগঠনিক জেলাগুলো আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করে- যা কর্মীদের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রম হিসেবে নিয়মিত শিক্ষা শিবির ছাড়া কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় "বিশেষ শিক্ষা শিবির"। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সাজানো এ শিক্ষা শিবির শিক্ষার্থীদের মাঝে বেশ সাড়া জাগায়। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শাখা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল এবং স্কুল বিভাগীয় শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করে।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সফর অনুষ্ঠিত হয়- ৬১টি

৩য় দফার সমস্যা-সমাধানে কলেজ সংসদে অংশ নেয়- সিলেট শহর- তিব্বতিয়া কলেজ, টাঙ্গাইল-সাদত কলেজ, রাজশাহী-বিশ্ববিদ্যালয় ও নিউমার্কেট কলেজ, পাবনা-এডওয়ার্ড কলেজ, খুলনা-বয়রা ও মহিলা কলেজ এবং সিরাজগঞ্জ-ইসলামিয়া কলেজে। এতে সিলেটের সাদত কলেজে ছাত্রীসংস্থা বিজয় অর্জন করে।

১৭তম সম্মেলন-১৯৯৫

"আপন কর্মের রেকর্ড পড়, আজ তোমার হিসেবের জন্য তুমিই যথেষ্ট।" – আল কুরআন

আখেরাতের ভয়ে কম্পমান প্রতিনিধিরা স্ব-স্ব শাখার এক বছরের রেকর্ড নিয়ে উপস্থিত হয় আল ফালায়। জবাবদিহির ভয়ে শঙ্কিত হলেও বাংলাদেশের ছড়িয়ে থাকা বোনদের সান্নিধ্য পাবার আকাঙ্ক্ষার কমতি নেই কারো মধ্যে। সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে হলরুম জমজমাট। ২৭ ও ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৭তম সম্মেলন।

সাঈদা রুম্মানের ২য় বৎসরের পরিচালনায় এ সম্মেলনের স্বাগত বক্তব্য শিক্ষার্থীদের যেন জাগ্রত করে তোলে। আর সম্মেলন উদ্বোধন করেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি জাহান আরা আজহারী।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

কেন্দ্র কর্তৃক সিরাত (সাঃ) দিবস উপলক্ষে বরাবরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, সফর করা হয়- ৫৪টি।

শাখাগুলো দিবস উদযাপনের পাশাপাশি হামদ, নাত, ইসলামী সঙ্গীতসহ আবৃত্তি ও বই পড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে মহানগরীসহ আদর্শ শাখার অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি শাখা, অন্যান্য দাওয়াতী কার্যক্রমের সাথে সাথে বিদায়ী সংবর্ধনা এ সেশনের নতুন সংযোজন। সাহিত্যমনা বোনদের কাজে লাগিয়ে অন্যান্য শাখার সাথে সাথে রাজশাহী মহানগরী "জাগরণ" চট্টগ্রাম মহানগরী "সুবেহ সাদিক" প্রকাশ করে।

প্রশিক্ষণের মাত্রা এবার T.C.-T.S. এর সাথে সাথে স্পীকার্সে ফোরাম গিয়ে উপনীত হয়েছে।

কলেজের সমস্যা সমাধান কল্পে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, ফরিদপুর, সিলেট এবং জামালপুর এতে ছাত্রীসংস্থা ব্যাপক পরিচিতি অর্জনে সক্ষম হয়।

১৮তম সম্মেলন-১৯৯৬

"সাহসের সাথে কিছু স্বপ্ন জড়াও
তারপর পথ চলো নির্ভয়
আঁধারের ভাজ কেটে আসবে বিজয়
সূর্যের লগ্ন সে নিশ্চয়।"

এ কাঙ্ক্ষিত বিজয় আনার লক্ষ্যে এ জনতার মিছিল এগুতে থাকে সামনের দিকে। রাজনৈতিক পরিবেশ এবং বাইরের আবহাওয়া মিলিয়ে কেমন যেন সংকটময় পরিস্থিতি। তথাপিও সাহসী শ্লোগানে সম্মেলন তার গতিপথে এগিয়েই চলে। তাকে হার মানাবার সাহস কারো নেই যেন। ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অনন্য নেতৃত্ব নাজমুন নাহার নীলু তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভানেত্রী। মানবীয় ও মৌলিক গুণাবলীর অর্জনের আহ্বান জানান তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে। অতঃপর উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য হাফেজা আসমা খাতুন।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

দাওয়াতী কার্যক্রমে যে কোন দিবস উদযাপনে শাখাগুলোর যেন কোন ক্লান্তি নেই। অন্যান্য দিবসের সাথে সাথে শাখাগুলো প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনে বেশ তৎপর।

www.pathagar.com

ঢাকা মহানগরী আয়োজন করে শিক্ষা সফরের। আহসান মঞ্জিল ছিল শিক্ষা সফরের স্থান। আঞ্চলিক কর্মী সম্মেলন, স্পীকার্স ফোরাম ছাড়াও ১০টি জেলায় শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আর শিক্ষা বৈঠক প্রায় সব শাখাতেই একাধিক হয়। এছাড়াও বেশ কিছু শাখায় কর্মী ও প্রাথমিক সদস্যা সমাবেশ হয় যা কর্মী ও প্রাথমিক সদস্যাদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বনভোজন আয়োজন করে ঢাকা মহানগরী, খুলনা, রাজশাহী মহানগরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও কুষ্টিয়া শহর-১টি করে বনভোজনের আয়োজন করে। এই প্রথমবারের মত বিশেষ কয়েকটি শাখা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কাজকে জোরদার করার লক্ষ্যে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কমিটি মিটিং শুরু করে এবং এ বছরেই ঢাকা মহানগরী প্রথমবারের মত পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে শিশু-কিশোর উপযোগী 'উন্মেষ' ম্যাগাজিন বের করে। ইতোমধ্যে কলেজ সংসদ নির্বাচনে শাখাগুলো বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। ঢাকা মহানগরী, পাবনা শহর, সিলেট শহর চৌদ্দগ্রাম থানা-কলেজ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

১৯তম সম্মেলন-১৯৯৭

'ইসলামই নারী মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি' এই শ্লোগানে অনুষ্ঠিত হয় ১৯তম সম্মেলন। এই প্রথম বারের মত সম্মেলন শ্লোগান মুখর হয়ে ওঠে। ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর। যথারীতি সম্মেলন শুরুর জয়গান শুরু হয়ে যায়। ২য় বারের মত কেন্দ্রীয় সভানেত্রী নাজমুন নাহার নীলু তাঁর স্পষ্ট কণ্ঠে পেশ করেন স্বাগত বক্তব্য। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ জাহান-আরা আজহারী এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

যথারীতি কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শাখাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শাখাগুলোতে সফর হয় মোট ১০০টি। যা পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

শাখার কার্যক্রমে দিবস উদযাপনের সাথে সাথে বিশেষভাবে উদযাপিত হয় বদর দিবস। এছাড়া ঢাকা মহানগরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা মহানগরী এবং পাবনা শহর শিক্ষা সফরের আয়োজন করে।

ঢাকা মহানগরীর নিয়মিত পত্রিকা প্রত্যয়, উন্মেষ, খুলনা মহানগরীর প্রত্যাশা চট্টগ্রাম মহানগরী 'সুবহে সাদিক' ছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 'উদ্ভাস' নামক পত্রিকা প্রকাশ করে। খুলনা মহিলা কলেজ, বগুড়া আজিজুল হক, রংপুর মেডিকেল, বাগেরহাট পি, সি, পাবনা এডওয়ার্ড, এসব কলেজে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হয়।

২০তম সম্মেলন-১৯৯৮

"যে কোন বিপদ আল্লাহর অনুমতিক্রমেই এসে থাকে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ তার দিলকে হেফাযত করেন।" –আল কোরআন

১৯৯৮ সাল। বন্যার ভয়াবহতা দেশে প্রকট। এ সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রতি বছরের নিয়মতান্ত্রিক সময়ের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। বোনদের সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিয়ে এ সম্মেলন করা হয় প্রায় ২০ দিন পিছিয়ে ১৭ ও ১৮ইই নভেম্বর।

সভানেত্রী নাজমুন নাহার নীলু তৃতীয়বারের মত পরিচালনা করে এ সম্মেলনের স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রাক্তন এমপি হাফেজা আসমা খাতুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন শামসুন নাহার নিজামী, খোন্দকার আয়েশা খাতুন। এবং ডা: শাহনুর বেগম। ছাত্রী বক্তা হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন কোহিনূর ইয়াসমিন লিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভানেত্রী হাসিনা ইয়াসমিন রীনা এবং ঢাকা মহানগরীর সভানেত্রী সাবিহা পারভীন।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে এ বছরে নতুনভাবে সংযোজিত হয় ছাত্রীসংস্থার ত্রাণ তৎপরতা। বন্যার্তদের মাঝে ১৫১১ পিচ কাপড় এবং এক লক্ষ টাকা পরিমাণের খাদ্যদ্রব্যসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়া শাখাগুলো বরাবরের ন্যায় অন্যান্য দিবস উদযাপন করে।

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম থেমে নেই। কেন্দ্রে প্রকাশনার মধ্যে আলোর পাখি, রমজানের সংকলন সিয়াম এবং স্মারক সংকলন, সম্মেলন স্মারক প্রকাশিত হয়। এছাড়া রাজশাহী মহানগরী 'উসওয়াতুন হাসানা'র সাথে পূর্বে প্রকাশিত শাখারা তাদের প্রকাশনা অব্যাহত রাখে, এ সেশনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চলে জোরালোভাবে বেশ কয়েকটি শাখায়।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সফর হয় ১২০টিরও বেশি।

প্রশিক্ষণ ঃ

কেন্দ্রীয় নিয়মিত T.C. ছাড়াও ১১টি শাখা একাধিক T.C.-এর আয়োজন করে।

www.pathagar.com

২১তম সম্মেলন - ১৯৯৯

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা পূর্ণ যৌবনে, ২২তম বর্ষের ২১তম সম্মেলন যেন এরই আভাস শোনাচ্ছে। সাথে সাথে গোটা বিশ্বেও নব জাগরণেরও নতুন ছোয়া। ঠিক এ মুহূর্তেই ছাত্রীসংস্থা 'আগামী শতাব্দী ইসলামের শতাব্দী'- এমন শ্লোগানেই মুখর এবারের সম্মেলন। ২৭ ও ২৮শে অক্টোবর। পূর্ণ প্রস্তুতির সমাপ্তির ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সভানেত্রী সাবিকুন্নাহার মুন্নী। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে রাখেন এ সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি জাহান আরা আজহারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন হাফেজা আসমা খাতুন, অধ্যাপিকা চেমন আরা, হাসনা হেনা জামান, প্রাক্তন সভানেত্রীবৃন্দ এবং ছাত্রী বক্তা ঢাকা ও খুলনা মহানগরীর সভানেত্রী যথাক্রমে উম্মে খালেদা জাহান এবং ফয়জুন্নাহার পাঠান।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিযোগিতা শাখাগুলোকে বেশ উৎসাহ প্রদান করে। কেন্দ্র কর্তৃক শাখার মজবুতির লক্ষ্যে সফর হয়েছে- ১২৪টিরও বেশি। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণে নতুনভাবে সংযোজিত হয় বিভাগীয় দায়িত্ব ভিত্তিক শিক্ষা শিবির।

শাখাগুলো দাওয়াতী কার্যক্রমের সাথে সাথে বনভোজনের বেশ সাড়া পড়ে যায়। ১৩টি শাখা প্রায় ২৫টি বনভোজনের আয়োজন করে। শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করে ১৪টি জেলা, সেই সাথে শাখাগুলো থানা ও ইউনিট সফরেও ছিল বেশ তৎপর।

২২তম সম্মেলন - ২০০০

"পাথরে পারদ জ্বলে, জলে ভাঙ্গে ঢেউ
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি গড়ে যাবে কেউ
তন্দ্রার আচ্ছাদন ছিঁড়ে এসো আমরা জেগে উঠি
এসো আমরা গড়ে যাই আর এক পৃথিবী।"

নতুন পৃথিবী গড়ার দৃপ্ত প্রত্যয়ে জমে ওঠে আল ফালাহ চত্বর। "মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য"- এমন শ্লোগান নিয়ে আয়োজিত হয় "২২তম সম্মেলন।" এ সম্মেলনে ২য় বারের মত কেন্দ্রীয় সভানেত্রী সাবিকুন্নাহার মুন্নী স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। উদ্বোধনী কথা রাখেন- জাহান আরা আজহারী।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের সিরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো সেটা শাখার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৫ই আগস্ট ইসলামী শিক্ষা দিবস, এর গুরুত্ব ধরে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ২টি গ্রুপে সাধারণ জ্ঞান ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া এই প্রথম বারের মত আলোর পাখিদের নিয়ে কেন্দ্র কর্তৃক "আলোর পাখি শিশু সমাবেশ" অনুষ্ঠিত হয়। শাখাগুলোতে সফর হয় মোট ১১৩টি।

দাওয়াতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শাখাগুলো দিবস উদযাপনে বেশ তৎপর। বিশেষ করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রায় ২৫০টির মত।

শাখার পক্ষ থেকে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়- ৮টি

৩য় দফার কার্যক্রম হিসেবে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ ছাত্র সংসদে নির্বাচনে অংশ নেয়।

এছাড়া বন্যার্তদের সহায়তার জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২৩তম সম্মেলন - ২০০১

"মিথ্যার আগল ভেঙ্গে সত্যের দ্বীপ মোরা জ্বালবই"-এমন তেজোদীপ্ত শ্লোগানে শুরু হয় ২৩তম সম্মেলন।

কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে সূরা আল আহযাবের ৩২ নং আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেন।

www.pathagar.com

"মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর সাথে নিজেদের ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছে, তাদের মধ্যে একদল তাঁদের লক্ষ্যে পৌছে গেছে আর একদল আছে প্রতীক্ষারত।"

প্রতীক্ষিত দলের দিকে আহ্বান জানিয়ে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করে তোলেন শিক্ষার্থীদেরকে ২৯ ও ৩০ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন জাহান আরা আজহারী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে একে একে উপবিষ্ট হন প্রাক্তন সভানেত্রীবৃন্দ। ছাত্রী বক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি নাজমুন নাহার নাজু এবং কুড়িগ্রামের সভানেত্রী হোসনে আরা বানু মুন্নী।

বিশেষ কার্যক্রম ঃ

এ সেশনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং সাংগঠনিক মজবুতি এবং আদর্শ শাখা মানে উপনীত হয় ২টি। সাংগঠনিক সফর হয় মোট- ২০৩টি।

শাখাগুলো তাদের সমাবেশগুলোসহ প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালিয়ে যায় যথারীতি। প্রায় ১৫টি শাখার উদ্যোগে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় দফার সমস্যা সমাধানে এ সেশনে থাকে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, নারী সমাজের অধিকারের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রদান করা হয় বিবৃতি। এছাড়া ছাত্রীদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত স্টাইপেন্ড, ভর্তিকালীন সহযোগিতাসহ পড়াশুনা সংক্রান্ত অন্যান্য সহযোগিতা করা হয়।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

২৪তম সম্মেলন - ২০০২

"আমাদের রুখতে চাবে ঝঞ্ঝাবাঁধার পাহাড় এসে
বাঁধার এ পাহাড় দলে চলতে হবে দু:সাহসে
জীবনের স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে সাজাতে হবে
হোক না বন্ধুর এ পথ তবুও তো চলতে হবে।"

নতুন পৃথিবী স্বপ্নে বিভোর হয়ে যারা জীবনের সোনাঝরা দিনগুলিকে কুরবান করে চলেছে, দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ সেই বিপ্লবী কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ২৪তম সম্মেলন '০২ ২৮শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়।

এতে কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান স্বাগত বক্তব্য রাখেন তিনি বলেন, এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে আমরা নির্মাণ করবো আলো ঝলমল এক সুখ ভালোবাসা পূর্ণ নির্মল সমাজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুহতারামা জাহান আরা আজহারী।

বিশেষ কার্যক্রম

একটি জাতির উন্নতি অবনতির মাপকাঠি হলো সে জাতির সাহিত্য সংস্কৃতির দান। কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিভাগের 'সমন্বয় গোষ্ঠী' এ সেশনে গ্রহণ করেছে ব্যাপক কার্যক্রম যা দেশব্যাপী সাহিত্য এ অঙ্গনে কাজের ক্ষেত্রে আশানুরূপ গতিশীলতার সৃষ্টিতে হয়েছে। বেশ কয়েক বছর পর বহু আকাংক্ষিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিভাগীয় শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়-১টি। ছাত্রীদের এ প্রতিভাকে জোরালোভাবে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং যথার্থ লোক তৈরি-এ লক্ষ্য নির্ধারণ করে এই প্রথমবারের মতো 'সমন্বয়' সাহিত্য গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'ষান্মাসিক কর্মশালা'।

এছাড়াও এই প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ৩টি আঞ্চলিক শিক্ষা শিবির। অঞ্চলগুলো হলো-

১. ঢাকা অঞ্চল
২. রাজশাহী অঞ্চল
৩. নোয়াখালী অঞ্চল।

শাখার কাজের মজবুতি, সমস্যা সমাধান, মানুন্নোয়ন, অডিট ইত্যাদি প্রয়োজনে এবারে সফরের কার্যক্রম অনেক জোরদার করা হয়। সারা দেশে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সফর করা হয় মোট - ২৮৯টি।

"আমি মানুষকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে চাই"-

আল্লাহ পাকের দেওয়া এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট ছিল যথেষ্ট তৎপর। এ তৎপরতায় এ সেশনে শাখা বৃদ্ধি পায় মোট- ২৮টি।

www.pathagar.com

ছাত্রী সংস্থার গান

সূর্যের দিন এসে ঘন ঘোর আঁধিয়ায়
অবশেষে তাড়ায় যেমন
ঘরে ঘরে আলো জ্বালে
ইসলামী ছাত্রীসংস্থা তেমন ॥
মুক্তির দিকে ডাকে সুফিয়া আয়শা আর
ফাতেমার পথের পথিক
ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করে
খরতর স্রোতের অধিক
আলোকিত জীবনের এনে দেয় সন্ধান
প্রভাতের দিশারী এমন ॥
সকল আঙিনা জুড়ে পুষ্পের সমারোহ
পাখিদের নীড়ে ফেরা গান
অথবা নতুন করে নদী ও নারীর দেশে
ঈমানের নব উত্থান
জেহাদের প্রেরণায় যারা চলে অবিরাম
কোরানের কাঙ্ক্ষিত রাহে
মিথ্যার বাধা যত দলে যায় যারা
শহীদি স্বপ্ন উৎসাহে
খাওলার এ বাহিনী গড়ে তোলে সংগ্রাম
সময়ের দাবি যা এখন ॥

কথা : মতিউর রহমান মল্লিক
সুর: মশিউর রহমান

www.pathagar.com

২৫ বছরের গান

মারহাবা মারহাবা মারহাবা মারহাবা॥
২৫ বছর পার করে
আমাদের এই আয়োজন তাই তোমাদের তরে॥
মারহাবা মারহাবা মারহাবা
তিমির রাত্রি পেরিয়ে প্রতিটি সবুজ প্রাণে
কোরানের আলো মোরা ছড়াবো॥
সোনালী দিনের ওই হাতছানি দেখ
নতুন সুরে ডাকছে তোমায়
এই পথে চলো আরও এগিয়ে যাই
আর কি তবে বসে থাকা যায়॥
এই পথে আছে শত বাধার পাহাড়
তবু যদি তুমি এগিয়ে যাও
কোরানের রঙে রঙেবে জীবন
পাবে ঠিকানা জান্নাতের।

www.pathagar.com

২৫ বছর উদযাপন

সময় তার নিজস্ব গতিতে সামনের দিকে বহমান। সে কখনও পেছনে ফিরে তাকায় না। তার ধর্মই হলো এগিয়ে যাওয়া। আর এগিয়ে যাওয়ার পথে সে সৃষ্টি করে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার। যা সময় ও যুগের সন্ধিক্ষণে ভাস্বর হয়ে থাকে। পথ দেখায় অনাগত ভবিষ্যৎ-এর। তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইসলামী আদর্শবাহী ছাত্রী সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ২৫ বছর পূর্তি। বাংলাদেশের বুকে ইসলামী আন্দোলনের বলিষ্ঠ সংযোজন হিসাবে শুধুমাত্র ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ২৫ বছর অতিক্রম মূলত দুঃসাহসিক পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চলারই প্রমাণ বহন করে। বাংলাদেশের বুকে এ এক নজির সৃষ্টিকারী ঘটনা। অবশ্যই এ কথা বলারই অপেক্ষা রাখে না যে এ নজির সৃষ্টিতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমতের হাতই প্রসারিত ছিলো। আর তাই এ গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাটিকে স্মৃতির পাতায় ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা কেন্দ্র কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছিল ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন কর্মসূচি। যা ঢাকাসহ সারা দেশে আলোড়ন জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। মূলত ইসলামী ছাত্রীসংস্থা বাংলাদেশের ছাত্রীদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন বিধায় ২৫ বছর পূর্তি উদযাপনে মাধ্যম তার স্বাক্ষর ছিলো প্রতিটি কর্মসূচিতে। কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার অনুমতিক্রমে ২৫ বছর উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে মূল কমিটি ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচির আলোকে কমিটি গঠন করা হয়েছিল যারা তাদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২৫ বছর পূর্তিতে গৃহীত যাবতীয় কর্মসূচির বাস্তবায়ন করেন। মূল কমিটিতে যারা ছিলেন তারা হলেন–

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

মুহতারামা	ঃ	জাহান আরা আজহারী
”	ঃ	শামসুন্নাহার নিজামী
”	ঃ	হাসনা হেনা জামান
”	ঃ	খোন্দকার আয়েশা খাতুন
”	ঃ	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
”	ঃ	ডাঃ হাবিবা চৌধুরী সুইট
”	ঃ	শামীমা ইয়াসমিন লায়লা
”	ঃ	নাজমুন নাহার নীলু
”	ঃ	সাবিকুননাহার মুন্নী
পরিচালিকা	ঃ	উম্মে খালেদা জাহান
সহপরিচালক	ঃ	আলেয়া বেগম সুমী
সার্বিক ব্যবস্থাপনা	ঃ	হামিদা আক্তার কাজলী
সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা	ঃ	নাজমুন নাহার নাজু

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা পরিষদ ঃ

১. আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি
২. হামিদা রুম্মান
৩. আছিফা বেগম
৪. শাহনাজ পারভীন
৫. খাদিজা আক্তার
৬. ফেরদৌসী রুমা
৭. মুশফিকা সালসাবিল মুন্নী
৮. শামীমা নাসরিন
৯. ইশরাত ইসলাম
১০ রাহাত তাসনিয়া সুবর্ণা
১১. ফাতেমা আক্তার হেপী
১২. ফাতেমা নার্গিস
১৩. দেলোয়ারা বেগম
১৪. উম্মে সালমা
১৫. তাসলিমা আক্তার
১৬. শারমিন মাহবুবা
১৭. নূরজাহান উমা
১৮. রওশন আরা স্বপ্না।

উপরোক্ত কমিটি নিয়ে প্রথম কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২২ এপ্রিল '০৩ এ। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কমিটি বৈঠক। কমিটির প্রতিটি সদস্যার উপস্থিতিই তার প্রমাণ বহন করে। প্রত্যেকের চোখে মুখে ঠিক্‌রে পড়ছিল ২৫ বছরকে Celebrate করার আনন্দ। এ যেন এক অপার্থিব আনন্দ। কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান তার সংক্ষিপ্ত গুছানো কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ২৫ বছর উদযাপনের মাধ্যমে ছাত্রীসংস্থার পরিচিতি সেই সাথে প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসাবে তার অবস্থান সুদৃঢ় করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই কমিটির প্রত্যেক সদস্যা বোনদের কাছ থেকে আলাদা আলাদাভাবে মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেকের মতামতের ভিত্তিতে যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা হলো–

কেন্দ্রভিত্তিক ২৫ বছর উদযাপন উপলক্ষে

১. শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার ১টি
২. ২৫ বছর পূর্তি স্মারক এবং
৩. সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

'কেমন হবে সাংস্কৃতিক উৎসব' আর কোথায়ই বা অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান–এ ২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিলো ২৫ বছর উদযাপন কমিটির সামনে। সে যাই হোক দেশের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ হল উসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ৪টি বিষয়ে প্রদর্শনীর হবে, সেই সাথে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিভাগের পক্ষ থেকে সারা দেশের নির্বাচিত শাখাসমূহ নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং কর্মশালা। এ কয়েকটি বিষয় সাংস্কৃতিক উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো,

সেমিনার

ছাত্রীসংস্থা এ যুগের রাহবার। জাতীয় মূল্যবোধ আর বিশ্বাসের স্ফুরণ ঘটে যে শিক্ষাব্যবস্থায় তা যদি অসম্পূর্ণ আর অপর্যাপ্ত হয় তাহলে সে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনে যথার্থ ভূমিকা পালনের দায় দায়িত্ব এ যুগের রাহবারের উপরই বর্তায়। আমরা জানি ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশদের কলোনীতে পরিণত করার মানসে ইংরেজরা যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তা ছিলো মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা আর মূল্যবোধের পরিপন্থী। তাই ২৫ বছর পূর্তিতে ছাত্রীসংস্থা এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে আয়োজন করে শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার '০৩ এর। এ সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো- "আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা ও আমাদের ছাত্র সমাজ"।

সেমিনার কমিটিতে যারা ছিলেন তারা হলেন–

www.pathagar.com

উপদেষ্টা ঃ

মোহতারামা	ঃ	জাহান আরা আজহারী
”	ঃ	শামসুন্নাহার নিজামী
”	ঃ	হাসনাহেনা জামান
”	ঃ	খোন্দকার আয়েশা খাতুন
”	ঃ	নূরুন্নিসা সিদ্দিকা
”	ঃ	ডাঃ হাবীবা চৌধুরী সুইট
”	ঃ	শামীমা ইয়াসমিন লায়লা
আহ্বায়িকা	ঃ	উম্মে খালেদা জাহান
বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান	ঃ	আলেয়া বেগম সুমী
সদস্যা	ঃ	কোহিনূর আখ্‌তার সীমা
”	ঃ	হামিদা আক্তার কাজলী
”	ঃ	আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি
”	ঃ	হামিদা রুম্মান
”	ঃ	নাজমুন নাহার নাজু
”	ঃ	আছিফা বেগম
”	ঃ	খাদিজা আক্তার
”	ঃ	ফাতেমা আক্তার হ্যাপী
”	ঃ	ফেরদৌসী রুমা
”	ঃ	ফাতেমা নার্গিস
প্রবন্ধ কমিটি	ঃ	আলেয়া বেগম সুমী
	ঃ	কোহিনূর আখ্‌তার সীমা
	ঃ	হামিদা আক্তার কাজলী
	ঃ	আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি
	ঃ	নাজমুন নাহার নাজু

উপরোক্ত কমিটি নিয়ে কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২২ এপ্রিল ’০৩ এ। যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহলো–

১. সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে “আজকের শিক্ষাব্যবস্থা ও আমাদের ছাত্র সমাজ”।
২. সেমিনার ‘বিয়াম’ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে।
৩. সমাজের সুশীল শ্রেণী বিশেষ করে ছাত্রী ও শিক্ষিকা মহলে এ বিষয়ের পক্ষে জনমত তুলে ধরার মানসে দাওয়াতী কাজ করা হবে।
৪. সার্বিক শৃংখলা আর সুন্দর মনোরম পরিবেশে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। ইত্যাদি। আর এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

প্রস্তাবনা কমিটি	ঃ	কোহিনূর আক্তার সীমা
	ঃ	হামিদা রুম্মান
	ঃ	মুশফিকা সালসাবিল মুন্নী

www.pathagar.com

এছাড়াও সেমিনার একটি স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই স্মরণিকার কমিটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

সম্পাদিকা ঃ আলেয়া বেগম সুমী
নির্বাহী সম্পাদিকা ঃ আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি
ঃ আছিফা বেগম

সেমিনারের পূর্ববর্তী ব্যস্ততা ছিলো চোখে পড়ার মত। বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল, সলিমুল্লাহ মেডিকেল, ইডেন কলেজ, এছাড়াও বেসরকারী মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কাতারের ছাত্রীরা ছিলো সেমিনারের মূল টার্গেট। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শিক্ষিকাদের মাঝেও ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করা হয়। প্রতিটি ছাত্রী প্রতিটি শিক্ষিকাদের কাছে দাওয়াতী কার্ড পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রীসংস্থার কর্মীরা যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার জুড়ি মেলা ভার। দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে কারো কটুকথা, অবজ্ঞা তাদেরকে মনভাঙা করেনি, হতাশ করেনি বরং দ্বিগুণ উৎসাহ আর উদ্দীপনায় মুখরিত ছিলো দায়ী গ্রুপ। আর থাকবেই না কেন এ গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান এবং সেক্রেটারী জেনারেল আলেয়া বেগম সুমী। আর অন্যদিকে চলছিল একটি ভাবগম্ভীর, সময়োপযোগী এবং সামগ্রিকভাবে যথার্থ এরকম একটি প্রবন্ধ রচনায় প্রবন্ধ কমিটির নিরন্তন প্রচেষ্টা। রাতের পর রাত জাগা, গবেষণামূলক অধ্যয়ন ইত্যাদি ছিলো তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত কয়েক রাতের নির্ঘুম প্রচেষ্টায় সত্যিই একটি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ দাঁড় করে প্রবন্ধ কমিটি যা পরবর্তীতে সুধীদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এই প্রবন্ধ যারা পরিবর্ধন আর পরিমার্জনে সহায়তা করেছেন তারা হলেন-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের প্রভোস্ট ডঃ তাজমেরী এস.এ. ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়নের শিক্ষিকা ডঃ উম্মে কুলসুম রওজাতুর রুম্মান। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুস শহীদ নাসিম।

যেভাবে অনুষ্ঠিত হলো সেমিনার

একমাস ব্যাপী ব্যাপক প্রস্তুতি আর ভয়-আশংকার অবসান ঘটিয়ে নির্দিষ্ট দিনটি ঘনিয়ে এলো- ২৫ জুলাই '০৩। ২৫ বছর পূর্তি কার্যক্রমের শুরুটা ছিলো এ সেমিনার দিয়েই। ২৫ জুলাই এ সকাল থেকেই ছিলো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। সকাল ৯টায় শুরু হবে সেমিনার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব অতিথিরা পৌঁছতে পারবে কিনা এ আশংকাটা সকাল থেকেই উদ্যোক্তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু না এ বর্ষণ যে মহান আল্লাহর রহমতেরই বর্ষণ ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ঘড়ির কাঁটা ঠিক নয়টার ঘরে উঁকি দিল তখন। একে একে সব অতিথিরা বিয়াম মিলনায়তনে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করলেন। তবে প্রধান অতিথির আগমন একটু বিলম্বিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান কিছুটা উৎকণ্ঠায় ছিলেন। এমন সময় মোবাইল ফোনে প্রধান অতিথি জানালেন যে তার আসতে একটু দেরি হবে তাই সেমিনার শুরু করার অনুমতি তিনি দিলেন।

৯:১০ এ কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান আপা অতিথিবৃন্দাদের নিয়ে স্টেজে আসন গ্রহণ করলেন। ফাতেমা রুহানীর কোরআন তেলাওয়াতের সুর মূর্ছনায় পিনপতন নীরবতার মধ্য দিয়ে শুরু হলো সেমিনার '০৩। সেমিনারে যারা অতিথি হিসাবে ছিলেন তারা হলেন-

প্রধান অতিথি- ডঃ তাজমেরী এস.এ ইসলাম প্রভোস্ট, রোকেয়া হল অধ্যাপিকা রসায়ন বিভাগ, ঢাবি, আলোচকবৃন্দা হিসাবে যারা ছিলেন তারা হলেন- শামসুন্নাহার নিজামী, প্রিন্সিপাল ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ডাঃ সাহানা আফরোজ পরিচালক নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ডঃ উম্মে কুলসুম রওজাতুর রুম্মান, সহকারী অধ্যাপিকা রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, নওয়াজিশ আরা, প্রিন্সিপাল নর্থ সাউথ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ইডেন মহিলা কলেজের সমাজ কল্যাণ বিভাগের প্রভাষিকা শামীমা ইয়াসমিন লায়লা এবং লালমাটিয়া

www.pathagar.com

মহিলা কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ এর অধ্যাপিকা ফেরদৌস আরা বকুল। এছাড়াও ছাত্রী বক্তা হিসাবে যারা ছিলেন তারা হলেন- হামিদা আক্তার কাজলী কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল সম্পাদিকা এবং কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদিকা আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি।

তেলওয়াত-এর আবেশী পরিবেশের রেশ কাটিয়ে স্বাগত বক্তব্যের জন্য মঞ্চে ঠিক ৯ঃ৩৫ মিনিটে উপস্থিত হন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে তিনি মুসলিম মনীষীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা তুলে ধরে উপস্থিত জনতাকে কুরআনী জ্ঞানের আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের উদাত্ত আহ্বান জানান।

অতঃপর উপস্থাপিকার বিশেষ আহ্বানে আকাঙ্ক্ষিত পর্ব প্রবন্ধ পাঠ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় "আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা ও আমাদের ছাত্র সমাজ"–এ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ইসলামী ছাত্রীসংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল আলেয়া বেগম সুমী। সুললিত কণ্ঠে দীর্ঘ সময়ে নিরলসভাবে তিনি পাঠ করলেও দর্শকশ্রোতার কোন ক্লান্তি তো নেই-ই বরং ধৈর্যের সাথে পাঠ করার জন্য সত্যিই তিনি প্রশংসার দাবিদার। এরই মধ্যে আগমন ঘটে প্রধান অতিথির। উল্লেখ করা যেতে পারে মোট আটজন আলোচকদের মধ্যে অধ্যাপিকা ইফফাত আরা নাসিম হঠাৎ অসুস্থতার কারণে সেমিনারে উপস্থিত হতে পারেননি।

এরপর রসের জগৎ। এই প্রবন্ধের ওপর আলোচনা। আলোচকদের বিভিন্ন চিন্তা, সব দৃষ্টিকোণ এবং নিজস্ব বাচনভঙ্গি ও স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থাপনায় যেন সেমিনারের মত একঘেয়েমী প্রোগ্রামকেও হার মানিয়ে দেয়। দর্শক-শ্রোতারা যেন গোগ্রাসে উপভোগ করছিল।

শুরুতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিউক্লিয়ার মেডিসিন ডাঃ শাহানা আফরোজ। তার আকর্ষণীয় কণ্ঠে অত্যন্ত গুছালো এবং তথ্যবহুল বক্তব্য যেন সবার মনোযোগ কেড়ে নেয়। তিনি প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসার মাধ্যমে শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরে ইসলামী শিক্ষার ওপর বিশেষ দাবি জানিয়ে শিক্ষার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। মাত্র সাত মিনিট তিনি তার বক্তব্য স্থায়ী করলেও আকর্ষণীয়ভাবে তা শেষ করেন।

দ্বিতীয় আলোচক ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত অনন্য ব্যক্তিত্ব ঢাকা ভার্সিটির এ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডঃ উম্মে কুলসুম রওজাতুল রুম্মান। সুবহানাল্লাহ বাহ্যিক অবয়বের সাথে যোগ্যতা যেমনটি মিশে আছে তদ্রুপ জ্ঞানীর পরিচয় মিলে যায় তার মুখনিঃসৃত ফল্গুধারায়। অতঃপর আরবি উচ্চারণের গুরুত্বের উপলব্ধি জাগ্রত করার লক্ষ্যে মঞ্চে উপবিষ্ট হন নওয়াজিশ আরা। মাত্র ১০ মিঃ অথচ আল কোরআনের ভাষা শিক্ষার চমৎকার দিক তুলে ধরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন দর্শক-শ্রোতাদের। আলোচনার আহ্বান রাখতে গিয়ে উপস্থাপিকা নাজমুন নাহার নাজুর প্রশংসা না করলেই নয়। আলোচনার মাঝে বিনোদনের চাবি যেন তারই হাতে। আবৃত্তিকারের কণ্ঠ নিয়ে কবি আসাদ বিন হাফিজসহ বিভিন্ন কোটেশনে আরও মুখরিত হয়ে ওঠে "বিয়াম" মিলনায়তন।

উপস্থাপিকার আহ্বানে হাস্যোজ্জ্বল রূপে মাইকের সামনে আসেন ইঞ্জিনিয়ার ড: সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া। অত্যন্ত জোরালে কণ্ঠে তিনি ইসলামী শিক্ষার সাথে অন্যান্য শিক্ষার সমন্বয়ে গুরুত্ব তুলে ধরেন। ছাত্র সমাজকে দুনিয়াবী ডিগ্রীর সাথে সাথে কোরআনের 'দৃপ্ত পথ' ধরে 'অগ্রসর হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানালেন তিনি।

পরবর্তীতে প্রস্তুত থাকা বিশেষ আকর্ষণীয় শামীমা ইয়াসমিন লায়লা, অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির দিকটি উল্লেখ পূর্বক দুঃখ করে তুলে ধরেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট সেই সাথে সমাধানের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। আলোচকদের ধারাবাহিকতায় মঞ্চে উপবিষ্ট মিসেস শামসুন্নাহার নিজামী শিক্ষাব্যবস্থা যেমনটি আমরা চাই তা উল্লেখ করেন। এই বিশেষ দিকটি আলোচনা করতে যেয়ে উপস্থিত ছাত্রীদেরকে প্রসঙ্গক্রমে তিনি একদিকে ভাল ছাত্রী হওয়ার এবং অপরদিকে যুগের মুয়াজ্জিন হওয়ার বিশেষ নির্দেশনা দেন। বর্তমান যুগের চাহিদা মেটানোর প্রেক্ষিতে তথা শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে তিনি প্রতনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে ছাত্রীসংস্থার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। উনার বক্তব্য শেষ হতেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার খসড়া কাঠামো বলতে গিয়ে মঞ্চে আসেন ফেরদৌস আরা খানম বকুল। তিনি প্রচলিত শিক্ষার প্রভাব তুলে ধরেন এবং মর্মাহত হৃদয়ে সেই প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় উল্লেখ করেন।

একেক আলোচকদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মুখরিত দর্শক-শ্রোতাদের সেমিনারের মত ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশ যেন উপভোগ্য পরিবেশের সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

এবারে ছাত্রীবক্তার বক্তব্য, উপস্থাপিকা নাজমুন নাহার নাজুর ঘোষণায় ছাত্রীবক্তা হিসেবে পর্যায়ক্রমিকভাবে আসেন মেধাবী ছাত্রী হামিদা আক্তার কাজলী ও আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি।

হামিদা আক্তার কাজলী তথাকথিত শিক্ষার প্রভাব বলতে গিয়ে ভার্সিটি ২/১টি 'ঘটনা উল্লেখপূর্বক দর্শক-শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অপরদিকে আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে সবাইকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার কল্পনার জগতে নিয়ে যান। যা কি না উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার প্রাণের দাবি। তাদের জোরালো যুক্তিতে যেন উপস্থিত ছাত্রী সমাজ তাদের প্রতিনিধির সন্ধান পায়।

যথারীতি আলোচনার ক্রমধারার পর্ব শেষ পর্যায়ে। প্রধান অতিথির মুখনিঃসৃত বাণীর অপেক্ষায় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা। যেন "কখন আসবে কবি কখন আসবে।" এমন ভাব।

মাইকে ঘোষণার মাধ্যমে সে অপেক্ষার অবসান ঘটলো। প্রধান অতিথি ড: তাজমেরী এস. এ. ইসলাম অসুস্থতার দিকে তোয়াক্কা না করে নিজেকে অভিভাবক বেশে ছাত্রীদের দাবি পূরণে মঞ্চে দাঁড়ান। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার আলোচনার প্রেক্ষিতেই তাঁর অবস্থান। সংক্ষিপ্ত অথচ ভাবও ভাষার তাৎপর্যে তার মাত্র ১৫ মিনিটের কথায় যেন সবাই পেয়ে গেল তাদের সঠিক সিদ্ধান্তে। "আর নয় অশিক্ষা করবো গ্রহণ সুশিক্ষা-" এ শ্লোগান অজান্তেই সবার মনে যেন দৃঢ় হয়ে যায়।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে প্রস্তাব পেশের পর্ব। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে দর্শক-শ্রোতার পক্ষ থেকে আসতে থাকে অসংখ্য প্রস্তাব। যেন সবাই চায় এখনই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম হয়ে যাক। অতঃপর সবার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপিকার আহ্বানে প্রস্তাব পাঠ করেন ছাত্রীসংস্থার সহকারি সেক্রেটারী জেনারেল কোহিনূর আখতার সীমা।

১৫ দফা সম্বলিত প্রস্তাবে আদর্শ মুসলিম নাগরিক ও দক্ষ জনশক্তির তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার কারিকুলাম, সিলেবাস এবং পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দাবি পেশ করা হয়। সম্মানিত অতিথি ও উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের সর্ব সম্মতিক্রমে ১৫ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্বশেষে সভানেত্রীর পালা। ছাত্রীসংস্থার অগ্রযাত্রার নিদর্শন হিসেবে তিনি এই সেমিনারের বিষয়কে উল্লেখ করেন। সেই প্রেক্ষিতেই আলোচকদের যথাযথ আলোচনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

পরিশেষে সেমিনার আয়োজকদের পক্ষ থেকে আগত প্রধান অতিথিসহ আলোচকবৃন্দাদের সৌজন্য পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে এ আয়োজনের পরিসমাপ্তি ঘটে দুপুর ১টা বেজে ২০ মিনিটে।

অত্যন্ত পরিপাটি আর সাজানো গোছানো পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এ সেমিনার। শ্রোতাদের পিনপতন নীরবতা, বক্তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আর স্বেচ্ছাসেবী বোনদের আন্তরিক সেবা সব মিলিয়ে সেমিনারটি খুবই উপভোগ্য ছিলো। সেমিনারে আগত শিক্ষিকা মহলের প্রশংসা সত্যিই ছাত্রীসংস্থার জন্য পরবর্তীতে মাইল ফলক হয়ে থাকবে। ভূয়সী প্রশংসা করেছে আগত ছাত্রীরাও। ঢাকা মেডিকেলের ছাত্রী সুলতানা নাসের এর মন্তব্য ছিলো এরকম- এ সেমিনারে অংশ নিতে পেরে আল্লাহর শোকরিয়া জানাই। এরকম সম্ভাবনাময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদেরকে সচেতন করার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই দোয়া করি এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। শুধু সুলতানা নাসেরেরই এ মন্তব্য ছিলো না বরং সেমিনারে ৫৫০ ছাত্রীর হৃদয়ের আবেগ এমনই ছিলো। সত্যিকারে বলতে কি এ ধরনের সেমিনারের আয়োজন করে ছাত্রীসংস্থা একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে নিঃসন্দেহে।

সাংস্কৃতিক উৎসব

মূলতঃ সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির মূল্যবোধ ও জীবনাচরণের বহিঃপ্রকাশ। সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পাশাপাশি তাকে সামাজিক উপযুক্ততা দান করে। তাই "অপসংস্কৃতির বন্যানয় খরা আসুক সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ছড়িয়ে পড়ুক" এই শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ২৫ বছর উদযাপন উপলক্ষে আয়োজন করেন সাংস্কৃতিক উৎসবের। এ উৎসব তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল-

১. কর্মশালা
২. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৩. প্রদর্শনী

সমগ্র কার্যক্রমকে সম্পাদন করার জন্য গঠন করা হয় সাংস্কৃতিক উৎসব কমিটি। এ কমিটিতে যারা ছিলেন তারা হলেন-

www.pathagar.com

উপদেষ্টা ঃ

মোহ্তারাম	মীর কাশেম আলী
”	মতিউর রহমান মল্লিক
মোহ্তারামা	সাবিকুন্নাহার মুন্নী
”	কামরুন্নেসা মাকসুদা
”	উম্মে খালেদা জাহান
”	শাহীন আখতার আঁখি
”	সাবিনা মল্লিক

পরিচালিকা	ঃ	আছিফা বেগম
সহ-পরিচালিকা	ঃ	আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি
বাস্তবায়ন কমিটি	ঃ	কোহিনূর আখ্তার সীমা
	ঃ	হামিদা আক্তার কাজলী
	ঃ	হামিদা রুম্মান
	ঃ	শাহানাজ পারভীন
	ঃ	নাজমুন নাহার নাজু
	ঃ	খাদিজা আখ্তার
	ঃ	কাজী তাবাস্সুম
	ঃ	নূরুন্নাহার লিমু
	ঃ	ফাতেমা নার্গিস
	ঃ	ইশরাত ইসলাম
	ঃ	মুশফিকা সালসাবিল মুন্নী

১. কর্মশালা

কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা আছিফা বেগমের পরিচালনায় ২৬ ও ২৭ আগস্ট '০৩ বাছাইকৃত শাখা নিয়ে ২ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মশালা। এ কর্মশালার মূল টার্গেট যা ছিলো তা হলো গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলোতে সাহিত্য-সংস্কৃতিক চর্চার বিকাশ ঘটানো এবং জনশক্তিকে এ ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলা। যে সমস্ত শাখা এই ২দিন ব্যাপী কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করে তা হলো- ১. ঢাকা মহানগরী, ২. চট্টগ্রাম মহানগরী, ৩. রাজশাহী মহানগরী, ৪. খুলনা, ৫. সিলেট, ৬. বরিশাল শহর ৭. রংপুর শহর, ৮. বগুড়া শহর ৯. সিরাজগঞ্জ শহর, ১০. নাটোর শহর, ১২. নারায়ণগঞ্জ শহর, ১৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর, ১৪. কুমিল্লা শহর, ১৫. বাগেরহাট শহর।

উল্লেখিত শাখাগুলো থেকে অনুর্ধ্ব ৪ জন শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সর্বমোট ৬০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এ কর্মশালা।

যেভাবে অনুষ্ঠিত হলো কর্মশালা

২৪শে আগস্ট, সমাগত, পরদিন থেকেই কর্মশালার শুরু, পুরো অফিস ব্যস্ততার মুখোমুখি, কারো যেন কোন ফুরসত নেই। দিন রাত একাকার হয়ে গিয়েছে। পরদিকে সব বিভাগের বোনদের সচল রাখার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী বোনদের প্রশংসা না করলেই নয়। তাদের অবিশ্রান্ত শ্রমের ফসলেই সবাই সবার কাজ গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

যথারীতি ক্যালেন্ডারের পাতার ২৫ আগস্ট ধরা দেয়। কর্মশালার পূর্ব প্রস্তুতির সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন। দুপুর ১২টার দিকে ঘটতে থাকে শিক্ষার্থীদের আগমন। মহানগরী অফিসটি শিক্ষার্থীদের বিশ্রাম স্থান করে গ্রীণভ্যালী হল রুমটিতে প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়।

www.pathagar.com

ঘড়ির কাঁটা ঠিক ৪টা পরিচালিকা আছিফা বেগম পুরো প্রস্তুত। বোনদের আগমন ঘটতে থাকে বিশ্রামালয় থেকে হল রুমে। ৪:১৫ মি: কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিতিতে কর্মশালা শুরু হয়, শাখাগুলো সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে সব পর্যায়ের জনশক্তির সমন্বয়ে একটি Team গঠন করে এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। তিন দিন ব্যাপী এ কর্মশালায় বিশেষ বক্তা হিসেবে ছিলেন কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান, মতিউর রহমান মল্লিক, কামরুন্নেসা মাকসুদা এবং আবদুল কাদের মোল্লা। বিশুদ্ধ কোরআন প্রশিক্ষণ দেন বোন আঞ্জুমানারা মিঞ্জু। সর্বস্তরের জনশক্তিকে উৎসাহের মোড়কে আরও জোড়ালো করে দেয় এ কর্মশালার বিশেষ আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতা।

প্রতিটি শাখার মার্জিত রুচি সম্মত পোশাক গুছানো আইটেম সেই সাথে সময় সচেতনতা সত্যিই বিচারকদের ভাবিয়ে তোলে। অত:পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ১ম স্থান লাভ করে ঢাকা মহানগরী, ২য়- বরিশাল শহর এবং ৩য় খুলনা মহানগরী। তবে কোন শাখাকেই নিরাশ করা হয়নি। প্রতিটি শাখাই গ্রহণ করে শুভেচ্ছা উপহার। আর এভাবেই পার হয়ে যায় কর্মশালার ৩টি দিন।

২. প্রদর্শনী

সাংস্কৃতিক উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী এ প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে গতানুগতিকতার বাইরে এমন কিছু বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে যা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আগত দর্শকদের বিমোহিত করেছে। করেছে স্তম্ভিতও। ছাত্রীসংস্থার অসামান্য বুদ্ধিমত্তা সৃজনশীলতা আর মেধার পরিচয় ছিলো প্রদর্শনীর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে। প্রদর্শনী কমিটিতে
যারা ছিলেন তারা হলেন–

প্রধান	ঃ	ফাতেমা নার্গিস
সহকারী	ঃ	ফাতেমা আক্তার হেপী
	ঃ	ইসরাত ইসলাম
	ঃ	নূরজাহান উমা

এছাড়াও যাদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় প্রদর্শনীর সার্বিক কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়েছে তারা হলো ক্ষুদে শিল্পীবৃন্দা। যাদের কথা আলোচনার শেষে আসবে ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশের বুকে এ ধরনের এক প্রদর্শনীর আয়োজন শুধু ছাত্রীসংস্থার গ্রহণযোগ্যতাই বাড়ায়নি বরং এ সংগঠনের গৌরব আর মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুন। প্রদর্শনী মোট ৫টি বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়।

১. ইসলামী ছাত্রীসংস্থার জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাস ঐতিহ্য

হালকা পিং কালারের আর্ট পেপারে ছাত্রীসংস্থার আল্লাহু আকবার লেখা মনোগ্রামের জলছাপের উপর ছাত্রীসংস্থার শুরুর প্রেক্ষাপট, ২৫ বছরের ছন্দময় পথ চলা, উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, ১৯৭৮-৭৯ থেকে ২০০২-২০০৩ সেশন পর্যন্ত ধারাবাহিক কমিটি পরিচিতি, ২৫ বছরের কাজের তুলনামূলক পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্য ইত্যাদি বিষয়গুলোকে যত্নের সাথে তথ্য আকারে তুলে ধরা হয়। যা থেকে দর্শক শ্রোতারা সহজেই ছাত্রীসংস্থার ২৫ বছর পরিভ্রমণ করে আসতে পেরেছেন। ঢাকা মহানগরীর সভানেত্রী নাজমুন নাহার নাজুর তৈরি করা স্ক্রীপ্ট থেকে রোকসানা নাজনীন মারিয়াম, জেবুন্নেসা বেগম লাইলী, রাফিয়া আক্তার, ফাতেমা জহুরা তামান্না অত্যন্ত যত্নের সাথে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দেন।

২. সারা দেশ থেকে প্রাপ্ত ছাত্রীসংস্থার বোনদের প্রস্তুতকৃত হস্তশিল্পের প্রদর্শনী

এ প্রদর্শনীতে ছিলো রকমারী জিনিসের সমারোহ। কেন্দ্রীয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগমনের মাধুরি মিশিয়ে তৈরি করা এ সমস্ত হস্তশিল্প দর্শকদের অনুভূতিতে সাড়া জাগিয়েছে ব্যাপকভাবে। ফাতেমা নার্গিস আর ফাতেমা আক্তার হেপীর তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত এ সমস্ত হস্তশিল্প ২৯শে আগস্ট '০৩ উন্মোচিত করেছিলো আরেকটি সত্যের আর সেটা হলো ছাত্রীসংস্থার কর্মী বাহিনীর দক্ষতা এবং যোগ্যতা চতুর্মুখীতা।

www.pathagar.com

৩. সীরাত (সাঃ) এর উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী

প্রদর্শনীতে আরো একটি বিষয়ে দর্শকদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তা হলো শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সীরাতের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী। ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস রচিত হয়েছিল যে সকল স্থানকে কেন্দ্র করে, ঐতিহাসিক যুদ্ধগুলোর ময়দান, রাসূল (সাঃ)-এর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন যা মুসলমানদের যথার্থ পরিচয় বহন করছে, ইত্যাদি নিয়ে কিছু দুর্লভ আলোকচিত্রের সমাবেশ ছিল প্রদর্শনীতে। যা দর্শকদের ফিরিয়ে নিয়ে গেছে রাসূল (সাঃ) এর প্রতিষ্ঠিত সেই যুগে, যে যুগ ছিল সব যুগের সেরা যুগ।

৪. বাংলাদেশ

'বাংলাদেশ' এই বিষয়ে প্রদর্শনীতে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয় তা হলো বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন, মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ, বিশ্বে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অবদান, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিবরণ ইত্যাদি। হালকা সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ডে বাংলাদেশের বিভিন্ন রূপের চিত্রাংকের উপর উপরোক্ত তথ্যসমূহের বিবরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সত্যিকার রূপ তুলে ধরা হয়েছিল।

৫. মুসলিম বিশ্বের সচিত্র প্রতিবেদন

সত্যিই দেখার মতো ছিলো মুসলিম বিশ্বের সচিত্র প্রতিবেদন। প্রদর্শনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিলো 'মুসলিম বিশ্ব' নামক গ্যালারী। লামিয়া, জেবুন্নেসা বেগম লাইলী, মাহফুজা মৌসুমী, ফাতেমা রূহানী, ফাতেমা জহুরা তামান্না এ সমস্ত শিল্পিদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় হালকা আকাশী রং এ ব্যাকগ্রাউন্ডে জীবন্ত হয়ে উঠে গৌরবোজ্জ্বল মুসলিম অতীত।

মুসলিম বিশ্বের পরিচিতি, কালের বিবর্তনে মুসলিম শাসনামল, মুসলমানদের স্থাপত্য শিল্পের অনন্য নিদর্শনসমূহ, বিশ্ব সভ্যতা বির্নিমানে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, আগ্রাসনের মুখে মুসলিম বিশ্ব, মুসলমানদের ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশনা জীবন্ত হয়ে উঠে শিল্পীদের চিত্রে আর লেখিকাদের ছন্দবদ্ধ লেখনির গাঁথুনিতে। এ ছিলো এক অসামান্য সৃষ্টি।

সব মিলিয়ে প্রদর্শনীটি ছিলো যুগের রাহবার হিসাবে ছাত্রীসংস্থার যথার্থ প্রতিনিধিত্বের স্বাক্ষর। আর তা সম্ভব হয়েছে প্রদর্শনীর প্রধান ফাতেমা নার্গিস, সহকারী ফাতেমা আক্তার হেপীসহ প্রদর্শনী কমিটির প্রতিটি বোন নিজেদের খাওয়া দাওয়া, বিশ্রামকে হারাম করে নিজেদের সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে রাত দিন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বলেই। প্রদর্শনী সার্বিক তদারকী এবং স্ক্রীপ্ট তৈরিতে কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান এবং অফিস সম্পাদিকা আকলিমা ফেরদৌসী আঁখির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

৩. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আর একবার সূর্য! জেগে উঠো প্রদীপ্ত গৌরবে
এ অন্ধ গুহায় আজি তোমার একান্ত প্রয়োজন।
সংকীর্ণ কূপে আনো, আনো মুক্তির সংবাদ,
ক্ষুদ্র এ গণ্ডির মাঝে আকাশের উদারতা আনো।

আকাশের উদারতা আনার এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার নজির সৃষ্টি করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা, ২৫ বছর উদযাপনের সর্বশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শনের মাধ্যমে। যা সম্ভব হয়েছিল কেবল মাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার মেহেরবানী আর কর্মী বাহিনীর আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কমিটিতে যারা ছিলেন−

www.pathagar.com

পরিচালিকা ঃ আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি

সদস্যা ঃ মুশফিকা সালসাবিল মুন্নী

ঃ ফারহানা সিদ্দিকা তানজিমা

ঃ রাহাত তাসনিয়া সুর্বনা

ঃ শামিমা নাসরিন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে বিভিন্ন বিভাগে আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করা হয়। যেমন- স্টেজ ম্যানেজমেন্ট, স্ক্রীপ্ট তৈরি, ইসলামী গান, মাইক ও লাইট ইত্যাদি। নিম্নে বিভাগ অনুযায়ী কমিটি পরিচিতি দেয়াহলো-

১. **স্ক্রীপ্ট কমিটি ঃ** প্রধান- আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি সহকারী- শারমিন মাহবুবা, আমাতুর রহমান তাসনিম।

২. **ইসলামী গান ঃ** প্রধান- রওশন আরা স্বপ্না, সহ- তাসলিমা আক্তার।

৩. **স্টেজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি ঃ** প্রধান- শামিমা নাসরিন, সহকারী- আমাতুল্লাহ পারভীন, তানিয়া তাবাসসুম।

৪. **মাইক ও লাইট ঃ** তাসলিমা মারজান, সৈয়দা রাফিজা সুলতানা, খন্দকার শিউলী।

৫. **ড্রেসআপ ও মেকআপ ঃ** প্রধান- ফারহানা সিদ্দিকা তানজিমা, সহকারী- সাদিয়া জান্নাত রীমু, আয়েশা বিনতে সালমা।

৬. **অর্থ ও পরিবহন ঃ** প্রধান- শাহনাজ পারভীন, সহ- আমাতুল্লাহ পারভীন।

৭. **শৃংখলা বিভাগ ঃ** ফেরদৌসী রুমা, দেলোয়ারা বেগম, সহ- নাসরিন আক্তার।

২৫ বছরের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণার এ অনুষ্ঠান স্বাভাবিক ভাবেই জমজমাট সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য এবং ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন হতেই হবে এ চিন্তা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কমিটির আগে থেকেই ছিলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন কমিটি বিভিন্ন সময়ে একাধিক প্রোগ্রামে মিলিত হন। এবং সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহিত হয় তা হলো-

১. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২টি পর্বে অনুষ্ঠিত হবে- প্রথম পর্বে উদ্বোধন এবং দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন।

২. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকার বাইরের সাংস্কৃতিক কর্মীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তবে যারা কর্মশালায় অনুষ্টিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বিজয়ী হবে এবং এছাড়াও তাদের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হবে যা বিচারকগণ নির্বাচিত করবেন।

৩. একই দিনে ২টি শো হবে প্রথম শো সকাল ১০টায় এবং দ্বিতীয় শো হবে বেলা ৩টায়। এছাড়াও প্রোগ্রামটি হবে টিকিট সিস্টেমে এবং পরিচিতিমূলক একটি প্রসপেক্টাসও বের করা হবে। ইত্যাদি

যাইহোক উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি পর্বের ব্যস্ততা।

তবে অনুষ্ঠানের পূর্ববর্তী ব্যস্ততা ছিলো দেখার মতো। প্রাথমিকভাবে সমগ্র ঢাকা মহানগরী থেকে শিশু-শিল্পিসহ ৫৬জন সাংস্কৃতিক কর্মি বাছাই করা হয়। এবং এদেরকে নিয়ে পুরো আড়াই মাস চলে একটানা রিহার্সেল। কেন্দ্রীয় অফিসে টানিয়ে দেয়া হয় রিহার্সেল সিডিউল তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বেচ্ছাসেবী তালিকা, তাদের ফোন নাম্বার এবং প্রতিটি আইটেমের জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষকের তালিকা ইত্যাদি। পুরো আড়াইটা মাস স্বেচ্ছাসেবী বোনদের উপর দিয়ে গিয়েছে স্টীম রোলার। অফিস ছিলো লোকে লোকরণ্য। দৈনিক ১০ কেজি চালের ভাত, ডাল, বান্না আর সাংস্কৃতিক কর্মীদের খাওয়ানো, এক্ষেত্রে তদরকী করা সব মিলিয়ে স্বেচ্ছাসেবী বোনদের প্রচেষ্টায়ই সম্ভব হয়ে টাইম অনুযায়ী রিহার্সেল Maintain করা। আর রিসর্হাসেলে সাংস্কৃতিক কর্মীরা যে আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে তা অনন্য। রির্হাসেলে যাতে ভুল না থাকে। তার জন্য একেকটা আইটেম একই সময়ে ১ ঘন্টা দু'ঘন্টা ব্যাপীও হয়েছে, ফলে পরিশ্রান্ত হয়েছে বোনেরা কিন্তু দায়িত্বশীলার আনুগত্যের সামান্য হেরফের হয়নি। নাটকের রিহার্সেলে নাট্যকর্মীদের প্রানান্তকর প্রচেষ্টায় আস্তে আস্তে জীবন্ত হয়ে উঠছিলো নাটকের বিষয় বস্তু। নাটকের প্রতিটি অভিনেত্রী এতটাই আন্তরিক ছিলেন যে একই অভিনয় কতবার যে তারা করেছেন তার কোন সঠিক হিসাব নেই। রিহার্সেলে যে বিষয়টি মূর্তমান হয়েছে তাহলে কর্মী বাহিনী সদস্যরা নিজস্ব প্রচেষ্টায় নিজযোগ্যতাকে আল্লাহর রাহে নিয়োজিত করতে সদাসর্বদা প্রস্তুত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রিহার্সেলে যারা প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন তারা হলেন, আছিফা বেগম, আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি, মুশফিকা সালসাবিল মুন্নী, রাহাত তাসনিয়া সূর্বনা।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রস্তুতি পর্বের ব্যস্ততা

দিনের পর দিন একটানা রির্হাসেলের পাশাপাশি আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছিল সেই কাঙ্খিত দিনটি; অর্থাৎ ২৯ আগস্ট '০৩। যতই দিন ঘনিয়ে আসছিল ততই যেন ব্যস্ততা বেড়ে চলছিলো পুরো দমে। মহানগরীর সেক্রেটারী খাদিজা আখতারের তত্ত্বাবধানে ড্রেস আপ কমিটি ছিলো মহা ব্যস্ত। সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ অল্প দাম এই বিষয়গুলোকে লক্ষ্য রেখে রুচিসম্মত ড্রেস শিশুবিভাগ এবং বড়দের জন্য তৈরি করতে তাদেরকে রীতিমতো পেরেশান হয়ে ছিল। আবার অন্য দিকে ফারহানা সিদ্দিকা তানজিমার তত্ত্বাবধানে মেকাপ কমিটির স্বেচ্ছাসেবীরাও কম কম ব্যস্ত ছিলেন না। তারা অনুষ্ঠান সম্পর্কে পুরো ধারণা নেয়া, আইটেমের সাথে পোশাক ও সাজগোজের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা যায়, এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান সব মিলিয়ে কিভাবে বোনদেরকে আকর্ষীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায় ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণ মনোযোগী ছিল। আর তাইতো মেকাপ, ড্রেসআপসহ প্রতিটি বিষয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের কাছে দারুন প্রশংসিত হয়েছে। ব্যস্ততা কোন অংশে কম ছিলোনা অভ্যর্থনা ডেকোরেশন কমিটিরও। ব্যানার, স্ক্রীন রেডি, আনুষ্ঠানিক ডেকোরেশন, অতিথিদের জন্য ক্রেস্ট, ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় পুংখানুপুংখভাবে সম্পাদন করতে অভ্যর্থনা ডেকোরেশনের বোনদের অন্যান্য সমস্ত কাজ বন্ধ করেই শুধু এদিকেই মনোযোগ দিতে হয়েছে। পানির মত অর্থ খরচ হচ্ছিল অর্থ ও পরিবহন বিভাগের। কেন্দ্রীয় কলেজ বিভাগীয় সম্পাদিকা শাহনাজ পারভীন অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পালন করছিলেন এ দায়িত্ব। বিভিন্ন কমিটির বোনদের ব্যস্ততার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েট যেমন সেক্রেটারী জেনারেল আলেয়া বেগম সুমী, বায়তুলমাল ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদিকা হামিদা আক্তার কাজলীসহ কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সদস্যা বোনেরা, প্রত্যেকের ব্যস্ততা চলছিল সমান তালে। এ যেন এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে বাস্তবায়নে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার এক অনন্য মহড়া।

কেমন ছিলো প্রস্তুতির সর্বশেষ দিনটি

২৮শে আগস্ট সকালের শুরুটা ছিলো মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে। সকাল ৭:৩০ সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্দেশ্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্রিফিং দেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচালিকা আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি। প্রতিভা আল্লাহ্‌র দান, এই প্রতিভাকে আল্লাহ্‌রই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত; ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসাবে কোন রিয়া বা প্রদর্শনী নয় বরং আল্লাহ্‌র ভালবাসার নিয়তকে অন্তরে রেখে যাবতীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে এবং যাবতীয় কৃতিত্ব আল্লাহর একথা মনে দৃঢ় মূল করতে হবে এ সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি কর্মীদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তোলেন। কাংখিত ২৯ আগস্টের প্রস্তুতির সর্বশেষ দিনটিতে ছিল থমথমে ভাব। কারও মুখে হাসি নেই, শুধু আশংকার চিহ্ন। এই মনোভাব নিয়েই একদিকে রিহার্সেল অপরদিকে প্রদর্শনীর গুছানো পর্ব। আবার মেহমান, হল যোগাযোগের লিয়াজোঁ, করা ইত্যাদি সব মিলিয়ে কেমন এক পেরেশানী মন ঘিরে ধরেছিলো সবাইকে। মহান আল্লাহর সহযোগিতার তৃষ্ণার্ত হৃদয়গুলো যেন সুযোগ পেলেই সিজদায় লুটে পড়ছে, কেউ বা এত পরিশ্রমের মাঝেও আল্লাহর সহযোগিতার প্রত্যাশায় রোজাও পালন করছে। আর সেদিনকার রিহার্সেলটাও ছিল ব্যতিক্রম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে সেদিন ছিল হরতাল। যার কারণে সবাইকে একসাথে পাওয়া গিয়েছে এবং ওসমানীতে স্টেজ রিহার্সেলের সুযোগ হয়ে যায়, সন্ধ্যা ৭টায় হতে রাত ১০টা পর্যন্ত এ রিহার্সেল চলতে থাকে। রাত ১১টার দিকে ওসমানী থেকে ফিরে ক্লান্ত অবসন্ন চিত্তে সবার হাত যেন আসমানের উপর ছাড়া আর কোন দিকে নয়, যে যার মত মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে নেয় কাতর স্বরে। কেউবা প্রস্তুতির পর্ব সারতে সারতে ফজরের সুমধুর আজানকে অভ্যর্থনা জানায়। আর এভাবেই কেটে যায় ২৮শে আগস্ট।

কাংখিত ২৯শে আগস্ট

অত:পর ২৯শে আগস্ট, সবার আতংক, সবার ব্যস্ততার কাংখিত দিন সমাগত। বাদ ফজরেই মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করেই বেরিয়ে পড়ে ফাতেমা নার্গিসের নেতৃত্বে প্রদর্শনী গ্রুপ, ঠিক এ সময়েই সেক্রেটারী জেনারেল সব বোনদের সহযোগিতার ছায়া নিয়ে বাসা থেকে চলে আসেন ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে। একে একে শিল্পী গোষ্ঠীসহ বিভাগীয়

www.pathagar.com

বোনের এবং ১৫টি জেলার বোনেরা সালাতুল ফজর পড়ে বেরিয়ে পড়েন। সুশৃংখলভাবে একের পর এক গাড়ির সার্ভিসে সবাই পৌঁছে যায় কাংখিত স্থানে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে। যেন এই দুর্যোগে এই দুর্ভোগে জাগতেই হবে জাগতেই হবে সবাইকে। এখানে প্রসঙ্গত প্রশংসা না করলেই নয়, আমাদের এত বড় আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে মুরব্বী 'চাচারাও এগিয়ে আসেন। ২/৩ দিন আগে থেকেই সার্বিক বিষয়ে নির্দেশনা, পরামর্শ প্রদান, যাতায়াতের সুব্যবস্থাপনা সব কিছুর জন্যই তারা হাত বাড়িয়ে দেন। সেই সাথে আমাদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে মুহতারাম রফিকুন্নবীর নেতৃত্বে প্রায় ২৫ সদস্যের একটি গ্রুপকে সার্বক্ষণিক হলে অবস্থান করেন, যেটা আমাদেরকে সত্যিই ব্যস্ততম মুহূর্তে সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছে।

সাজ সাজ রব ওসমানী মিলনায়তনে, দু'দিকে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা মাঝে প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় ব্যানার। বুক ভরা আশা নিয়ে টিকিট সাথে সকাল ৯টায় থেকেই আগমন ঘটতে থাকে দর্শক শ্রোতার।

এদিকে আয়োজকদের কঠোর নীতি অবলম্বনে অডিটরিয়ামে ৯.৩০ টার পূর্বে কাউকে ঢুকানো নিষেধ, ভীড় জমতে থাকে প্রদর্শনীতে। এভাবেই ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১০টায় পৌঁছায় সবাই অপেক্ষমান প্রধান অতিথির আগমনে। ইতোমধ্যে জানানো হলো প্রধান অতিথি আসলেই শুরু হবে, অতএব সবাই অপেক্ষমান। এদিকে পরিচালিকাসহ আয়োজকেরা উদ্বিগ্ন। কেননা এই দেরী হওয়া মানেই ২য় শো দেরী হওয়া। যাহোক ১০:৪০, প্রধান অতিথির আগমনের সাথে সাথেই পর্দার আড়াল থেকে ভেসে আসে প্রোগ্রাম শুরুর আহ্বান। পরিচালিকা আছিফা বেগম, প্রধান অতিথি জুবাইদা গুলশান আরা, কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান এবং বিশেষ মেহমান শামসুন্নাহার নিজামী আসেন মঞ্চে। আর দ্বিতীয় পর্বের প্রধান অতিথি ছিলেন উম্মে সালমা মুন্নী।

১ম পর্ব ঃ উদ্বোধনী পূর্বে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যিক জুবায়দা গুলশান আরা বলেন, ২৫ বছর পূর্তিতে ছাত্রীসংস্থার এ ধরনের বিশাল একটি আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ছাত্রীসংস্থা এই বাংলার সবুজ জমীনে যে ভূমিকা রেখে চলেছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে এটা হবে দেশ ও জাতির জন্যে চ্যালেঞ্জ। ২য় পর্বের প্রধান অতিথি আহ্বায়িকা কমিটির ১১ জনের ১ জন মোহতারামা উম্মে সালমা মুন্নী তার বক্তব্যে বলেন, মাত্র ১১ জনের যে কাফেলা যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৭৮ সালে, সেই কাফেলা আজ গন্তব্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, বাংলাদেশের ছাত্রীদের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান পেয়েছে। এর চেয়ে আনন্দ আর গর্বের বিষয় কি হতে পারে। মহান আল্লাহ ইনশাল্লাহ ছাত্রীসংস্থার এ যাত্রাপথকে আরো মসৃণ ও সাবলীল করবেন। অতিথির বক্তব্যে মোহতারামা শামসুন নাহার নিজামী বলেন, ছাত্রীসংস্থা বাংলাদেশের ছাত্রী সমাজের জন্য একটি যথার্থ প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন। এটা তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি মহান আল্লাহর কাছে ছাত্রীসংস্থার সামনের পথচলা যাতে আরো বেগবান হয় সে জন্যে দোয়া করেন। সর্বশেষে কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান বলেন, আমরা মুসলমান। আমাদের আলাদা ধ্যান-ধারণা আর মূল্যবোধ আছে। আমাদের আছে স্বকীয়তা এবং গৌরবোজ্জ্বল একটি ইতিহাস। আমরা আমাদের সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি সেই সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটাতে। আমাদের বোনদের তৈরি হস্তশিল্প আর প্রদর্শনী নিশ্চয় আপনাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিবে। প্রদর্শনীর দিক উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের একটি প্রদর্শনী সত্যিই ব্যতিক্রমধর্মী একটি উদ্যোগ এতে সন্দেহ নেই।

২য় পর্ব ঃ দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসহ ছাত্রীসংস্থার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি দর্শকদের কাছে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। উপচে পড়া ভিড়ে পিনপতন নীরবতার মধ্য দিয়ে দর্শক-শ্রোতা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। মারহাবা মারহাবা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ওসমানী মিলনায়তন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিষয় ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও চমৎকার। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ফাতেমা রুহানীর কণ্ঠে সূরা আল-ইমরানের ১৯০-১৯৪ নং আয়াতের সুললিত তেলাওয়াত এক পবিত্র আবেশ সৃষ্টি করে, সেই সাথে আকিলা সিদ্দিকার বলিষ্ঠ কণ্ঠের তরজমায় বিমোহিত হয় সবাই। এর পরপরই ছিলো হামদ। সমন্বয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বোনদের সুবহানাল্লাহ সুবাহানাল্লাহ্

www.pathagar.com

গুঞ্জরণে হামদ পরিবেশন সত্যিই হৃদয়কাড়া ছিলো। শিশু শিল্পীদের ছড়াগান হাট্টিমাট্টিম টিম পরিবেশন বেশ সাবলীল ছিলো। তাদের পরিবেশনা যেন দর্শক-শ্রোতাকে সেই ছেলেবেলাকার দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়াও তাদের পরিবশেনায় বাংলাদেশের গ্রামবাংলার চিত্রের স্থির খণ্ড নাটক পরিবেশ দর্শকদের মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের "বাপের বাড়ী" কাব্য অভিনয় আরেকটি উল্লেখ করার মতো বিষয়। এছাড়া বগুড়া ও সিরাজগঞ্জের বোনদের পরিবেশনায় ছিলো দুটো কমেডি নাট্যাংশ যা দর্শকদের মনের খোরাক যোগাতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন কোরাস একক গান ইত্যাদি সমন্বয়ে ২২টি আইটেম পরিবেশন করা হয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো মুসলিম বিশ্বের নির্যাতিত শিশুদের প্রতীকী হিসাবে পরিবেশিত নাট্যাংশ যা প্রত্যেকের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমান হিসাবে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে এ উপলব্ধি জাগাতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমান হিসাবে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমেই শেষ হয় ২য় পর্বের অনুষ্ঠান।

৩য় পর্ব ঃ তৃতীয় পর্বে পরিবেশিত ২য় নাটক "সময়ের পথচলা"। রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন আকলিমা ফেরদৌসী আঁখি। একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপন ছিলো এ নাটকটি। যা দর্শকদের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে। নাটকের কাহিনী সংক্ষেপ ছিলো এরকম-একবিংশ শতাব্দী-"সময়" নিরবচ্ছিন্নভাবে তার চিরন্তন স্বভাব ধর্ম অনুযায়ী বয়তে পারছে না। আবহমানকাল থেকে বয়ে চলা সময়ের গতিপথ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। মানবতার অর্ধাংশ নারী সমাজে দেখা দিয়েছে অসন্তোষ। বিভিন্ন রকম সমস্যা দানা বেঁধে উঠেছে। "সময়" এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে চায়, বের করে আনতে চায়, দানা বেঁধে উঠা সমস্যার সমাধান। আর সে কারণেই "সময়" "যুগের" পরামর্শ অনুযায়ী বের হয়ে পড়ে পেছনের শতাব্দী ভ্রমণে। প্রথমে তারা পৌছে যায় প্রাচীনতম গ্রীক সভ্যতায়, এ সভ্যতায় "সময়" দেখতে পায় এ সময়ের নারীদের।

অধঃপতিত দৃশ্য। তখন নারীরা ছিলো ভোগ-বিলাস আর কামনার বস্তু। তাদের ছিলো দু'জন দেবতা। "আফ্রোদাতি" আর "কিউপিড"। এ দু'জন দেবতার মূল্যমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলো সে সমাজ। অবাধ সম্পর্কই চিলো তাদের আদর্শ এমনকি তারা এতো নিচে নেমে গিয়েছিলো যে, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারকে কোন রকম কদর্য ও দূষণীয় কাজ বলে মনে করতো না। বিবাহকে অনাবশ্যক প্রথা মনে করতো। এই ছিলো তখনকার সভ্যতার নারীর জীবন। এর পরের দৃশ্যে "সময়" পৌছে রোমান সভ্যতার খৃস্টপূর্ব ৪৩০ থেকে ৪০০ শতকে। নৈতিকতা ও সামাজিক বন্ধন এতটাই শিথিল ছিলো যে, নারীদের কোনো মূল্যায়নই ছিলো না। তারা ছিলো ভর্ৎসনার যোগ্য সেবার দাসী, মাঠে-ঘাটে তাদেরকে বিক্রি করা হতো। তারপরের দৃশ্যে "সময়" পৌছে যায় খৃস্টীয় ইউরোপে, যাদের প্রাথমিক ও মৌলিক ধারণা ছিলো নারীরাই পাপের মূল উৎস। আর এ কারণেই Tertullion নামক ধর্মগুরুরা মনে করতো নারী শয়তানের প্রবেশদ্বার, পুরুষের ধ্বংসকারিণী, তাই নারীকে ধ্বংস করাই উচিত। এরপর ৬ষ্ঠ দৃশ্যে সময়কে দেখা যায় সিন্ধুনদ অববাহিকা পার হয়ে ভারতীয় প্রাচীন যুগে, যেখানে নারীদের কোনো মূল্যায়ন ছিলো না। "সতীদাহ প্রথা" এমনকি ফসল ও বৃষ্টির প্রত্যাশায় নারীদেরকে বলী দেয়া ছিলো সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। তার পরের দৃশ্য আরবের জাহেলী সমাজ যেখানে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। দাসী হিসেবে বিক্রি হয়ে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হতো তাদের। অন্যায়-অশ্লীলতার বন্যায় ডুবে ছিলো জাহেলী সে যুগ। এর পরের দৃশ্যে 'সময়' বিচলিত হয়ে পড়ে নারীদের এহেন অবমাননাকর পরিস্থিতি দেখে-তখন যুগ তাকে আরো সামনে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দেয়।

সর্বশেষ দৃশ্যে যুগ অবাকভাবে পেয়ে যায় নারীর কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়ন। যা ছিলো ৬৩০ খৃস্টাব্দ। এ সময় একজন মহামানবের আবির্ভাব হয় যিনি ছিলেন মানবতার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এ যুগে সময় দেখতে পায় নারীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে, সম্পদ-সম্পত্তিতে তাদের মর্যাদা এমনকি সার্বিক অবস্থায় নারীদের স্বাধীন এবং পরিচ্ছন্ন পবিত্র জীবন চিত্র 'সময়'কে করেছে আনন্দে আপ্লুত। এরপর যুগ 'সময়'কে পরামর্শ দেয় 'সময়' যেন এই স্বর্ণালী অধ্যায়ের ছবি এঁকে দিতে পারে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর অস্বস্তিকর পরিবেশে। 'সময়' সে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এক অব্যক্ত প্রত্যয়ে শুরু করে তার ভবিষ্যৎ পথচলা।

নাটকের প্রতিটি দৃশ্যপটের মধ্যে নারী জাতির অবস্থা, নারীদের উপর নির্যাতন, দাস প্রথা, নারীকে বলি দেওয়া এবং সর্বশেষে মহান রাসূল (সাঃ) এর যুগকে তুলে ধরার। যেখানে নারীরা ফিরে পায় তাদের অধিকার, মর্যাদা এবং পুরুষের পাশাপাশি লড়াই-এর একদিকে ঘটনার ধারাবাহিকতায় অভিনেত্রীদের পোশাকে সজ্জিত রূপ সত্যিই দর্শক শ্রোতাকে

www.pathagar.com

মনমুগ্ধ করে তোলে। এরই মধ্যে আরেকটি আকর্ষনীয় দিক ছিল দৃশ্যের সাথে সাথে বোনদের নিপুম হাতের কারুকার্যে ফুটিয়ে তোলা ছবি। যা দর্শক শ্রোতাকে সত্যিই বিমোহিত করে তোলে।

সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল গীতিকার মতিউর রহমান মল্লিক এবং সুরকার মসিউর রহমানের সুরে ছাত্রীসংস্থার দলীয় গান। অংশগ্রহণে করে সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দাসহ বাইরের ১৫টি জেলার শিল্পীবৃন্দা। ঘড়িতে তখন ২:৪০ মি:।

সর্বশেষে সমাপন ঘোষণা। দেখতে দেখতে দর্শক শ্রোতার, ৪টি ঘন্টা পার হয়ে গেল কেউ যেন বুঝতেই পারলনা! যেন "শেষ হইয়াও হইল না শেষ" এমন আকুতি নিয়ে প্রস্থান ঘটতে থাকে ২য় শো-এর দর্শকের ভীড়ের মধ্য দিয়ে ১ম শো-এর দর্শক-শ্রোতার।

যথারীতি ৩:১৫ মিনিটে শুরু হল ২য় শো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এই শোতে প্রধান অতিথি ছিলেন কবি জাহানারা আরজু, আকস্মিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত হওয়াতে তিনি উপস্থিত হতে না পারলেও সৌভাগ্যক্রমে প্রধান অতিথির পদ অলংকিত করেন ছাত্রীসংস্থার ১ম আহ্বায়িকা কমিটির সদস্যা ১১ জনের অন্যতম মুহতারামা প্রবাসী উম্মে ছালমা মুন্নী।

সন্ধ্যা ৭:৩০-এ শো-এর পরিসমাপ্তি ঘটে। দর্শক-শ্রোতার মন মাতানো আহ্বান ধ্বনি নিয়ে সমন্বয়ের শিল্পী প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। অত:পর অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে একে একে সবার প্রস্থান ঘটতে থাকে ওসমানী মিলনায়তন থেকে। আর এভাবেই ২৫ বছরের কাংখিত উৎসব মুখর দিনগুলি মিলিয়ে গেল ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে। কিন্তু আজও সুগন্ধ ভেসে আসে ইসলামী সংস্কৃতির সুশীতল বাতাস।

যাদের সহযোগিতায় ২৫ বছর উদযাপন সম্ভব হয়েছে

২৫ বছর উদযাপনকে কেন্দ্র করে ছাত্রী সংস্থা যাদের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবে তারা হলেন-

- কেন্দ্রীয় সভানেত্রী উম্মে খালেদা জাহান। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টা, তদারকী, আন্তরিক সহযোগিতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সুনির্দিষ্ট পরামর্শ এ কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করতে সহযোগিতা করেছে, এ কথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।
- ছাত্রীসংস্থা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভানেত্রীবৃন্দাদেরকে আগামী প্রজন্ম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে তাদের সুপরামর্শের জন্য।
- মুরুব্বী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আমীরে জামায়াত, সেক্রেটারী জেনারেল, মকবুল আহমদ, অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, জাহান আরা আজহারী, শামসুন নাহার নিজামীসহ আরো অনেকে পরামর্শ উপদেশ দিয়ে ২৫ বছর উদযাপনকে সহজ করে দিয়েছেন। সেই সাথে ছাত্রীসংস্থার সবধরনের কাজের একান্ত সহযোগি মোঃ ওয়ালী উল্লাহ যে পরিমাণ শ্রম, সেবা আর ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন তার কোন তুলনা হয়না। মহান আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম যাযা দান করুন, তাদের জন্য এ দোয়া ছাত্রীসংস্থার প্রতিটি কর্মীর।

মোবারক হোক সাংস্কৃতিক উৎসবের
মোবারক হোক ২৫ বছরের এ আয়োজনের।

www.pathagar.com

একটি কাফেলার কথা

শারমিন মাহবুবা খানম

হয়নি শুভ্র ভোরের আলো
গভীর অন্ধ কালো
বাতাস ভারি, চেতনা রুদ্ধ
বিবেক কপাট বন্ধ
স্তব্ধ বাতাস, স্মরণ করালো
ভাবনার সব ভ্রান্তি
তাইতো এ পথে পা মেলালো
এগার জনার কান্তি
তারপর হতে এই কাফেলায়
একে একে এলো যত
রাঙালো শুভ্র কোরআন আলোয়
খাঁটি মানুষের মত
বিনয়ী নম্র, যত বেশী জ্ঞানী
তত বেশী খোদাভীরু
বিশাল হৃদয়, অমিত সাহসী
যদি চাও কিছু আরো
কত বাধা এলো, টলেনি তবু
ঈমানের ভিত একটুকু
জ্বলে উঠে আরো দুর্বার বেগে
বাধা পেলো যতটুকু
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া আজ
যতটুকু আছে জানা
সব মঞ্জিলে গড়ে উঠেছে
প্রতিষ্ঠান চির চেনা
উল্কার সঙ্গে আসবে বেরিয়ে
অনুসরণীয় প্রিয় যারা
পড়বে ছড়িয়ে দূর দূরান্তে
জাগাবে ঘুমের পাড়া
কত চেষ্টা, কত সাধনা
কত ভরসা কত-ভাবনা
খোদায়ী মদদে পথ চালনা
এইত তাদের মূল প্রেরণা
মাত্র ব্যাথা আর শত বেদনা
শত কথারই বিষ মনিহার।
সয়েছে নিরবে, তবু হেসেছে
পেতে আল্লাহর প্রিয় দিদার
নির্লোভ এই শ্বেত পঙ্খেরা
ঘোষিছে উচ্চে তাওহীদের,
দ্বার হতে দ্বারে পৌঁছে দেবে
দৃপ্ত আলো ইসলামের।

www.pathagar.com

এ্যালবাম
২৫ বছর উদযাপন

www.pathagar.com

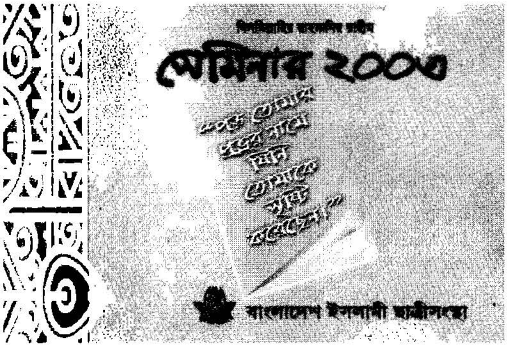

www.pathagar.com

www.pathagar.com

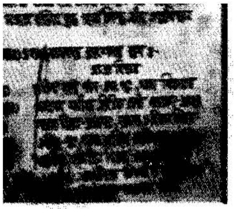
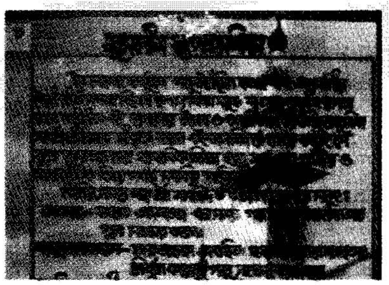

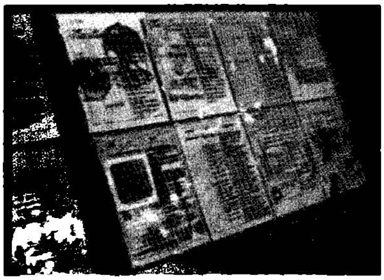
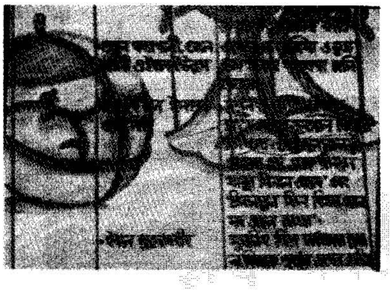
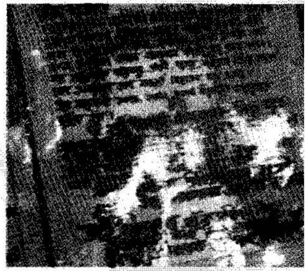

www.pathagar.com

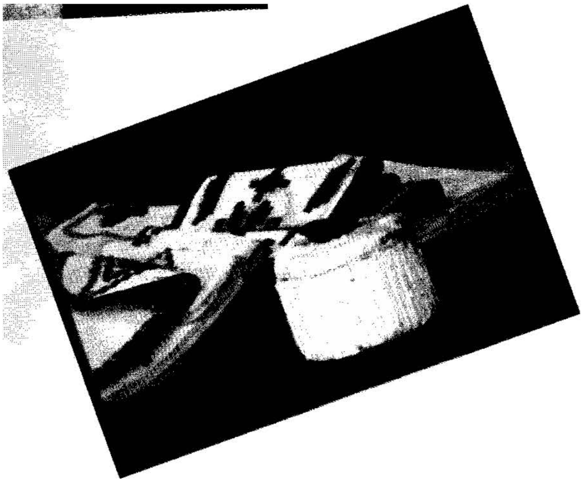

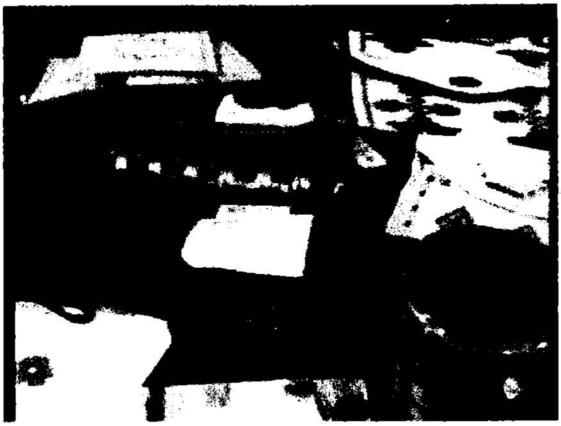

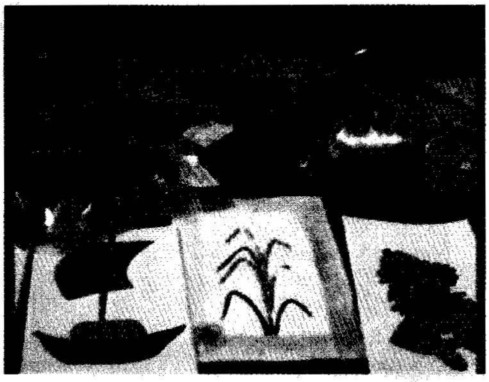

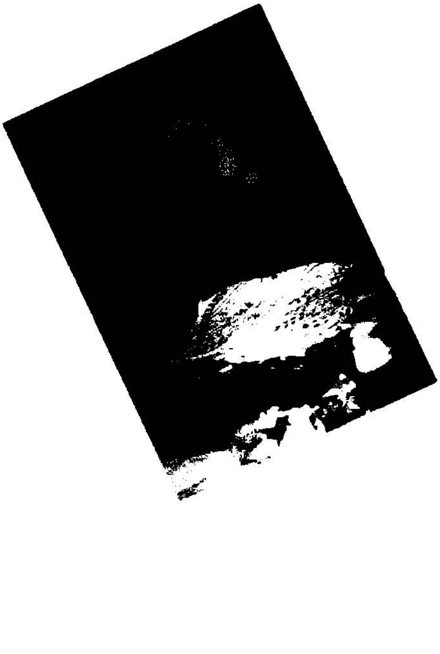

www.pathagar.com

www.pathagar.com

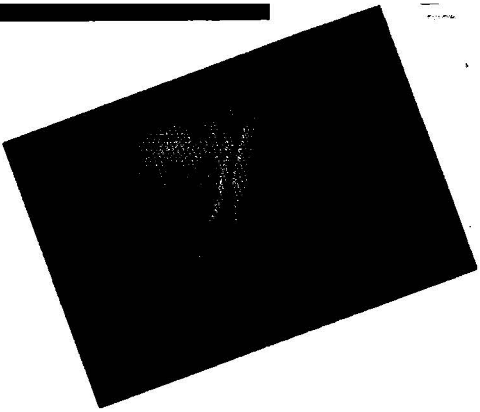

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি কোচিং

ভর্তি চলছে!!

- সকল শিক্ষার্থীর জন্য *Special Care*
- সর্বাধিক সংখ্যক ক্লাস ও পরীক্ষা
- A+ প্রাপ্তদের ফ্রি কোচিং এবং ৪.৮৮ প্রাপ্তদের ৫০% কমিশন
- **ছাত্রীদের জন্য পৃথক ব্যাচ**

২০০২-২০০৩ সেশনে লিখিত পরীক্ষায় ১ম এবং জাতীয় মেধায় ৩য়, ৪র্থ, ৫মসহ ৫৭০ জন

সেশন	সাফল্য
২০০২-২০০৩	লিখিত পরীক্ষায় ১ম এবং জাতীয় মেধায় ৩য়, ৪র্থ, ৫মসহ ৫৭০ জন
২০০১-২০০২	লিখিত পরীক্ষায় ১ম, ২য়, ৩য়সহ ৪৯৯ জন চান্স পেয়েছে
২০০০-২০০১	জাতীয় মেধায় ১ম, ৫ম, ৭ম, ১৫তমসহ ৪৮৫ জন চান্স পেয়েছে

শাহবাগ শাখা :	২/ক/৫ নবাব হাবিবুল্লাহ রোড (পিজির পিছনে) ফোন : ৮৬১৮৯৪৯
ফার্মগেট শাখা :	৪৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (হলিক্রস কলেজের বিপরীতে) ফোন : ৯১৩০৯৫১
মৌচাক শাখা :	৯০/এ নিউ সার্কুলার রোড (ফুজি কালারের বিপরীতে) ফোন : ৯৩৫২১৫২
ঢাকার বাইরে : শাখাসমূহ-	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, কুমিল্লা

যে কোন মূল্যেই হোক
এর গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখা হয়,
অনন্য গুণগত মানই ৯৬ বছর ধরে

রুহ্ আফজা'র

জনপ্রিয়তার ভিত্তি

রুহ্ আফজায় রয়েছে

প্রাকৃতিক ভিটামিন, আয়রণ,
পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম,
ক্যালশিয়াম, জিংক, সালফার এবং
ফসফরাস, যা মস্তিষ্ক, লিভার, হার্ট
এবং কিডনি সতেজ ও সক্রিয় রাখে।
শরীর রাখে চাঙ্গা, সতেজ আর
প্রফুল্ল।

রুহ্ আফজা

প্রশান্তি দেয়

সতেজ করে

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ
হামদর্দ ভবন, ২৯১/১, সোনারগাঁও রোড,
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি মানেই উন্নতমানের আসবাবপত্র

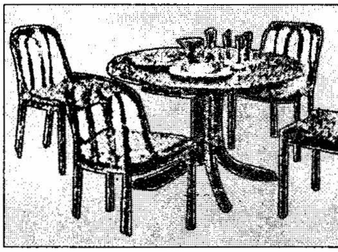

উন্নতমান ও রুচিশীল ডিজাইনের সেগুন কাঠের আসবাবপত্রের জন্য আসুন

ইয়ামিন ইম্পোরিয়াম ফার্নিচারস
YEAMIN EMPORIUM FURNISHERS

৭৬, জাতীয় স্টেডিয়াম আর্কেড
ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৫৬৩১৩
ব্যবস্থাপনায়
মোঃ শহীদুল ইসলাম
ব্যাংকের মাধ্যমেও ক্রয়ের সু-ব্যবস্থা আছে

উন্নতমানের প্রতীক

রোটোম্যাক্স ফ্যান

ডিলারশীপের জন্য যোগাযোগ করুন

গ্যারান্টি ১২ বছর

বিশেষত্ব

⇨ অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড
⇨ কোরিয়ান বেয়ারিং
⇨ কোরিয়ান সুপার ওয়্যার
⇨ উন্নতমানের প্রযুক্তি এবং দক্ষ কারিগর দ্বারা প্রস্তুত

ব্রান্ড ঃ রোটোম্যাক্স
সাইজ ঃ ৫৬" এবং ৪৮" (৩ পাখা ও ৪ পাখা)
RPM ঃ ৩২০, ৫৬", ২২০/২৩০ ভোল্ট
৩৪০, ৪৮", ২২০/২৩০ ভোল্ট
পাওয়ার ঃ ৮০ ওয়াট (৫৬")
৭০ ওয়াট (৪৮")

প্রস্তুতকারকঃ রোটোম্যাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

"নামেই যার দ্রুত প্রসার"

রোটোম্যাক্স টেলিভিশন

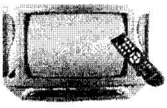

◀ মডেল ঃ 44YL-3R

◀ রিমোট

মডেল ঃ MTYL-14DX ▶

বিশেষত্ব

⇨ ছবি এবং শব্দের পরিচ্ছন্নতা
⇨ এ,সি ও ডি,সি-তে চালানোর সুবিধা
⇨ মোট ৩ বছরের সেবা নিশ্চয়তা
⇨ রিমোট টিভি ভি,সি,ডি-তে চালানোর সুবিধা
⇨ সকল অপারেশন রিমোট নিয়ন্ত্রিত
⇨ রিমোট টিভির ২৩০টি চ্যানেল
⇨ নন-রিমোট টিভির ১৮ চ্যানেল
⇨ বর্তমানে ১৫ ধরনের মডেল চালু আছে

প্রস্তুতকারক ঃ ইউয়ান লিমিটেড

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

PLOT আইকাব হাউজিং SHOP

ICAB CITY

MOSTLY NEAR TO DIPLOMATIC ZONE BARIDHARA, DHAKA.

GARDEN CITY

CLOSE TO DHAKA INTER-DISTRICT BY PASS ROAD OR DISCUSSED ASIAN HIGH WAY

ICAB City রাজধানী ঢাকা মহানগরীর প্রাক্তন গুলশান থানার বর্তমান বাড্ডা থানার বিশেষ আকর্ষণীয় আবাসিক এলাকায় পরিণত হতে যাচ্ছে। ২০০৩ সালে ICAB City-তে মাটি ভরাট কাজ শুরু হয়েছে। ইনশাল্লাহ মাটি ভরাটের কাজ আর কোন একটি বছরও বন্ধ হবে না।

Garden City-র অধিকাংশ বুকিংদাতার কিস্তির মেয়াদ ২০০৪ সালেই শেষ হবে। সুতরাং ২০০৪ সালেই অত্র প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ ইনশাল্লাহ শুরু করা যাবে। ঢাকা আন্তঃজেলা By Pass সড়ক Garden City -কে অঘোষিতভাবে ঢাকার অংশেই পরিণত করেছে।

আপনার কাংখিত প্লট/শপ ক্রয়ের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ
(ফোন, ই-মেইল করতে পারেন বা নিজ ঠিকানা দিয়ে পত্র লিখে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ডাকযোগে সংগ্রহ করতে পারেন)।

কোম্পানীর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

MOHAMMOD ULLAH
MANAGING DIRECTOR

ICAB COMPANY (Pvt.) LTD.

59/3-2, PURANA PALTAN, DHAKA-1000,
PHONE- 9566903, 9566519
E-mail : icab1@bdonline.com

DEFORMED BAR
FROM
KABIR STEEL

KABIR STEEL RE-ROLLING MILLS LTD.

Head Office: Kabir Manzil, Sheikh Mujib Road
Agrabad, Chittagong -1100, Bangladesh

www.pathagar.com

"তোমাদের ধন-সম্পত্তি এবং তোমাদের বংশ ও জনশক্তি এর কোনটিই তোমাদেরকে আমার নিকট সম্মানিত বা নিকটবর্তী করতে পারে না। কিন্তু ঈমান ও তদনুযায়ী আমল যার আছে কেবল তারাই আমার নিকট সম্মানিত। তাদেরকে তাদের প্রতিটি কাজের দ্বিগুণ ফল প্রদান করা হবে।ঃ

– আল কুরআন

RAIHAN LIMITED

AL-ALAM CORPORATION

1142, North Agrabad
Chittagong Bangladesh
Tel: 880-31-716426
Fax- 880-31-716309
Res: 880-31-682689

INPRO
Omeprazole Capsule

ACIN
Ranitidine Teblet

BIOCID
Antacid tablet/ Suspension

BESTCEF
Cefixime
Capsule/Suspension

CIPCIN
Ciprofloxacin

SUPRACEF
Cephracire
Capsule Dy Syrup drops

SUPRALEX
Cephalexin
Capsule/Dry Syrup

AMOTID
Amoxicillin
Capsule/Dry Syrup

BIOPEN VK
Penicillin V
Dry Syrup

BIOTRIM
Co-trimoxadcis
Tablet/Suspension

BIOZYL
Metronidazole
Tablet/Suspension

LACTU
Lactulose solution

TOP
Ketoproten Tablet

ACETA
Paracetamol
Tablet/Suspension

CEVALIN
Vitamin-C Tablet

BIOVIT
Vitamin- B complex Capsule/Syrup
Multivitamin Drops

SALBU
Salburamol Tablet/Syrup

LORFAST
Loratadine
Tablet/Suspension

Best Compliments
from

BIO- PHARMA
Laboratories Ltd.

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

বাংলাদেশে শরীয়াহ্‌ ভিত্তিক প্রথম ইসলামী জীবন বীমা (তাকাফুল)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

সুদমুক্ত হালাল বীমা ব্যবস্থা

■

লাভ ও লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত

■

পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অংশীদারিত্ব

■

সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা

■

পারস্পরিক সংহতি ও সহযোগিতা

ইসলামী শরীয়াহ্‌ মোতাবেক পরিচালিত

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার

প্রধান কার্যালয় ঃ টি.কে ভবন, (১৪তম তলা) ১৩, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ৮১৩০৬১০, ৮১৩০৬১১, ৮১৩০৬২০, পিএবিক্স-৮১৫০১২৭-৩১

সুপার স্টার
সামগ্রী
ব্যবহারে নিরাপদ
SUPER STAR
FLUORESCENT TUBELIGHT
IDEAL DAYLIGHT

মিরপুরের
অভিজাত আবাসিক এলাকায়
দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণার প্লট
ক্রিসেন্ট হ্যাভেন
১৩৭০ ও ১৪০০ বর্গফুট
ক্রিসেন্ট ভিউ
৯০০, ১০৪০ ও ১৩৭০ বর্গফুট
(1 sft. = 0.0929 sqm. appx.)
মাত্র ৩০%
নিজস্ব বিনিয়োগে আধুনিক ফ্ল্যাট
For Ideal Homes...
CRESCENT HOLDINGS LTD.
House : 63, Road : 15/A, 1st Floor, Dhanmondi, Dhaka 1209
Tel : 9121135, 9142268 Cell : 019 327176, 019 480560

বিশ্ব মুসলিম জাগরণের এই শতাব্দীতে
ইয়াহুদী-খৃষ্টান-ব্রহ্ম চক্রের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করে
মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও ইসলামের বিশ্বজনীন বিজয়ের জন্য
আধুনিক বিশ্বের সেরা ইসলামী মনীষী

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী রহঃ এর
বিশ্বসেরা তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'
সীরাতে সরওয়ারে আলমসহ

আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক
ও বিভাগের উপর গবেষণালব্ধ সুচিন্তিত লিখিত
বইগুলো পড়ুন

ইসলামকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিন।
গোটা মুসলিম বিশ্বকে এক পরিবারে গড়ে তুলুন
এ দাবী বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ'র দাবী
সত্বর আসুন, দ্বীনি দায়িত্ব পালন করুন।

ঃ যোগাযোগ করুন ঃ
বাংলাদেশ ইসলামী ইনিস্টিটিউট

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন ঃ ৭১১৫১৯১
৪৩৫/২-এ ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২
বায়তুল মোকাররম বইমেলা

গৌরবময় সাফল্যের ২২ বছর

ফোকাস

ভর্তি চলছে

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

IBA এর BBA স্পেশাল কোচিং

সমৃদ্ধশালী লেকচারশীট। প্রতি ক্লাস শেষে পরীক্ষা। অপ্রতিদ্বন্দ্বী "ফোকাস গাইড" ফ্রি।
কোর্স শেষে সর্বাধিক Model Test। Basic English Course ফ্রি। আবাসিক সু-ব্যবস্থা।
সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম সরবরাহ।

আমাদের শাখাসমূহ :

প্রধান কার্যালয় ১৬ তেজকুনিপাড়া (আল রাজী হাসপাতাল সংলগ্ন জনতা ব্যাংক গলি), ফার্মগেট, ঢাকা, ফোন : ৯১১২৬৫৫, ০১৭১-১১৯১১৫, ০১৭১-৩২৫২৯২
শাহবাগ শাখা : ২/ক/৫, নবাব হাবিবুল্লাহ রোড (পিজির পেছনে) শাহবাগ, ঢাকা, ফোন : ৮৬১২২২৯, ০১৭১-৭৮৪১৭৫
মৌচাক শাখা : ৮৯/১ নিউ সার্কুলার রোড (ঢাকা বিজ্ঞান কলেজের গলি), মৌচাক, ঢাকা, ফোন : ৮৩৫৫২৫৪, ০১৭১-২৩০৪১৬, ০১৭১-১১৩৯৩৩

ঢাকার বাইরে :

রংপুর : শাপলা চত্বর, টার্মিনাল রোড, রংপুর, ফোন : ৬৪২৭৬, ০১১-৩৮০৭২৫
বগুড়া : রেনেসাঁ কোচিং ভবন, রিয়াজ কাজী লেন, সূত্রাপুর, বগুড়া, ফোন : ০৫১-৭৩৬১৪, ০১৭১-৯৭৪৭৪৩
ময়মনসিংহ : ১৫ শ্যামাচরন রায় রোড নীচতলা (সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের সামনে), ফোন : ৬১৯৭৩, ০১৭১-৯৪৭৯৬৫
কুমিল্লা : কুমিল্লা হাইস্কুলের উত্তর পার্শ্বে, পুরাতন চৌধুরী পাড়া রোড, ফোন : ০১৭১-০২৫৩০৩

২০০২-২০০৩ সেশনে শুধু ঢা.বি.তেই ৯২৩ জনের বিস্ময়কর সাফল্য

www.pathagar.com

Sl. No	Names of Procedures	Rates in Taka
1.	Video Endoscopy	650/-
2.	Video Endoscopy with Sedation	800/-
3.	Sclerotherapy (EST)	2,500/-
4.	Band Ligation (EVL)	3,500/-
5.	Balloon Dilatation (Pneumatic)	3,500/-
6.	Savary Gilliard Dilatation	4,500/-
7.	Polypectomy	4,500/-
8.	F.B. Removal	4,000/-
9.	Haemostasis	4,000/-
10.	Emergency Hemostasis	5,000/-
11.	Polypectomy	4,500/-
12.	Worm Removal	2,500/-
13.	PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)	8,000/-
14.	Doudenal Dilatation	4,500/-
15.	Stenting (Esophageal)	9,000/-
16.	Video Colonoscopy (Full)	2,500/-
17.	Short Colonoscopy	1,550/-
18.	Proctosigmoidoscopy	750/-
19.	Stenting (Rectal)	10,000/-
20	ERCP (Therapeutic)	4,000/-
21.	ERCP (Therapeutic) :	
	a. Papillotomy	11,500/-
	b. Stone extraction	14,000/-
	c. Stenting	14,000/- + (Stent)
22.	BND (Naso Biliary Drainage)	10,000/-
23.	Pseudopancreatic Cyst drainage	13,000/-
24.	FB removal from bile duct.P.duct	14,000/-
25.	PTC (Percutaneous Transhpetic Cholangiography)	3,500/-
26.	EBD (External Biliary Drainage)	8,000/-
27.	Liver Biophy (Fluoroscopy guided)	2,000/-
28.	US guided FNAC	2,500/-
29.	US guided liver Abscess drainage	4,000/-
30.	US guided Alcohol Injection in Hepatoma	4,000/-
31.	US guided liver Abscess drainage	4,000/-
32.	Hemorrholds Band ligation	4,000/-
33.	Liver Biophy (Blind)	1,500/-

Crescent Gastroliver & General Hospital Ltd.
House # 60, Road # 8/A, Dhanmondi, Dhaka. Tel : 9116851, 9137181-2.

for
SSC
HSC
Students

Physics | (Mechanics & Heat)
Physics || (Sound, Light & Magnet)
Physics ||| (Electricity, Electronics & Modern Physics)

Chemistry | (Introductory)
Chemistry || (Physical & Group Chemestry)
Chemistry ||| (Bio-Chemistry, Organic & Group Chemistry)

Collect Today!!

A unparalleled addition to the realm of science publications

Lively presentation of secondary and higher secondary syllabus and excellent implementation of scientific method of answering in exam

Biology | (Human BodY)
Biology || (Animal Diversity : Invertebrates)
Biology ||| (Plant Diversity)
Biology |V(Cell Biology, Plant Physiology, Plant Structure & Reproduction)
Biology V(Genetics, Biotechnology & Ecology)
Biology V| (Animal Diversity : Vertabrates & Zoogeography)

Where found :

Dhaka - Tofazzal Book House, Farmgate
- Dolphin, Nilkhel
- Universal Publications, Banglabazar
Chittagong - Maple Traders, 160\3, Shahzada Market Chawkbazar, Chittagong, 018-179124
Khulna - Sahi Book Corner
Barisal - Mahbub Library, Sadar Road, Barisal
Bogra - Islamia Boighar, Fateh Ai Mazar Road

I.C.S PUBLICATION
48/1 A Purana Paltan, Dhaka-1000
9566440, 8113998, 0171304738
e-mail-icspublication@yahoo.com

www.pathagar.com

উন্নতমানের আধুনিক ডি.টি.পি (সিস্টেম)
স্ক্যানিংসহ ছাপার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার যে কোন ছাপার জন্য

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমরা নিম্নে বর্ণিত খাতে দক্ষ, বিশ্বস্ত ও আন্তরিকতাপূর্ণ সেবার নিশ্চয়তা দিচ্ছি-

❖ দেশ-বিদেশে গমনাগমন এয়ার টিকেট সার্ভিস।
❖ সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে এনওসি ও ভিসা প্রসেসিং সার্ভিস।
❖ আন্তরিক-সযত্ন ওমরাহ ও হজ্ব সার্ভিস।
❖ নির্ভরযোগ্য আমদানী, রপ্তানী এবং সরবরাহ সার্ভিস।

রেদওয়ান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
REDWAN INTERNATIONAL LTD.
Government Approved Recruiting, Indenting & Traveling Agent

Licence No. RL- 473

Head Office : Malek Mansion (1st floor, 128 Motijheel C/A, Dhaka- 1000
Phone : 9551608, Fax : 880-2-9567029, E-mail : redwan@bdmail.net

Regd. Office : 128 J, Toyenbi, Circular Road, (1st floor, Fakirapool), Motijheel C/A, Dhaka- 1000
Phone : 9553508, 9552972, Fax : 880-2-9567029, E-mail : redwan@bdmail.net

২৫ বছর পূর্তি স্মারক

চেতনায় দীপ্তপথ

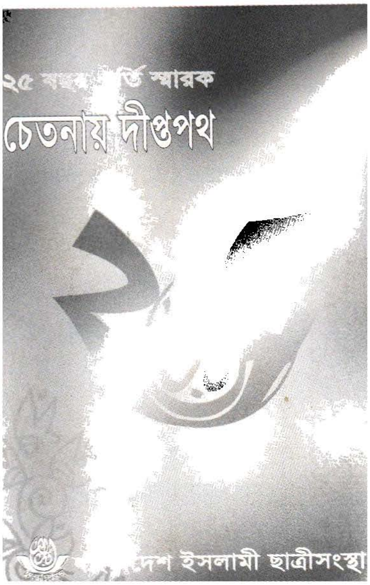

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা
৪৯৩,২/এ গ্রীণভ্যালী এপার্টমেন্ট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫১৭৮৬

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০০৩ ইং
কার্তিক ১৪১০ বাংলা
রমজান ১৪২৪ হিজরী

প্রচ্ছদ
এম. এ. আকাশ
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

অলংকরণ
সাজেদা হোমায়রা হিমু

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ এনায়েত হোসেন

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর কথা

দ্রুত প্রবাহিত সময় তার নির্দিষ্ট গতিপথে সদা প্রবহমান। বহমান সময় তার ধর্মে তৎপর। একটি সময় একটি সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। আবার তা কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়ে সভ্যতার নতুন কোন রূপায়ন উপহার দিয়ে যায়। সময়ের এই পালাবদল সত্যিই বিস্ময়কর কিন্তু অভেদ্য। পালাবদলের এই ধারায় মানুষ ও তার সৃষ্ট সভ্যতা এক দরজা পথ ছেড়ে আরেক দরজা পথেই কেবল উপনীত হয়েছে, কিন্তু সভ্যতা তার জন্য কোন নতুন দিগন্তের সন্ধান পায়নি। বরং এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারেই পর্যবসিত হয়েছে। যার ফলে সভ্যতার যাবতীয় আয়োজন আজ এক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি। এ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি কোথায়? হ্যাঁ, এক আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য অর্জনেই রয়েছে সভ্যতার সত্যিকার স্থিতি ও প্রশান্তি। এর মধ্যেই সভ্যতার জন্য রয়েছে শাশ্বত ও চিরন্তন এক লক্ষ্যের সন্ধান যা তার গতিধারাকে পরিবর্তন করে এক পবিত্র স্রোতধারায় পরিণত করে দেবে। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। আলোকময় নতুন প্রভাতের সূচনা হবে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা, সে পবিত্র স্রোতধারারই এক নাম, যা অনন্ত সমারোহে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মুসলিম জাতিসত্তার সত্যিকার মানযিলে পৌঁছার অন্যতম সহযাত্রী। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা তার এ প্রত্যয় দীপ্ত পথচলার ২৫টি বছর পার করে ২৬তম বর্ষে উপনীত। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ স্মারক আমাদের সুদীর্ঘ কর্মময় সময়গুলোর উজ্জ্বল স্বাক্ষরই পেশ করছে। তাই এ স্মারক আমাদের পেছন ফেলে আসা অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি, আগামীতে পথ চলার জন্য উজ্জ্বল পাথেয়। এ আত্মপ্রকাশে আমি সত্যিই আনন্দিত।

মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে অবিচল রাখুন এবং সমস্ত তাগুতী শক্তির মোকাবেলায় গোটা সমাজ ও সভ্যতাকে সমস্ত দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির চিরন্তন পথে ফিরিয়ে দিতে তাওফিক দান করুন। পঁচিশ বছরের পূর্ণতায় এটাই আমাদের একমাত্র কামনা। মহান আল্লাহ পাক আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

উম্মে খালেদা

(উম্মে খালেদা জাহান)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অধ্যক্ষ
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার মুখ্য দায়িত্ব আমাদের নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের। তারা আগামীর পথে এগিয়ে যাবে প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরির মাধ্যমে। কিন্তু সময়ের কালস্রোতে তাদের নৈতিকতার অবক্ষয় আজ জাতির মনে নতুন আশংকার সৃষ্টি করছে।

সভ্যতার ক্রান্তিলগ্নে তাই আজ নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ছাত্রী অংগনে এ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করে চলেছে ২৫ বছর। এ পরিক্রমায় তারা যে "স্মারক" বের করতে যাচ্ছে আমি তার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

M. Abdullah

(অধ্যাপক ডাঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অধ্যক্ষ
রংপুর মেডিকেল কলেজ
রংপুর

আজ মুসলিম বিশ্বাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা–ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তাদের সকল কুট-কৌশল ও ষড়যন্ত্রে তৎপর। এমন দিনে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার পদচারণা দেখায় মজলুমের মুখে হাসি ফুটানোর বিশ্বাসী প্রত্যয়। আজ পশ্চিমাদের প্ররোচনায় তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে পদে পদে নারী সমাজ নির্যাতিত-অবহেলিত; হয়ে উঠেছে ব্যবসার পণ্য। এবং দিতে হচ্ছে চরম মূল্য। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নর-নারী সমান অধিকারের কথা যেখানে বলা হয়েছে– সেখানে মানুষ পশ্চিমা চাকচিক্যের মোহে ধর্ম থেকে দূরে গিয়ে এই অকল্যাণ ডেকে নিয়ে এসেছে। মানুষের তৈরি আইন কোনদিন মানুষের সঠিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কারণ মানুষ তার সম্মুখের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও অনুভূতির সীমারেখা অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে না। শান্তির অন্বেষায় তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জনে ইসলামকে উপেক্ষা করে আপাতত আকর্ষণীয়, ভিত্তিহীন মানব রচিত মনগড়া মতবাদের শ্লোগান তুলে সীমাহীন বেলাল্লাপনায় দিশেহারা নারীমাতৃকুল। সমগ্র বিশ্বই আজ মানব রচিত মতবাদের পূজায় ব্যস্ত এবং মুসলমানরা স্বকীয়তা ও নিজস্ব পরিচয় ভুলে এই ভুল মতেরই আনুগত্য করছে।

মুসলমানদের এই সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ছাত্রীদের তথা সকল নারীদের মধ্যে শাশ্বত ইসলামের জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস অত্যন্ত গৌরবজনক।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সমীপে প্রার্থনা, তাদের এই প্রয়াস আরও গতিশীল ও কামিয়াবী অর্জন করুক এবং বিশ্বনারী তথা সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য বয়ে আনুক সকল কল্যাণের আশা।

(প্রফেসর এম. এ. সোবহান)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

অধ্যক্ষ
সরকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ২৫ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমরা জানি যে, সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশের নারী সমাজও নানা কারণে পিছিয়ে আছে। ইসলাম সকলের জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ করেছে। একবিংশ শতাব্দির এ সূচনালগ্নে বিশ্ব ব্যাপী নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে এ পিছিয়ে পড়া অবহেলিত নারীদের এগিয়ে আনতে চাই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত, মূল্যবোধে উজ্জীবিত ও সুসংগঠিত নারীমুক্তি আন্দোলন। নারীমুক্তি তথা মানবমুক্তির এ মহান উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ২৫ বছর ধরে যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। দূর যাত্রীর এ প্রচেষ্টায় যুক্ত হোক কোটি কোটি নারী কণ্ঠ। আমি এ সংগঠনের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

(আয়েশা শিরিন)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিন্সিপ্যাল
ইডেন মহিলা কলেজ
ঢাকা

১৯৭৮ সালের ১৫ জুলাই "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা" হাঁটি হাঁটি পা পা করে তাদের যাত্রা শুরু করে। কালের পরিক্রমায় আজ এ সংগঠন ২৫ বছরে পদার্পণ করেছে।
২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংগঠনটি বের করতে যাচ্ছে একটি স্মরণিকা। আমি তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক তাদের এ পরিশ্রমকে সার্থক করুন। আমীন।

(দিলারা হাফিজ)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অধ্যক্ষ
কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
রংপুর

জাহেলিয়াতের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যে কলুষিত আজকের এ সামাজিক অবস্থায় নারী সমাজই সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত, নির্যাতিত এবং বঞ্চিত, অথচ নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারও আজ সর্বত্র। তবু ফিরে পাচ্ছে না নারীরা তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা। এর কারণ নারীরা নিজেরাই তাদের নিজেদের যথাযথ মর্যাদা এবং কোন পথে তা আসতে পারে এ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অসচেতন।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ইসলামী আদর্শবাহী একটি একক, ব্যতিক্রমধর্মী ছাত্রী সংগঠন, ছাত্রীসমাজকে আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে গড়ে তোলা, আল্লাহ্ তায়ালার দেখানো পথে চলে তার সন্তোষ অর্জন এবং নিজেদের যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে এ সংগঠন।

আলহামদুলিল্লাহ। এ সংগঠন তার প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্ণ করেছে। আল্লাহ পাক এ সংস্থার লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে কবুল করুন এবং প্রত্যেকটি নারীর নিকট ইসলামের দেখানো শান্তি পথের সন্ধান পৌঁছে দেবার তৌফিক দিন, এ দোয়া করছি।

(প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অধ্যক্ষ
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
কুমিল্লা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে আমরা যখন প্রতিনিয়ত তলিয়ে যাচ্ছি অজ্ঞানতার অন্ধকারে, পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিতে; ভোগবাদী কামনা বাসনার স্রোতে আমরা যখন গা ভাসিয়ে দিয়েছি তখন এই স্মারক পত্রিকা মুসলিম ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে ছাত্রীদের সুষ্ঠু দিক নির্দেশনা দিবে এ আমার বিশ্বাস।

স্মারক পত্রিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভ কামনা।

(প্রফেসর মোঃ আশরাফুল ইসলাম)

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ
সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ
পাবনা

সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা মানব জীবনের একটি অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আদর্শ মানুষ পদচারণা করে থাকে। মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনকে কলুষতামুক্ত করে সুন্দর সাবলীল গতিশীল সৎ জীবনপথ তৈরিই আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য। সে কারণেই শিক্ষার বিকল্প কিছু নেই। যথার্থ শিক্ষাই আমাদের মনকে আলোকিত করে কাঙ্ক্ষিত সেই সুন্দর পথের সন্ধান দেয়।

জাতিকে আশার আলো দেখাতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ২৫ বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ ছাত্রীসংস্থার ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে 'স্মারক' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(প্রফেসর নিত্য গোপাল আস)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

অধ্যক্ষ
আনন্দ মোহন কলেজ
ময়মনসিংহ

২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা একটি স্মারক সংখ্যা বের করতে যাচ্ছে শুনে আমি আনন্দিত। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দরুন জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ মারাত্মক দুর্দশা নেমে এসেছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, খুন, নারী-নির্যাতন, মাদকের ব্যবহার সমাজ জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলছে। আমাদের তরুণ সমাজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে। ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও বিধিবিধান মেনে চললেই এ দুঃসহ অবস্থা থেকে সমাজ পরিত্রাণ পেতে পারে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রীদেরকে ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত করার জন্য যে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাদের কর্মকাণ্ড দ্বারা ছাত্রীসমাজ নৈতিকমূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হবে। এটাই আমার বিশ্বাস।

আমি তাদের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করি। আল্লাহ হাফিজ।

(প্রফেসর ড. মো. আজিজুর রহমান)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অধ্যক্ষ
হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ
চট্টগ্রাম

প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সিঁড়ি বেয়ে পৃথিবী যখন উপরের দিকে ধাবমান ঠিক তখনই নৈতিক মূল্যবোধের চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি সভ্যতা। বর্তমানে ছাত্রী সমাজ আজ পশ্চিমা অপসংস্কৃতির সয়লাবে নৈতিক অবক্ষয় ও অশ্লীলতার স্রোতে ভাসমান, ঠিক তখনই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ইসলামের সুশীতল ঝাণ্ডা হাতে এগিয়ে এসেছে ছাত্রী সমাজের প্রকৃত মুক্তির দিক-নির্দেশনা নিয়ে। সেই সাথে অনৈতিক ও বস্তুবাদী শিক্ষার বিরুদ্ধে ছাত্রী সমাজের সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং কুরআন ও রাসূলের শিক্ষায় দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে এই বিপ্লবী সংগঠন। দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে এই নির্ভীক কাফেলা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। আর তাই আমি তাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবং এই সংগঠন যেন ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পেরিয়ে পুরো বিশ্বে এই দু'আ করি। আর ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যে স্মারক প্রকাশ হতে যাচ্ছে আমি এর সফলতা কামনা করি। আল্লাহ তাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

(প্রফেসর মোঃ জসীম উদ্‌দীন)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ডীন
বিজ্ঞান অনুষদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংস্থাকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, সংঘাত ও ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তা চলতেই থাকবে এবং এই সব প্রতিহত করার জন্য একদল লোকও সৃষ্টি হবে। ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কর্মীরা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলামের ওপর যে চরম আঘাত আসছে তা ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ে শুভ সূচনারই পরিচায়ক। এতে আমাদের দুঃখ না করে খুশি হওয়ারই কথা। ইসলামী ছাত্রীসংস্থা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, তফসীর ক্লাস, ইসলামী সংস্কৃতি, সাহিত্য পত্রিকা, শিক্ষা শিবির এবং অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলিম ছাত্রীদেরকে মহান আল্লাহ্‌র খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য যোগ্য করে তোলার যে জেহাদী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তা অতুলনীয়। আমি তাদের এই কর্মকাণ্ড আরও বর্ধিত পরিসরে করার জন্য আহ্বান জানাই। এবং দোয়া করি মহান আল্লাহ্‌ যেন তাদের এই নেক আমল কবুল করে তাদেরকে উভয় জগতে কামিয়াবী করেন। আমিন।

(ডঃ এম, এ, সালেহ)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ডীন,
বিজ্ঞান অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মহিলাগণ আল্লাহ্‌র পথে পুরুষদের পাশাপাশি দাওয়াতে দীনের কাজ করে আসছে। এ স্রোতধারায় নৈতিক পুনর্গঠন ও জ্ঞানানুশীলনের উত্তম কর্মসূচি নিয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা যাত্রা শুরু করেছে। তাদের এ যাত্রার ২৫ বছর পূর্তিতে সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(নূরুল আবসার)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ডীন
থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে। তাদের আয়োজনটুকু একটু ব্যতিক্রমধর্মী বহুমাত্রিক হচ্ছে– কারণ এ বছর সংগঠনটি তাদের অগ্রযাত্রার রজতজয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে। এ দেশের ধর্মপ্রাণ ও শিক্ষিত মুসলিম সমাজে ইসলামী ছাত্রীসংস্থার পরিচিতি নতুন করে তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইতোমধ্যে এই সংস্থাটি আদর্শভিত্তিক কর্মধারার মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে যুব মহিলা তথা ছাত্রী সমাজে বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই সাথে স্বীয় কর্মপরিধিও বৃদ্ধি করে চলছে। আল হামদুলিল্লাহ।

তবে এটা সত্য যে, পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে এ দেশের মানুষ যে হারে নিমজ্জিত হচ্ছে– বিশেষ করে যুব সমাজ– সে তুলনায় এর প্রতিরোধে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত সংগঠনের সংখ্যা নিতান্তই কম। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা নারী সমাজে বিশেষত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রীদের মধ্যে এ ধরনের একমাত্র সংগঠন। তাই তাদের কার্যক্রম ও আদর্শিক দায়-দায়িত্বের বোঝা যে কত বিশাল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এ সংস্থার বোনেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং একমাত্র তাঁরই রহমতের ওপর ভরসা করে তাদের ওপর অর্পিত সুবিশাল আদর্শিক দায়িত্ব পালনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রার্থনা করি রাব্বুল আলামীন যেন তাদের এ মহতী প্রচেষ্টা কবুল করেন। প্রসঙ্গত এ দেশের সুধীমহলে আকুল আবেদন, আপনারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব অনন্য এ ছাত্রীসংস্থাটিকে অনুপ্রেরণা প্রদান করুন। আপনার এতটুকু সহানভুতি ও অনুপ্রেরণা তাদের চলার পথকে খানিকটা হলেও কুসুমাস্তীর্ণ করতে সহায়তা করবে। এটি আপনার আমার যেমন নৈতিক দায়িত্ব, তেমনি দ্বীনি কর্তব্যও বটে।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে তাঁর দীনের পথে একনিষ্ঠ থেকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের তৌফিক দান করুন। আমীন। "ইয়া রাব্বাল আলামীন"

(ডঃ এ. কে. এম. নূরুল আলম)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ডীন
ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গভাবে আমরা সেই স্বপ্নকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। নানামুখী সমস্যায় নিমজ্জিত আজকের এই বাংলাদেশে নারী সমাজ সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও নির্যাতিত এবং তাদের পূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত। পবিত্র ইসলাম ধর্মে নারী সমাজকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদানসহ তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলামে স্বীকৃত নারীদের এই অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী ছাত্রীসংস্থা একটি গঠনমূলক এবং কার্যকর ভূমিকা রাখবে এটিই প্রত্যাশিত। আমি তাদের সর্বাধিক সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর এম, আলাউদ্দিন)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ডীন
মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

যে দিক থেকেই দেখা যাকনা কেন সমকালীন ঘটনাপ্রবাহে বিশ্ববিবেক আজ নিস্তব্ধ। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার যে কোন সময়ের চেয়ে ভয়াবহ। স্যাটেলাইট আর পশ্চিমা সংস্কৃতির ভয়াল প্রভাবে সামান্য বিবেকবানরাও শ্বাসরুদ্ধ। তথাকথিত নারীবাদীদের সস্তাবুলি ও শ্লোগানের সাড়া দিয়ে নারীসমাজ তাদের যথাসর্বস্ব হারাতে বসেছে। খোদ পশ্চিমা সমাজের নারীসমাজ যখন মতলববাজ প্রগতিবাদীদের খপ্পর থেকে নিষ্কৃতি পেতে বিকল্পের অনুসন্ধান করছে- ঠিক তখনই তাদেরই উচ্ছিষ্টভোগী একশ্রেণীর ধান্দাবাজ-বুদ্ধিজীবী নারীবাদীরা নারীপ্রগতির নামে আমাদের সরলমনা নারী সমাজের সরলতার সুযোগ নিয়ে এক সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে। সময় থাকতে এদেরকে প্রতিহত করা না গেলে আগামীতে জাতিকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে। বলাবাহুল্য, নারীবাদীরা ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে আমাদের পবিত্র ক্যাম্পাসগুলোকেই।

চির দ্বান্দ্বিক সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে মিথ্যার পরাজয় অনিবার্য। অসভ্য সমাজের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে বিবেকবানরা আজ মুক্তির অন্বেষায় ছুটে আসছে কুরআনের পথে। বিশ্ব মানবতা অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে ইসলামের পথে। সব মিলিয়ে আগামী দিনের সূর্যোদয় যেন ইসলামের সূর্যোদয়, আর এই দীপ্ত কাফেলার অগ্রসেনানী হিসেবে ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ছাত্রীসমাজের নিকট ইসলামের উদাত্ত আহ্বান পৌঁছে দেয়ার পবিত্র দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন এবং পথও বন্ধুর। তবে কোন প্রতিবন্ধকতাই তাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণিকা বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দবোধ করছি। রাব্বুল আলামীন তাদের এ উদ্যোগ কবুল করুন। আমীন। পরিশেষে মুক্তির কাফেলায় তোমাদেরকে সুস্বাগতম।

(ড. আ. ব. ম. মুখলেছুর রহমান)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ডীন
আইন ও শরীয়াহ অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ইসলাম মেয়েদের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ তারা নিজেদের অবস্থান থেকে অনেক দূরে। নারী স্বাধীনতার নামে মেয়েরা আজ বেছে নিচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগবাদী সংস্কৃতি। যা শুধু ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এতেও কি মেয়েরা ফিরে পেয়েছে মর্যাদা, সম্মান, স্বস্তি? না। কেননা ইসলামই নারী মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। আর সেই ইসলামের আলোকবর্তিকা বুকে ধারণ করে পথহারা ছাত্রীদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে ছাত্রীদের মাঝে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা। আইয়্যামে জাহেলীয়াতের মত নারী সমাজকে সঠিক আলোর পথ দেখাতে, সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে এ সংগঠন বদ্ধপরিকর। খুব শীঘ্রই এ সংগঠন তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হবে এ প্রত্যয় আমার আছে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ১৯৭৮ সালের ১৫ই জুলাই থেকে শুরু হয়ে গুটি গুটি পায়ে তার ২৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং ২৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্মারক বের করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দো'য়া করি তিনি যেন শীঘ্রই এ সংগঠনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর তৌফিক দেন। আমীন।

(শহীদ আহ্‌মেদ চৌধুরী)

www.pathagar.com

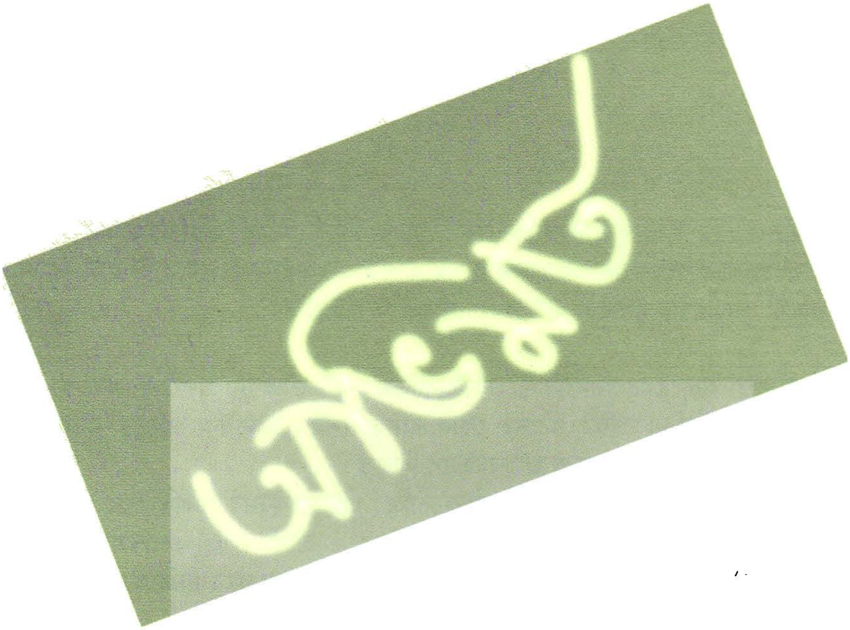

www.pathagar.com

অভিমত

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি স্মারক প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ১৯৭৮ সালে যে ছাত্রীসংস্থা মাত্র কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীর সহযোগিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে যাত্রা শুরু করেছিল; তার সাহসী পদচারণায় মুখরিত আজ বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তর।
আলহামদুলিল্লাহ।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ইসলামের আদর্শবাহী একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও অনন্য সংগঠন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের কোন ব্যবস্থা নেই। আদর্শিক জ্ঞানের অভাব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণে নারী সমাজ আজ চরমভাবে বিভ্রান্ত।
প্রগতির নামে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে সর্বত্র। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সমস্ত প্রতিকূলতা ও বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে ছাত্রীসংস্থা মা-বোনদের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত শাশ্বত জীবন বিধান ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ছাত্রীদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
তাদের এ বলিষ্ঠ তৎপরতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের মাঝে বৃদ্ধি পেয়েছে ঈমানী চেতনা, বৃদ্ধি পেয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব।
বর্তমানের যৎসামান্য অনুকূল পরিবেশকে আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে গণ্য করে সময় ক্ষেপণ না করে এ কাফেলাকে আরও দৃঢ়পদে এগিয়ে যেতে হবে অভীষ্ট লক্ষ্য পানে।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা, ছাত্রী ও নারী সমাজের জন্য আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার আন্তরিক প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও কুরবানী কবুল করুন, তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখুন ২৫ বছর পূর্তির এ শুভক্ষণে এই কামনা করি।

জাহান আরা আজহারী

সেক্রেটারী
মহিলা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

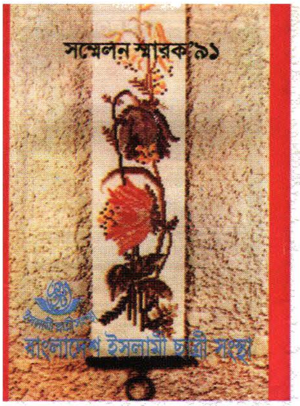
সম্মেলন স্মারক'৯১
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা

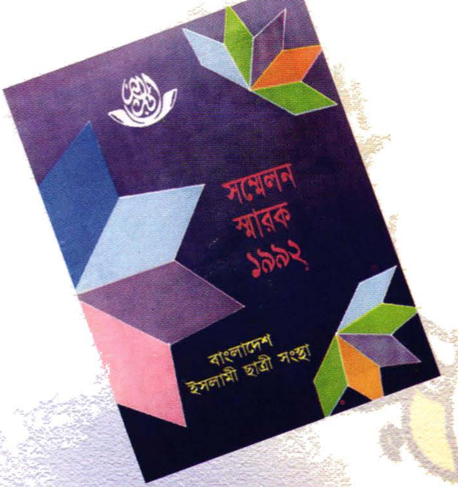
সম্মেলন
স্মারক
১৯৯২
বাংলাদেশ
ইসলামী ছাত্রী সংস্থা

সম্মেলন
স্মারক
'৯৩
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

সম্মেলন
স্মারক: ৯৪
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

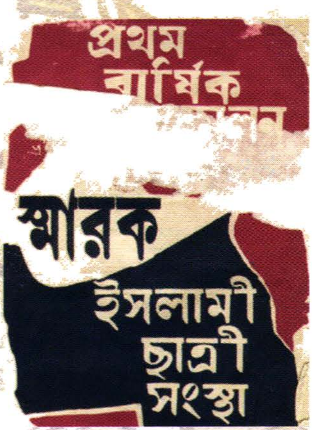
প্রথম
বার্ষিক
স্মারক
ইসলামী
ছাত্রী
সংস্থা

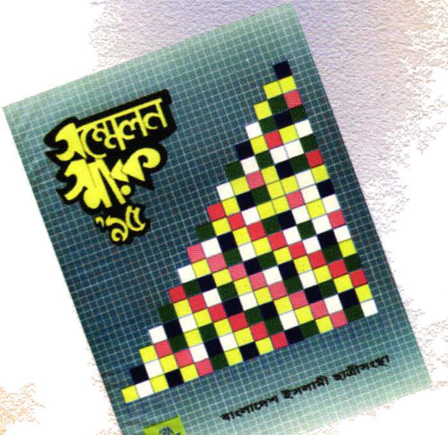
সম্মেলন
স্মারক
'৯৫
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

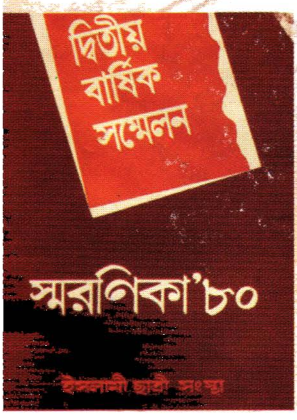
দ্বিতীয়
বার্ষিক
সম্মেলন
স্মরণিকা'৮০
ইসলামী ছাত্রী সংস্থা

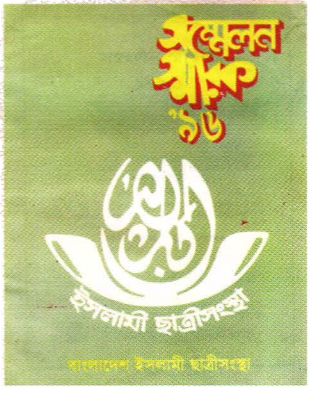
সম্মেলন
স্মারক
'৯৬
ইসলামী ছাত্রীসংস্থা
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

www.pathagar.com

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কার্ড সমূহ

www.pathagar.com

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কার্ড সমূহ

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কার্ড ও প্যাড সমূহ

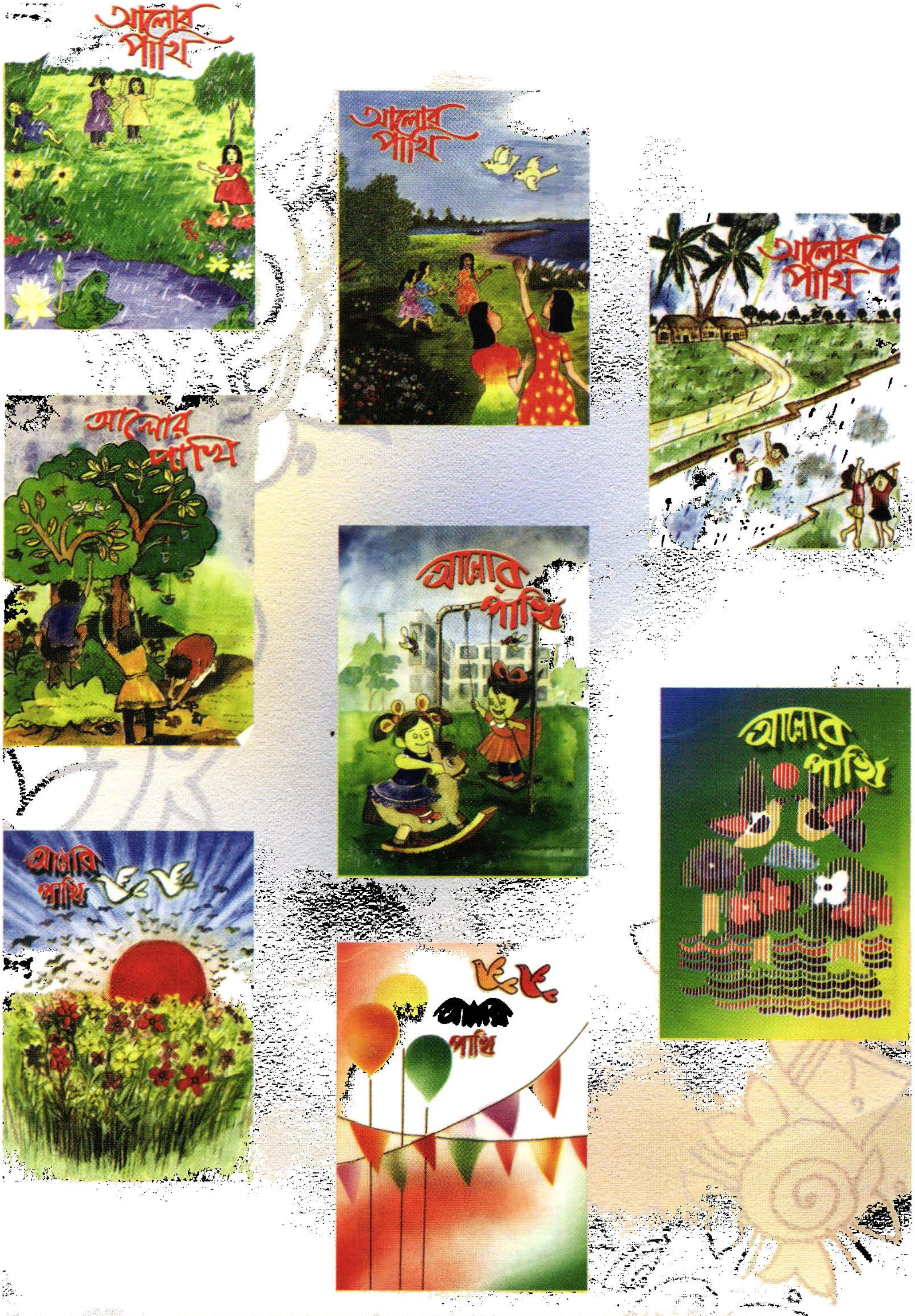

কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত শিশুতোষক পত্রিকা 'আলোর পাখি'

www.pathagar.com

ছাত্রীবার্তা
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা
রাহবার
সমন্বয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা
সেমিনার
স্মরণিকা
'৮৩

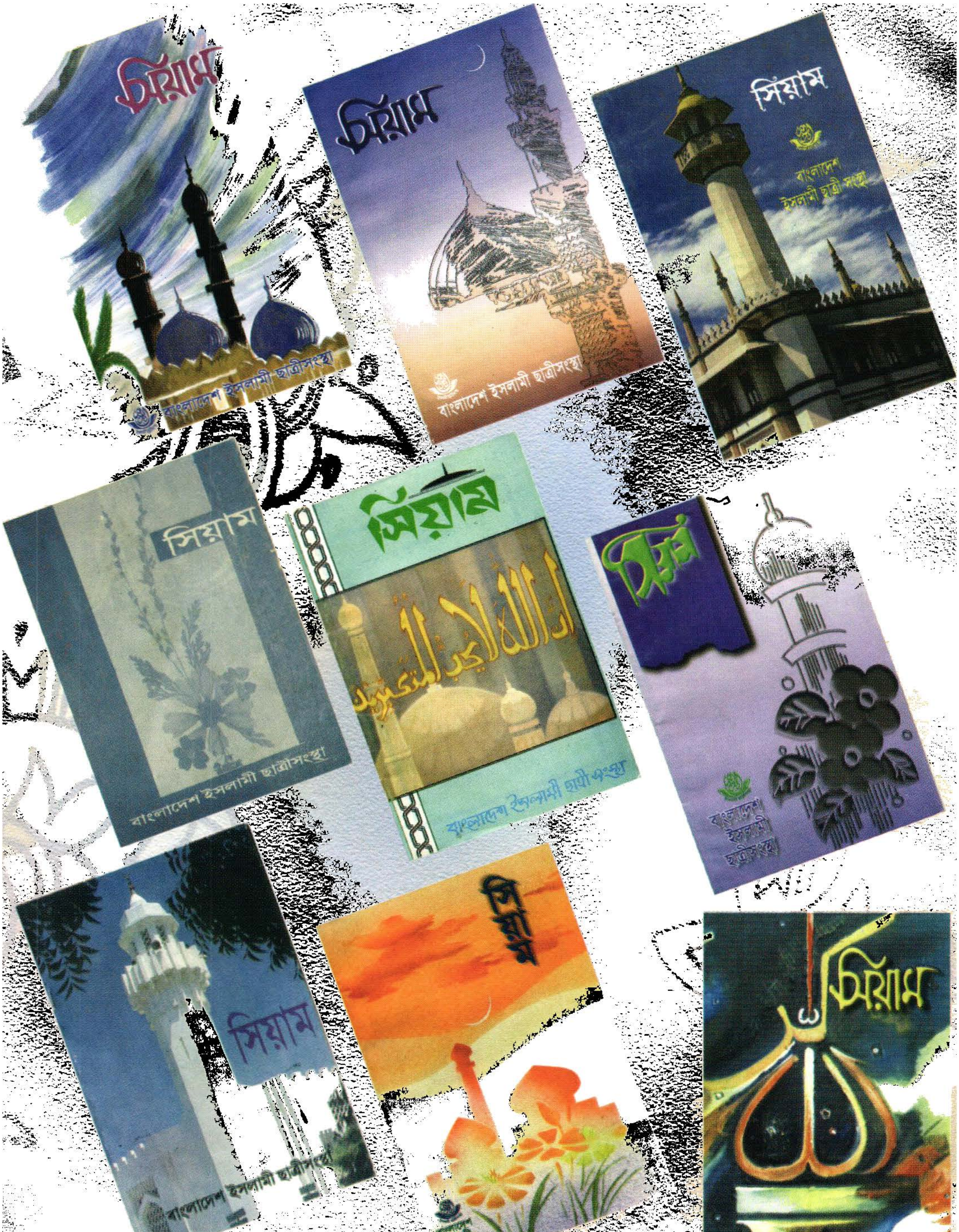

কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সিয়াম

www.pathagar.com

কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত সিয়াম

www.pathagar.com

কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত স্টিকার

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ক্যালেন্ডার সমূহের একাংশ

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ক্যালেন্ডার সমূহের একাংশ

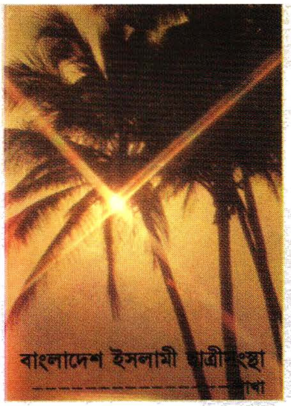

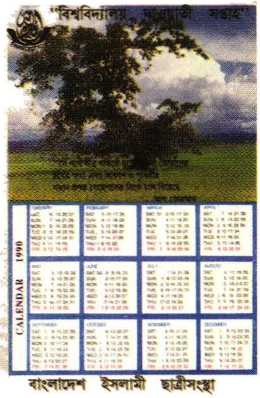

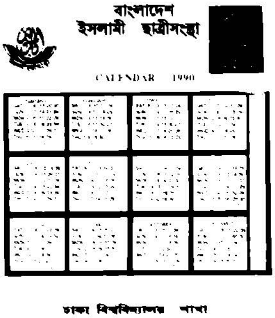

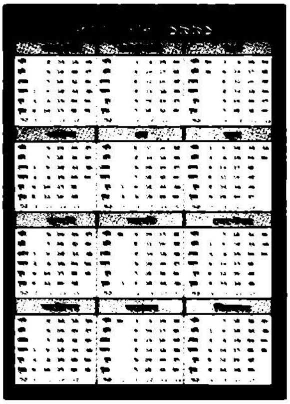

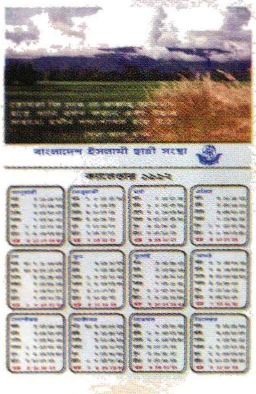

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ক্যালেন্ডার সমূহের একাংশ

www.pathagar.com

বিভিন্ন শাখা কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনা সমূহ

সীরাত (সাঃ) উপলক্ষে, ঢাকা মহানগরী কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রত্যয়'

সীরাত (সাঃ) উপলক্ষে, ঢাকা মহানগরী কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রত্যয়'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

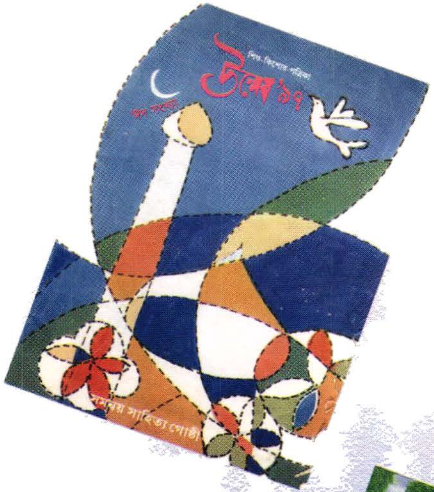

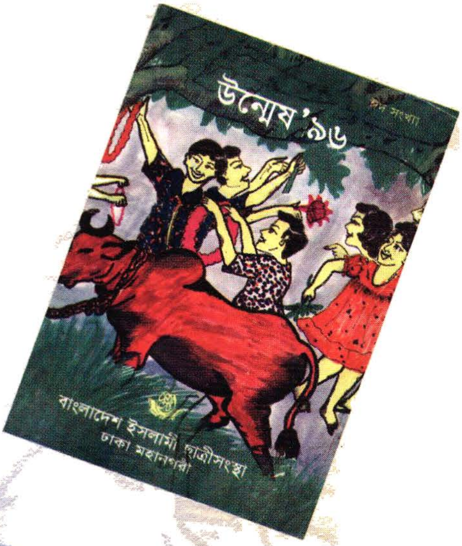

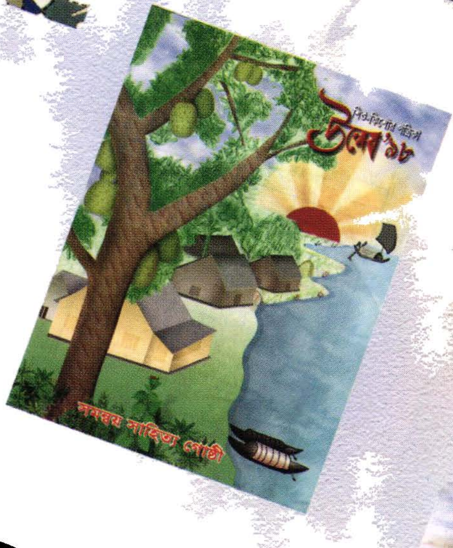

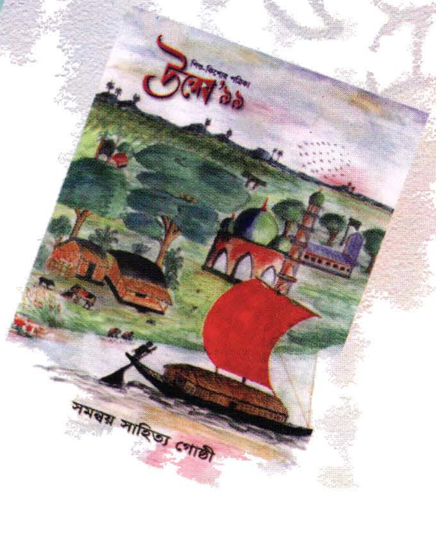

www.pathagar.com

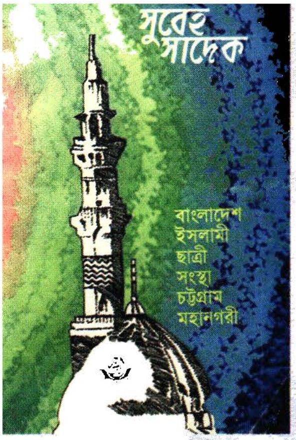

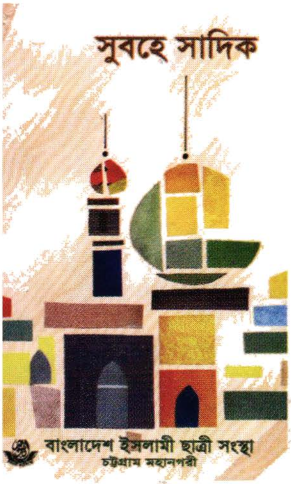

www.pathagar.com

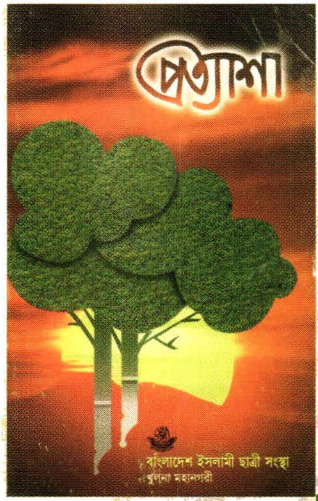

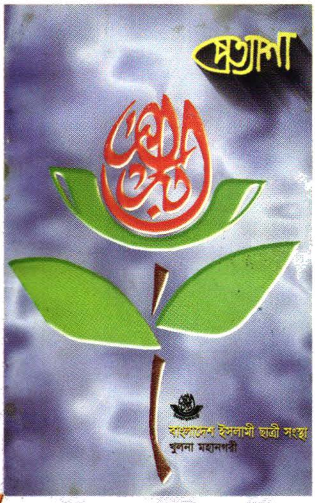

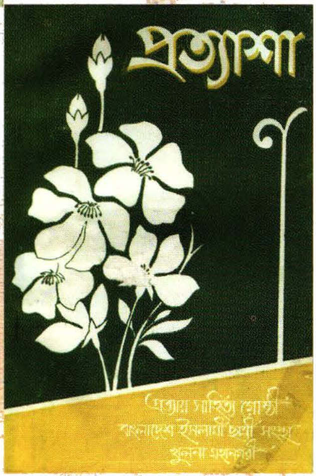

খুলনা মহানগরী কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রত্যাশা'

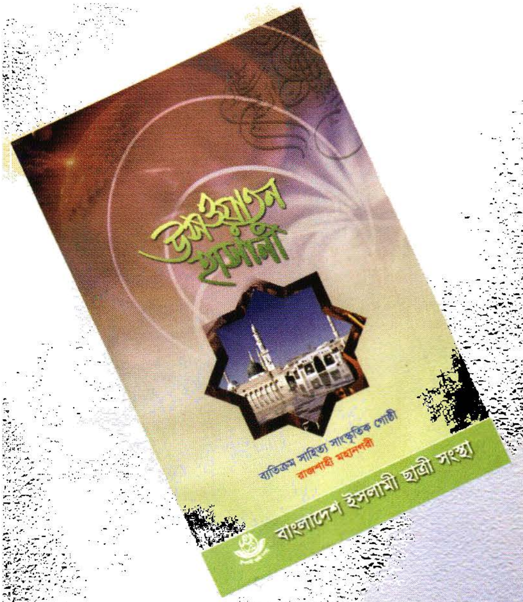

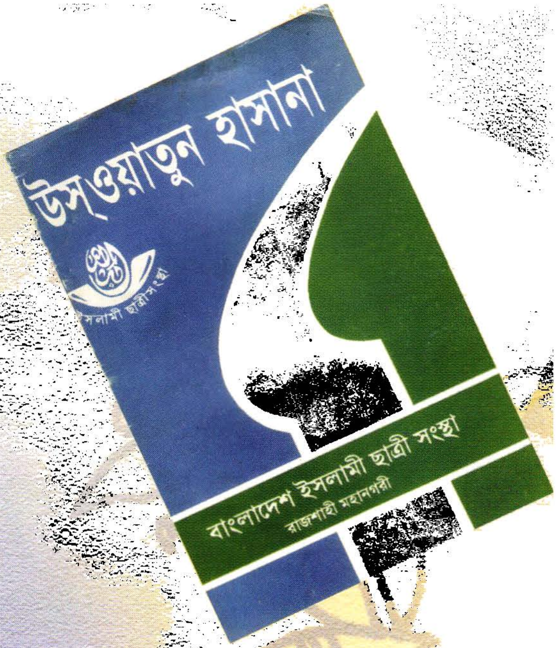

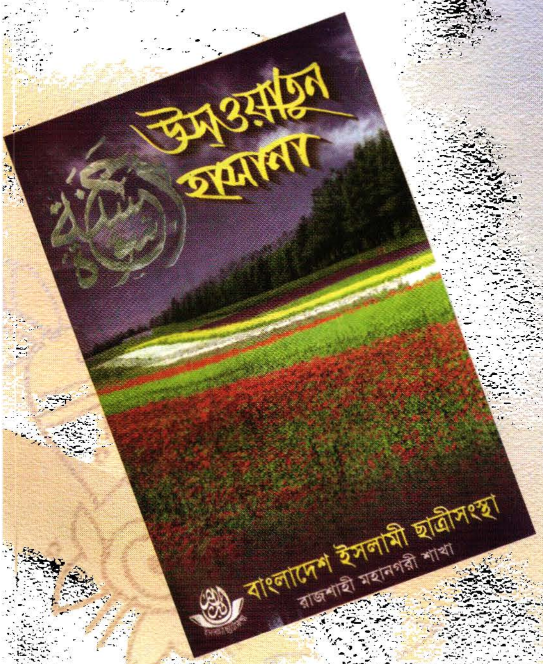

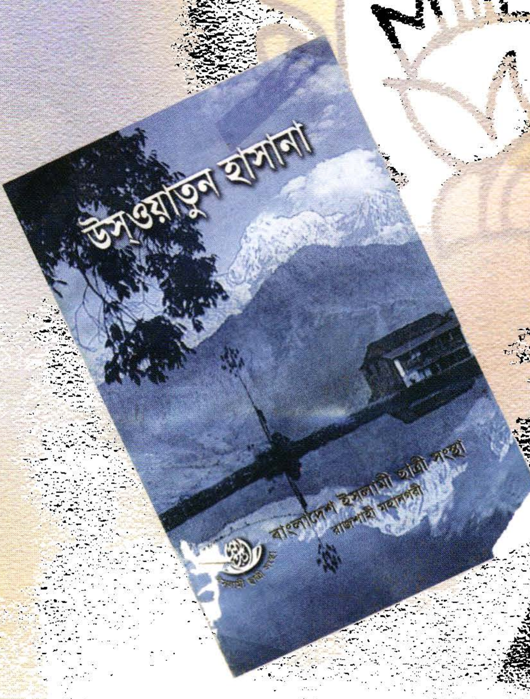

রাজশাহী মহানগরী কর্তৃক প্রকাশিত 'উসওয়াতুন হাসানা'

www.pathagar.com

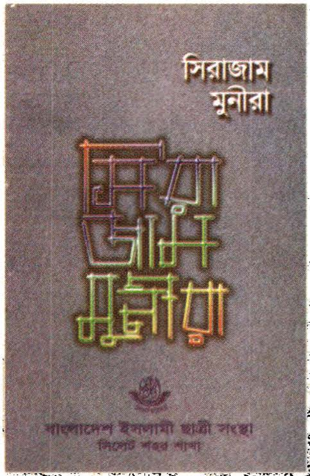

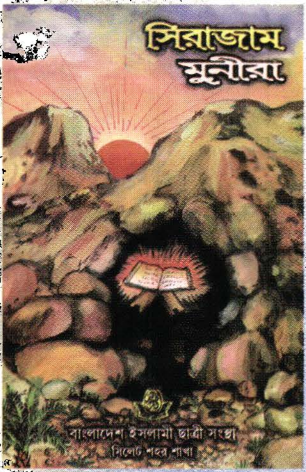

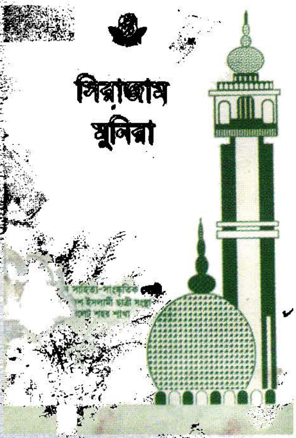

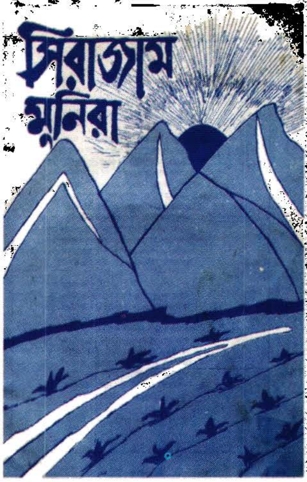

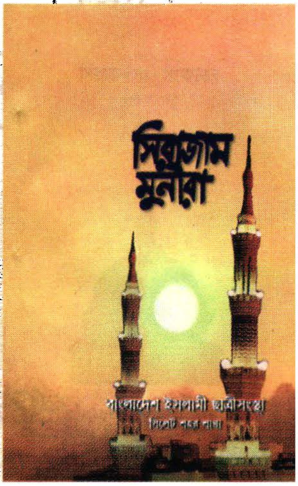

www.pathagar.com

ঢাকা মেডিকেলের প্রকাশিত পত্রিকা

www.pathagar.com

পাবনা শহর কর্তৃক প্রকাশিত 'স্পন্দন'

বিভিন্ন শাখা কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা

www.pathagar.com

বিভিন্ন শাখা কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা

মুদারাবা মোহর সঞ্চয় প্রকল্প

শরীয়াহর দৃষ্টিতে স্ত্রীদের অন্যতম অধিকার দেনমোহর স্বামীর উপর ফরজ। এই ফরজ আদায়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড **মুদারাবা মোহর সঞ্চয় প্রকল্প** চালু করেছে।

দেশের যে কোন দায়িত্ববান বিবাহিত পুরুষ তাঁর স্ত্রীর নামে এ প্রকল্পের আওতায় ৫০০, ১০০০, ২০০০, ৩০০০, ৪০০০ ও ৫০০০ টাকা মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদী হিসাব খুলতে পারেন।

এছাড়াও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পের আওতায় মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব, মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব, মুদারাবা মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব, মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব (সঞ্চয়)-সহ বিভিন্ন মেয়াদের সঞ্চয়ী ও অদীয়াহ চলতি হিসাব খোলা যায় এবং মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড কেনা যায়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের যে কোনো শাখায় যোগাযোগ করুন

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত